

বিদ'আত (البدع)
ও
প্রচলিত কুসংস্কার

সাজ্জাদ সালাদীন

সূচী পত্র

ক্রঃ নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
০১	প্রারম্ভিকা	০৬
০২	বিদ'আতের সংজ্ঞা	১৪
০৩	বিদ'আতের বৈশিষ্ট্য	২৯
০৪	সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্য	৩৪
০৫	বিদ'আতের মৌলিক নীতিমালা	৩৭
০৬	বিদ'আতের প্রকারভেদ	৫৮
০৭	দ্বীনের ভিতর বিদ'আতে হাসানাহ বলে কিছু আছে কি?	৬১
০৮	বিদ'আতের ধরন	৭৫
০৯	বিদ'আত প্রচলন ও বিদ'আত উৎপত্তির কতিপয় কারণ	৭৮
১০	বিদ'আতের অপকারিতা	১০০
১১	আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য বিদ'আত ও প্রচলিত কুসংস্কার	১১১
১২	শবে মেরাজের রাত্রি উদযাপন করা	১১৪
১৩	মাহে শাবান ও শবে বরাত (شب براءت) করণীয় ও বর্জনীয়	১৩৭
১৪	শারী'য়াতের দৃষ্টিতে 'ঈদে মীলাদুন্নাবী বা মীলাদ মাহ্‌ফিল এবং কিয়াম - নব আবিষ্কৃত বিদ'আত	২০৭
১৫	মীলাদে কিয়াম করা প্রসংঙ্গ	২৪০
১৬	বিয়ে সংক্রান্ত প্রচলিত কিছু বিদ'আত	২৫৮
১৭	নামাযের শুরুতে মুখে নিয়ত পাঠ করা	২৯৫
১৮	ফরয নামাযের আগে-পরে দলবদ্ধভাবে জিকির করা	২৯৬
১৯	রুকুতে রাফ'উল ইয়াদাইন "(দু'হাত উঠান)" ছেড়ে দেয়া সুন্নাহ বিরোধী কাজ তথা বিদ' আত	২৯৯
২০	উচ্চে কঠে বা চিৎকার করে যিকির করা বা হালকায়ে যিকিরের অনুষ্ঠান করা	৩১৯
২১	মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিদ'আত	৩১৯
২২	জানাযা নামাজ শেষে সম্মিলিতভাবে দুআ-মুনাজাত	৩২৬
২৩	কুলখানি বা চল্লিশা পালন	৩২৭
২৪	মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা	৩২৮
২৫	রুহের মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে ফাতিহা পাঠের বিদ'আত	৩২৯

২৬	কবরে মামত পেশ, পশু যবেহ এবং খতমে কুরআনের বিদ'আত	৩৩১
২৭	কবরের কাছে বা মাযারে, পথের ধারে কুরআন পাঠ	৩৩২
২৮	তথাকথিত পীর ব্যবসা বা পীরের মুরিদ হওয়া সর্ব উৎকৃষ্ট বিদ'আত	৩৩৫
২৯	ওরস	৩৩৬
৩০	ফরয সালাতের পরে সম্মিলিত মুনাজাত - একটি প্রচলিত বিদ'আত	৩৩৮
৩১	শাহাদাত আঙ্গুলে চুঘন করা ও চোখে মাসাহ করা	৩৩৯
৩২	প্রচলিত তাবলীগ এবং চিল্লা প্রথা	৩৪১
৩৩	মৃত ব্যক্তির কাযা বা ছুটে যাওয়া নামাজ সমূহের কাফফারা আদায় করা	৩৫৪
৩৪	জামাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়া সুন্নাহ বিরোধী কাজ তথা প্রচলিত বিদ'আত	৩৫৮
৩৫	জোরে আমীন না বলা সুন্নাহ বিরোধী কাজ তথা বিদ'আত	৩৬২
৩৬	ঢিলা কুলুখ নিয়ে হাঁটাহাঁটি করা	৩৭৪
৩৭	প্রচলিত পদ্ধতিতে কেক কেটে, মোমবাতি নিভিয়ে বার্থ-ডে বা জন্মদিন পালন করা কি সুন্নাহ না বিদ'আত	৩৭৬
৩৮	দুআকে অবহেলা করা ও আনুষ্ঠানিকতাকে উত্তম মনে করা	৩৭৭
৩৯	দানের ক্ষেত্রে সুন্নাহ পদ্ধতির চেয়ে প্রচলিত আনুষ্ঠানিকতাকে গুরুত্ব প্রদান	৩৭৮
৪০	এ সকল কাজের জন্য কোনো দিন বা মৃত্যু দিনকে নির্ধারণ করা	৩৭৯
৪১	“স্বাদাক্বাল্লাহুল আযীম” (صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ) পড়া কি শরীয়ত সম্মত?	৩৮০
৪২	তসবীহ গুনতে তাসবীহ-মালা ব্যবহার করা কি বিদ'আত	৩৮৮
৪৩	হজ্জের বিদ'আতসমূহ	৩৮৯
৪৪	ফযরের আযানে বিদ'আত	৩৯৭
৪৫	বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত খতমে (ختم) বিদ'আত	৪০০
৪৬	আযান ও ইকামতে বিদ'আত	৫০৩
৪৭	সালাতে নাতীর নিচে হাত বাঁধা সুন্নাহ বিরোধী কাজ তথা বিদ'আত	৫০৬
৪৮	মুহাররম মাসের সুন্নাহ ও বিদ'আত	৫০৯
৪৯	অন্যান্য বিদ'আতী কাজ এবং সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার সমূহ	৫২১
৫০	বিদ'আত প্রসঙ্গে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী (রহঃ) এর নসীহত	৫২২
৫১	প্রচলিত কুসংস্কার	৫২৫
৫২	বিদাতীর পরিচয়, বিদ'আতী চেনার উপায়, বিদাতীর কাজের পরিণতি সম্বন্ধে শরীয়তের ফয়সালা কি, বিদ'আতের ভয়াবহতা এবং দ্বীনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা	৫৩৯
৫৩	বিদ'আতের নিন্দা, তিরস্কার ও তা থেকে সতর্কতা প্রদর্শন	৫৫৪
৫৪	বিদ'আত চেনার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি	৫৪৭

৫৫	বিদ'আতের ভয়াবহতা	৫৪৯
৫৬	বিদআতের নিন্দা, তিরস্কার ও তা থেকে সতর্কতা প্রদর্শন ও দ্বীনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা	৫৫৪
৫৭	বিদ'আতের ব্যাপারে সাহাবীগণের অবস্থান	৫৬৭
৫৮	সালাফ ও সালাফিয়ারের অনুসরণ এবং বিদ'আত বর্জন	৫৭৩
৫৯	উপসংহার	৫৮৬

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

[وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٣] [النعام: ١٥٣]

“আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এ গুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর”।

শুধু তাই নয় আল্লাহ (سبحانه وتعالى) পবিত্র কুরআনে আরও বলেছেন, আজ তোমাদের জন্য দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে”। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ﷺ) কে জানিয়ে দেন, তিনি রাসূল (ﷺ) - এর মৃত্যুর পূর্বেই দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তার দীনকে পূর্ণতা দান করার পর দীনের মধ্যে কোন কিছু বাড়ানোর কোন অবকাশ নাই। অথচ আজকাল আমাদের দেশে দ্বীন ও শরীয়তের মধ্যে যে সকল বিদ'আত ও কুসংস্কার প্রবেশ করেছে এবং একাকার হয়ে আছে তা দূর করার লক্ষেই আমার এ গ্রন্থটি লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অতএব, আল্লাহ আমাদেরকে সকল প্রকার বিদ'আত ও কুসংস্কার মুক্ত সমাজ গড়ে উঠুক সেই প্রত্যাশা ও দোয়া কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের সেই দোয়া কবুল করুন, আমীন।

তাহাড়া যদি কেউ দ্বীনের মধ্যে কোন কিছু বাড়ান বা কমান তার অর্থ হল আল্লাহ দীনকে পূর্ণতা দান করেননি। দীনকে অসম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছেন এবং অবশিষ্ট কাজের জন্য কোন মাখলুককে দায়িত্ব বা অধিকার দিয়েছেন? অথচ আজকাল মায়হাবপন্থীরা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ বিরোধী যাল ও যঈফ হাদীসের উপর আমল করে এবং প্রচলিত বানোয়াট বিদ'আতী ও কুসংস্কারযুক্ত রসম অনুসরণ করা থেকে যেন বিরত থাকে এবং আমার লিখিত গ্রন্থটি পড়ে যেন সকল মুসলিম উম্মাহ এবং নামধারী মুসলিম উম্মাহরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার প্রয়াস পায়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন এবং এই অধর্মের লেখনীর প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, আমীন।

অধিকন্তু এই গ্রন্থটি প্রণয়নে যেসব গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছি তা ফুটনোট আকারে গ্রন্থটিতে সংযোজন করেছি। তাছাড়া যেসব দ্বীনি ভাই ও বোন এই গ্রন্থটি প্রণয়নে উৎসাহ ও বিভিন্ন সময়ে যেসব তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন হে আল্লাহ আপনি তাঁদেরকে যাক্বালাহ খায়ের দান করুন, আমীন।

সর্বশেষে আমি মানুষ। ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ﷺ) এর একটি হাদীস না উল্লেখ করলেই নয়। তিনি বলেছেনঃ « كُلُّ إِنْسَانٍ أَمَّ خَطْئًا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ » ‘প্রতিটি মানুষই ভুলকারী আর ভুলকারীদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা তাওবাকারী।’ [তিরমিযী - ২৪২৩; আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফ - ৩৫৩৫৭]। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি নির্ভুলভাবে গ্রন্থটি প্রণয়নে। তারপরেও চোখের অগোচরে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। তাই সম্মানিত পাঠকবৃন্দ আপনাদের চোখে ভুল ধরা পড়লে আমাদেরকে অবহিত করবেন ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে। অতএব, এই হাদীসের আলোকে পাঠকবৃন্দকে বলব যে, ছোটখাট ভুলগুলো আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সেই প্রত্যাশা করি।

সবশেষে সঠিক ইসলাম রক্ষার জন্য ও মুসলিম সমাজের কল্যানের জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। হে আল্লাহ আপনি এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং দ্বীনি খেদমতে আরও বেশি বেশি খেদমত করতে পারি তাঁর তৌফিক দান করুন, আমীন।

ধন্যবাদান্তে,



সাজ্জাদ সালাদীন

ইসলামী গবেষক, লেখক ও দাঈ।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রারম্ভিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ
يُضِلِّهِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ،

সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তা‘আলার জন্য, যিনি
পরিপূর্ণ দ্বীন হিসাবে আমাদেরকে ইসলাম দান করেছেন, যে দ্বীনে মানুষের
পক্ষ থেকে কোন সংযোজন বা বিয়োজনের প্রয়োজন হয় না। সালাত ও
সালাম তাঁরই রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যিনি
আল্লাহর দ্বীনের রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করেছেন, কোথাও
কোন কার্পণ্য করেননি। দ্বীন হিসাবে যা কিছু এসেছে তিনি তা উম্মতের
কাছে পৌঁছে দিয়েছেন ও নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে গেছেন। তাঁর
সাহাবায়ে কিরামের প্রতি আল্লাহর রাহমাত বর্ষিত হোক, যারা ছিলেন
উম্মতে মুহাম্মাদীর আদর্শ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া
সাল্লামের সুন্নাহ পালনে সকলের চেয়ে অগ্রগামী।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে আদর্শ পৃথিবীর মানুষের কাছে পেশ
করেছেন তাই হচ্ছে সুন্নাহ। বিদ‘আত শব্দটি আরবী হলেও সারা পৃথিবীর
মুসলমানদের কাছে এটি একটি অতীব পরিচিত পরিভাষা। অর্থ ও
প্রয়োগগত দিক থেকে এটি সুন্নাহের রিপরীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

অপ্রিয় হলে ও সত্য যে কালের পরিক্রমায় মুসলমানদের কথা-বার্তা ও আকীদা বিশ্বাসে প্রবেশ করেছে অসংখ্য বিদ'আত। যা আজ গোটা মুসলিম মিল্লাতকে মহামারির ন্যায় করেছে বিপর্যস্ত। তাই আজ সুন্নাহ থেকে বিদ'আতকে আলাদা করা এবং বিদ'আতের সর্বনাশা ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সমগ্র মুসলিম মিল্লাতকে অবহিত করণ একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। আলোচ্য গ্রন্থটি তারই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আধুনিককালে অধিকাংশ লোকের ধারণা যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (ﷺ) এর যুগে ছিলনা তা-ই বিদ'আত। আবার অনেকে মনে করেন বর্তমান নিয়মতান্ত্রিক মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি একটি বিদ'আত, মসজিদে কাতার করে নামায পড়া বিদ'আত, বিমানে হজ্জে যাওয়া বিদ'আত, মাইকে আজান দেয়া বিদ'আত ইত্যাদি।

এ সকল দিক বিবেচনা করে তারা বিদ'আতকে নিজেদের খেয়াল খুশি মত দুই ভাগ করে কোনটাকে হাসানাহ (ভাল বিদ'আত) আবার কোনটাকে সাইয়েআহ (মন্দ বিদ'আত) বলে চালিয়ে দেন। আসলে বিদ'আত সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে এ বিভ্রান্তি। তাই অধিকাংশ এ বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বিদ'আতকে দু'ভাগে ভাগ করার চেষ্টা করেন। বিদ'আতে হাসানাহ ও বিদ'আতে সাইয়েআহ। সত্যি কথা হল বিদ'আতকে এভাবে ভাগ করাটা হল আরেকটি বিদ'আত এবং তা হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিপন্থী। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي في السنن عن العرياض بن سارية)

অর্থঃ সকল নব-আবিষ্কৃত (দীনের মধ্যে) বিষয় হতে সাবধান! কেননা প্রত্যেকটি নব-আবিষ্কৃত বিষয় বিদ'আত, আর প্রত্যেকটি বিদ'আত হল পথভ্রষ্টতা। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও বাইহাকী)¹ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন সকল প্রকার বিদ'আত ভ্রষ্টতা। এখন যদি বলা হয় কোন কোন বিদ'আত আছে যা হাসানাহ বা উত্তম, তাহলে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ হাদীস বিরোধী হয়ে যায়। তাই তো ইমাম মালিক (রহঃ) বলেছেনঃ

من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول (اليوم أكملت لكم دينكم) فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا

অর্থঃ যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন বিদ'আতের প্রচলন করে আর এটিকে হাসানাহ বা ভাল বলে মনে করে, সে যেন প্রকারান্তরে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাতে খিয়ানাত করেছেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেনঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ

¹ আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও বাইহাকী

‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করে দিলাম।’ (সূরা মায়েদা, আয়াত ৩)^২ রাসূল (সাঃ) ও এ বিদ’আত প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেনঃ

وعن جابر، رضي الله عنه ، كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذا خطب
احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول:
"صبحكم ومساكم" ويقول: "بعثت أنا والساعة كهاتين" ويقرن بين أصبعيه؛
السبابة والوسطى، ويقول: "أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي
هدي محمد، صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة"
ثم يقول: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالا فإلهه، ومن ترك ديناً
أو ضياعاً فإلي وعلى" ((رواه مسلم)).

وعن العرياض بن سارية، رضي الله عنه ، حديثه السابق في باب المحافظة
على السنة

হযরত জাবির বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বক্তৃতা করতেন, তখন তাঁর চোখ দু’টি লাল বর্ণ ধারণ করত, তাঁর কণ্ঠস্বর বুলন্দ হয়ে যেত এবং তাঁর রাগ বৃদ্ধি পেত; (তখন মনে হতো) তিনি যেন কোনো সেনাবাহিনীকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। তিনি বলতেনঃ ‘আল্লাহ তোমাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় (দিবা-রাত্র) ভালো রাখুক।’ তিনি আরো বলতেনঃ ‘আমাকে এবং কিয়ামতকে এই দুই আঙ্গুলের ন্যায় পাঠানো হয়েছে।’ একথা বলেই তিনি তাঁর মধ্যমা ও তর্জনী একত্র করতেন এবং বলতেনঃ অতপর সবচেয়ে ভালো বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আর সবচেয়ে ভালো নিয়ম হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

^২ সূরা মায়েদা, আয়াত নং -৩

নিয়ম। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হলো (দ্বীনের ব্যাপারে) বিদআত --- নতুন কিছু সৃষ্টি করা। আর প্রতিটি বিদআত (নতুন সৃষ্টিই) হলো ভ্রষ্টতা। এরপর তিনি বলতেনঃ ‘আমি প্রতিটি মুমিনের জন্য তার নিজের চাইতেও উত্তম।’ যে ব্যক্তি পিছনে কোন সম্পদ রেখে যায়, তা তার পরিবারবর্গের জন্য। আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ কিংবা রেখে যায় অসহায় সন্তান, তার দায়িত্ব আমারই ওপর বর্তায়। (সহীহুল মুসলিম) (তথ্যসূত্রঃ তাহক্বীক - রিয়াদুস সালাহীন, তাওহীদ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা নং - ১০৫)^৩। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যা ধর্ম রূপে গণ্য ছিল না আজও তা ধর্ম বলে গণ্য হতে পারে না। তাই বিদ‘আতে হাসানাহ বলে কোন কিছু নেই। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন আমরা তাই বলব; সকল প্রকার বিদ‘আত গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা। বিদ‘আতে হাসানায় বিশ্বাসীরা যা কিছু বিদ‘আতে হাসানাহ হিসাবে দেখাতে চান সেগুলো হয়ত শাদ্বিক অর্থে বিদ‘আত, শরয়ী অর্থে নয় অথবা সেগুলো সুন্নাতে হাসানাহ। যে সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء (رواه مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما)

অর্থঃ যে ইসলামে কোন ভাল পদ্ধতি প্রচলন করল সে উহার সওয়াব পাবে এবং সেই পদ্ধতি অনুযায়ী যারা কাজ করবে তাদের সওয়াবও সে পাবে, তাতে তাদের সওয়াবে কোন কমতি হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন

^৩ তাহক্বীক - রিয়াদুস সালাহীন, তাওহীদ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা নং - ১০৫

খারাপ পদ্ধতি প্রবর্তন করবে সে উহার পাপ বহন করবে এবং যারা সেই পদ্ধতি অনুসরণ করবে তাদের পাপও সে বহন করবে, তাতে তাদের পাপের কোন কমতি হবে না। (সহীহুল মুসলিম)⁴

এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে, শবে বরাত উদযাপন, মীলাদ মাহফিল, মীলাদুন্নবী প্রভৃতি আচার - অনুষ্ঠানকে কি সুন্নাতে হাসানাহ হিসাবে গণ্য করা যায় না? মাইকে আজান দেয়া, মাদ্রাসার পদ্ধতি প্রচলন, আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা ইত্যাদি কাজগুলো যদি সুন্নাতে হাসানাহ হিসাবে ধরা হয় তাহলে শবে বরাত, মীলাদ, তাবলীগ জামাত ইত্যাদিকে কেন সুন্নাতে হাসানাহ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না? পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, বিদ'আত হবে ধর্মীয় ক্ষেত্রে। যদি নতুন কাজটি ধর্মের অংশ মনে করে অথবা সওয়াব লাভের আশায় করা হয়, তাহলে তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্ন আসে। আর যদি কাজটি ধর্মীয় হিসাবে নয় বরং একটা পদ্ধতি হিসাবে করা হয় তাহলে তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্ন আসে না। যেমন ধরুন মাইকে আজান দেয়া। কেউ মনে করেনা যে, মাইকে আজান দিলে সওয়াব বেশী হয় অথবা মাইক ছাড়া আজান দিলে সওয়াব হবে না। তাই সালাত ও আজানের ক্ষেত্রে মাইক ব্যবহারকে বিদ'আত বলা যায় না। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হল এর দ্বারা উম্মত উপকৃত হবে কিন্তু নিজে মাইক ব্যবহারের কারণে সরাসরী কোনো উপকার পাচ্ছে না। এদিক থেকে চিন্তা করে দেখলে ঐ কাজটা করলে সওয়াবও হতে পারে, কেননা তিনি কাউকে ডাকছেন যে অন্যকাজে ব্যস্ত আছে এবং এই মাইক ব্যবহারের ফলে ঐ কর্মরত ব্যক্তি সালাহ আদায় করতে পারছে। মূলত ডাকা উদ্দেশ্য। তাই এটা

⁴ সহীহুল মুসলিম

বিদআত নয় বরং সুন্নাতে হাসানা। তাই বলতে হয় বিদআত ও সুন্নাতে হাসানার মধ্যে পার্থক্য এখানেই যে, কোন কোন নতুন কাজ ধর্মীয় ও সওয়াব লাভের নিয়াত হিসাবে করা হয় আবার কোন কোন নতুন কাজ দ্বীনি কাজ ও সওয়াবের নিয়াতে করা হয় না বরং সংশ্লিষ্ট কাজটি সহজে সম্পাদন করার জন্য একটা নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। যেমন আমরা যদি ইতিপূর্বে উল্লিখিত হাদীসটির প্রেক্ষাপটের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে, একবার মুদার গোত্রের কতিপয় অনাহারী ও অভাবগ্রস্থ লোক আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো। তিনি সালাত আদায়ের পর তাদের জন্য উপসি'ত লোকজনের কাছে সাহায্য চাইলেন। সকলে এতে ব্যাপকভাবে সাড়া দিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের আগ্রহ ও খাদ্য সামগ্রী দান করার পদ্ধতি দেখে উল্লিখিত কথাগুলি বললেন। অভাবগ্রস্থদের সাহায্যের জন্য যে পদ্ধতি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ওটাকে সুন্নাতে হাসানাহ বলা হয়েছে। বলা যেতে পারে, সকল পদ্ধতি যদি হাসানাহ হয় তাহলে সুন্নাতে সাইয়েআহ বলতে কি বুঝাবে? উত্তরে বলব, মনে করুন কোন দেশের শাসক বা জনগণ প্রচলন করে দিল যে এখন থেকে স্থানীয় ভাষায় আজান দেয়া হবে, আরবী ভাষায় দেয়া চলবে না। এ অনুযায়ী ‘আমল করা শুরু হল। এটাকে আপনি কি বলবেন? বিদআত বলতে পারবেন না, কারণ যারা এ কাজটা করল তারা সকলে জানে অনারবী ভাষায় আজান দেয়া ধর্মের নির্দেশ নয় এবং এতে সওয়াবও নেই। তাই আপনি এ কাজটাকে সুন্নাতে সাইয়েআহ হিসাবে অভিহিত করবেন। এর প্রচলনকারী পাপের শাস্তি প্রাপ্ত হবে, আর যারা ‘আমল করবে তারাও। আবার অনেক উলামায়ে কিরাম বিদআতকে অন্যভাবে দু ভাগে ভাগ করে থাকেন। তারা বলেন বিদআত দু

প্রকার। একটা হল বিদ'আত ফিদ্দীন (البدعة في الدين) বা ধর্মের ভিতর বিদ'আত। অন্যটা হল বিদ'আত লিদ্দীন (البدعة للدين) অর্থাৎ ধর্মের জন্য বিদ'আত। প্রথমটি প্রত্যাখ্যাত আর অন্যটি গ্রহণযোগ্য। আমার মতে এ ধরণের ভাগ নিষ্প্রয়োজন বরং তা বিভ্রান্তি- সৃষ্টিতে সহায়ক। কারণঃ

প্রথমতঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন সকল বিদ'আত পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহী। এতে উভয় প্রকার বিদ'আত शामिल।

দ্বিতীয়তঃ অনেকে বিদ'আত ফিদ্দীন করে বলবেন, আমি যা করেছি তা হল বিদ'আত লিদ্দীন।

যেমন কেহ মীলাদ পড়লেন। অতঃপর যারা এর প্রতিবাদ করলেন তাদের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ে অনেক দূর যেয়ে বললেন, মীলাদ পড়া হল বিদ'আত লিদ্দীন। এর দ্বারা মানুষকে ইসলামের পথে ডাকা যায়। আসলে যা বিদ'আত লিদ্দীন বা দ্বীনের স্বার্থে বিদ'আত তা শরীয়তের পরিভাষায় বিদ'আতের মধ্যে গণ্য করা যায় না। সেগুলোকে সুন্নাতে হাসানাহ হিসাবে গণ্য করাটাই হাদীসে রাসূল দ্বারা সমর্থিত। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! বিদ'আত সম্পর্কে এ কথাগুলো এখানে এ জন্য আলোচনা করলাম যাতে আলোচ্য বিষয়ের উপর কোন প্রশ্ন বা বিভ্রান্তি-র সৃষ্টি হলে তার সমাধান যেন পাঠকবৃন্দ সহজে অনুধাবন করতে পারেন। বিদ'আতের কুফল এমন অনেকের সাক্ষাত পাবেন যারা ইসলামী চেতনায় সমৃদ্ধ। তাই কেউ কেউ বলেন যে, বিদ'আতের বিরোধিতায় এত বাড়াবাড়ির কি দরকার? কেহ একটু মীলাদ পড়লে, কুলখানি বা চল্লিশা-চেহলাম পালন কিংবা এ জাতীয়

কিছু করলে দ্বীন ইসলামের কি এমন ক্ষতি হয়ে যায়? উদাহরন হিসাবে বলা যায় যে, আমি একদিন এক মসজিদের ইমাম সাহেবের বক্তব্য শুনছিলাম। তিনি বলছিলেন শবে মিরাজ উপলক্ষ্যে এ রাতে কোন বিশেষ সালাত, ইবাদাত-বন্দেগী বা সিয়াম নেই। যদি শবে মিরাজ উপলক্ষ্যে কোন ‘আমল করা হয় তা বিদ‘আত হিসাবেই গণ্য হবে। তার এ বক্তব্য শেষ হতে না হতেই কয়েকজন শিক্ষিত শ্রেণীর মুসল্লী বলে উঠলেন, হুজুর এ কি বলেন! রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বতে এ রাতে কিছু করলে বিদ‘আত হবে কেন? প্রশ্নকারী লোকগুলো যে বিভ্রান্ত বা বিদ‘আতপন্থী তা' নয়। তাদের খারাপ কোন উদ্দেশ্য নেই। তারা যা করার ইচ্ছা করেছেন, সেটার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই। অবশ্যই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বত ঈমানের অঙ্গ। আর সব ধরনের মুহাব্বতেই আবেগ থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বতেও থাকবে। সেই আবেগ যেন মুহাব্বতের নীতিমালা লংঘন না করে। সেই আবেগভরা মুহাব্বত যেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ও সুন্নাহর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত না হয়।

বিদ‘আতের সংজ্ঞাঃ

শাব্দিক অর্থে বিদ‘আত (بِدْعَة):

বিদআত (بِدْعَة) এর শাব্দিক অর্থ হলো অভূতপূর্ব ও নতুন কোন বিষয়। অর্থাৎ বিদ‘আত শব্দের শাব্দিক অর্থ নব উদ্ভাবন। এ শব্দটি শাব্দিক অর্থে সাধারণত কর্তার পূর্ণতা ও সৃষ্টিশীল বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিতবহ। (بِدْعَة) শব্দের অর্থ

হলো অভিনব ও নজীরবিহীন। এ শব্দটি যখন মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হলো মহান আল্লাহ বিশ্বকে কোন পূর্ববর্তী নজীর ছাড়াই কারো সাহায্য ব্যতীত ও কোন প্রাথমিক উপাদান ভিন্নই সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ তিনি সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন নমুনারই অনুসরণ করেন নি। (অভিধান গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য। আল আইন, মুফরাদাত লি রাগিব ইসফাহানী, লি সানুল আরাব প্রভৃতি, ‘بدع’ ধাতু)।

বিদ’আত শব্দের শাব্দিক বিশ্লেষণ - নিম্নে আরও বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করে আলোচনা করা হলো:-

(১) বাদিউন (بدیع) শব্দের অর্থ সৃষ্টি করাঃ এমন কিছু সৃষ্টি করা যার কোন অস্তিত্ব বা নজির আগে ছিল না। আমাদের এই বিশ্বজগতের কোন অস্তিত্ব ছিল না, মহান আল্লাহ তা’আলা সৃষ্টি করেন সেহেতু আল্লাহ তা’আলার এক সিফাতি নাম হলোঃ বাদিউল আলম।

(২) বাদউন (بدیع) শব্দের অর্থ আবিষ্কার করাঃ কোন বস্তু আমাদের অজ্ঞাত ছিল তা আবিষ্কার করা হয়েছে। আমেরিকা মহাদেশ কলম্বাস তা আবিষ্কার করেছেন, ভূ-গর্ভতে খনিজ পদার্থ বের করাকে বাদউন বলা হয়।

(৩) বিদ’উন (بدیع) শব্দের অর্থ উদ্ভাবন করাঃ মহান আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর সাহায্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করা, মহান আল্লাহর দেয়া বিভিন্ন খনিজ পদার্থ যেমনঃ লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, পেট্রোল, ডিজেল, কাঠ, বাঁশ, মাটি, পানি, পাথর ইত্যাদির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক কারিগর, প্রস্তুতকারীগণ বিভিন্ন প্রকার বস্তু তৈরী করেছেন।

যেমনঃ বিদ্যুৎ, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, ফ্রিজ, টেলফোন, এরোপ্লেন ইত্যাদি তৈরী করাকে বলা হয় বিদ'উন। ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষগণ এগুলো ব্যবহার করে থাকেন। এতে দ্বীন ইসলামে পাপ বা সাওয়াবের কিছু নেই। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা পবিত্র কুরআনে সয়ং সূরা আস-সাফফাতের ৯৬নং আয়াতে উল্লেখ করেছেনঃ

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

‘অথচ আল্লাহই তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তা সৃষ্টি করেছেন’?
(সূরা আস-সাফফাত, আয়াত নং - ৯৬)।^৫

(৪) বিদ'আতুন (بدعة) শব্দের অর্থঃ দ্বীনের ক্ষেত্রে ইসলামে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যত কিছু আমাদের দিয়েছেন তাতেই ইসলাম সয়ংসম্পূর্ণ।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর দ্বীন ইসলামের নামে সাওয়াবের আশায়ে যে কোন নতুন প্রথা, রসম-রেওয়াজ প্রচলন করার নামই হলো বিদ' 'আতুন' বা বিদ'আত। (তথ্যসূত্রঃ ইন্জিনিয়ার শামসুদ্দীন আহমাদ - ফিকহে ইসলাম বনাম দ্বীন ইসলাম, পৃষ্ঠা নং - ৮৩)^৬

বিদ'আত (البدع) শব্দের শাব্দিক বিশ্লেষণঃ বিদ'আত (البدع) বিষয়টি যেহেতু উপরে আলোচনা করা হয়েছে তারপরেও আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি নিম্নরূপ দাঁড়ায় যা উপস্থাপন করা হলোঃ-

^৫ সূরা আস-সাফফাত, আয়াত নং - ৯৬

^৬ ইন্জিনিয়ার শামসুদ্দীন আহমাদ - ফিকহে ইসলাম বনাম দ্বীন ইসলাম, পৃষ্ঠা নং - ৮৩

শাব্দিক অর্থে বিদ'আত (البدع) থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ হচ্ছে,

الاختراع على غير مثال سابق.

অর্থাৎ অতীত দৃষ্টান্ত ব্যতীত নতুন আবিষ্কার।

এ থেকেই আল্লাহ তাআলার বাণীঃ

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. البقرة: (১১৭)

অর্থাৎ অতীত দৃষ্টান্ত ব্যতীত আকাশ জমিনের সৃষ্টিকর্তা এবং

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ (الأحقاف: ৯)

অর্থাৎ 'আমিই প্রথম ব্যক্তি নই যে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের নিকট রিসালতের দায়িত্ব নিয়ে এসেছি।' বরং আমার পূর্বে বহু রাসূল অতীত হয়েছেন।

প্রচলন আছেঃ ابتدع فلان بدعة অর্থাৎ এমন পদ্ধতি শুরু করেছে যা ইতিপূর্বে কেউ করেনি। শরয়ী পরিভাষায় বিদ'আত বলা হয়ঃ-

ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة وعمل.

'দ্বীনের মধ্যে রাসূল (সাঃ) ও সাহাবা কর্তৃক প্রবর্তিত আক্বিদা ও আমল পরিপন্থী নতুন আক্বিদা ও আমলের প্রচলন ঘটানো।'

অধিকন্তু বলা যায় যে, মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'য়ালা'র ঘোষণায় দ্বীন ইসলাম ১৪০০ বৎসর আগেই সম্পূর্ণ। কারন আল্লাহ তা'আলা সূরা আনআমের ৩৮ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন যেঃ আমি এই কিতাবে কোন কিছু উল্লেখ করতে বাদ দেই নি। (সূরা আনআম, আয়াত নং - ৩৮)।^৭ আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'য়ালা আরও বলেছেন যে, “আখেরি রাসূল তোমাদের জন্যে যা এনেছেন বিনাশর্তে গ্রহণ কর, আর তা থেকে বিরত থেকে থাক যা তিনি নিষেধ করেছেন।” (সূরা হাশরঃ আয়াত নং - ৭)^৮।

উপরোক্ত পবিত্র কুরআনের আয়াতটি সহীহ হাদীসেও এসেছে।

নিম্নে হাদীসটি উপস্থাপন করা হলোঃ-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»

:: সুনানু ইবনে মাজাহ্ :: হাদীস ১ (রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নতের বিবরণ অধ্যায়)^৯। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ রাক'আত সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি তোমাদেরকে যা আদেশ দেই, তোমরা তা গ্রহণ করো এবং যে বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাকো। তাখরীজ কুতুবুত তিসআহ: বুখারী ৭২৮৮, মুসলিম ১৩৩৭, তিরমিযী ২৬৭৯, আহমাদ ৭৩২০, ৭৪৪৯, ৮৪৫০, ৯২২৯,

^৭ সূরা আনআম, আয়াত নং - ৩৮

^৮ সূরা হাশর, আয়াত নং - ৭

^৯ সুনানু ইবনে মাজাহ্ - হাদিস ১ [রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নতের বিবরণ অধ্যায়]

৯৪৮৮, ৯৫৭৭, ২৭২৫৮, ৯৮৯০, ২৭৩১২, ১০২২৯, ইবনু মাজাহ ২। তাহকীক আলবানী: সহীহ। তাখরীজ আলবানী: ইরওয়াউল গালীল ১৫৫, ৩১৪; সহীহাহ ৮৫০। বিদআত (البدع) শব্দটি হাদীস গ্রন্থসমূহে সাধারণত শরীয়ত ও সুন্নাতের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এমন কিছু করা যা ইসলামী শরীয়ত ও মহানবী (ﷺ) - এর সুন্নাতের পরিপন্থী বলে গণ্য। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ

إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ مَتَّبِعِ شَرْعَهُ وَ مَبْتَدِعِ بَدْعَهُ

অর্থাৎ ‘মানুষ দু’ ধরনের হয় যেমনঃ শরীয়তের অনুসারী, নতুবা ধর্মের মধ্যে নতুন কিছুর উদ্ভাবক’। (নাহজুল বালাগা, খুতবা নং ১৭৬)।¹⁰ অন্যত্র তিনি মহানবীর নবুওয়াত সম্পর্কে বলেছেনঃ

إِظْهَرِ بِهِ الشَّرَائِعَ الْمَجْعُولَةَ وَ قَمَعَ بِهِ الْبَدْعَ الْمَدْخُولَةَ

‘মহান আল্লাহ মহানবীর মাধ্যমে মানব জাতিকে তাদের অজানা ও ভুলে যাওয়া শরীয়তের সাথে পরিচিত করিয়েছেন (অজানা বিধানসমূহকে তাদের সামনে প্রকাশ করেছেন) এবং পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহের মধ্যে যে বিদআত ও নব উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ সংযোজিত হয়েছিল তা হতে পরিশুদ্ধ করেছেন।’ (প্রাগুক্ত, খুতবা নং ১৬১)¹¹

অন্যত্র হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ

مَا أَحْدَثْتُ بَدْعَةً إِلَّا تَرَكْتُ بِهَا سُنَّةَ

¹⁰ নাহজুল বালাগা, খুতবা নং ১৭৬

¹¹ প্রাগুক্ত, খুতবা নং ১৬১

এমন কোন বিদআতই (নব উদ্ভাবিত বিষয়ই) শরীয়তে প্রবেশ করে নি যার দ্বারা কোন না কোন সুন্নাত উপেক্ষিত ও পদদলিত না হয়েছে।’ (তথ্যসূত্রঃ প্রাগুক্ত, খুতবা নং - ১৪৫)¹²। উদাহরন হিসাবে বলা যায় যে, সারা রাত জেগে নিদ্রা পরিহার করে কিয়ামুল লাইল এর মাধ্যমে এবং ভঙ্গ না করে সারা বছর সাওম রাখার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা এবং অনুরূপভাবে স্ত্রী, পরিবার ও সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্যবাদের ব্রত গ্রহন করা। সহীহ বুখারীতে আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) এর হাদীসে যারা সারা বছর সাওম রাখার ও বিবাহ করে সংসার ধর্ম পালন না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিল তাদের উদ্দেশ্যে রাসূল (ﷺ) বলেছিলেনঃ “আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বেশী ভয় পোষণ করি এবং তাকওয়া অবলম্বনকারী। কিন্তু আমি সওম পালন করি ও ভাঙ্গি, সালাত আদায় করি ও নিদ্রা যাপন করি এবং নারীদের বিবাহ করি। যে আমার এ সুন্নাত থেকে বিরাগভাজন হয়, যে আমার দলভুক্ত নয়।”

বিদআতের আভিধানিক অর্থঃ

বিদআত (البدعة) শব্দটি باب فتح এর মাসদার, অভিধানে এর কয়েকটি অর্থ পাওয়া যায়। যেমন-

- (১) নতুন সৃষ্টি।
- (২) অভিনব কোনো কিছু তৈরী করা।
- (৩) দৃষ্টান্ত বিহীন সৃষ্টি।

¹² প্রাগুক্ত, খুতবা নং ১৪৫

(৪) ধর্মে নতুন কিছু আবিষ্কার করা ইত্যাদি।

[[Adictionary of Modern written Arabic](#) এ বিদ'আত (البدعة) সম্পর্কে বলা হয়েছে Newness/Novelty (নতুনত্ব/অভিনবত্ব)। এ দৃষ্টিকোন থেকে আল্লাহ্ হচ্ছেন [بدیع](#) কারণ তিনি অস্তিত্বহীন থেকে সৃষ্টি করেন, তাই তাকে [بدیع](#) বলা হয়। আল-মুনজিদ ফিল-লুগাতি ওয়াল আ'লাম এ বলা হয়েছে-

هی کل ما احدث على غير مثال سبق

“প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত জিনিস যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই”।

الشيء المخترع على غير مثال سابق ومنه قوله تعالى (قل ما كنت بدعا من
(الرسول) وجاء على هذا المعنى قول عمر رضي الله عنه (نعمت البدعة)

অর্থঃ পূর্বের দৃষ্টান্ত ব্যতীত নতুন সৃষ্ট কোন বিষয় বা বস্তু। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: “বলুন, আমি তো কোন নতুন রাসূল নই”। আসলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাসূল হিসাবে নতুনই। কিন্তু এ আয়াতে বিদ'আত শব্দের অর্থ হল এমন নতুন যার দৃষ্টান্ত ইতোপূর্বে গত হয়নি। আর উমার (রাঃ) তারাবীহর জামাত কায়েম করে বলেছিলেন “এটা উত্তম বিদ'আত।” এখানেও বিদ'আতের আভিধানিক অর্থ প্রযোজ্য।

অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, সাধারণ ভাবে সুন্নতের বিপীরত বিষয়কে বিদাত বলে। আর শার'ঈ ভাবে বিদআত হলো “আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে ধর্ম এর নামে নতুন কোন প্রথা বা ইবাদতের প্রচলন করা যা

শরীয়াতের কোন সহীহ দলীল-প্রমানের উপর ভিত্তিশীল নয় (তথ্যসূত্রঃ আল ইতিসাম ১/১০ পৃষ্ঠা)।¹³

الشَّيْءُ الْمُخْتَرَعُ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ

অর্থাৎ পূর্ববর্তী কোন নমুনা ছাড়াই নতুন আবিষ্কৃত বিষয়। (তথ্যসূত্রঃ আন-নিহায়াহ্, পৃষ্ঠা: ৬৯, কাওয়ায়েদ মা'রিফাতিল বিদআ'হ, পৃষ্ঠা নং - ১৭)।¹⁴

আর শরীয়াতের পরিভাষায় বলা যায় যে -

مَا أُخْدِثَ فِي دِينِ اللَّهِ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ عَامٌّ وَلَا خَاصٌّ يُدُلُّ عَلَيْهِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ দ্বীনের মধ্যে নতুন করে যার প্রচলন করা হয়েছে এবং এর পক্ষে শরীয়াতের কোন ব্যাপক ও সাধারণ কিংবা খাস ও সুনির্দিষ্ট দলীল নেই। (তথ্যসূত্রঃ কাওয়ায়েদ মা'রিফাতিল বিদআ'হ, পৃষ্ঠা নং - ২৪)।¹⁵

এ সংজ্ঞাটিতে তিনটি বিষয় লক্ষণীয় যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:-

১. নতুনভাবে প্রচলন অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের যুগে এর কোন প্রচলন ছিল না এবং এর কোন নমুনাও ছিল না।

¹³ আল ইতিসাম ১/১০ পৃষ্ঠা

¹⁴ আন-নিহায়াহ্, পৃষ্ঠা: ৬৯, কাওয়ায়েদ মা'রিফাতিল বিদআ'হ, পৃষ্ঠা নং - ১৭

¹⁵ কাওয়ায়েদ মা'রিফাতিল বিদআ'হ, পৃষ্ঠা নং - ২৪

২. এ নব প্রচলিত বিষয়টিকে দ্বীনের মধ্যে সংযোজন করা এবং ধারণা করা যে, এটি দ্বীনের অংশ।

৩. নব প্রচলিত এ বিষয়টি শরীয়তের কোন 'আম বা খাস দলীল ছাড়াই চালু ও উদ্ভাবন করা।

সংজ্ঞার এ তিনটি বিষয়ের একত্রিত রূপ হল বিদআত, যা থেকে বিরত থাকার কঠোর নির্দেশ শরীয়তে এসেছে। কঠোর নিষেধাজ্ঞার এ বিষয়টি হাদীসে বারবার উচ্চারিত হয়েছে।

বিদ'আতের পরিভাষিক অর্থঃ

বিদ'আত শব্দের শাব্দিক অর্থ নব উদ্ভাবন। প্রখ্যাত ভাষাবিদ ইবনু মানযুর লিখেনঃ “বিদ'আত অর্থ - নতুন সৃষ্ট এবং দীনের পূর্ণতার পর যা উদ্ভাবন করা হয়েছে”।¹⁶ দ্বিতীয় অর্থটি মূলত পরিভাষিক। ইবনু ফারিস¹⁷ বিদ'আতের অর্থ লিখেন : পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে কোনো কিছু সৃষ্টি করা, শুরু করা বা প্রচলন করা।¹⁸

লিসানুল আরব অভিধান থেকে আমরা শাব্দিক অর্থের সাথে সাথে বিদআতের পরিভাষিক অর্থ জানতে পেরেছি। আরেকটু স্পষ্ট হওয়ার জন্য ফিকহী পরিভাষায় বিদ'আতের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় তা উল্লেখ করা হলঃ

¹⁶ ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব, মাদ্দাহ 'عَدُ', ৮/৬।

¹⁷ আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ইমাম আবুল হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস ইবন যাকারিয়া আল-কাযবীনি আর-রাযি, ৩২৯-৩৯৫ হিজরী, ৯৪১-১০০৪ ঈসাব্দী।

¹⁸ ইবনু ফারিস, মু'জামু মাঝায়িসিল লুগাহ, মাদ্দাহ 'عَدُ', ১/২০৭, লিসানুল আরব, প্রাপ্ত।

"البدعة طريقة في الدين مخترة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك
عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية". (الاعتصام، الباب الأول في
تعريف البدع وبيان معناها...، 1-26)

“বিদ‘আত হচ্ছে, দীনের মধ্যে আবিষ্কৃত পদ্ধতি, যা শরয়ী পদ্ধতির সামঞ্জস্য,
এই পদ্ধতির উপর চলার সেই উদ্দেশ্য যা শরয়ী পদ্ধতির উপর চলার
উদ্দেশ্য।”¹⁹

কেউ কেউ বলেনঃ “দীনের মধ্যে আবিষ্কৃত পদ্ধতি, যা শরয়ী পদ্ধতির
সামঞ্জস্য, এই পদ্ধতির উপর চলার উদ্দেশ্য হলোঃ আল্লাহ সুবহানাহুর
ইবাদতের মধ্যে বৃদ্ধি করা।”²⁰

শরীয়াতের পরিভাষায় বিদ‘আতের সংজ্ঞাঃ ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়
বিদ‘আতের সংজ্ঞা

ما أحدث في دين الله وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه

‘যা কিছু আল্লাহর দ্বীনে নতুন সৃষ্টি করা হয় অথচ এর সমর্থনে কোন
ব্যাপক বা বিশেষ দলীল প্রমাণ নেই।’

অর্থাৎ নব সৃষ্ট বিষয়টি অবশ্যই ধর্মীয় ব্যাপারে হতে হবে। যদি ধর্মীয়
ব্যাপার ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে নব-আবিষ্কৃত কিছু দেখা যায় তা
শরীয়তের পরিভাষায় বিদ‘আত বলে গণ্য হবে না, যদিও শাব্দিক অর্থে তা

¹⁹ আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনু মুসা আশ-শাতিবী আল-মালিকী, ৭৯০ হিজরী, আল-ইতিসাম, প্রথম
অনুচ্ছেদ, বিদআতের সংজ্ঞা ও তার অর্থ..., ১/২৬।

²⁰ প্রাপ্ত।

বিদ'আত। এ প্রসঙ্গে আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) তার 'শরিক ও বিদ'আত' কিতাবে বিদ'আতের পরিচ্ছন্ন সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন। তা হলঃ যে বিশ্বাস বা কাজ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করেননি কিংবা পালন করার নির্দেশ দেননি সেই ধরনের বিশ্বাস বা কাজকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করা, এর অঙ্গ বলে সাব্যস্ত করা, সওয়াব বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় মনে করে এই ধরনের কাজ করার নাম বিদ'আত। ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ এবং মুহাদ্দিসগণ বিভিন্নভাবে বিদআতকে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

বস্তুতঃ শরয়ী পদ্ধতি বলতে ইবাদতের সুন্নাত পদ্ধতি বুঝানো হয়েছে। কেননা সুন্নাত পদ্ধতি বা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদত জাতীয় যে বিষয়ে তিনি যে পদ্ধতি উম্মতকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন তাই শরয়ী পদ্ধতি। এর বাইরে কোনো শরয়ী পদ্ধতি নেই। এই অর্থেই আহলুসুন্নাহ শব্দের বিপরীতে আহলুল বিদ'আহ শব্দটি উলামায়ে কেরাম প্রয়োগ করে থাকেন বলে আমরা ইতোপূর্বে দেখে এসেছি।

সুতরাং, বিভিন্ন হাদীসে বিদ'আত বা নব উদ্ভাবিত বিষয় বুঝাতে 'মুহদাসাত' শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে, যা একটু পরেই আমরা দেখতে পাব ইনশাআল্লাহ। বিদ'আত বা মুহদাসাতের শরয়ী সংজ্ঞা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, শরীয়তের পরিভাষায় বিদ'আত শুধুমাত্র ইবাদত কেন্দ্রিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে। যে কোনো নব অবিষ্কৃত জিনিসের উপর শাস্ত্রিক অর্থে বিদআতের প্রয়োগ করা গেলেও শরয়ী অর্থে তার উপর বিদ'আত শব্দ প্রয়োগ হবে না এবং তা বিদ'আত ও মুহদাসাত সংক্রান্ত হাদীসের আওতাধীন হবে না। যেমন ধরুন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়াসাল্লাম উটে সওয়ার হয়ে সফর করেছেন, যানবাহনের আবিষ্কার আজ আপনাকে বিমান আরোহন করাচ্ছে, আপনি বিমান আরোহন করে সফর করছেন। বিমান নব আবিষ্কার। উটের পরিবর্তে আপনি বিমান আরোহন করছেন। এটাকে শরয়ী বিদ'আত বলা যাবে না। কেননা উট বিমান কোনোটি ইবাদত নয়। এটি একটি বাহন মাত্র। তবে বাহনে সওয়ার হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দো'আ পড়তেন, তিনি সফরের যে দো'আ পড়তেন তা ইবাদত। এই দো'আর মধ্যে কোনো সংযোজন বা বিয়োজন করার সুযোগ নেই। এই দো'আ তিনি যে পদ্ধতিতে পড়তেন আমাকেও সেই পদ্ধতিতেই পড়তে হবে। যুক্তির আলোকে এখানে কোনো পরিবর্তন ঘটানো যাবে না। যেমন, উট একটি সাধারণ জন্তু, সে মাটিতে চলে, নবীজী উটে উঠতে এই দো'আ পড়তেন। আমি আজ আকাশে চড়ছি, এই নেয়ামত অনেক বড়, সুতরাং দো'আকে একটু বৃদ্ধি করতে হবে। অথবা নবীজী স্বাভাবিকভাবে দো'আ পড়তেন, কেননা নেয়ামতটি স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু আমার নেয়ামতটি অসাধারণ, তাই বিমানে উঠেই সেজদায় পড়ে এই দো'আ করতে হবে, অথবা সেজদায় পড়ে দো'আটি পড়লে ছওয়ার বেশি হবে, এজাতীয় চিন্তাধারা সবই ভ্রান্ত। কেননা দো'আ একটি ইবাদত। আর ইবাদতের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতির বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। গেলেই তা বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

মোটকথাঃ বিদ'আতের সম্পর্ক ইবাদতের বিষয় ও তার পদ্ধতির সাথে। বস্তুর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। জনৈক ব্যক্তি একবার এক বিদ'আত বিরোধী আলেমকে গিয়ে বললেনঃ আপনারা সবকিছুই শুধু বিদ'আত বিদ'আত করেন, তবে আপনি চশমা পরেছেন কেন? আল্লাহর রাসূল কি জীবনে কখনো চশমা পরেছেন? চশমা তো নবীজীর সময়ে ছিল না, তাহলে

এটা কি বিদ'আত নয়? আলেম বললেনঃ ভাই, তাহলে তো আপনি নিজেই বিদ'আত। আপনিও তো নবীজীর সময়ে ছিলেন না। বিদ'আত না বোঝার কারণেই মাঝে মাঝে এমন কৌতুকের সৃষ্টি হয়। চশমা কোনো ইবাদত নয়। তাই এর সাথে বিদআতের কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন লোকটি নিজে কোনো ইবাদত নয়, তাই সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় না থাকা, আবার এখন থাকা বিদ'আতের বিষয় নয়। যে ইবাদত বা তার পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রমাণিত নয় একমাত্র তার আবিষ্কার শরী' পরিভাষায় বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

বিদ'আত সম্পর্কে প্রখ্যাত আলেমদের সংজ্ঞাঃ নিম্নে বিদ'আত সম্পর্কে প্রখ্যাত আলেমদের দেয়া কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা উপস্থাপন করছিঃ

১। ইমাম নববী (রঃ) বলেন-

البدعة كل شئ عمل غير مثال سبق وفي الشرع احداث مالم يكن في عهد رسول الله ص

বিদ'আত বলা হয় এমন কার্যকলাপকে যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। আর শরী'য়তের পরিভাষায় বিদ'আত বলা হয় এমন সব বিষয়কে যা রাসূল (সঃ) এর যমানায় ছিল না।

২। মুফতি সাইয়্যদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (রঃ) বলেন-

هي الامر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي.

“এমন নব উদ্ভাবিত বিষয় যা সাহাবা ও তাবিঈনের যুগে ছিল না এবং যার উদ্ভাবন শরীয়ী কোন দলিলের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

৩। প্রখ্যাত হাদীসবিদ ইমাম খাত্তাবী বলেন -

وكل شيء أحدث على غير أصل من أصول الدين وعلى غير عياره وقياسه
وأما ما كان مبنيًا على قواعد الأصول ومردود إليها فليس ببدعة ولا ضلالة

“যে মত বা নীতি দ্বীনের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং কোন দৃষ্টান্ত ও ক্রিয়াস সমর্থিত নয় এ রকম যাই নতুন আবিষ্কৃত হবে তাই বিদআত।”

৪। ইবনে রাজাব হাম্বালী (রহঃ) বলেছেনঃ ‘বিদআত হলো নব উদ্ভাবিত বিষয় যার শরীয়তগত কোন ভিত্তি ও দলিল-প্রমাণ নেই। যদি কোন কিছু শরীয়ী দলিল থাকে তবে তা বিদআত বলে গণ্য নয়, যদিও শাব্দিক অর্থে তা বিদআত হয়ে থাকে।’ (জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃ. ১৬০)।²¹

৫। ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেনঃ ‘বিদআত হলো নব উদ্ভাবিত এমন বিষয় যার কোন শরীয়তগত প্রমাণ ও দলিল নেই। যদি শরীয়তে তার সপক্ষে কোন দলিল থাকে তবে তা বিদআত বলে গণ্য হবে না।’ (ফাতহুল বারী, ১৭তম খণ্ড, পৃঃ ৯)।²²

²¹ জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃ. ১৬০

²² ফাতহুল বারী, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৯

৬। সাইয়েদ মুর্তাজা (রহঃ) বলেছেনঃ ‘বিদআত হলো ধর্মে কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করে তাকে ধর্মের সাথে সম্পর্কিত করা।’ (রিসালাতু শারিফ আল মুরতাজা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৪)।^{২৩}

৭। আল্লামা মাজলিসী (রহঃ) বলেছেনঃ ‘শরীয়তের ক্ষেত্রে বিদআত হলো এমন বিষয় যা রাসুলের মৃত্যুর পর ধর্মে সংযোজন করা হয়েছে এবং এর সপক্ষে কোন প্রমাণ কোরআন ও সুন্নাহয় নেই। তবে তা সাধারণ কোন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হলে বিদআত হবে না।’ (বিহারুল আনওয়ার, ৭৪তম খণ্ড, পৃ. ২০২)।^{২৪}

হাদীসশাস্ত্র, প্রখ্যাত আলেম ও ফিকাহবিদদের বর্ণিত সংজ্ঞাসমূহ হতে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বিদআত পারিভাষিক অর্থে ধর্মে কোরআন ও সুন্নাহর দলিল ব্যতিরেকে কোন নতুন বিধান সংযোজন বা বিয়োজন। সুতরাং, আকীদা ও আমলের সে সব আবিষ্কৃত পন্থা ও পদ্ধতিকে বিদআত বলা হয়, যা রাসুল (সঃ), সাহাবা, তাবিঈন ও তাবি তাবিয়ীনের যামানার পর সওয়াব ও আল্লাহ সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। অথচ এর কোন প্রমাণ তাদের কথায় বা কাজে স্পষ্টরূপে বা ইঙ্গিতে পাওয়া যায় না এবং শরিয়তে এর কোন ভিত্তি নেই।

বিদআতের বৈশিষ্ট্যঃ উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বিদআতের ৪টি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে সেসব বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলোঃ -

^{২৩} রিসালাতু শারিফ আল মুরতাজা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৪

^{২৪} বিহারুল আনওয়ার, ৭৪তম খণ্ড, পৃ. ২০২

১। বিদআতকে বিদআত হিসেবে চেনার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন দলীল পাওয়া যায় না তবে তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মূলনীতিগত 'আম ও সাধারণ দলীল পাওয়া যায়।

২। বিদআত সবসময়ই শরীয়তের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও মাকাসিদ এর বিপরীত ও বিরোধী অবস্থানে থাকে আর এ বিষয়টিই বিদআত নিকৃষ্ট ও বাতিল হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এ জন্যই হাদীসে বিদআতকে ভ্রষ্টতা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৩। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদআত এমন সব কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে হয়ে থাকে যা রাসূল (সাঃ) ও সাহাবাদের যুগে প্রচলিত ছিল না। ইমাম ইবনুল জাওয়ী (রহঃ) বলেন,

البِدْعَةُ عِبَارَةٌ عَنْ فِعْلٍ لَمْ يَكُنْ فَايْتَدِعَ

বিদআত বলতে বুঝায় এমন কাজকে যা ছিল না, অতঃপর তা উদ্ভাবন করা হয়েছে'। (তথ্যসূত্রঃ তালবীসু ইবলীস, পৃষ্ঠা নং - ১৬)।²⁵

৪। বিদআতের সাথে শরীয়তের কোন কোন ইবাদতের কিছু মিল থাকে। দু'টো ব্যাপারে এ মিলগুলো লক্ষ্য করা যায়ঃ-

²⁵ তালবীসু ইবলীস, পৃষ্ঠা নং - ১৬

প্রথমতঃ দলীলের দিক থেকে এভাবে মিল রয়েছে যে, কোন একটি আম দলীল কিংবা সংশয় অথবা ধারনার ভিত্তিতে বিদ'আতটি প্রচলিত হয় এবং খাস ও দলীলকে পাশ কাটিয়ে এ আম দলীল কিংবা সংশয় অথবা ধারনাটিকে বিদআতের সহীহ ও সঠিক দলীল বলে মনে করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ শরীয়ত প্রণীত ইবাদতের রূপরেখা ও পদ্ধতির সাথে বিদ'আতের মিল তৈরী করা হয় সংখ্যা, আকার-আকৃতি, সময় বা স্থানের দিক থেকে কিংবা হুকুমের দিক থেকে। এ মিলগুলোর কারণে অনেকে একে বিদআত মনে না করে ইবাদত বলে গণ্য করে থাকেন।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য ও সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বিদ'আত সম্বন্ধে আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে, যে সকল বিশ্বাস ও কাজকে দ্বীনের অংশ মনে করে অথবা সওয়াব হবে ধারণা করে 'আমল করা হয় তা বিদ'আত। কারণ হাদীসে এসেছে: আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

“আমাদের এ দ্বীনে যে এমন কিছু আবিষ্কার করল, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা পরিত্যক্ত।” [তথ্যসূত্রঃ সহীহুল বুখারীঃ ২৫১২, মুসলিমঃ ৩২৪৮]^{২৬}। এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হল যে, নতুন আবিষ্কৃত বিষয়টি যদি ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে তা বিদ'আত ও প্রত্যাখ্যাত।

^{২৬} সহীহুল বুখারীঃ ২৫১২, মুসলিমঃ ৩২৪৮

হাদীসে আরো এসেছেঃ “যে ব্যক্তি এমন কাজ করল যার প্রতি আমাদের (ইসলামের) নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত”। (সহীহুল মুসলিম)²⁷।

এ হাদীসে “যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই” বাক্যটি দ্বারা এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, বিষয়টি ধর্মীয় হতে হবে। ধর্মীয় বিষয় হিসাবে কোন নতুন ‘আমল করলেই বিদ’আত হবে।

কুরআনে বিদ’আত শব্দের উল্লেখঃ কুরআন মজীদে বিদ’আত শব্দটি তিনটি স্থানে তিন ভাবে উল্লেখিত হয়েছে:-

একঃ আল্লাহ্ সম্পর্কে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে দু’টো আয়াতে । যেমন-

۝۱۱۹-بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. البقرة

“আসমান ও জমিনের নতুন উদ্ভাবন কারী নতুন সৃষ্টিকারী, তিনি যখন কোনো কাজের ফয়সালা করেন তখন শুধু তাকে বলেনঃ হও, অমনি তা হয়ে যায়।”

۝۱۵۱-الانعام. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ

“তিনি তো আসমান যমীনের নব সৃষ্টিকারী। তার সন্তান হবে কোথেকে, কেমন করে হবে তার স্ত্রী? তিনিই তো সব সৃষ্টি করেছেন।

²⁷ সহীহুল মুসলিম

এ দুটো আয়াতে আল্লাহ তাআলাকে আসমান যমিনের “বদীউন” তথা পূর্ব দৃষ্টান্ত, পূর্ব উপাদান ও পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই সৃষ্টিকারী বলা হয়েছে।

দুইঃ অন্য আয়াতে রাসুল (সাঃ) সম্পর্ক এভাবে বলা হয়েছে।

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. الْإِحْقَافُ

“আপনি বলুন আমি এমন কোন রাসুল নই যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। আমি জানিনা আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে।”

তিনঃ বনি ইসরাঈলের কতিপয় লোকদের বিশেষ আমল সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

﴿۲۹-وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ (الحديد

“আর বৈরাগ্যবাদ সেতো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে। আমি এটি তাদের উপর লিখে ফরয করে দেইনি।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, **بدعة** শব্দের অর্থ হচ্ছে নাই থেকে সৃষ্টিকরা। নিরস্তির থেকে অস্তিত্ব দেয়া, নব্য উদ্ভাবন ইত্যাদি।

বিদ‘আত নির্ধারণে মানুষ সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্তঃ

এক : দলীল পাওয়া যায় না এমন প্রতিটি বিষয়কে এক শ্রেণীর মানুষ বিদ‘আত হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং এক্ষেত্রে তারা বিশেষ বাছ-বিচার না

করেই সব কিছুকে (এমন কি মু‘আমালার বিষয়কেও) বিদ‘আত বলে অভিহিত করছে। এদের কাছে বিদ‘আতের সীমানা বহুদূর বিস্তৃত।

দুই : যারা দ্বীনের মধ্যে নব উদ্ভাবিত সকল বিষয়কে বিদ‘আত বলতে রাজী নয়; বরং বড় বড় নতুন কয়েকটিকে বিদ‘আত বলে বাকী সবকিছু শরীয়তভুক্ত বলে তারা মনে করে। এদের কাছে বিদ‘আতের সীমানা খুবই ক্ষুদ্র।

তিন : যারা যাচাই-বাছাই করে শুধুমাত্র প্রকৃত বিদ‘আতকেই বিদ‘আত বলে অভিহিত করে থাকেন। এরা মধ্যম পন্থাবলম্বী এবং হকপন্থী। (তথ্যসূত্রঃ **বিদ‘আত পরিচিতির মূলনীতি**, ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, **সম্পাদনা** : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, ইসলাম হাউসের সৌজন্যে, পৃষ্ঠা নং - ১২)^{২৮}।

সুন্নাত ও বিদ‘আতের পার্থক্যঃ অন্ধকার না বুঝলে যেমন আলো বুঝা যায় না, ঠান্ডা না বুঝলে গরম বুঝে আসেনা, মুর্থতা না বুঝলে শিক্ষা বুঝে আসেনা, তেমনি সুন্নাত না বুঝলে বিদ‘আত বুঝা যায় না। কারণ বলা হয়ে থাকে-

تعرف الأشياء باضدادها.

বিদ‘আত (السنة) আরবী শব্দ। - এর অভিধানিক অর্থঃ

الطريقة محمودة كانت او مذمومة

^{২৮} **বিদ‘আত পরিচিতির মূলনীতি**, ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, **সম্পাদনা** : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, ইসলাম হাউসের সৌজন্যে, পৃষ্ঠা নং - ১২

অতএব, পস্থা-পদ্ধতি, রীতি, নিয়ম, পথ, স্বভাব ইত্যাদি চাই তা ভাল হোক কিংবা মন্দ হউক তাই বিদ'আত।

কুরআন- হাদীসে সুন্নাত (سنة) শব্দটির ব্যবহারঃ কুরআন এবং হাদীসে এ শব্দটির অধিক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমনঃ

কুরআন মজীদে এর ব্যবহারঃ

১৩-سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (الفتح)

৪৩-فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (الفاطر)

৭৭-سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا (بنی اسرائیل)

হাদীসে এর ব্যবহারঃ

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا
لَتَتَّبِعَن سُنَنُ مَنْ قَبْلَكُمْ الشُّبْرَ بِالشُّبْرِ وَالْزَّرْعَ بِالزَّرْعِ وَالْبَاعُ بِالْبَاعِ حَتَّىٰ لَوْ أَنَّ
أَحَدَهُمْ دَخَلَ حَجْرًا ضَبَّ لَدَخَلْتُمُوهُ

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসগুলোতে 'সুন্নাত' শব্দটি **طريقة** পথ-পস্থা, পদ্ধতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বোপরি এ কথা বলা যায় যে, সুন্নাত শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১। নবীর হাদীস

২। নবীর আমল এবং

৩। নবীর তরীকা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, রাসুল (সঃ) কর্তৃক অনুসৃত মতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সকল কর্মনীতিই হলো সুন্নাত। আর এ নীতিতে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন ও বিকৃতি সাইনেরই অপর নাম হলো বিদ'আত। এ প্রসঙ্গে আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন -

وتطلق في الشرع على مقابلة السنة

সুন্নত ও বিদ'আতের পার্থক্যের কিছু উদাহরণঃ যেমন-

এক - পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে আযান - একামত আছে, কিন্তু খুতবা নাই।
পক্ষান্তরে জুম'আর নামাজে খুতবা আছে।

দুই - ঈদের নামাজ ও জানাযার নামাজে আযান একামত নেই। এখন যদি কেউ নিজের মনগড়া ইচ্ছায় একথা বলে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং ঈদ ও জানাযার নামাজ একই তাই এখানে আযান - একামত দিতে হবে এবং জুমআর নামাজ ছাড়াও যে নামাজ গুলো আছে তাতে খুতবা দিতে হবে, এ ধারণা পোষণকারীর নামাজ না হওয়ায় কারণ হলো তার নামাজ নবীর দেখানো সুন্নাত তথা ত্বরীকা অনুযায়ী হয় নাই। তাই এটা বিদ'আত হবে।

মোট কথা - ধর্মের কাজ নবীর তরীকা অনুযায়ী করলে নবীর সুন্নাত হবে আর ধর্মের কাজ নিজের ইচ্ছামত করলে বিদ'আত হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ধর্মের কাজ ছাড়া যতকাজ আছে তা মনগড়া করলে বিদ'আত হবে না। যেমন মাইক তৈরী, যন্ত্রপাতি, মেশিনারী দ্রব্য, রকেট, বিমান, টেলিভিশন, রেডিও, মোবাইল, গাড়ি, কম্পিউটার, বিন্দিং ইত্যাদি আবিষ্কার বিদ'আত নয়, কারণ এ গুলো ধর্মের কাজের জন্য তৈরি করা হয় নাই। এসব বিষয়ে উপরে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথের হেদায়ত দান করুন, আমীন।

বিদ'আতের মৌলিক নীতিমালাঃ

বিদ'আতের তিনটি মৌলিক নীতিমালা রয়েছে। সেগুলো হলঃ

১. এমন 'আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাওয়াবের আশা করা যা শরীয়ত সিদ্ধ নয়। কেননা শরীয়তের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হল- এমন আমল দ্বারা আল্লাহর নিকট সাওয়াবের আশা করতে হবে যা কুরআনে আল্লাহ নিজে কিংবা সহীহ হাদীসে তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমোদন করেছেন। তাহলেই কাজটি ইবাদাত বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমল অনুমোদন করেন নি সে আমলের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাত করা হবে বিদ'আত।

২. দ্বীনের অনুমোদিত ব্যবস্থা ও পদ্ধতির বাইরে অন্য ব্যবস্থার অনুসরণ ও স্বীকৃতি প্রদান। ইসলামে একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, শরীয়তের বেঁধে দেয়া পদ্ধতি ও বিধানের মধ্যে থাকা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি ইসলামী শরীয়ত ব্যতীত অন্য বিধান ও পদ্ধতি অনুসরণ করল ও তার প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি প্রদান করল সে বিদ'আতে লিপ্ত হল।

৩. যে সকল কর্মকাণ্ড সরাসরি বিদ'আত না হলেও বিদ'আতের দিকে পরিচালিত করে এবং পরিশেষে মানুষকে বিদ'আতে লিপ্ত করে, সেগুলোর হুকুম বিদ'আতেরই অনুরূপ।

জেনে রাখা ভাল যে, 'সুন্নাত'-এর অর্থ বুঝতে ভুল হলে বিদ'আত চিহ্নিত করতেও ভুল হবে। এদিকে ইঙ্গিত করে ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন, “সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সুন্নাতকে বিদ'আত থেকে পৃথক করা; কেননা সুন্নাত হচ্ছে ঐ বিষয়, শরীয়ত প্রণেতা যার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর বিদ'আত হচ্ছে ঐ বিষয় যা শরীয়ত প্রণেতা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বলে অনুমোদন করেন নি। এ বিষয়ে মানুষ মৌলিক ও অমৌলিক অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর বিভ্রান্তির বেড়াজালে নিমজ্জিত হয়েছে। কেননা, প্রত্যেক দলই ধারণা করে যে, তাদের অনুসৃত পন্থাই হল সুন্নাত এবং তাদের বিরোধীদের পথ হল বিদ'আত।”²⁹

বিদ'আতের উপরোল্লিখিত তিনটি প্রধান মৌলিক নীতিমালার আলোকে বিদ'আতকে চিহ্নিত করার জন্য আরো বেশ কিছু সাধারণ নীতিমালা শরীয়ত বিশেষজ্ঞ আলেমগণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যদ্বারা একজন সাধারণ মানুষ সহজেই কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের ভিত্তিতে বিদ'আতের পরিচয় লাভ করতে পারে ও সমাজে প্রচলিত বিদ'আতসমূহকে চিহ্নিত করতে পারে। (বিদ'আত পরিচিতির মূলনীতি, ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, ইসলাম হাউসের সৌজন্যে, পৃষ্ঠা নং - ১৩ - ৪৮ দ্রষ্টব্য)³⁰। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হল

²⁹ আল-ইস্তিকামাহ : ১/১৩

³⁰ বিদ'আত পরিচিতির মূলনীতি, ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, ইসলাম হাউসের সৌজন্যে, পৃষ্ঠা নং - ১৩ - ৪৮ দ্রষ্টব্য

শরীয়তের দৃষ্টিতে যা বিদ'আত তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনে নেয়া ও তা থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা। নীচে উদাহরণ স্বরূপ কিছু দৃষ্টান্তসহ আমরা অতীব গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় নীতিমালা উল্লেখ করছি।

প্রথম নীতি :

অত্যধিক দুর্বল, মিথ্যা ও জাল হাদীসের ভিত্তিতে যে সকল ইবাদাত করা হয়, তা শরীয়তে বিদ'আত বলে বিবেচিত।

এটি বিদ'আত চিহ্নিত করার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি। কেননা ইবাদাত হচ্ছে পুরোপুরি অহী নির্ভর। শরীয়তের কোন বিধান কিংবা কোন ইবাদাত শরীয়তের গ্রহণযোগ্য সহীহ দলীল ছাড়া সাব্যস্ত হয় না। জাল বা মিথ্যা হাদীস মূলতঃ হাদীস নয়। অতএব এ ধরনের হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া কোন বিধান বা ইবাদাত শরীয়তের অংশ হওয়া সম্ভব নয় বিধায় সে অনুযায়ী আমল বিদ'আত হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে থাকে। অত্যধিক দুর্বল হাদীসের ব্যাপারে জমহুর মুহাদ্দিসগণের মত হল এর দ্বারাও শরীয়তের কোন বিধান সাব্যস্ত হবে না।

উদাহরণ :

রজব মাসের প্রথম জুমু'আর রাতে অথবা ২৭শে রজব যে বিশেষ শবে মি'রাজের সালাত আদায় করা হয় তা বিদ'আত হিসেবে গণ্য। অনুরূপভাবে নিসফে শা'বান বা শবেবরাতের রাতে যে ১০০ রাকাত সালাত বিশেষ পদ্ধতিতে আদায় করা হয় যাকে সালাতুর রাগায়েব বলেও অভিহিত করা হয়, তাও বিদ'আত হিসেবে গণ্য। কেননা এর ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসটি

দ্বিতীয় নীতি :

যে সকল ইবাদাত শুধুমাত্র মনগড়া মতামত ও খেয়াল-খুশীর উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয় সে সকল ইবাদাত বিদ'আত হিসেবে গণ্য। যেমন কোন এক 'আলিম বা আবেদ ব্যক্তির কথা কিংবা কোন দেশের প্রথা অথবা স্বপ্ন কিংবা কাহিনী যদি হয় কোন 'আমল বা ইবাদাতের দলীল তাহলে তা হবে বিদ'আত।

দ্বীনের প্রকৃত নীতি হল- আল কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমেই শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে জ্ঞান আসে। সুতরাং শরীয়তের হালাল-হারাম এবং ইবাদাত ও 'আমল নির্ধারিত হবে এ দু'টি দলীলের ভিত্তিতে। এ দু'টি দলীল ছাড়া অন্য পন্থায় স্থিরীকৃত 'আমল ও ইবাদাত তাই বিদ'আত বলে গণ্য হবে। এ জন্যই বিদ'আতপন্থীগণ তাদের বিদ'আতগুলোর ক্ষেত্রে শরয়ী দলীলের অপব্যাখ্যা করে সংশয় সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাতেবী রহ. বলেন, “সুন্নাতি তরীকার মধ্যে আছে এবং সুন্নাতে অনুসারী বলে দাবীদার যে সকল ব্যক্তি সুন্নাতে বাইরে অবস্থান করছে, তারা নিজ নিজ মাসআলাগুলোতে সুন্নাহ দ্বারা দলীল পেশের ভান করেন।”³²

উদাহরণ :

১। কাশ্ফ, অন্তর্দৃষ্টি তথা মুরাকাবা-মুশাহাদা, স্বপ্ন ও কারামাতের উপর

³¹ তানযীলুশ শারীয়াহ আল মরফু'আহ ২/৮৯-৯৪, আল-ইবদা' পৃঃ ৫৮

³² আল ই'তেসাম ১/২২০

ভিত্তি করে শরীয়াতের হালাল হারাম নির্ধারণ করা কিংবা কোন বিশেষ ‘আমল বা ইবাদাতের প্রচলন করা।³³

২। শুধুমাত্র ‘আল্লাহ’ কিংবা হু-হু’ অথবা ‘ইল্লাল্লাহ’ এর যিকর উপরোক্ত নীতির আলোকে ইবাদাত বলে গণ্য হবে না। কেননা কুরআন কিংবা হাদীসের কোথাও এরকম যিকর অনুমোদিত হয় নি।³⁴

৩। মৃত অথবা অনুপস্থিত সৎব্যক্তিবর্গকে আহ্বান করা, তাদের কাছে প্রার্থনা করা ও সাহায্য চাওয়া, অনুরূপভাবে ফেরেশতা ও নবী-রসূলগণের কাছে দু‘আ করাও এ নীতির আলোকে বিদ‘আত বলে সাব্যস্ত হবে। শেষোক্ত এ বিদ‘আতটি মূলতঃ শেষ পর্যন্ত বড় শিক্রে পরিণত হয়।

তৃতীয় নীতি :

কোন বাধা-বিপত্তির কারণে নয় বরং এমনিতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল ‘আমল ও ইবাদাত থেকে বিরত থেকেছিলেন, পরবর্তীতে তার উম্মাতের কেউ যদি সে ‘আমল করে, তবে তা শরীয়তে বিদ‘আত হিসেবে গণ্য হবে। কেননা তা যদি শরীয়তসম্মত হত তাহলে তা করার প্রয়োজন বিদ্যমান ছিল। অথচ কোন বাধাবিপত্তি ছাড়াই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ‘আমল বা ইবাদাত ত্যাগ করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ‘আমলটি শরীয়তসম্মত নয়। অতএব সে ‘আমল করা যেহেতু আর কারো জন্য জায়েয নেই, তাই তা করা হবে বিদ‘আত।

³³ আল-ই‘তিসাম ১/২১২, ২/১৮১

³⁴ মাজমু‘ আল ফাতাওয়া ১০/৩৬৯

উদাহরণ :

১। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জুমা' ছাড়া অন্যান্য সালাতের জন্য 'আযান দেয়া।
উপরোক্ত নীতির আলোকে বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

২। সালাত শুরু করার সময় মুখে নিয়তের বাক্য পড়া। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম ও সাহাবীগণ এরূপ করা থেকে বিরত থেকেছিলেন এবং নিয়ত করেছিলেন শুধু অন্তর দিয়ে, তাই নিয়তের সময় মুখে বাক্য পড়া বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

৩। বিপদ-আপদ ও ঝড়-তুফান আসলে ঘরে আযান দেয়াও উপরোক্ত নীতির আলোকে বিদ'আত বলে গণ্য হবে। কেননা বিপদ-আপদে কী পাঠ করা উচিত বা কী 'আমল করা উচিত তা হাদীসে সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে।

৪। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম এর জন্মোৎসব পালনের জন্য কিংবা আল্লাহর কাছে সাওয়াব ও বরকত লাভের প্রত্যাশায় অথবা যে কোন কাজে আল্লাহর সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে মিলাদ পড়া উপরোক্ত নীতির আলোকে বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

চতুর্থ নীতি :

সালাফে সালাহীন তথা সাহাবায়ে কেরাম, ও তাবেরীন যদি কোন বাধা না থাকে সত্ত্বেও কোন ইবাদাতের কাজ করা কিংবা বর্ণনা করা অথবা লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত থেকে থাকেন, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে তাদের বিরত থাকার কারণে প্রমাণিত হয় যে, কাজটি তাদের দৃষ্টিতে শরীয়তসিদ্ধ নয়। কারণ তা যদি শরীয়তসিদ্ধ হত তাহলে তাদের জন্য তা করার প্রয়োজন

বিদ্যমান ছিল। তা সত্ত্বেও যেহেতু তারা কোন বাধাবিপত্তি ছাড়াই উক্ত ‘আমল ত্যাগ করেছেন, তাই পরবর্তী যুগে কেউ এসে সে ‘আমল বা ইবাদাত প্রচলিত করলে তা হবে বিদ‘আত। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, “যে সকল ইবাদাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম এর সাহাবাগণ করেন নি তোমরা সে সকল ইবাদাত কর না।”³⁵

মালিক ইবনে আনাস (রহ.) বলেন, “এই উম্মাতের প্রথম প্রজন্ম যে ‘আমল দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল একমাত্র সে ‘আমল দ্বারাই উম্মাতের শেষ প্রজন্ম সংশোধিত হতে পারে।”³⁶

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) কিছু বিদ‘আতের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলেন, “এ কথা জানা যে, যদি এ কাজটি শরীয়তসম্মত ও মুস্তাহাব হত যদ্বারা আল্লাহ সাওয়াব দিয়ে থাকেন, তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী অবহিত থাকতেন এবং অবশ্যই তাঁর সাহাবীদেরকে তা জানাতেন, আর তাঁর সাহাবীরাও সে বিষয়ে অন্যদের চেয়েও বেশী অবহিত থাকতেন এবং পরবর্তী লোকদের চেয়েও এ ‘আমলে বেশী আগ্রহী হতেন। কিন্তু যখন তারা এ প্রকার ‘আমলের দিকে কোন ভ্রক্ষেপই করলেন না তাতে বোঝা গেল যে, তা নব উদ্ভাবিত এমন বিদ‘আত যাকে তারা ইবাদাত, নৈকট্য ও আনুগত্য হিসেবে বিবেচনা করতেন না। অতএব এখন যারা একে ইবাদাত, নৈকট্য, সাওয়াবের কাজ ও আনুগত্য হিসাবে প্রদর্শন করছে তারা সাহাবাদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করছেন এবং দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু প্রচলন করছেন যার

³⁵ সহীহ বুখারী।

³⁶ ইকতিযা আস-সিরাত আল মুস্তাকীম ২/৭১৮

অনুমতি আল্লাহ প্রদান করেন নি।”³⁷ তিনি আরো বলেন, “আর যে ধরনের ইবাদাত পালন থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরত থেকেছেন অথচ তা যদি শরীয়াতসম্মত হত তাহলে তিনি নিজে তা অবশ্যই পালন করতেন, অথবা অনুমতি প্রদান করতেন এবং তাঁর পরে খলিফাগণ ও সাহাবীগণ তা পালন করতেন।

অতএব এ কথা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা ওয়াজিব যে এ কাজটি বিদ‘আত ও ভ্রষ্টতা।”³⁸ এর দ্বারা বুঝা গেল যে, যে সকল ইবাদাত পালন করা থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এবং তাঁর পরে উম্মাতের প্রথম প্রজন্মের আলিমগণ বিরত থেকেছিলেন নিঃসন্দেহে সেগুলো বিদ‘আত ও ভ্রষ্টতা। পরবর্তী যুগে কিংবা আমাদের যুগে এসে এগুলোকে ইবাদাত হিসেবে গণ্য করার কোন শর‘য়ী ভিত্তি নেই।

উদাহরণ :

১। ইসলামের বিশেষ বিশেষ দিবসসমূহ ও ঐতিহাসিক উপলক্ষগুলোকে ঈদ উৎসবের মত উদযাপন করা। কেননা ইসলামী শরীয়াতই ঈদ উৎসব নির্ধারণ ও অনুমোদন করে। শরীয়াতের বাইরে অন্য কোন উপলক্ষকে ঈদ উৎসবে পরিণত করার ইখতিয়ার কোন ব্যক্তি বা দলের নেই। এ ধরনের উপলক্ষের মধ্যে একটি রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম উৎসব উদযাপন। সাহাবীগণ ও পূর্ববর্তী আলিমগণ হতে এটি পালন করাতো দূরের কথা বরং অনুমোদন দানের কোন বর্ণনাও পাওয়া যায় না।

³⁷ ইকতিয়া আস সীরাত আল-মুস্তাকীম ২/৭৯৮

³⁸ মাযমু‘ আল ফাতাওয়া- ২৬/১৭২

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন, “এ কাজটি পূর্ববর্তী সালাফগণ করেন নি অথচ এ কাজ জাযিয় থাকলে সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে তা পালন করার কার্যকারণ বিদ্যমান ছিল এবং পালন করতে বিশেষ কোন বাধাও ছিল না। যদি এটা শুধু কল্যাণের কাজই হতো তাহলে আমাদের চেয়ে তারাই এ কাজটি বেশী করতেন। কেননা তারা আমাদের চেয়েও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বেশী সম্মান ও মহব্বত করতেন এবং কল্যাণের কাজে তারা ছিলেন বেশী আগ্রহী।”³⁹

২। ইতোপূর্বে বর্ণিত সালাত-আর রাগায়েব বা শবে মি'রাজের সালাত উল্লেখিত চতুর্থ নীতির আলোকেও বিদ'আত সাব্যস্ত হয়ে থাকে। ইমাম ইয়যুদ্বীন ইবনু আব্দুস সালাম (রহ.) এ প্রকার সালাত এর বৈধতা অস্বীকার করে বলেন, “এ প্রকার সালাত যে বিদ'আত তার একটি প্রমাণ হলো দ্বীনের প্রথম সারির 'উলামা ও মুসলিমদের ইমাম তথা সাহাবায়ে কিরাম, তাবায়ীন, তাবে তাবায়ীন ও শরীয়াহ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নকারী বড় বড় 'আলিমগণ মানুষকে ফরয ও সুন্নাত বিষয়ে জ্ঞান দানের প্রবল আগ্রহ পোষণ করা সত্ত্বেও তাদের কারো কাছ থেকে এ সালাত সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় নি এবং কেউ তাঁর নিজ গ্রন্থে এ সম্পর্কে কিছু লিপিবদ্ধও করেন নি ও কোন বৈঠকে এ বিষয়ে কোন আলোকপাতও করেন নি। বাস্তবে এটা অসম্ভব যে, এ সালাত আদায় শরীয়তে সুন্নাত হিসেবে বিবেচিত হবে অথচ দ্বীনের প্রথম সারির 'আলিমগণ ও মুমিনদের যারা আদর্শ, বিষয়টি তাদের সকলের কাছে থেকে যাবে সম্পূর্ণ অজানা”। [আত

³⁹ ইকতিয়া আস-সিরাত আল মুস্তাকিম-২/৬১৫

তারগীব ‘আন সলাতির রাগাইব আল মাওদুয়া, পৃঃ ৫-৯]⁴⁰

পঞ্চম নীতি :

যে সকল ইবাদাত শরীয়াতের মূলনীতিসমূহ এবং মাকাসিদ তথা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিপরীত সে সবই হবে বিদ‘আত।

উদাহরণ :

১. দুই ঈদের সালাতের জন্য আযান দেয়া। কেননা নফল সালাতের জন্য আযান দেয়া শরীয়ত সম্মত নয়। আযান শুধু ফরয সালাতের সাথেই খাস।
২. জানাযার সালাতের জন্য আযান দেয়া। কেননা জানাযার সালাতে আযানের কোন বর্ণনা নেই, তদুপরি এতে সবার অংশগ্রহণ করার বাধ্যবাধকতাও নেই।
৩. ফরয সালাতের আযানের আগে মাইকে দরুদ পাঠ। কেননা আযানের উদ্দেশ্য লোকদেরকে জামাআ‘তে সালাত আদায়ের প্রতি আহবান করা, মাইকে দরুদ পাঠের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

ষষ্ঠ নীতি :

প্রথা ও মু‘আমালাত বিষয়ক কোনো কাজের মাধ্যমে যদি শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছাড়াই আল্লাহর কাছে সাওয়াব লাভের আশা করা হয় তাহলে তা হবে বিদ‘আত।

⁴⁰ আত তারগীব ‘আন সলাতির রাগাইব আল মাওদুয়া, পৃঃ ৫-৯

উদাহরণ :

পশমী কাপড়, চট, ছেঁড়া ও তালি এবং ময়লাযুক্ত কাপড় কিংবা নির্দিষ্ট রঙের পোষাক পরিধান করাকে ইবাদাত ও আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়ার পন্থা মনে করা। একই ভাবে সার্বক্ষণিক চুপ থাকাকে কিংবা রুটি ও গোশত ভক্ষণ ও পানি পান থেকে বিরত থাকাকে অথবা ছায়াযুক্ত স্থান ত্যাগ করে সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে কাজ করাকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পন্থা হিসাবে নির্ধারণ করা।

উল্লেখিত কাজসমূহ কেউ যদি এমনিতেই করে তবে তা নাজায়য নয়, কিন্তু এ সকল ‘আদাত কিংবা মোয়ামালাতের কাজগুলোকে যদি কেউ ইবাদাতের রূপ প্রদান করে কিংবা সাওয়াব লাভের উপায় মনে করে তবে তখনই তা হবে বিদ‘আত। কেননা এগুলো ইবাদাত ও সাওয়াব লাভের পন্থা হওয়ার কোন দলীল শরীয়তে নেই।

সপ্তম নীতি :

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল কাজ নিষেধ করে দিয়েছেন সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও সাওয়াব লাভের আশা করা হলে সেগুলো হবে বিদ‘আত।

উদাহরণ :

১। গান-বাদ্য ও কাওয়ালী বলা ও শোনা অথবা নাচের মাধ্যমে যিকর করে আল্লাহর কাছে সাওয়াবের আশা করা।

২। কাফির, মুশরিক ও বিজাতীয়দের অনুকরণের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও সাওয়াব লাভের আশা করা।

অষ্টম নীতি :

যে সকল ইবাদাত শরীয়তে নির্ধারিত সময়, স্থান ও পদ্ধতির সাথে প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলোকে সে নির্ধারিত সময়, স্থান ও পদ্ধতি থেকে পরিবর্তন করা বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ :

১। নির্ধারিত সময় পরিবর্তনের উদাহরণ- যেমন জিলহাজ্জ মাসের এক তারিখে কুরবানী করা। কেননা, কুরবানীর শরয়ী সময় হল ১০ জিলহাজ্জ ও তৎপরবর্তী আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলো।

২। নির্ধারিত স্থান পরিবর্তনের উদাহরণ- যেমন মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ই'তিকাফ করা। কেননা, শরীয়ত কর্তৃক ই'তিকাফের নির্ধারিত স্থান হচ্ছে মসজিদ।

৩। নির্ধারিত শ্রেণী পরিবর্তনের উদাহরণ- যেমন গৃহ পালিত পশুর পরিবর্তে ঘোড়া দিয়ে কুরবানী করা।

৪। নির্ধারিত সংখ্যা পরিবর্তনের উদাহরণ- যেমন পাঁচ ওয়াক্তের অতিরিক্ত ৬ষ্ঠ আরো এক ওয়াক্ত সালাত প্রচলন করা। কিংবা চার রাক'আত সালাতকে দুই রাক'আত, কিংবা দুই রাক'আতের সালাতকে চার রাক'আতে পরিণত করা।

৫। নির্ধারিত পদ্ধতি পরিবর্তনের উদাহরণ : অযু করার শর'য়ী পদ্ধতির বিপরীতে যেমন দু'পা ধোয়ার মাধ্যমে অযু শুরু করা এবং তারপর দু'হাত ধৌত করা এবং মাথা মাসেহ করে মুখমন্ডল ধৌত করা। অনুরূপভাবে সালাতের মধ্যে আগে সিজদাহ ও পরে রুকু করা।

নবম নীতি :

‘আম তথা ব্যাপক অর্থবোধক দলিল দ্বারা শরীয়তে যে সকল ইবাদাতকে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে সেগুলোকে কোন নির্দিষ্ট সময় কিংবা নির্দিষ্ট স্থান অথবা অন্য কিছুর সাথে এমনভাবে সীমাবদ্ধ করা বিদ'আত বলে গণ্য হবে যদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ইবাদাতের এ সীমাবদ্ধ করণ প্রক্রিয়া শরীয়তসম্মত, অথচ পূর্বোক্ত ‘আম দলীলের মধ্যে এ সীমাবদ্ধ করণের উপর কোন প্রমাণ ও দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না। এ নীতির মোদাকথা হচ্ছে কোন উন্মুক্ত ইবাদাতকে শরীয়াতের সহীহ দলীল ছাড়া কোন স্থান, কাল বা সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ করা বিদ'আত হিসেবে বিবেচিত।

উদাহরণ :

১। যে দিনগুলোতে শরীয়াত রোযা বা সাওম রাখার বিষয়টি সাধারণভাবে উন্মুক্ত রেখেছে যেমন মঙ্গল বার, বুধবার কিংবা মাসের ৭, ৮ ও ৯ ইত্যাদি তারিখসমূহ, সে দিনগুলোর কোন এক বা একাধিক দিন বা বারকে বিশেষ ফযীলাত আছে বলে সাওম পালনের জন্য যদি কেউ খাস ও সীমাবদ্ধ করে অথচ খাস করার কোন দলীল শরীয়তে নেই, যেমন ফাতিহা-ই-ইয়াযদাহমের দিন সাওম পালন করা, তাহলে শরীয়াতের দৃষ্টিতে তা হবে বিদ'আত, কেননা দলীল ছাড়া শরীয়াতের কোন হুকুমকে খাস ও সীমাবদ্ধ

করা জায়েয নেই।

২। ফযীলাতপূর্ণ দিনগুলোতে শরীয়াত যে সকল ইবাদাতকে উন্মুক্ত রেখেছে সেগুলোকে কোন সংখ্যা, পদ্ধতি বা বিশেষ ইবাদাতের সাথে খাস করা বিদ'আত হিসাবে গণ্য হবে। যেমন প্রতি শুক্রবার নির্দিষ্ট করে চল্লিশ রাক'আত নফল সালাত পড়া, প্রতি বৃহস্পতিবার নির্দিষ্ট পরিমাণ সদাকা করা, অনুরূপভাবে কোন নির্দিষ্ট রাতকে নির্দিষ্ট সালাত ও কুরআন খতম বা অন্য কোন ইবাদাতের জন্য খাস করা।

দশম নীতি :

শরীয়াতে যে পরিমাণ অনুমোদন দেয়া হয়েছে ইবাদাত করতে গিয়ে সে ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশী 'আমল করার মাধ্যমে বাড়াবাড়ি করা এবং কঠোরতা আরোপ করা বিদ'আত বলে বিবেচিত।

উদাহরণ :

১। সারা রাত জেগে নিদ্রা পরিহার করে কিয়ামুল লাইল এর মাধ্যমে এবং ভঙ্গ না করে সারা বছর সাওম রাখার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা এবং অনুরূপভাবে স্ত্রী, পরিবার ও সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্যবাদের ব্রত গ্রহণ করা। সহীহ বুখারীতে আনাস ইবনে মালেক (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) এর হাদীসে যারা সারা বছর সাওম রাখার ও বিবাহ করে সংসার ধর্ম পালন না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিল তাদের উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন :

«أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ

وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» رواه البخاري.

“আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বেশী ভয় পোষণ করি এবং তাকওয়া অবলম্বনকারী। কিন্তু আমি সওম পালন করি ও ভাজি, সালাত আদায় করি ও নিদ্রা যাপন করি এবং নারীদের বিবাহ করি। যে আমার এ সুন্নাহ থেকে বিরাগভাজন হয়, যে আমার দলভুক্ত নয়।”⁴¹

২। হাজ্জের সময় জামরায় বড় বড় পাথর দিয়ে রমী করা, এ কারণে যে, এগুলো ছোট পাথরের চেয়ে পিলারে জোরে আঘাত হানবে এবং এটা এ উদ্দেশ্যে যে, শয়তান এতে বেশী ব্যথা পাবে। এটা বিদ‘আত এজন্য যে, শরীয়তের নির্দেশ হল ছোট পাথর নিক্ষেপ করা এবং এর কারণ হিসেবে হাদীসে বলা হয়েছে যে, “আল্লাহর যিকর ও স্মরণকে কায়েম করা।”⁴² উল্লেখ্য যে, পাথর নিক্ষেপের স্তম্ভটি শয়তান বা শয়তানের প্রতিভূ নয়। হাদীসের ভাষায় এটি জামরাহ। তাই সকল ক্ষেত্রে নিরাপদ হল হাদীস অনুযায়ী ‘আমল করা ও আকীদা পোষণ করা।

৩। যে পোষাক পরিধান করা শরীয়তে মুবাহ ও জায়েয, যেমন পশমী কিংবা মোটা কাপড় পরিধান করা তাকে ফযীলাতপূর্ণ অথবা হারাম মনে করা বিদ‘আত, কেননা এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে বাড়াবাড়ি।

একাদশ নীতি :

যে সকল আকীদাহ, মতামত ও বক্তব্য আল-কুরআন ও সুন্নাহের বিপরীত

⁴¹ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৬৩

⁴² সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ১৬১২ ও সুনান আ-তিরমিযী, হাদীস নং ৮২৬, তিরমিযী বলেছেন, এটি হাসান ও সহীহ হাদীস।

কিংবা এ উম্মাতের সালাফে সালেহীনের ইজমা‘ বিরোধী সেগুলো শরীয়াতে দৃষ্টিতে বিদ‘আত। এই নীতির আলোকে নিম্নোক্ত দু‘টি বিষয় শরীয়াতে দৃষ্টিতে বিদ‘আত ও প্রত্যাখ্যাত বলে গণ্য হবে।

প্রথম বিষয়ঃ নিজস্ব আকল ও বিবেকপ্রসূত মতামতকে অমোঘ ও নিশ্চিত নীতিরূপে নির্ধারণ করা এবং কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যকে এ নীতির সাথে মিলিয়ে যদি দেখা যায় যে, সে বক্তব্য উক্ত মতামতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তাহলে তা গ্রহণ করা এবং যদি দেখা যায় যে, কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য উক্ত মতামত বিরোধী তাহলে সে বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করা। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর উপরে নিজের আকল ও বিবেককে অগ্রাধিকার দেয়া।

শরীয়াতে দৃষ্টিতে এ বিষয়টি অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন : “বিবেকের মতামত অথবা কিয়াস দ্বারা আল কুরআনের বিরোধিতা করাকে সালাফে সালেহীনের কেউই বৈধ মনে করতেন না।

এ বিদ‘আতটি তখনই প্রচলিত হয় যখন জাহমিয়া, মু‘তাজিলা ও তাদের অনুরূপ কতিপয় এমন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে যারা বিবেকপ্রসূত রায়ের উপর ধর্মীয় মূলনীতি নির্ধারণ করেছিলেন এবং সেই রায়ের দিকে কুরআনের বক্তব্যকে পরিচালিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, যখন বিবেক ও শরীয়ার মধ্যে বিরোধিতা দেখা দিবে তখন হয় শরীয়াতে সঠিক মর্ম বোধগম্য নয় বলে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা হবে অথবা বিবেকের রায় অনুযায়ী তা‘বীল ও ব্যাখ্যা করা হবে। এরা হলো সে সব লোক যারা কোন

দলীল ছাড়াই আল্লাহর আয়াতের ব্যাপারে তর্ক করে থাকে।”⁴³

ইবনু আবিল ‘ইয় আল-হানাফী (রহ.) বলেন, “বরং বিদ‘আতকারীদের প্রত্যেক দলই নিজেদের বিদ‘আত ও যাকে তারা বিবেকপ্রসূত যুক্তি বলে ধারণা করে তার সাথে কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যকে মিলিয়ে দেখে। কুরআন সুন্নাহর সে বক্তব্য যদি তাদের বিদ‘আত ও যুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহলে তারা বলে, এটি মুহকাম ও দৃঢ়বক্তব্য। অতঃপর তারা তা দলীলরূপে গ্রহণ করে। আর যদি তা তাদের বিদ‘আত ও যুক্তির বিপরীত হয় তাহলে তারা বলে, এটি মুতাশাবিহাত ও আবোধগম্য, অতঃপর তারা তা প্রত্যাখ্যান করে.....অথবা মূল অর্থ থেকে পরিবর্তন করে”⁴⁴

দ্বিতীয় বিষয়ঃ কোন জ্ঞান ও ইলম ছাড়াই দ্বীনী বিষয়ে ফাতওয়া দেয়া।

ইমাম শাতিবী (রহ.) বলেন, “যারা অনিশ্চিত কোন বক্তব্যকে অন্ধভাবে মেনে নেয়ার উপর নির্ভর করে অথবা গ্রহণযোগ্য কোন কারণ ছাড়াই কোন বিষয়কে প্রাধান্য দেয়, তারা প্রকৃত পক্ষে দ্বীনের রজ্জু ছিন্ন করে শরীয়াত বহির্ভূত কাজের সাথে জড়িত থাকে। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে এ থেকে আমাদেরকে নিরাপদ রাখুন।

ফাতওয়ার এ পদ্ধতি আল্লাহ তা‘আলার দ্বীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবিত বিদ‘আতেরই অন্তর্ভুক্ত, তেমনিভাবে আকল বা বিবেককে দ্বীনের সর্বক্ষেত্রে Dominator হিসেবে স্থির করা নবউদ্ভাবিত বিদ‘আত।”⁴⁵

⁴³ আল-ইসতেকামা ১/২৩

⁴⁴ শরহুল আকীদা আত তাহাভিয়া পৃঃ ১৯৯৯

⁴⁵ আল-ইতিসাম ২/১৭৯

দ্বাদশ নীতি :

যে সকল আকীদা কুরআন ও সুন্নাহ আসে নি এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেরীনের কাছ থেকেও বর্ণিত হয় নি, সেগুলো বিদআতী আকীদা হিসেবে শরীয়তে গণ্য।

উদাহরণ :

১. সুফী তরীকাসমূহের সে সব আকীদা ও বিষয়সমূহ যা কুরআন ও সুন্নাহ আসে নি এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেরীনের কাছ থেকেও বর্ণিত হয় নি।

ইমাম শাতিবী (রহ.) বলেন, “তন্মধ্যে রয়েছে এমন সব অলৌকিক বিষয় যা শ্রবণকালে মুরিদদের উপর শিরোধার্য করে দেয়া হয়। আর মুরীদের কর্তব্য হল যা থেকে সে বিমুক্ত হয়েছে পুনরায় পীরের পক্ষ থেকে তা করার অনুমতি ও ইঙ্গিত না পেলে তা না করা..... এভাবে আরো অনেক বিষয় যা তারা আবিষ্কার করেছে, সালাফদের প্রথম যুগে যার কোন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না।”⁴⁶

২. আল্লাহর যাতী গুণাবলীর ক্ষেত্রে ⁴⁷الجهة বা দিক-নির্ধারণ الجسم বা শরীর ইত্যাদি সার্বিকভাবে সাব্যস্ত করা কিংবা পুরোপুরি অস্বীকার করা বিদআত

⁴⁶ আল-ইতিসাম ১/২৬১

⁴⁷ তবে দিক নির্ধারণ না করলেও جهة العلو বা উপরের দিক আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। এটা কুরআন ও হাদীসের হাজার হাজার ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য جهة শব্দটি ব্যবহার না করা। উপরের দিক প্রতিটি মুসলিমই সাব্যস্ত করে থাকেন। [সম্পাদক]

হিসেবে গণ্য। কেননা কুরআন, হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্যের কোথাও এগুলোকে সরাসরি সাব্যস্ত কিংবা অস্বীকার কোনটাই করা হয় নি।

এ সম্পর্কে ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, “সালাফের কেউই আল্লাহর ব্যাপারে الجسم বা শরীর সাব্যস্ত করা কিংবা অস্বীকার করার বিষয়টি সম্পর্কে কোন বক্তব্য প্রদান করেন নি। একইভাবে আল্লাহর সম্পর্কে الجواهر বা মৌলিক বস্তু এবং (التحيز) বা অবস্থান গ্রহণ অথবা অনুরূপ কোন বক্তব্যও তারা দেন নি। কেননা এগুলো হলো অস্পষ্ট শব্দ, যদ্বারা কোন হক প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং বাতিলও প্রমাণিত হয় না।..... বরং এগুলো হচ্ছে সে সকল বিদআতী কালাম ও কথা যা সালাফ ও ইমামগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।”⁴⁸

আল্লাহর সিফাত সম্পর্কিত মুজমাল ও অস্পষ্ট শব্দমালার সাথে সালাফে সালেহীনের অনুসৃত ব্যবহারিক নীতিমালা কী ছিল সে সম্পর্কে ইমাম ইবনু আবিল ইয় আল-হানাফী রহ. বলেন, “যে সকল শব্দ (আল্লাহর ব্যাপারে) সাব্যস্ত করা কিংবা তার থেকে অস্বীকার করার ব্যাপারে নস তথা কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে তা প্রবলভাবে মেনে নেয়া উচিত। অতএব আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল শব্দ ও অর্থ সাব্যস্ত করেছেন আমরা সেগুলো সাব্যস্ত করব এবং তাদের বক্তব্যে যে সব শব্দ ও অর্থকে অস্বীকার করা হয়েছে আমরাও সেগুলোকে অস্বীকার করবো। আর যে সব শব্দ অস্বীকার করা কিংবা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে কিছুই আসে নি (আল্লাহর ব্যাপারে) সে সব শব্দের ব্যবহার করা যাবে না। অবশ্য যদি বক্তার নিয়তের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে অর্থ শুদ্ধ,

⁴⁸ মাজমু‘ আল ফাতাওয়া ৩/৮১

তাহলে তা গ্রহণ করা হবে। তবে সে বক্তব্য কুরআন-হাদীসের শব্দ দিয়েই ব্যক্ত করা বাঞ্ছনীয়, মুজমাল ও অস্পষ্ট শব্দ দিয়ে নয়.....।”⁴⁹

ত্রয়োদশ নীতি

দ্বীনী ব্যাপারে অহেতুক তর্ক, ঝগড়া-বিবাদ ও বাড়াবাড়িপূর্ণ প্রশ্ন বিদ‘আত হিসেবে গণ্য। এ নীতির মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শামিলঃ

১. মুতাশাবিহাত বা মানুষের বোধগম্য নয় এমন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা। ইমাম মালেক রহ.-কে এক ব্যক্তি আরশের উপর আল্লাহর استواء বা উঠার প্রকৃতি-ধরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন “কিরূপ উঠা তা বোধগম্য নয়, তবে استواء বা উঠা একটি জানা ও জ্ঞাত বিষয়, এর প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজিব এবং প্রশ্ন করা বিদ‘আত।”⁵⁰

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, “কেননা এ প্রশ্নটি ছিল এমন বিষয় সম্পর্কে যা মানুষের জ্ঞাত নয় এবং এর জবাব দেয়াও সম্ভব নয়।”⁵¹

তিনি অন্যত্র বলেন, “استواء বা আরশের উপর উঠা সম্পর্কে ইমাম মালেকের এ জবাব আল্লাহর সকল গুণাবলী সম্পর্কে ব্যাখ্যা হিসেবে পুরাপুরি যথেষ্ট।”⁵²

২। দীনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কিছু নিয়ে গোঁড়ামি করা এবং গোঁড়ামির

⁴⁹ শারহু আল-‘আকীদাহ আত-তহাবিয়াহ, পৃঃ২৩৯, আরো দেখুন পৃঃ ১০৯-১১০।

⁵⁰ আস-সুন্নাহ ৩/৪৪১, ফাতহুল বারী ১৩/৪০৬-৪০৭

⁵¹ মাজমু‘ আল-ফাতাওয়া ৩/২৫

⁵² মাজমু‘ আল- ফাতাওয়া ৪/৪

কারণে মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করা বিদ'আত বলে গণ্য।

৩। মুসলিমদের কাউকে উপযুক্ত দলীল ছাড়া কাফির ও বিদ'আতী বলে অপবাদ দেয়া।

চতুর্দশ নীতিঃ

দ্বীনের স্থায়ী ও প্রমাণিত অবস্থান ও শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখাকে পরিবর্তন করা বিদ'আত।

উদাহরণ :

১। চুরি ও ব্যভিচারের শাস্তি পরিবর্তন করে আর্থিক জরিমানা দন্ড প্রদান করা বিদ'আত।

২। যিহারের কাফফারার ক্ষেত্রে শরীয়াতের নির্ধারিত সীমারেখা পাঁচটি আর্থিক জরিমানা করা বিদ'আত।

পঞ্চদশ নীতিঃ

অমুসলিমদের সাথে খাস যে সকল প্রথা ও ইবাদাত রয়েছে মুসলিমদের মধ্যে সেগুলোর অনুসরণ বিদ'আত বলে গণ্য।

উদাহরণ :

কাফিরদের উৎসব ও পর্ব অনুষ্ঠানের অনুকরণে উৎসব ও পর্ব পালন করা।
ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন, “জন্ম উৎসব, নববর্ষ উৎসব পালনের মাধ্যমে

অমুসলিমদের অনুকরণ নিকৃষ্ট বিদ'আত।”⁵³

বিদ'আতের প্রকারভেদঃ সাধারণভাবে বর্তমানে কথিত হানাফী নামধারী মুসলিম সমাজের প্রচলিত ধারণা হলোঃ

বিদ'আত দু প্রকার, যথাঃ

(১) বিদ'আতে হাসানাহ এবং

(২) বিদ'আতে সাযিয়াহ্

কেউ কেউ বিদ'আতে সাযিয়াহ্কে **بدعة مستقبحة** বা ঘৃণ্য বিদ'আত নাম দিয়েছেন। আর এই বিদ'আতকে **حسنة** ও **سيئة** ঐ দুটি ভাগে ভাগ করার কারণে বহু সংখ্যক বিদ'আত ভালো বিদ'আত এর নাম নিয়ে অত্যন্ত সুস্বভাবে ইসলামী আকীদা ও আমলের বিশাল ব্যবস্থাপনায় অনুপ্রবেশ করেছে। ফলে তাওহীদ বাদীরা আজ বিদ'আত সমূহ অবলিলাক্রমে করে যাচ্ছে। যা প্রকৃতপক্ষে তাওহীদ ও সুন্নাহ বিরোধী।

এখানে উল্লেখ্য যে, যদিও আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী **عمدة القارى** এর মধ্যে বিদ'আতকে দু'প্রকার বলেছেন। তিনি বলেছেনঃ

ثم البدعة على نوعين : بدعة حسنة وبدعة مستقبحة

কিন্তু তা গ্রহণযোগ্য নয়। বিদ'আতকে দু'ভাগে ভাগ করা একেবারেই অমূলক ও অযৌক্তিক। কারণ রাসুল (সঃ) এর যুগে বিদ'আতের মধ্যে

⁵³ আত-তামাসসুক- বিসসুনান পৃঃ ১৩০

হাসানা বা ভালো দিক পাওয়া যায়নি। আর রাসূলের যুগেও নয় এবং রাসূল (সঃ) এর বানীর মাধ্যমেও বিদ'আতকে এভাবে দু'ভাগ করা হয়নি। তবে মুসলিম সমাজে বিদ'আতের এ ভাগ চালু হয়, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল কারী বর্ণিত হযরত ওমরের তারাবীহ এর সালাত সংক্রান্ত হাদীসের উক্তি **نعمة البدعة هذه** “এটা একটা উত্তম বিদ'আত” নামক বাক্য থেকে।

উত্তম বিদ'আত বলার পর আপনা আপনি বুঝা যায় যে, এর বিপরীতে আরেকটি বিদ'আত আছে যা অবশ্যই খারাপ ও নিন্দনীয় হবে। হযরত ওমর (রাঃ) এর হাদীসের জবাব-

(১) হযরত ওমর (রাঃ) এর উক্তি দিয়ে বিদ'আতকে ভাগ করলে রাসূলের হাদীস **كل بدعة ضلالة** “সব বিদ'আতই গোমরাহী” অর্থহীন হয়ে যায়।

(২) হযরত ওমর কর্তৃক তারাবীহের সালাত জামায়াত সহকারে পড়ানো এটা নতুন নয় বরং এর ভিত্তি পূর্বে পাওয়া যায়। কারণ রাসূল (সঃ) এর যামানায় স্বয়ং রাসূল (সঃ) নিজে দুই তিন রাত ইমাম হয়ে নামাজ পড়িয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم * أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس -ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعت فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم وذلك في رمضان. (بخارى ومسلم)

উপরোক্ত হাদীস থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, জামাআতের সাথে তারাবীহের নামাজ পড়ানোর কাজ প্রথমে নিজে রাসুল (সঃ) করেছেন। আর তা পর পর তিন রাত্রি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তাহলে হযরত ওমর জামাআতের সাথে তারাবীহ পড়াকে বিদ'আত বললেন কেন? এর জবাব হলো হযরত ওমর এখানে শাদিক ও আভিধানিক দৃষ্টিকোন থেকে বিদ'আত বলেছেন পারিভাষিক দৃষ্টিকোন থেকে নয়। কারণ রাসুল (সঃ) ২-৪ দিন পড়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। হযরত আবু বকর এর খিলাফত কালেও তা আর জামাআতের সাথে চালু করা হয়নি। এ হিসাবে হযরত ওমরের একে বিদ'আত বলা ভুল হয়নি এবং তাতে করে এটা বিদ'আত ও হয়ে যায়নি।

মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে হযরত ওমরের **نعمه البدعة هذه** এর তাৎপর্যঃ

نعم الامر البديع الذي ثبت عن رسول الله ص وترك في زمان ابي بكر لاشتغال (نيل الاوطار) ..الناس فيما حصل بعد وفات الرسول ص

জামাআতের সাথে তারাবীহ পড়া এক অতি উত্তম ব্যবস্থা। যা রাসুলে করীম (সঃ) থেকে শুরু হয়েছিল এবং পরে হযরত আবু বকর এর সময়ে লোকদের নানা জটিলতার মশগুল হয়ে থাকার কারনে পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী ক্বারী হযরত ওমর ফারুকের কথার ব্যাখ্যায় বলেনঃ

انما سماها بدعة لاعتبار صورتها فان هذا الاجتماع محدث بعده عليه الصلاة والسلام.

উমর ফারুক এ কাজকে বিদ'আত বলেছেন বাহ্যিক দিক লক্ষ্য করে। কেননা নবী কারীমের পর এই প্রথম বার নতুন ভাবে জামায়াতে সাথে তারাবীহের নামাজ চালু হয়েছিল।

দ্বীনের ভিতর বিদআতে হাসানাহ বলে কিছু আছে কি?

উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে যে দ্বীনের ভিতর সকল বিদ'আতই হারাম। যারা বিদ'আতকে হাসানাহ ও সাইয়্যেআহ বলে বিভক্ত করে, তারা ভুল করে থাকেন এবং রাসূল (সাঃ) - এর বাণী **فإن كل بدعة ضلالة** নিশ্চয়ই প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহ্ এর বিরোধিতাকারী। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদ'আত প্রসঙ্গে রায় দিতে গিয়ে বলেছেন প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহি আর মাযহাবপন্থীরা বলছে, না প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহি নয় বরং কিছু বিদ'আত আছে হাসানাহ (ভাল)। আল্লামা হফেয ইবনে রজব বলেনঃ নবী আকরাম (সাঃ) - এর বাণী **كل بدعة ضلالة** (প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহি) একটি **جوامع الكلم** তথা ব্যাপক অর্থ বোধক বাক্য। কোন কিছুই তার বহির্ভূত নয়। সকল প্রকারই তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এটি দ্বীনের একটি বিশেষ মূলনীতি। এটি রাসূলের নিম্নোক্ত বাণীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বক্তব্য।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেনঃ **من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد** (যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, সেটি পরিত্যাজ্য হবে)। আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে, 'বিদআতে হাসানাহ' (ভাল বিদআত) বলে কোন বিদআত নেই। বরং প্রত্যেক বিদআতই 'সাইয়্যেআহ' (মন্দ)। মহানবী (সঃ) বলেছেন, “প্রত্যেক

বিদআতই ভ্রষ্টতা।” (আবু দাউদ, তিরমিযী)। আর হাদীসে যে ভাল রীতি চালু করার কথা বলা হয়েছে, তা নতুন কোন রীতি নয়। বরং যে রীতি শরীয়ত সম্মত কিন্তু কোন জায়গায় তা চালু ছিল না। কোন ব্যক্তি তা চালু করলে তাঁর ঐ সওয়াব হয়। পূর্ণ হাদীসটি পড়লে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন, কোন শ্রেণীর রীতির কথা বলা হয়েছে।

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রঃ) বলেন, “একদা আমরা দিনের প্রথম ভাগে রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর নিকটে ছিলাম। অতঃপর তাঁর নিকট কিছু লোক এল, যাঁদের দেহ বিবস্ত্র ছিল, পশমের ডোরা কাটা চাদর (মাথা প্রবেশের মত জায়গা মাঝে কেটে) পরে ছিল অথবা ‘আবা’ (আংরাখা) পরে ছিল, তরবারী তাঁরা নিজেদের গর্দানে ঝুলিয়ে রেখেছিল। তাঁদের অধিকাংশ মুয়ার গোত্রের (লোক) ছিল; বরং তাঁরা সকলেই মুয়ার গোত্রের ছিল। তাঁদের দারিদ্রতা দেখে রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল।

সুতরাং তিনি (বাড়ীর ভেতরে) প্রবেশ করলেন এবং পুনরায় বের হলেন। তারপর তিনি বেলালকে (আযান দেওয়ার) আদেশ করলেন। ফলে তিনি আযান দিলেন এবং ইকামত দিলেন। অতঃপর তিনি নামায পরে লোকেদেরকে (সম্বোধন করে) ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, “হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তাঁর সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাঁদের দুজন থেকে বহু নরনারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করারকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।” (সূরা নিসা ১ আয়াত) অতঃপর দ্বিতীয় আয়াত যেটি

সূরা হাশর এর শেষে আছে সেটি পাঠ করলেন, “যে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামিকালের (কিয়ামতের) জন্য সে অগ্রিম কি পাঠিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।” (সূরা হাশর ১৮ নং আয়াত)। “অতএব, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা), দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা), কাপড়, এক সা’ গম ও এক সা’ খেজুর থেকে সাদকাহ করে।” এমনকি তিনি বললেন, “খেজুরের আধা টুকরা হলেও (তা যেন দান করে।)” সুতরাং আনসারদের একটি লোক (চাঁদির) একটি থলে নিয়ে এল, লোকটির করতল যেন তা ধারণ করতে পারছিল না; বরং তা ধারণ করতে অক্ষমই ছিল। অতঃপর (তা দেখে) লোকেরা পরস্পর দান আনতে আরম্ভ করল। এমনকি খাদ্য সামগ্রী ও কাপড়ের দুটি স্তূপ দেখলাম। পরিশেষে আমি দেখলাম যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর চেহারা যেন সোনার মতো ঝলমল করছে। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন, “যে ব্যক্তি ইসলামে ভাল রীতি চালু করবে, সে তাঁর নিজের এবং ঐ সমস্ত লোকের সওয়াব পাবে, যারা তাঁর (মৃত্যুর) পর তাঁর উপর আমল করবে। তাঁদের সওয়াব কিছু পরিমাণও কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতির প্রচলন করবে, তাঁর উপর তাঁর নিজের এবং ঐ লোকদের গোনাহ বর্তাবে, যারা তাঁর (মৃত্যুর) পর তাঁর উপর আমল করবে। তাঁদের গোনাহর কিছু পরিমাণও কম করা হবে না।” (মুসলিম)। লক্ষণীয় যে, দান করা একটি ভাল রীতি। কিন্তু অনেকের মধ্যে যে প্রথম শুরু করবে, তাঁর হবে উক্ত সওয়াব। কোন নতুন রীতি আবিষ্কার করা উদ্দেশ্য নয়। হাদীসের শব্দে ঐ রীতিকে ‘সুন্নাহ’ বলা হয়েছে, যা বিদআতের বিপরীত। সুতরাং ‘বিদআতে হাসনার’ দলীল তাতে নেই।

বলা বাহুল্য, উক্ত হাদীসে নতুন রীতি চালু করার পর্যায়ভুক্ত তিন প্রকার কাজঃ-

(ক) শরীয়তসম্মত ভাল কাজ। কিন্তু অনেকের মধ্যে সর্বপ্রথম করা।

(খ) কোন সুন্নত কাজ, যা উঠে গিয়েছিল বা লোকমাঝে প্রচলিত করা অথবা জানিয়ে তাঁর প্রচলন করা।

(গ) কোন এমন কাজ করা, যা কোন শরীয়তসম্মত ভাল কাজের মাধ্যম। যেমন দ্বীনী মাদ্রাসা নির্মাণ করা, দ্বীনী বই-পত্র ছাপা ইত্যাদি। (ইবনে উষাইমীন)

সুতরাং যে কেউ নতুন কিছু উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করবে এবং তাকে দ্বীনের দিকে নিসবত (সম্বন্ধযুক্ত) করবে অথচ দ্বীনে তার কোন মূল ভিত্তি নেই যার দিকে সে ফিরতে পারে, সেটিই গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা। দ্বীন এ সকল বস্তু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ ক্ষেত্রে সকল বিষয় যথা আকায়েদ, আমল জাহেরী ও বাতেনী আকওয়াল সব সমান। রাসুল (সাঃ) অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় সকল বিদ'আতকে ভ্রষ্ট বা দালালাত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাই কিছু কিছু বিদ'আতকে হাসানাহ বলার কোন সুযোগ নেই। কেননা রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ وشرُّ الأمور محدثاتها
وكلُّ محدثةٍ بدعةٌ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

নিশ্চয় সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহ্ কিতাব আর সর্বোত্তম হিদায়াত হলো মুহাম্মদ এর হিদায়াত। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হলো মনগড়া নব প্রবর্তিত বিষয়।

আর প্রত্যেক নব প্রবর্তিত বিষয়ই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদআতই গুমরাহী। তাই বিদআতকে দু ভাগে ভাগ করলে রাসুল (সাঃ) এর এ ঘোষণাকে অগ্রাহ্য করা হয়। এ প্রসঙ্গে শাইখ ইবনে ফাউযান বলেনঃ

من قسم البدعة الى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهو غلط مخطئ ومخالف لقوله عليه الصلاة والسلام فان كل بدعة ضلالة لان الرسول ص حكم على البدع كلها بانها ضلالة

যে ব্যক্তি বিদ'আতকে হাসানাহ ও সাযিয়াহ বলে বিভক্ত করল সে ভুল করল এবং “সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা” মর্মে রাসুল (সাঃ) এর বাণীর বিরোধীতা করল। কেননা রাসুল (সাঃ) সকল বিদ'আতকে গুমরাহী বলে আখ্যায়িত করেছেন। সর্বোপরি একথা বলা যায় যে, বিদ'আতকে এভাবে ভাগ করে এর কিছু অংশকে হাসানাহ বলা গুমরাহী বৈ কিছু নয়।

এরূপ বিভক্তকারীদের যুক্তি প্রমাণ ও তার খণ্ডনঃ

সাহাবী ওমর (রাঃ) একবার সালাতে তারাবীহ সম্পর্কে বলেছিলেন: **نعمت** **البدعة هذه** (কত না সুন্দর বিদ'আত এটি) বিদ'আতকে হাসানাহ ও সাইয়েয়াহ দ্বারা বিভক্তকারীদের নিকট ওমরের এ উক্তিটি ব্যতীত তাদের মতের স্বপক্ষে আর কোন দলিল নেই। তারা আরো বলে যে, এরূপ আরো অনেক নতুন নতুন বিষয়ের প্রবর্তন হয়েছিল কিন্তু সালাফের কেউ সে গুলোকে ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান করেননি, যেমন কোরআনুল কারীমকে এক মাসহাফে একত্রিত করা, (যা রাসূলের যুগে ছিল না) হাদীস লেখা ও সংকলন করা এটিও রাসূল (সাঃ) নিজে করে যাননি। আপত্তি উত্থাপিত বিষয়গুলো বিদ'আত নয় বরং শরীয়তের এগুলোর একটি ভিত্তি আছে। আর ওমর (রাঃ) এর বক্তব্য **نعمت البدعة** তে শরঈ **بدعة** নয়। সুতরাং যে

সকল বিষয়ের একটি শরঈ ভিত্তি থাকবে যার দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায়, সে গুলো সম্পর্কে যখন **بدعة** বলে মন্তব্য করা হবে তখন শাস্তি বিদ'আত বুঝতে হবে শরঈ নয়। আর সালাতে তারাবীহ তো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেই সাহাবীদের নিয়ে পড়ে ছিলেন। শেষ দিকে এসে ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে তিনি তাদের থেকে পিছিয়ে গেছেন। তবে সাহাবারা বিক্ষিপ্ত ভাবে রাসূলের জীবদ্দশায় এবং ওফাতের পর ধারাবাহিক ভাবে পড়েছেন।

এক পর্যায়ে এসে ওমর (রাঃ) সকলকে এক ইমামের পিছনে একত্রিত করে দিয়েছেন যেমন তারা রাসূলের পিছনে পড়ে ছিলেন। নিম্নে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে উপস্থাপন করা হলোঃ-

তারাবীহ সালাতের ১১ রাকাতের দলীলঃ আধুনিক কালের ইজমার উদাহরন হিসাবে ২০ রাকাত তারাবীহ সালাতের কথা বলা যায়। নিম্নে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ হানাফী আলেমগণই ২০ রাকআত তারাবী পড়ার পক্ষের হাদীসগুলোকে যঈফ বলেছেন। হানাফী মাযহাবের যে সমস্ত বিজ্ঞ আলেম ২০ রাকআত তারাবী পড়ার পক্ষের হাদীসগুলোকে যঈফ বলেছেন, তাদের নামের একটি বিশাল তালিকাঃ-

- ১) মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ, অধ্যায়ঃ কিয়ামে শাহরে রামাযান, পৃষ্ঠা নং- ১৩৮। মুস্তফায়ী ছাপা, ১২৯৭ হিঃ।⁵⁴
- ২) নাসবুর রাযা, (২/১৫৩) আল্লামা যায়লাঈ হানাফী, মাজলিসুল ইলমী ছাপা, ভারত।⁵⁵

⁵⁴ মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ, অধ্যায়ঃ কিয়ামে শাহরে রামাযান, পৃষ্ঠা নং-১৩৮। মুস্তফায়ী ছাপা, ১২৯৭ হিঃ।

৩) মিরকাতুল মাফাতিহ, (৩/১৯৪) মোল্লা আলী কারী হানাফী, এমদাদীয়া লাইব্রেরী, মুলতান, ভারত।⁵⁶

৪) উমদাতুল কারী শরহে সহীহ আল-বুখারী, (৭/১৭৭) প্রণেতা আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী মিশরী ছাপা।⁵⁷

৫) ফতহুল কাদীর শরহে বেদায়া (১/৩৩৪) প্রণেতা ইমাম ইবনুল হুমাম হানাফী।⁵⁸

৬) হাশিয়ায়ে সহীহ বুখারী (১/১৫৪) প্রণেতা মাওলানা আহমাদ আলী সাহরানপুরী।⁵⁹

৭) আল-বাহরুর রায়েক (২/৭২) প্রণেতা ইমাম ইবনে নুজাইম হানাফী।⁶⁰

৮) হাশিয়ায়ে দুররে মুখতার (১/২৯৫) প্রণেতা আল্লামা তাহাভী (رحيمه الله) হানাফী।⁶¹

⁵⁵ নাসবুর রায়া, (২/১৫৩) আল্লামা যায়লাঈ হানাফী, মাজলিসুল ইলমী ছাপা, ভারত।

⁵⁶ মিরকাতুল মাফাতিহ, (৩/১৯৪) মোল্লা আলী কারী হানাফী, এমদাদীয়া লাইব্রেরী, মুলতান, ভারত।

⁵⁷ উমদাতুল কারী শরহে সহীহ আল-বুখারী, (৭/১৭৭) প্রণেতা আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী মিশরী ছাপা।

⁵⁸ ফতহুল কাদীর শরহে বেদায়া (১/৩৩৪) প্রণেতা ইমাম ইবনুল হুমাম হানাফী।

⁵⁹ হাশিয়ায়ে সহীহ বুখারী (১/১৫৪) প্রণেতা মাওলানা আহমাদ আলী সাহরানপুরী।

⁶⁰ আল-বাহরুর রায়েক (২/৭২) প্রণেতা ইমাম ইবনে নুজাইম হানাফী।

⁶¹ হাশিয়ায়ে দুররে মুখতার (১/২৯৫) প্রণেতা আল্লামা তাহাভী (রহঃ) হানাফী।

৯) দুররুল মুখতার (ফতোয়া শামী) (১/৪৯৫) প্রণেতা আল্লামা ইবনে আবেদীন হানাফী।⁶²

১০) হাশিয়াতুল আশবাহ পৃষ্ঠা নং - ৯ প্রণেতা সায়েদ আহমাদ হামুভী হানাফী।⁶³

১১) হাশিয়ায়ে কানযুদ দাকায়েক পৃষ্ঠা নং - ২৬, প্রণেতা মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ নানুতুভী।⁶⁴

১২) মারাকীউল ফালাহ শরহে নুরুল ইজাহ পৃষ্ঠা নং- ২৪৭, প্রণেতা আবুল হাসান শরানবালালী।⁶⁵

১৩) মা ছাবাতা ফিস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা নং- ২৯২, প্রণেতা শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী।⁶⁶

১৪) মাওলানা আব্দুল হাই লাখনুভী হানাফী বিভিন্ন কিতাবের হাশিয়াতে ২০ রাকআতের হাদীছগুলোকে যঈফ বলেছেন। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন উমদাতুর রেআয়া (১/২০৭)।⁶⁷

⁶² দুররুল মুখতার (ফতোয়া শামী) (১/৪৯৫) প্রণেতা আল্লামা ইবনে আবেদীন হানাফী।

⁶³ হাশিয়াতুল আশবাহ পৃষ্ঠা নং - ৯ প্রণেতা সায়েদ আহমাদ হামুভী হানাফী।

⁶⁴ হাশিয়ায়ে কানযুদ দাকায়েক পৃষ্ঠা নং - ২৬, প্রণেতা মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ নানুতুভী।

⁶⁵ মারাকীউল ফালাহ শরহে নুরুল ইজাহ পৃষ্ঠা নং- ২৪৭, প্রণেতা আবুল হাসান শরানবালালী।

⁶⁶ মা ছাবাতা ফিস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা নং- ২৯২, প্রণেতা শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী।

⁶⁷ মাওলানা আব্দুল হাই লাখনুভী হানাফী বিভিন্ন কিতাবের হাশিয়াতে ২০ রাকআতের হাদীছগুলোকে যঈফ বলেছেন। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন উমদাতুর রেআয়া (১/২০৭)।

১৫) তালীকুল মুমাজ্জাদ, পৃষ্ঠা নং - ১৩৮।⁶⁸

১৬) তুহফাতুল আখয়ার পৃষ্ঠা নং-২৮, লাখনু ছাপা।⁶⁹

১৭) হাশিয়ায়ে হেদায়া (১/১৫১) কুরআন মহল, করাচী ছাপা।⁷⁰

১৮) ফাইয়ুল বারী, (১/৪২০) প্রণেতা মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশমীরী।⁷¹

১৯) আলউরফুয্ শায়ী পৃষ্ঠা নং- ৩০৯।⁷²

২০) কাশফুস সিতর আন সালাতিল বিতর পৃষ্ঠা নং- ২৭⁷³।

২১) শরহে মুআত্তা ফারসী, (১/১৭৭) প্রণেতা শাহ অলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী। কুতুব খান রাহীমিয়া, দিল্লী, ১৩৪৬ হিঃ।⁷⁴

উপরোক্ত আলেমগণ ছাড়া আরও অনেকেই ২০ রাকআত তারাবীর হাদীসগুলোকে যঈফ বলেছেন।

⁶⁸ তালীকুল মুমাজ্জাদ, পৃষ্ঠা নং-১৩৮।

⁶⁹ তুহফাতুল আখয়ার পৃষ্ঠা নং-২৮, লাখনু ছাপা।

⁷⁰ হাশিয়ায়ে হেদায়া (১/১৫১) কুরআন মহল, করাচী ছাপা।

⁷¹ ফাইয়ুল বারী, (১/৪২০) প্রণেতা মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশমীরী।

⁷² আলউরফুয্ শায়ী পৃষ্ঠা নং- ৩০৯।

⁷³ কাশফুস সিতর আন সালাতিল বিতর পৃষ্ঠা নং- ২৭।

⁷⁴ শরহে মুআত্তা ফারসী, (১/১৭৭) প্রণেতা শাহ অলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী। কুতুব খান রাহীমিয়া, দিল্লী ১৩৪৬ হিঃ।

উক্ত তথ্যগুলো জানার পর কেউ ২০ রাকআত তারাবীর পক্ষের হাদীসগুলো সহীহ বলা থেকে সকলেই বিরত থাকবেন এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ (سبحانه وتعالى) আমাদের সকলকে সহীহ হাদীসের উপর আমল করার এবং জাল ও যঈফ হাদীছ বর্জন করার তাওফীক দিন। আমীন। এছাড়াও হযরত উমর (رضي الله عنه) এর সময় ইজমার মাধ্যমে যে ২০ রাকাত তারাবীর কথা প্রচলিত আছে তা সম্পূর্ণই জাল হাদীস দ্বারা প্রমানিত যা নিম্নে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো:-

অতএব ইজমায়ে সাহাবা কর্তৃক ওমর, ওসমান ও আলীর যামানা থেকে ২০ রাকআত তারাবীহ সাব্যস্ত বলে যে কথা বাজারে চালু রয়েছে, তার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। একথাটি পরবর্তীকালে সৃষ্ট। হাদীসের বর্ণনাকারী ইমাম মালেক নিজে ১১ রাকআত তারাবীহ পড়তেন যা রাসূল (ﷺ) হ'তে প্রমাণিত। (তথ্যসূত্রঃ হাশিয়া মুওয়াত্তা পৃঃ ৭১; দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী হা/৮০৩-এর ব্যাখ্যা ৩/৫২৬-৩২)।⁷⁵ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রামাযান মাসে বিতর সহ ১১ রাকআতের বেশী রাতের সালাত (তারাবীহ) আদায় করেননি। (তথ্যসূত্রঃ বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ; আবুদাউদ ১/১৮৯পৃঃ; নাসাঈ ১/১৯১ পৃষ্ঠা; তিরমিযী ১-৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ১/৯৬-৯৭ পৃঃ; মুওয়াত্তা মালেক ১/৭৪ পৃঃ)।⁷⁶ ওমর (رضي الله عنه) উবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী (رضي الله عنه) - কে রামাযান মাসে লোকদের নিয়ে ১১ রাকআত (তারাবীহ) সালাত আদায়ের নির্দেশ

⁷⁵ হাশিয়া মুওয়াত্তা পৃঃ ৭১; দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী হা/৮০৩-এর ব্যাখ্যা ৩/৫২৬-৩২

⁷⁶ বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ; আবুদাউদ ১/১৮৯পৃঃ; নাসাঈ ১/১৯১ পঃ;; তিরমিযী ১-৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ১/৯৬-৯৭ পৃঃ; মুওয়াত্তা মালেক ১/৭৪ পৃঃ

দিয়েছিলেন। (তথ্যসূত্রঃ মুওয়াত্তা ১/৭১ পৃঃ; মিশকাত হা/১৩০২, হাদীছ ছহীহ; ঐ বঙ্গনুবাদ হা/১২২৮ রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ অনুচ্ছেদ)।^{৭৭}

তারবীহ সালাতের ১১ রাকাতের নির্ভরযোগ্য দলীল উপস্থাপন

ইমাম মালেক ও অন্যান্য আইম্মায়ে কিরামগণ ইবন খাসীফাহকে হুজ্জত মনে করেন। যেহেতু ইয়াযীদ ইবন খাসীফাহ এর বর্ণনা সহীহ হওয়ার দিক থেকে দুর্বোধ্য ও অপ্রতুল। কেননা এটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনার বিপরীত। কেননা ইবন খাসীফাহ ও মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ উভয়ে নির্ভরযোগ্য এবং তারা সায়েব ইবন ইয়াযিদ হতে বর্ণনা করেছেন। প্রথমে তিনি বলেছেন একুশ রাকা'আত, আর দ্বিতীয়বার এগার রাকা'আত। ফলে দ্বিতীয় মতটি অগ্রাধিকার পাবে। এখানে দুটি দিক রয়েছে। যেমনঃ প্রথমদিকঃ তিনি তাঁর সাথীর চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। এজন্য হাফেয ইবন হাজর ইয়াযিদ ইবন খাসীফাহ এর গুণ বর্ণনায় বলেছেন সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য। আর মুহাম্মদ ইবন ইউসুফের শানে বলেছেনঃ নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত বা সাব্যস্ত হয়েছে। দ্বিতীয়দিকঃ অনুরূপভাবে মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ সায়েব এর বোনের ছেলে। আর তিনি তার মামার হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।

উপরের বর্ণনাটি ইয়াযিদ ইবন খাসীফাহ ও মুহাম্মদ ইবন ইউসুফের মতবিরোধের মূল বর্ণনা। আর আলিমগণ ইয়াযিদ ইবন খাসীফাহকে যঈফ

^{৭৭} মুওয়াত্তা ১/৭১ পৃঃ; মিশকাত হা/১৩০২, হাদীছ ছহীহ; ঐ বঙ্গনুবাদ হা/১২২৮ রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ অনুচ্ছেদ

বলেননি। বরং তারা মুহাম্মদ ইবন ইউসুফের বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইমাম মালেক (رحيمه الله) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন; ইয়াযিদ ইবন রুমান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর ইবনুল খাত্তাবের যুগে মানুষ তেইশ রাকা‘আত সালাত আদায় করত। আলোচ্য বর্ণনাটি মুনকাতি‘ বা বিচ্ছিন্ন সনদে; কেননা ইয়াযিদ ইবন রুমান ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে পাননি। ইবন আবু শাইবাহ ওকী‘ হতে, তিনি মালেক হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, ‘ওমর ইবনুল খাত্তাব এক ব্যক্তিকে বিশ রাকা‘আত সালাত পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। এ বর্ণনাটিও বিচ্ছিন্ন বর্ণনা, কেননা ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ ওমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে পাননি। ইবন মাদিনী বলেন: আমার জানা নেই তিনি আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত অন্য কোন সাহাবী থেকে শুনেছেন কি না।

দ্বিতীয় ‘আছার’: উবাই ইবন কা‘ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিতঃ ইবন আবু শাইবাহ আব্দুল আযীয ইবন রুফাই‘ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রমযান মাসে মদিনাতে উবাই ইবন কা‘ব বিশ বাকা‘আত সালাত আদায় করতেন এবং তিন রাকা‘আত বিতির পড়তেন। এ বর্ণনাটিও মুনকাতি‘ বা বিচ্ছিন্ন। কেননা আব্দুল আযীয উবাই ইবন কা‘ব রাদিয়াল্লাহু আনহু কে পাননি, তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৯ হিজরীতে অথবা ৩২ হিজরীতে মারা গিয়েছেন, আর আব্দুল আযীয মারা গেছে ১৩০ হিজরীতে। তার জীবনীতে এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না যে তিনি উবাই ইবন কা‘ব

রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি শুধুমাত্র ছোট সাহাবী ও বড় বড় তাবেঈন থেকে বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় ‘আছার’: ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিতঃ মুহাম্মদ ইবন নসর আল- মারওয়াযী হতে কিয়ামুল লাইল সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আ‘মাশ বলেন, ইবন মাসউদ বিশ রাকা‘আত তারাবীহ্ পড়তেন এবং তিন রাকা‘আত বিতির সালাত পড়তেন। আলোচ্য বর্ণনাটিও মুনকাতি’ বা বিচ্ছিন্ন। কেননা, নিশ্চয় আ‘মাশ (رحيمه الله) ইবন মাসউদ কে পাননি।

চতুর্থ ‘আছার’: আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিতঃ ইমাম বায়হাকী তার সুনানে কুবরা গ্রন্থে আবুল হাসনা হতে বর্ণনা করেছেন যে, ‘আলী ইবন আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু মানুষকে পাঁচ বার বিশ্রামের সাথে বিশ রাকা‘আত তারাবীর সালাত পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। আলোচ্য বর্ণনাটি যঈফ বা দুর্বল। কেননা আবুল হাসনা একজন অপরিচিত ব্যক্তি।

ইমাম বায়হাকী অন্য আরেকটি বর্ণনায় হাম্মাদ ইবন শুয়াইব হতে এবং তিনি আতা ইবন আস-সায়েব হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি আব্দুর রহমান আস সুলামী হতে, তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রমযান মাসে কারীদেরকে তার কাছে ডেকে পাঠালেন, তারপর তাদের মধ্যে হতে একজনকে বিশ রাকা‘আত তারাবীহ্ সালাত মানুষদের পড়াতে নির্দেশ দিলেন। আর তিনি [আলী (رضي الله)

عنه) স্বয়ং] লোকদের সঙ্গে বিতির সালাত আদায় করতেন। এ বর্ণনাটি দুর্বল বা যঈফ। কেননা, এখানে হাম্মাদ ইবন শু'য়াঈব দুর্বল রাবী।

ইমাম বায়হাকী আরও বলেন, আমাদের নিকট শাতীর ইবন শাকল বর্ণনা করেছেন। আর তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সঙ্গী ছিলেন। নিশ্চয় তিনি রমযান মাসে বিশ রাকা'আত তারাবীহ্ ও তিন রাকা'আত বিতিরের ইমামতি করতেন।

পঞ্চম 'আছার': সুয়াইদ ইবন গাফলাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত: -
বায়হাকী হতে বর্ণিত তিনি তার সনদে বলেন, আমার নিকট আবু যাকারিয়া ইবন আবু ইসহাক সংবাদ দিয়েছেন, তার নিকট আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াকুব খবর দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব বর্ণনা করেছেন, তাকে জা'ফর ইবন আউন, এবং তাকে আবুল খুসাইব এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি বলেন, রমযান মাসে সুয়াইদ ইবন গাফলাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদের সালাতে ইমামতি করতেন এবং তিনি পাঁচ বিশ্রামে বিশ রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।

এ হচ্ছে রমযানে কিয়ামুল লাইল হিসেবে বিশ রাকা'আত তারাবীহ্ সালাতকে সুস্পষ্ট প্রমাণ করার ক্ষেত্রে মৌলিক বর্ণনা। কিন্তু বর্ণনাকারীগণের জীবনী পাঠে জানা যায় যে, তাদের কেউ কেউ মুনকার, আবার কারো বর্ণনা যঈফ, কেউ কেউ মুনকাতি।

যাই হোক, উপরোক্ত আলোচনার পর বলা যায় যে, আর এক মাসহাফে কোরআন শরীফ একত্রিত করাও শরীয়তের একটি ভিত্তি আছে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে কোরআন লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেগুলো বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তাকারে ছিল পরে সাহাবায়ে কেরাম সংরক্ষণের নিমিত্তে সবগুলোকে এক মাসহাফে জমা করেছেন।

হাদীস লিপিবদ্ধ করারও একটি শরয়ী ভিত্তি আছে। রাসূল (সাঃ) কতিপয় সাহাবীকে অনুমতি প্রার্থনা করার পর কোন কোন হাদীস লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে তার জীবদ্দশায় কোরআনের সাথে গায়রে কোরআন মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ব্যাপক হারে লেখার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু তার ওফাতের পর উক্ত নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। কেননা তিনি জীবিত থাকা অবস্থায়ই কোরআন পূর্ণতা লাভ করে এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা পাকাপাকি ভাবে সম্পূর্ণ হয়। এরপর মুসলমানগণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে হাদীস সংকলনে হাত দেন এবং সম্পন্ন করেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। কারণ তারা স্বীয় প্রতিপালকের কিতাব এবং নিজ নবীর সুন্নাহ বৃথা যাওয়া ও ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষাকল্পে পদক্ষেপ নিয়েছেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যাবে যে ইলম ও ইবাদত সংশ্লিষ্ট সাধারণ বিদ্যাভ্যাসের প্রচলন উম্মতের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষ যুগে শুরু হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
المهدين.

'তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা বহু এখতেলাফ মতানৈক্য দেখতে পাবে। সেসময় তোমাদের কর্তব্য হবে আমার সুন্নত, হেদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ আঁকড়ে ধরা।' সাহাবায়ে কেরাম সে সকল আহলে বিদআতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনার সারাংশে বলা যায় যেঃ

- (১) ঐ বিদআতী কাজ বা আমল আল্লাহর দরবারে কখনোই গৃহীত হবে না।
- (২) বিদআতী কাজ বা আমলের ফলে মুসলিম সমাজে গোমরাহী বিস্তার লাভ করে এবং
- (৩) এ গোমরাহীর চূড়ান্ত ফলাফল হলো বিদআত কার্য সম্পাদনকারীকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

বিদআতের ধরনঃ পরিচয়গত দিক থেকে বিদআতী কাজগুলো প্রধানত তিন ধরনের। যথাঃ

১. **البدعة الحقيقية** বা মৌলিক বিদআতঃ এটা এমন বিদআত কোরআন সুন্নাহ যার কোন অস্তিত্ব নেই। যেমন:- মৃত ব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়া, মৃত ব্যক্তির নামে চল্লিশা করা ইত্যাদি।

২. **البدعة الاضافية** বা সংযুক্ত বিদআতঃ এমন বিদআত কোরআন হাদীসে আর ভিত্তি রয়েছে। কিন্তু এগুলো আদায়ের ক্ষেত্রে পস্থা পদ্ধতি, ধরণ

পরিমান ও সময়কাল ইত্যাদির দিক থেকে শরীয়াত বিবর্জিত। যেমন: ফরজ নামাজের পরে উচ্চস্বরে সামষ্টিক যিকির ও মুনাজাত। কিন্তু মূলত এসব দো'আ ও যিকির বিদ'আত নয় তবে উচ্চস্বরে সামষ্টিকভাবে পড়া বিদ'আত।

৩. **البدعة التركية** বর্জিত বিদআতঃ এটা এমন বিদ'আত যা কুরআন এবং সুন্নাহ বর্ণিত বিধানকে বর্জন করা হয়। যেমনঃ নামাজের গুরুত্ব সময় আরবীতে নিয়্যাত করা।

শরীয়াতের মানদণ্ডে বিদ'আতঃ আল্লাহ্ অনুমোদনহীন মানবীয় প্রবৃত্তি অনুসরণের মাধ্যমে কাল্পনিক কোন প্রথা প্রবর্তন করে তার প্রতি ইবাদাতের মাহাত্ম্য আরোপকে বিদ'আত নামে আখ্যায়িত করা হয়। আর এটি শিরকতুল্য অপরাধ। এ কারনেই মহানবী (সঃ) স্বীয় উম্মতকে বিদ'আতের ব্যাপারে অত্যন্ত জোরালোভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেনঃ

اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

“তোমরা নিজেদেরকে দ্বীনের নতুন আবিষ্কৃত বিষয়াদি থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। কেননা দ্বীনে প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত জিনিসই বিদ'আত এবং সব বিদ'আতই গোমরাহীর মূল।” (সুনানে আহমদ)। এ হাদীসের শব্দ **محدثات الامور** এর ব্যাখ্যায় আল্লামা আহমদুল বান্নাত তার “ফতহে রাব্বানী”তে লিখেছেনঃ

وهي ما لم يكن معروفا في كتاب ولا سنة ولا اجماع وهي البدعة

محدثات الامور বলতে এমন জিনিস ও বিষয়াদিকে বুঝায় যা কুরআন সুন্নাহ এবং ইজমা কোন দিক দিয়েই শরীয়তে বিধিবদ্ধ নয়। রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. (مسلم) #

من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (بخاري) #

“যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে তা প্রত্যাখান হবে।”

اتبعوا ولا تبثدعوا #

“তোমরা রাসূলের আদর্শ অনুসরণ কর কোন ক্রমেই বিদ‘আত কর না” সর্বোপরি একথা বলা যায় যে, বিদ‘আত একটি মারাত্মক পাপ। তাই তা থেকে বেঁচে থাকা একান্ত প্রয়োজন।

বিদআত প্রচলন ও বিদ‘আত উৎপত্তির কতিপয় কারণঃ

(ক) বিদ‘আতের প্রচলনঃ অতীতে মক্কায় মূর্তিপূজা সত্ত্বেও মক্কাবাসীরা ধারণা করত যে, তারা দ্বীনে ইবরাহীমের উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম আছে। কেননা আমরা বিন লুহাই তাদের বুঝিয়েছিল যে, এগুলি ইবরাহীমী দ্বীনের বিকৃতি নয়, বরং ‘বিদআতে হাসানাহ’। অর্থাৎ ভালো কিছু সংযোজন মাত্র।

এজন্য সে বেশ কিছু ধর্মীয় রীতি-পদ্ধতি আবিষ্কার ও চালু করেছিল। যেমন

-

(১) তারা মূর্তির পাশে বসে তাকে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করত ও তাদের অভাব মোচনের জন্য অনুনয় বিনয় করে প্রার্থনা জানাতো। তারা ধারণা করত যে, এই মূর্তি তাদের আল্লাহর নৈকট্যশীল করবে (যুমার ৩৯/৩) এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুফারিশ করবে (ইউনুস ১০/১৮)।

(২) তারা মূর্তির উদ্দেশ্যে হজ্জ করত, তাওয়াফ করত, তার সামনে প্রণত হত ও সিজদা করত।

(৩) তারা মূর্তির জন্য নযর-নেয়ায নিয়ে আসত। সেখানে মূর্তির নামে কুরবানী করত (মায়েদাহ ৫/৬)।

(৪) তারা মূর্তিকে খুশি করার জন্য গবাদি পশু ও তাদের জন্য চরণক্ষেত্র মানত করত। যাদের কেউ ব্যবহার করতে পারত না (আনআম ৬/১৩৮-১৪০)।

(৫) তারা তাদের বিভিন্ন কাজের ভালো-মন্দ ফলাফল ও ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন প্রকার তীর ব্যবহার করত। যাতে হ্যা, না, ভালো, মন্দ ইত্যাদি লেখা থাকত। হোবল দেবতার খাদেম সেগুলো একটি পাত্রে মध्ये ফেলে অতঃপর তাতে ঝাকুনি দিয়ে তীরগুলি ঘুরিয়ে ফেলত। অতঃপর যে তীরটা বেরিয়ে আসত, সেটাকেই তারা ভাগ্য মনে করত।

(৬) এতদ্ব্যতীত তারা জোতিষীদের কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করত এবং বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রকে মঙ্গল-অমঙ্গলের কারণ মনে করত।

(৭) তারা পাখি উড়িয়ে দিয়ে কাজের শুভাশুভ ও ভাল-মন্দ নির্ধারণ করত।

দ্বীনে ইবরাহীমে উক্ত শিরক ও বিদআতসমূহ চালু করার পরেও তাদের অহংকার ছিল এই যে,

(১) আমরা ইবরাহীম (আঃ) -এর দ্বীনে হানীফের খাটি অনুসারী। তারা কা'বা গৃহের সংরক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক। অতএব তাদের সমকক্ষ আরব ভূখণ্ডে কেউ নেই। তাদের এই বড়ত্ব ও আভিজাত্যের অহংকার এতদূর পৌছে গিয়েছিল যে, তারা যেহেতু “হুমস” অর্থাৎ “সবচাইতে বড় বীর ও বড় ধার্মিক” অতএব তাদের পক্ষে “হারাম” -এর সীমানার বাইরে কোন হালাল এলাকায় যাওয়াটা মর্যাদাকর নয়। তারা যেহেতু “ক্বাতীন” বা “আহলুল্লাহ” অর্থাৎ “আল্লাহর ঘরের বাসিন্দা” সেকারণে হজ্জের মৌসুমে “মুযদালিফায়” অবস্থান করত, যা ছিল হারাম এলাকার অভ্যন্তরে। হারামের বাইরে হওয়ার কারণে তারা আরাফাতের ময়দানে যেত না বা সেখান থেকে মক্কায় ফিরে আসা অর্থাৎ “তাওয়াফে আফাযাহ” করত না। যা ছিল হজ্জের সবচেয়ে বড় রুকন। তারা মুযদালিফায় অবস্থান করত এবং সেখান থেকে মক্কায় ফিরে আসত। সেজন্য আল্লাহ নির্দেশ দেন, “অতঃপর তোমরা ঐ স্থান থেকে ফিরে এসো তাওয়াফের জন্য, যেখান থেকে লোকেরা ফিরে আসে (অর্থাৎ আরাফাত থেকে)। (সূরা বাক্বারাহ ২/১৯৯)।

(২) এতদ্ব্যতীত তারা নিজেরা ধর্মীয় বিধান রচনা করেছিল যে, বহিরাগত হাজীগণ মক্কায় এসে প্রথম তাওয়াফের সময় তাদের পরিবেশিত ধর্মীয় কাপড় পরিধান করবে। সম্ভবতঃ এটা তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থদুষ্ট বিদআত ছিল। যদি কেউ (আর্থিক কারণে বা অন্য কারণে) তা সংগ্রহে ব্যর্থ হয়,

তবে পুরুষরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে এবং মেয়েরা সব কাপড় খুলে রেখে কেবল ছোট্ট একটা কাপড় পরে তাওয়াফ করবে। এতে তাদের দেহ এক প্রকার নগ্নই থাকত। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন, “হে বনু আদম! প্রতিবার মসজিদে উপস্থিত হবার সময় তোমাদের পোষাক পরিধান কর” (সূরা আরাফ ৭/৩১)। তাদের কাছ থেকে “হুমস” কাপড় কিনতে বাধ্য করার জন্য তারা এ বিধানও করেছিল যে, যদি বহিরাগত কেউ উত্তম পোষাকে এসে তাওয়াফ করে, তাহলে তাওয়াফ শেষে তাদের ঐ পোষাক খুলে রেখে যেতে হবে। যার দ্বারা কেউ উপকৃত হত না।

(৩) তাদের বানানো আরেকটা বিদআতী রীতি ছিল এই যে, তারা এহরাম পরিহিত অবস্থায় স্ব স্ব বাড়ীর সম্মুখ দিক দিয়ে প্রবেশ করবে। কিন্তু বাকী আরবরা সকলে স্ব স্ব বাড়ির পিছন দিকের সরু পথ দিয়ে গৃহে প্রবেশ করবে। সম্মুখ দরজা দিয়ে নয়। এভাবে তারা তাদের ধার্মিকতার ক্ষেত্রে বৈষম্যগত শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব সারা আরবের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, “আর পিছনের দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। বরং মঙ্গল রয়েছে আল্লাহকে ভয় করার মধ্যে। তোমরা ঘরে প্রবেশ কর সম্মুখ দরজা দিয়ে” (সূরা বাক্বারা ২/১৮৯)।

উপরোক্ত আলোচনায় তৎকালীন আরবের ও বিশেষ করে মক্কাবাসীদের মধ্যে প্রচলিত শিরক ও বিদআতসমূহের একটা চিত্র পাওয়া গেল যা তারা ইবরাহীম (আঃ) - এর একত্ববাদী দ্বীনে হানীফের মধ্যে ধর্মের নামে বিদআত চালু করেছিল। (তথ্যসূত্রঃ নবীদের কাহিনী, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব)।

(খ) বিদ'আত উৎপত্তির কতিপয় কারণঃ বিদ'আত ও গোমরাহীতে পতিত হওয়া থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ ধরা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ .

(সূরা الأنعام: ১৫৩)

'এবং এ পথই আমার সরল পথ, সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ কর এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ কর না। তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে তার পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।'

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، قَالَ سَمِعْتُ مُجَالِدًا، يَذْكُرُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَطَّ حَطًّا وَحَطَّ حَطَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَحَطَّ حَطَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخُطِّ الْأَوْسَطِ فَقَالَ " هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ " . ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি একটি সরল রেখা টানলেন এবং তাঁর ডান দিকে দুটি সরল রেখা টানলেন এবং বাম দিকেও দুটি সরল রেখা টানলেন। অতঃপর তিনি মধ্যবর্তী রেখার উপর তাঁর হাত রেখে বলেন: এটা আল্লাহর রাস্তা। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেনঃ

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

(অর্থাৎ- এই হচ্ছে আমার সরল-সঠিক পথ, সুতরাং তোমরা একে অনুসরণ করো এবং তোমরা অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, নতুবা তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে।) (সূরা আনআম ৬:১৫৪)^{৭৮} তাখরীজ কুতুবুত সিভাহ: আহমাদ ১৪৮৫৩ তাহকীক আলবানীঃ সহীহ। তাখরীজ আলবানীঃ যিলুলুল জান্নাহ ১৬। গ্রন্থঃ সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ ১/ রাসুল (সাঃ)'র সুন্নাতের অনুসরণ, হাদিস নম্বরঃ ১১)^{৭৯} সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন এভাবে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেনঃ

خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله ثم خط خطوطا على كل يمينه متفرقة عن يمينه وعن شماله، ثم قال: وهذه سبل سبيل منها شيطان يدعو إليه.

‘রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের (দেখানোর) জন্য একটি রেখা টানলেন বা দাগ দিলেন অতঃপর বললেন এটি আল্লাহর পথ। এর পর এ রেখার ডানে বামে আরো অনেকগুলো দাগ দিলেন এর পর বললেন: এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন পথ।

ইয়াযীদ নামক হাদীসের জনৈক বর্ণনাকারী বললেন বিচ্ছিন্নকারী (অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে বিচ্ছিন্নকারী বিভিন্ন পথ) এরপর প্রত্যেকটি পথের উপর একটি করে শয়তান বসে আছে, সে পথের দিকে আহ্বান করে। অতঃপর পড়েছেনঃ

^{৭৮} সূরা আনআম ৬ : ১৫৪

^{৭৯} সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ ১/ রাসুল (সাঃ)'র সুন্নাতের অনুসরণ, হাদিস নম্বরঃ ১১

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ .
(الأنعام: ১৫৩)

‘এটিই আমার সরল পথ। তোমরা এর অনুসরণ কর। এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না। তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।’ (সূরাঃ আল আনআম - ১৫৩)^{৪০}। অতএব যে ব্যক্তি কোরআন ও সুন্নাহ থেকে বিমুখ হবে, এড়িয়ে চলবে, বিভ্রান্তকারী রাস্তা এবং নব আবিষ্কৃত বিদ’আত সমূহ তাকে বিভ্রান্ত করে দেবে।

মূলতঃ সমাজে বিদ’য়াত চালু হওয়ার মূলে চারটি কারণ লক্ষ্য করা যায়ঃ একঃ ব্যক্তি তার নিজের থেকে বিদ’আত চালু করে সমাজে তা চালিয়ে দেয়। পরে তা সাধারণ ভাবে সমাজে প্রচলিত হয়ে পড়ে।

দুইঃ কোন আলেম বা পীর সাহেব নিজে জানা সত্ত্বেও শরীয়ত বিরোধী একটা কাজ করছেন: কিন্তু তা দেখে সমাজের জাহিল লোকেরা মনে করতে শুরু করে যে, এত বড় আলেম বা পীর সাহেব হয়ে যেহেতু এটা করেছেন, তাই এটা অবশ্যই শরীয়ত সম্মত। নতুবা কি তিনি এটা করতেন? এভাবে এক ব্যক্তির কারণে গোটা সমাজে বিদ’আত চালু হয়ে যায়।

তিনঃ জাহিল লোকেরা শরীয়ত বিরোধী কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু সমাজের আলেম ও বড় বড় বুয়ুর্গ ব্যক্তিগণ এ ব্যাপারে নিজের ইমানের দায়িত্ব আদায় না করে কোন রূপ প্রতিবাদ না করে মৌনতার পরিচয় দেন। হতে পারে এটা নিজের চাকরি, ব্যবসা, অথবা অন্যান্য দুনিয়াবী স্বার্থের

^{৪০} সূরাঃ আল আনআম - ১৫৩

কারণে। তখন সমাজের লোকেরা মনে করে যেহেতু আলেমগন উক্ত কাজে বাধা দেননি তাই এটা বিদ'আত হবে না।

চারঃ শরীয়ত সম্মত কাজকে শরীয়াত বিরোধী মনে করে বাদ দেয়া। যেমন- কোন কাজ শরীয়ত সম্মত অথচ তা সর্বসাধারণের মাঝে আলেমরা সঠিক ভাবে প্রচার না করার কারণে লোকজনের মনে এ কথা বদ্ধমূল হয় যে, এটা শরীয়াত সম্মত নয়। শরীয়ত সম্মত হলে আলেম সাহেবগণ বাধা দিতেন। যেহেতু বাধা দেন নাই তাই এটা শরীয়তে না থাকাটাই স্বাভাবিক।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কুরআন-হাদীসে বিদআতের ভয়াবহতা দেখে সাধারণের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আমল বিনাশী ভয়াবহ বিদ'আত মুসলিম সমাজে কীভাবে চালু হলো? এ প্রশ্নে ইবনে উসাইমীন (রহঃ) বলেন, আমাদের সমাজে বিদ'আত বিভিন্নভাবে হতে পারে। এর মধ্যে কতিপয় কারন নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ-

১. কারণগতভাবেঃ যখন মানুষ আল্লাহর এমন ইবাদত করে, যা এমন কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট, যেটা শরী'আতের অংশ নয়, তা বিদ'আত এবং প্রত্যাখ্যাত হবে তার উদ্ভাবনকারীর দিকে। যেমন কিছু লোক রজব মাসের ২৭ তারিখে রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করে এ যুক্তিতে যে, এ রাত্রিতে রাসূল কে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অতএব তাহাজ্জুদের সালাত একটা ইবাদত। কিন্তু যখন এ কারণের সাথে তা মিলে গেল তখন সেটা বিদ'আত সাব্যস্ত হল। কেননা সে এ ইবাদতের ভিত্তি নির্মাণ করে এক কারণের উপর যা শরী'আত দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। কারণের ক্ষেত্রে ইবাদত শরী'আতের অনুকূলে হওয়ার জন্য এ বিবরণটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এর

মাধ্যমে অনেক বিদ'আত প্রকাশ পাবে, যেগুলো সুন্নাত না হওয়ার সত্ত্বেও সমাজে সুন্নাত বলে গণ্য করা হয়।

২. ধরনগতভাবেঃ ধরনের ক্ষেত্রে ইবাদত শরী'আতের অনুকূলে হওয়া আবশ্যিক। যদি মানুষ এমন পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদত করে, যার ধরন শরী'আত সমর্থিত নয়, তা'হলে সেটা অগ্রহনযোগ্য। যেমন কোন ব্যক্তি যদি ঘোড়া দিয়ে কুরবানী করে তাহলে তার কুরবানী সিদ্ধ হবে না। কেননা সে ধরনের ক্ষেত্রে শরী'আতের বিরোধীতা করছে।

৩. পরিমাণগতভাবেঃ মানুষ যদি ইচ্ছা করে যে তারা ফরয হিসাবে এক ওয়াক্ত সালাত বৃদ্ধি করবে, তা'হলে আমরা বলব যে, এটা বিদ'আত, অগ্রহনযোগ্য। কারণ পরিমাণের ক্ষেত্রে এটা শরী'আতের বিপরীত। আরো উত্তমভাবে বলা যায়, যদি কোন লোক যোহরের সালাত পাঁচ রাক'আত করে তাহলে সকলের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে তা সিদ্ধ হবে না।

৪. পদ্ধতিগতভাবেঃ যদি কোন লোক ওয়ু করা শুরু করে এবং প্রথমে দুই পা ধৌত করে, অতঃপর মাথা মাসাহ করে, এরপর দু'হাত ধৌত করে, তারপর মুখমন্ডল ধৌত করে, তাহলে আমরা বলব, তার ওয়ু বাতিল। কেননা সে পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোন শারঈ বিধানের বিপরীত করেছে।

৫. সময় ও কালগতভাবেঃ যদি কোন ব্যক্তি ফিলহজ্জ মাসের প্রথম দিনে কুরবানী দেয় তাহলে সময়ের ক্ষেত্রে শারঈ বিধানের বিপরীত হওয়ায় তার কুরবানী গ্রহণীয় হবে না। আমি শুনেছি কিছু লোক জবেহর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে রমযান মাসে ছাগল জবেহ করে। এ পদ্ধতিতে এ কাজটি বিদ'আত। কারণ কুরবানী ও আক্কাবর পশু জবেহ

ছাড়া এমন কিছু নেই যার মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। সুতরাং ঈদুল আযহার জবেহর মত নেকী পাওয়ার বিশ্বাসে রমযান মাসে জবেহ করলে সেটা বিদ'আত বলে গণ্য হবে। তবে গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে করলে সেটা বৈধ হবে।

৬. স্থানগতভাবেঃ কোন ব্যক্তি যদি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ই'তিকাফ করে তাহলে তার ই'তিকাফ শুদ্ধ হবে না। কারণ মসজিদ সমূহ ছাড়া অন্য কোথাও ই'তিকাফ বৈধ নয়। যদি কোন মহিলা বলে, আমি বাড়ীতে মুসল্লায় ই'তিকাফ করব, তাহলে স্থানের ক্ষেত্রে শারঈ বিধানের বিপরীত হওয়ায় তার ই'তিকাফ শুদ্ধ হবে না। দু'টি শর্তে উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া ছাড়া কোন ইবাদত সং কৰ্ম হতে পারে না।

প্রথম শর্ত হল- ইখলাস বা নিষ্ঠা।

দ্বিতীয় শর্ত হল- আনুগত্য বা অনুসরণ। তবে পূর্বে উল্লিখিত ৬টি বিষয় ব্যতীত অনুসরণ যথার্থ হবে না। আমি এ সকল লোকদের বলব, যাদের বিদ'আতের মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে এবং যাদের উদ্দেশ্য কখনও সং হতে ও যারা কল্যাণ কামনা করে, যখন আপনারা কল্যান কামনা করেন তখন আল্লাহর কসম করে বলছি! সালাফে সালাহীনের পথের চেয়ে অন্য কোন উত্তম পথের কথা আমাদের জানা নেই। (ইবনে উসাইমীন, সাবেক সৌদী সুপ্রিম ফতওয়া বোর্ড প্রধান)^{৪১}। শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, ইলম ও ইবাদত বিষয়ক সর্ব প্রকার বিদ'আত খুলাফায়ে

^{৪১} ইবনে উসাইমীন, সাবেক সৌদী সুপ্রিম ফতওয়া বোর্ড প্রধান

রাশেদীনের খেলাফতকালের শেষের দিকেই প্রকাশ পায়। (তথ্যসূত্রঃ মাজমু'ফাতওয়া ১০/৩৫৪ পৃষ্ঠা)^{৪২}।

ওসমান (রাঃ) - এর শাহাদত বরণের পরে যখন মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি হল, ঠিক তখনই সর্ব প্রথম হারুরিয়াহ' বিদ'আত প্রকাশ লাভ করলো। অতঃপর ছাহাবয়ে কেরামের শেষ যামানায় কদর'অর্থাৎ তাক্বদীর বলে কিছু নেই এই বিশ্বাসের বিদ'আত প্রকাশ লাভ করে। তার পরই ইরজা' অর্থাৎ আমল ঈমানের অংশ নয় এই বিশ্বাসের বিদ'আত তাশায়ু অর্থাৎ রাসূলুল্লা (সাঃ) এর মৃত্যুর পর আলী (রাঃ) প্রথম খলীফা হওয়ার যোগ্য অধিকারী এই বিশ্বাসের উপর গঠিত হয় বিদ'আত এবং খাওয়ারেজ' অর্থাৎ কাবীরা গুনাগার কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী বিশ্বাসের বিদ'আত প্রকাশ লাভ করে।

অতঃপর তাবেঈন শেষ যামানায় ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) - এর মৃত্যুর পরে খোরসানে হিশাম ইবনে আব্দুল মালেক (রহঃ) - এর খেলাফতকালে জাহমিয়াহদের উৎপত্তি হয়। আর উল্লিখিত বিদ'আতগুলি দ্বিতীয় শতাব্দি হিজরীতে সৃষ্টি হয়। সে সময় ছাহাবয়ে কেরামের অনেকেই জীবিত ছিলেন এবং তাঁরা এ সকল বিদ'আত সাধ্যমত দমন করেছিলেন। অতঃপর ইসলামের সোনালী যুগের পরে এসে মু'তাযিলা'(যারা নিজেদের জ্ঞান বা বিবেকের মান দণ্ডে শরী'তকে মানে) বিদ'আতের সৃষ্টি হয়। তার পর তাছাউফ'বা ছুফীবাদ তথা কবর পূজারীদের জন্ম হয়। এভাবে যুগের আর্বতনে বিশ্বব্যাপী রকমারী বিদ'আত এর প্রাদুর্ভাব ঘটে। যাই হোক, সামগ্রিকভাবে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিদ'আত মুসলিম সমাজে চালু

^{৪২} মাজমু'ফাতওয়া ১০/৩৫৪ পৃষ্ঠা

হওয়ার যে কতিপয় কার্যকারণ পাওয়া যায় তা নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:-

(১) **ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাঃ** ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই মুসলিম সমাজে বিদআত চালু হওয়ার অন্যতম কারণ। ঈমান-আমল হেফাযত করতে আবশ্যিক পরিমাণ ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্যই ফরজ করা হয়েছে। দ্বীনের যথার্থ জ্ঞানের অনুপস্থিতি মুসলিম সমাজকে যেমন কলুষিত, পশাৎপদ করেছে ঠিক তেমনি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই বিদআত প্রসারে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে। মূলতঃ রাসূলের যুগ থেকে সময় যত দীর্ঘ হচ্ছে এবং মানুষ রিসালাতের প্রভাব ও নিদর্শন থেকে দূরে সরে চলেছে ততই ইলম ও ধর্মীয় জ্ঞান কমে চলেছে এবং মূর্খতা ও অজ্ঞতা বেড়ে চলেছে ও সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে। বরং এ প্রসঙ্গে নবী (সাঃ) নিজেই বলেছেনঃ

من يعيش منكم فسيري اختلافا كثيرا.

'তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে।' তিনি আরও বলেনঃ

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، و لكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا، و أضلوا.

'আল্লাহ তাআলা ইলম বান্দাদের থেকে উপড়ে নেয়ার মত করে উঠিয়ে নিবেন না বরং ওলামাদের মৃত্যুর মাধ্যমে উঠিয়ে নেবেন। এক পর্যায়ে যখন আর কোন আলেম অবশিষ্ট রাখবেন না তখন লোকেরা অজ্ঞ মূর্খদেরকে

নিজেদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। তারা বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে তখন তারা না জেনে ফতওয়া দেবে। ফলে নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং অপরদেরকে গোমরাহ করবে।' তাই বিদআতকে একমাত্র ইলম ও ওলামারাই প্রতিরোধ করতে পারেন এবং করেও থাকেন। যখন এতদুভয়ের বিলুপ্তি ঘটে, তখন বেদআত প্রকাশ ও প্রসারের সুযোগ পেয়ে যায়, আর বেদআতপন্থীরা এ বিষয়ে নব উদ্যম খুঁজে পায় এবং কাজ করতে শুরু করে।

(২) প্রবৃত্তির অনুসরণঃ মানুষ যখন কোরআন ও সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেনঃ

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ
بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . (القصص: ৫০)

'অতঃপর তারা যদি আপনার ডাকে সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।' আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ
عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ . (الجالية: ২৩)

'আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল খুশিকে নিজ ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন। এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পরদা।

অতএব আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তা ভাবনা কর না?' বিদআত অনুসৃত প্রবৃত্তির বুনন বৈ কিছুই নয়।

প্রবৃত্তির অনুসরণ ও আল্লাহর দীনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিকে বিচারক হিসেবে মানা থেকে সতর্ক করা সম্বন্ধে কয়েক গ্রন্থাগারের মন্তব্যঃ (গাযালী) 'এহইয়াউ 'উলুমিদ্দীন' (إحياء علوم الدين) গ্রন্থে বলেনঃ যেমনিভাবে ঔষধের উপকারিতা উপলব্ধি করতে বিবেক স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, যদিও পরীক্ষা-নীরিক্ষা করার দ্বারাই সেটা নির্ধারিত হয়, তেমনিভাবে বিবেক আখিরাতে যা উপকার করবে তা জানতে অপারগ, কারণ সেটা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করার সুযোগ নেই। এটা শুধু সম্ভব হবে যদি আমাদের নিকট কিছু সংখ্যক মৃতব্যক্তি ফিরে আসে এবং তারা আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী করে এমন আমল ও তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এমন আমল সম্পর্কে জানিয়ে দেয়; আর এটা আশা করার কোনো সুযোগ নেই।

(২) 'মাজমাউল বাহরাইন' গ্রন্থকার তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, একলোক ঈদের দিন ময়দানে ঈদের সালাতের আগে কিছু সালাত আদায় করতে চাইলে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে নিষেধ করেন। তখন লোকটি বলল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি অবশ্যই জানি যে আল্লাহ আমাকে সালাত আদায় করার কারণে আযাব দিবেন না, তখন আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, আর আমিও জানি যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যে কোনো কাজেরই সাওয়াব দেন না, যতক্ষণ না তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম করবেন বা তিনি তা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন। সুতরাং তোমার সালাত বেহুদা কাজ হয়ে যাবে, আর বেহুদা কাজ করা হারাম। তাছাড়া

হতে পারে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবীর বিরোধিতার কারণে তোমাকে শাস্তি দিবেন।”।

(৩) ‘আল - হিদায়া’ গ্রন্থকার বলেনঃ “সুবহে সাদিকের পরে ফযরের দুই রাকাতের চেয়ে অতিরিক্ত নফল সালাত আদায় করা মকরুহ; কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের প্রতি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তিনি দুই রাকাতের বেশি আদায় করেননি।”

সুতরাং লক্ষ্য করুন, কিভাবে ইবাদত অধ্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কোনো কাজ না করাকে মাকরুহের উপর দলিল হিসেবে তিনি উল্লেখ করলেন। [তথ্যসূত্রঃ সংকলনঃ শাইখ আহমদ আর-রুমী আল-হানাফী (রহঃ), অনুবাদকঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম, সম্পাদনাঃ ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, সূত্রঃ ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদিআরব]।⁸³

(৩) ব্যক্তি ও মতের পক্ষাবলম্বনঃ সত্যাসত্য যাচাই না করে কোন ব্যক্তি ও ব্যক্তি মতের পক্ষাবলম্বন করা অনেক সময় একজন ব্যক্তিকে সঠিক দলিলের অনুসরণ ও হক গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে। ব্যক্তি ও দলিলের আনুগত্যের মাঝে সেই পক্ষাবলম্বন বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

⁸³ শাইখ আহমদ আর-রুমী আল-হানাফী (রহঃ), অনুবাদকঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম, সম্পাদনাঃ ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, সূত্রঃ ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদিআরব

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ
۝۹۰ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ . (البقرة:

'আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা সে হুকুমের অনুসরণ কর যা আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না বরং আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানতো না: জানতো না সঠিক পথও।' বর্তমান যুগেও এ প্রকৃতির অনেক লোক পাওয়া যায়, যারা সুফিবাদে বিশ্বাসী যেমনঃ কবর পূজারি বা প্রচলিত তথাকথিত মাযহাবপন্থীরা। অতএব, আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা যে মতাবলম্বী এবং যে ব্যক্তির দর্শন গ্রহণ করেছে যদি সে মত ও দর্শনের বিপরীত কোরআন ও হাদীসের সঠিক উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে তাদের বলা হয়, আপনি যে মত ও দর্শন গ্রহণ করেছেন সেগুলো তো কোরআনের এ আয়াত ও এ সকল হাদীস দ্বারা বাতিল বলে প্রমাণিত হচ্ছে। তাই ইমাম গাযালী (রহঃ) তাঁর 'আল-আরবা'ঈন ফী উসূলিদীন' (الأربعين في أصول الدين) নামক গ্রন্থে বলেন, “তুমি অবশ্যই বেঁচে থাক তোমার বুদ্ধি বা যুক্তির দ্বারা সবকিছু বিচার করা থেকে, আরও বেঁচে থাক ‘প্রত্যেক কল্যাণকর ও উপকারী বস্তুই উত্তম, আর যা কিছু অধিক পরিমাণে হবে, তাই অধিক উপকারী হবে’ এমন কথা বলা থেকে। কারণ, তোমার বুদ্ধি স্রষ্টার নির্দেশাবলীর রহস্য উদঘাটনে সক্ষম নয়; বরং তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শক্তিই অনুধাবন করতে পারে; সুতরাং তোমার উপর আবশ্যকীয় কর্তব্য হল অনুসরণ করা; কারণ, বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ তুমি কiyাসের মাধ্যমে বুঝতে পারবে না; তুমি কি দেখনি, কিভাবে তোমাকে সালাতের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানানো হয়েছে অথচ

দিনব্যাপী তা আদায় করা থেকে তোমাকে নিষেধ করা হয়েছে। তোমাকে তা পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সুবহে সাদিক ও আসরের পরে এবং সূর্য উদয়, অস্ত ও পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার সময়; আর এটার পরিমাণ হচ্ছে দিনের এক তৃতীয়াংশের মত সময়।”

সুতরাং উক্ত মত ও পথ ছাড়ুন এবং কোরআন সুন্নাহর অনুসরণ করুন। সঠিক পথে ফিরে আসুন। তখন তারা নিজ মাজহাব মাশায়েখ ও বাপ-দাদার মাধ্যমে দলিল দিয়ে বলে যে, এতকাল যাবৎ তারা কি ভুল করে এসেছে? যুগ যুগ ধরেই তো এ আমল চলে আসছে। কই কেউ তো ভুল বলেনি? আমাদের পীর-বয়ুর্গরা এত বড় আলেম, তারা কি ভুল করতে পারে? ইত্যাদি যতসব অসার ও বাতিল কথা বলে মাযহাবপন্থীরা হককে এড়িয়ে যায়।

(৪) বিধর্মী কাফেরদের সাদৃশ্যাবলম্বনঃ বিদ'আত ও কুপ্রথায় পতিত করার ব্যাপারে কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন একটি বিরাট কারণ, যেমন আবু ওয়াক্কিদ লায়সী (রাঃ) এর হাদীসে একটি ঘটনা উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে হোনাইন অভিযুগ্মে যাত্রা করলাম। সে সময় সবে মাত্র কিছুদিন হলো আমরা কুফর ছেড়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছি, এদিকে 'যাতে আনওয়াত' নামে মুশরিকদের একটি বড়ই বৃক্ষ ছিল, যার চার পাশে তারা অবস্থান করত এবং নিজেদের যুদ্ধাস্ত্র সে গাছে ঝুলিয়ে রাখত। পশ্চিমমুখে আমরা সে গাছের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমরা বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাদের যেমন 'যাতে আনওয়াত' আছে আপনি আমাদের জন্যও একটি 'যাতে আনওয়াত' স্থির করুন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আল্লাহ্ আকবার **إِنهَا السَّنَن** এটি

একটি রীতি, যে সত্তার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, তোমরা তেমন একটি কথাই কললে যেমনটি বলেছিল, বনী ইসরাইলরা নবী (সাঃ) মুসা (আঃ) কে।

قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. (الأعراف)

তারা বলতে লাগল, হে মুসা আপনি আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন। তিনি বললেন তোমরা নিতান্তই একটি অজ্ঞতা প্রসূত সম্প্রদায়। তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্বসূরীদের রীতি অনুসরণ করবে। এ হাদীস নবী আকরাম (সাঃ) সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করছেন যে, কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বনই বনী ইসরাইলকে ইবাদতের জন্য মূর্তি নির্মাণ করে দেয়ার মত কদর্য অনুরোধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর ঐ একই জিনিস রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কতিপয় সাহাবিকে বরকত হাসিলের জন্য আল্লাহকে বাদ দিয়ে একটি গাছ নির্ধারণ করে দেয়ার জন্য আবেদন করতে উৎসাহ করে তুলেছিল। বর্তমান সময়েও এমনটি ঘটে চলেছে যে অধিকাংশ মুসলমান শিরকি ও বিদ'আতী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে কাফেরদের অনুসরণ করে চলেছে। যেমন ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন, নির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য সপ্তাহ বা দিনক্ষণ নির্ধারণ করে নেয়া। বিভিন্ন উপলক্ষ ও স্মরণিকা স্বরূপ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা। স্মৃতি সৌধ, স্তম্ভ, ভাস্কর্য ইত্যাদি নির্মাণ। কবরের উপর ঘর-গুম্বজ ইত্যাদি নির্মাণ করা।

(৫) অন্ধভক্তি ও আনুগত্যঃ ইসলাম কখনো অন্ধ আনুগত্য সমর্থন করে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের দাবি করার পাশাপাশি দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। প্রশ্নবাণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে জর্জরিত করে ঈমান আনার ঘোষণা দিয়েছেন হযরত যিমাম ইবনে ছা'লাবা (বুখারী)। তবে ঈমান আনার পর কেবল কুরআন-সুন্নাহরই অন্ধভুক্তি ও আনুগত্য করা যায়। বজুর্গ,পীর-মাশায়েখ,অলি-আবদাল অন্ধ আনুগত্য পাওয়ার হকদার নন। সত্যিকারের কোন বজুর্গ ব্যক্তি এমনটি দাবিও করেন নি। তাদের আনুগত্য শর্তসাপেক্ষ। কুরআন-সুন্নাহর অনুগামী আদেশ-উপদেশই পালনীয়। কিন্তু কিছু অজ্ঞ লোক ইসলামের এই শাস্ত্রত বিধানের অনুগত হওয়ার পরিবর্তে অন্ধ আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। আমলের ক্ষেত্রে দলিল-প্রমাণের পরিবর্তে বজুর্গীর দোহাই দেন,অমুক বজুর্গ যদি 'বিদআত'করতে পারেন- তবে আমিও করব,অমুক পীর যদি 'বিদআত' করে জাহান্নামী হন তবে আমিও জান্নাত চাই না ইত্যাদি চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা বলে ফেলেন। যা মুসলিম সমাজে 'বিদআতে'র প্রসারে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

(৬) দীর্ঘদিন সুন্নাহ বর্জনের কারণেঃ ইসলামী শরীয়াত অনুমোদিত, কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত বা নির্দেশিত কোনো কাজ দীর্ঘদিন সমাজের দিনদার পরহেজগার বুজুর্গ, আলেম উলামা,বুজুর্গ ব্যক্তিগণ আমল করেননি,বা বহুকাল ধরে তার প্রচারো করেননি, লোকদের সামনে বহুকাল বলা হয়নি। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষের মনে ধারণা হয় যে,এ কাজ নিশ্চয়ই ভাল নয়। যদি ভালোই হতো তবে অবশ্যই তা পরহেজগার, দিনদার, বুজুর্গানে দ্বীন,উলামায়ে কেরাম করতেন। ভাল কাজ হলে উলামা-মাশায়েখগণকি এতদিন বলতেন না? এভাবে একটি শরীয়াত সম্মত কাজকে শেষ পর্যন্ত লোকদের শরীয়াত বীরোধী মনে করতে থাকে।সুন্নাহকেই হারাম,বিদআত ইত্যাদি আখ্যায়িত করে ফেলে।আর করোণীয় কাজকে বর্জনীয় মনে করাও মস্ত বরো বিদআত। যেমন- ইসলামী

রাজনীতি,সামাজিক বিভিন্ন কার্যক্রম দীর্ঘদিন উলামায়ে কেরামের মাঝে অনুপস্থিত থাকায় সাধারণের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে ইসলামে রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি করা হারাম (নাউযুবিল্লাহ)

(৭) নেতৃস্থানীয় জাহিল লোকদের কর্মতৎপরতাঃ দ্বীন সম্পর্কে জাহিল লোকেরা হয়ত কোন কাজ করতে আরম্ভ করল। আলেম সমাজ তার প্রতিবাদ করলেন না,বাধাও দিলেন না। এ কাজ শরীয়াত বিরোধী, তোমরা মুসলামান হিসাবে এ কাজ কিছুতেই করতে পারো না ইত্যাদি কিছুই বললেন না। ফলে সাধারণ লোকদের মধ্যে এমন ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে যে, নিশ্চয়ই এ কাজ অবৈধ নয়। যদি অবৈধ হতো তবে উলামায়ে কেরাম বাধা দিতেন অমুক মজলিসে এমনি কাজ হয়েছে। ওখানে অমুক বড় বড় আলেম ছিলেন। কেই বাধা দেননি। অতএব এ কাজ শরীয়াত সম্মত।

অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, একদিকে জনরোষের বয় অপর দিকে নিজেও দু'চার বার করে ফেলেছেন- এখন বাধা দিবেন কীভাবে? এমন কিছু সংখ্যক আলেম তাদের পক্ষে দলিল-যুক্তি আবিষ্কার করতে থাকেন। তখন আবার কিছু সংখ্যক আলেম বাধা দিয়েও আর সমাজের জোয়ার ফেরাতে ব্যর্থ হয়ে যান। বিদআতীগণ নিজেদের পক্ষে কিছু কিছু আলেমও পেয়ে যাওয়ায় তারা শরীয়াত বিরোধী কাজটি ত্যাগ করার প্রয়োজনও আর বোধ করেন না। তাদের মনে এমন ধারণা বদ্ধমূল করা হয় যে, আলেমের কথায় কাজ করে যদি কোন গুনাহ হয়, তবে তার দায় ঐ আলেমেই বহন করবেন- যিনি তাকে বাতলিয়েছেন। সুতরাং তার কোন অস্থিরতার কারণই নেই। এভাবে সমাজ বিদআদ চালু হয়ে যায়।

(৮) আলেম সমাজের কাজ-কর্মঃ কোন আলেম হয়ত অসতর্কতার দরুন বা কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে শরীয়াত বিরোধী বা সুন্নাহের খেলাফ কোন কাজ করে ফেলেছেন। তিনি নিজেও জানেন যে, তার কাজ সুন্নাহের খেলাফ বা তার কাজের সমর্থনে ইসলামী শরীয়াহের গ্রহণযোগ্য কোন দলিল-প্রমাণ নেই। তিনি হয়তো অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য তাওবাও করেছেন। কিন্তু তার কাজ দেখে জাহিল বা অতিভক্ত লোকেরা মনে করতে শুরু বিরোধী কোন কাজ করতেই পারেনা। কারণ মস্ত বড় আলেম-বুজুর্গ শরীয়াত বিরোধী কোন করতেই পারেন না। ইসলামী আইনের উৎস সম্পর্কে জাহিল লোকেরা এভাবে এক ব্যক্তির কারণে গোটা সমাজেই বিদআতের প্রচলন করে ফেলে। সেজন্য বিজ্ঞজনেরা বলেন- **حسنان اللابرار** **سيئات للمقر بين** অর্থাৎ- “বুজুর্গ ব্যক্তির ভাল কাজ ভক্তের জন্যে মন্দ হয়ে যায়”। বাধ্য হয়ে বুজুর্গ ব্যক্তি যা করেছেন তা ছিল বুজুর্গের জন্যে হালাল। আর বুজুর্গকে দেখে বিনা কারণেই যিনি বুজুর্গের অনুসরণ করলেন, তিনি হলেন পাপী। সংশ্লিষ্ট বুজুর্গ হয়তো জানেন-ই না যে, তাকে নিয়ে এতো কিছু হয়েছে বা হচ্ছে। এ ধরনের কাজ সাধারণত ঐ বুজুর্গের ওফাতের পরই হয়ে থাকে। আবার এক শ্রেণীর আলেম সাধারণত জনগণের মধ্যে এমন একটি ধারণাও প্রচার করেন যে, বুজুর্গ ব্যক্তির ভুল ধরা বা বলাও পাপ (!) শরীয়াহের সুস্পষ্ট বিধান লঙ্ঘনের পরও বলা হয়- তিনি মাদারজাত অলি (মাতৃগর্ভ হতেই আল্লাহর প্রিয় বান্দা), তার ব্যাপারে শরীয়াহের সব হুকুম প্রযোজ্য নহে (!) বিদআতের ব্যাপারে উদারনীতি গ্রহণকারীদের আচরণও বিদআত সম্প্রসারণে কার্যকার ভূমিকা পালন করে। সর্বমহলে নিজ অবস্থানকে গ্রহণযোগ্য করার মানসিকতা উদারনীতি গ্রহণে প্রাণ সঞ্চর করে। আবার ২/১ বার বিদআতী কাজের সাথে সম্পৃক্ত

হয়ে যাওয়ায় এখন ঐ কাজেকে কীভাবেই বা বিদআত বলা যায়? উদারপন্থী এসব সম্মানিত উলামা হযরত যদি তাদের যবান মোবারক দিআতের বিরুদ্ধে সোচ্চার করতেন, তবে কুসংস্কারের কড়াল গ্রাস হতে মুসলিম উম্মাহ রক্ষা পেয়ে প্রভূত উন্নতি সাধনে ব্রত হতো।

(৯) ইসলামী চেতনা, ঐতিহ্য ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যঃ মুসলিম উম্মাহ মধ্যে গড়ে উঠা সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বিনষ্ট করার অসৎ উদ্দেশ্য ইসলাম বিরোধী শক্তির প্রত্যেক বা পরোক্ষ মদদে বিদআদ সৃষ্টি করে তা সমাজে চালু করা হয়। একতাই শক্তি- একতাই বল। ঐক্যবদ্ধ কোন জাতিকে কোন অবস্থাতেই ধ্বংস করা সম্ভব নয়। এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য প্রমাণিত। মুসলিম সমাজে ইবাদতরূপে নতুন নতুন বিদআত সৃষ্টি করা হলে মূর্খ ও স্বার্থপর লোকেরা জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ পেয়ে ইসলামের মূল চেতনা হতে সরে আসবে, আর প্রকৃত দ্বীনদার ব্যক্তির কখনো বিদআত গ্রহণ করবে না। ফলে তাদের উভয়ের মধ্যে শুরু হবে সংঘাত। অগ্রগতি দূরের কথা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে একে অন্যের দমনে শুরু নিজেরাই উদ্যোগী হবে না বরং ভিন্নমত পোষনকারী গোষ্ঠকে নিমূল করার জন্যে প্রয়োজনে অমুসলিমদের ডেকে আনবে। সৃষ্টি হবে বিভিন্ন দল-উপদলের। ফলে মুসলিম সমাজ কখনো ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে শান্তির সমাজ কায়েমের সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে না। এমনই একটি ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য স্বার্থবাদী, অনভিজ্ঞ কতিপয় নামধারী আলেম, তথাকথিত পীর-মাশয়েখদের দূর হতে ব্যবহার করে ইসলাম বিরোধী শক্তি। আর এভাবে সমাজে প্রচলিত হতে থাকে অসংখ্য বিদআদী বিদআত। যার বাস্তব নমুনা আমরা আজ গোটা মুসলিম বিশ্বে প্রত্যেক করছি।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনার সারাংশে বলা যায় যে, এ কথা আমাদের জানা উচিত যে, বিদআতী কাজের ভিত্তি কি? বিভিন্ন বিদআতী কাজ সমাজে চালু হওয়ার পেছনে সাধারণ জনসাধারণ কেবল অনুসরণের দোষেরই দোষী। বিদআত সমাজে জন্ম দেয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের তেমন অবদান নেই। কিছু নামধারী আলেম, কতিপয় ভন্ড পীর সমাজে বিদআতের প্রবর্তন করে। এসব বিদআতগুলোকে সমাজে চালু করার জন্য প্রথমত কোন কোন আলেমের অসাধারণ ও বিস্ময়কর বুজুর্গ ও ফজিলত তুলে ধরা হয়। কোন না কোন ভাবে তার বংশ নিয়ে টেকানো হয় রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে। দেয়া হয় 'আওলাদে রাসূলের (!) খেতাব। আবার কেউ নিয়ে বংশ টেকান মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বা অন্য কোন প্রখ্যাত ইমামের সাথে। (নাউযুবিল্লাহ)। অতঃপর ঐ বুজুর্গের বুজুর্গীর দোহাই দিয়ে বিদআত বাজারজাতকরণে প্রয়াস চালায়। বলা হয় অমুক বড় বুজুর্গ এ কাজ করেছেন, তিনি অনেক বড় বড় আলেম, অলিয়ে কামেল ছিলেন সুতরাং এ কাজ জায়েজ হওয়ার এটাই বড় দলিল (!)। কথিত বুজুর্গের বাহারী টাইটলের আবর্তে অবুঝ শিশুর ন্যায় কিছু লোক ব্যাকুল হয়ে যায়। অতএব, হে মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে সমাজে প্রচলিত বিদআত হতে হেফাজত করুন এবং কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী সঠিক দ্বীন বুঝার তৌফিক দিন, আমীন।

বিদআতের অপকারিতাঃ অবশ্যই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহব্বত ঈমানের অঙ্গ। আর সব ধরনের মুহাব্বতেই আবেগ থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহব্বতেও থাকবে। কিন্তু সেই আবেগ যেন মুহব্বতের নীতিমালা লংঘন না করে। সেই আবেগভরা

মুহাব্বত যেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ও সুন্যাহর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত না হয়। যদি এমনটি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বতের নামে শয়তান তাকে ধোঁকায় ফেলেছে। অতএব, আর যে কাজের চাহিদা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বিদ্যমান ছিল কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতার অস্তিত্ব ছাড়াই, অথচ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কাজটি করেননি, তবে এমন কাজের উদ্ভাবন করা আল্লাহর দীনকে পরিবর্তন করে দেয়, কেননা তাতে যদি কোন কল্যাণ থাকত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করতেন এবং তার ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন, আর যখন তিনি তা করেননি এবং সে ব্যাপারে উৎসাহিত করেননি, তখন বুঝা যায় যে, তাতে কোনো কল্যাণ নেই, বরং তা নিকৃষ্ট ও মন্দ বিদ‘আত। তার দৃষ্টান্ত হল দুই ঈদের সালাতের পূর্বে আযান দেওয়া, কেননা, যখন কোনো কোনো সম্রাট তার উদ্ভাবন করে, তখন আলেমগণ তার প্রতিবাদ করেছিলেন এবং তারা তাকে মাকরুহ তথা হারাম বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

যদি তার বিদ‘আত হওয়াটাই মাকরুহ তথা হারাম হওয়ার দলিল না হত, তাহলে বলা যেতো যে, এটা আল্লাহ তা‘আলার যিকির এবং মানুষকে আল্লাহ তা‘আলার ইবাদতের দিকে আহ্বান করা; সুতরাং তাকে জুম‘আর আযানের উপর কিয়াস করা যাবে কিংবা এটাও বলা যেতো যে এটাকে (দুই ঈদের সালাতের পূর্বে আযান দেওয়ার বিষয়টিকে) ব্যাপক নির্দেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা যায়,

যেমন আল্লাহ তা‘আলার বাণী,

[(وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا) [الجمعة: ১০]

“আর তোমরা বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ কর।”

অনুরূপ আল্লাহ তা‘আলার অপর ব্যাপক বাণী,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ

“আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানায় ...।”
[সূরা হা-মীম-সিজদা, আয়াত নং - ৩৩]। কিন্তু আলেমগণ এটা বলেননি, বরং তারা বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজ করেছেন তা যেমন সুন্নাত তেমনিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কাজের চাহিদা থাকা ও প্রতিবন্ধক না থাকা সত্ত্বেও যদি তা পরিত্যাগ করেন তবে সে কাজ পরিত্যাগ করাটাই সুন্নাত। কারণ, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুম‘আ’র সালাতের ক্ষেত্রে আযানের নির্দেশ দিয়েছেন আর তিনি দুই ঈদের সালাতের জন্য নির্দেশ দেননি, তখন দুই ঈদের সালাতের জন্য আযান পরিত্যাগ করাটাই সুন্নাত। আর কারও অধিকার নেই যে, সে তা বৃদ্ধি করবে এবং বলবে- এটা সৎ আমলের বৃদ্ধি, তার বৃদ্ধিতে কোন ক্ষতি হবে না; কারণ তাকে বলা হবে, এভাবে রাসূলদের দীনসমূহ বিকৃত হয়েছে এবং তাঁদের শরী‘আতসমূহ পরিবর্তন হয়ে গেছে; সুতরাং দীনের মধ্যে যদি বৃদ্ধি করাটা বৈধ হয়, তাহলে ফজরের সালাত চার রাকাত এবং যোহরের সালাত ছয় রাকাত আদায় করা বৈধ হবে, আর বলা হবে-

এটা সৎ আমলের বৃদ্ধি, তার বৃদ্ধিতে কোনো ক্ষতি হবে না; কিন্তু কারও জন্য এ কথা বলার অধিকার নেই; কেননা, বিদ'আত প্রবর্তনকারী যে কল্যাণ ও ফযিলতের কথা ব্যক্ত করে, যদি তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে সাব্যস্ত হত এবং তা সত্ত্বেও তিনি তা না করতেন, তাহলে এই ধরনের কাজ পরিত্যাগ করা সুন্নাত, যা প্রত্যেক ব্যাপক নির্দেশ ও কিয়াসের উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রতি আমল করবে এ বিশ্বাস করে যে, তা দীনের মধ্যে অনুমোদিত নয়, সে ফাসিক অবাধ্য বলে বিবেচিত হবে, বিদ'আতকারী হিসেবে বিবেচিত হবে না; পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রতি আমল করবে এই বিশ্বাস করে যে, তা দীনের মধ্যে অনুমোদিত বিষয়, সে ফাসিক ও বিদ'আতকারী হিসেবে ধর্তব্য হবে। কারণ, ফিসক বা অবাধ্যতা বিদ'আতের চেয়েও ব্যাপক; কেননা প্রত্যেক বিদ'আতই ফিস্ক বা অবাধ্যতা, কিন্তু প্রত্যেক ফিস্ক বা অবাধ্যতাই বিদ'আত নয়।

অনুরূপভাবে এটাও বলা হয় যে, বিদ'আত ফিস্ক তথা অবাধ্যতার চেয়ে নিকৃষ্ট; কারণ, যে ব্যক্তি বিদ'আতপূর্ণ কাজ করে, সে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, যদি তার ধারণায় বিদ'আতের মাধ্যমে সে তাঁকে সম্মান করছে, কারণ সে মনে করে যে, তার প্রবর্তিত এ বিদ'আত সুন্নাতের চেয়ে উত্তম ও সঠিক হওয়ার অধিক যুক্তিযুক্ত। এভাবে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী বলে গণ্য হবে; কারণ শরী'আত যা অপছন্দ করেছে এবং যা থেকে নিষেধ করেছে, সে তাকে উত্তম মনে করেছে; আর তা হল দীনের মধ্যে নতুন কিছু প্রবর্তন করা; অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য এমন ইবাদত বিধিবদ্ধ করেছেন, যা তাদের জন্য যথেষ্ট, তাদের দীন হিসেবে

পরিপূর্ণ এবং তাদের প্রতি তাঁর প্রদত্ত নিয়ামত হিসেবে সম্পূর্ণ, যেমনটি তিনি তাঁর মর্যাদাপূর্ণ কিতাবের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, যেখানে তিনি বলেনঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম (সূরা মায়েরা, আয়াত নং - ৩)^{৪৪}।

সুতরাং পরিপূর্ণতার উপর বৃদ্ধি করা এক ধরনের ত্রুটি এবং অতিরিক্ত আঙুলের মতই বেমানান। আর সুনির্দিষ্ট নীতিমালায় হকপন্থীদের মতে, ইবাদতের ভাল ও মন্দ জানা যাবে কেবল শরী‘য়তের মাধ্যমে, আকল বা যুক্তির মাধ্যমে নয়; সুতরাং এমন প্রত্যেকটি কাজ, যা করার ব্যাপারে শরী‘য়তে নির্দেশনা রয়েছে, তা উত্তম কাজ; আর এমন প্রত্যেকটি কাজ, যা করার ব্যাপারে শরী‘য়তে নিষেধ করা রয়েছে, তা মন্দ কাজ। অতএব, এ কথাতো মুসলিমদের কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, খৃষ্টানরা বিদ‘আতী কাজ-কর্ম করে ও তাদের নবীর মুহব্বতে বাড়াবাড়ি করে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এ কথা যেমন আল-কুরআনে এসেছে, তেমনি হাদীসেও আলোচনা করা হয়েছে। আমি অতি সংক্ষেপে এখানে বিদ‘আতের কতিপয় পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করছিঃ

^{৪৪} সূরা মায়েরা, আয়াত নং - ৩

(১) বিদ'আত মানুষকে পথভ্রষ্ট করেঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা উম্মতের জন্য নিয়ে এসেছেন তা হল হক্ক। এ ছাড়া যা কিছু ধর্মীয় আচার হিসাবে পালিত হবে তা পথভ্রষ্টতা। আল্লাহ রাসুল আলামীন বলেনঃ হক্ক আসার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কি থাকে? (সূরা ইউনূস, ৩২)^{৪৫}

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ সকল ধরনের বিদ'আত পথভ্রষ্টতা। (মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

(২) বিদ'আত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য থেকে মানুষকে বের করে দেয় এবং সুন্নাতের বিলুপ্তি ঘটায়ঃ কেননা বিদ'আত অনুযায়ী কেউ 'আমল করলে অবশ্যই সে এক বা একাধিক সুন্নাত পরিত্যাগ করে। উলামায়ে কিরাম বলেছেনঃ “যখন কোন দল সমাজে একটা বিদ'আতের প্রচলন করে, তখন সমাজ থেকে কম করে হলেও একটি সুন্নাত বিলুপ্ত হয়ে যায়।”

আর এটা অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত যে, যখনই কোন বিদ'আত 'আমলে আনা হয়েছে তখনই সেই স্থান থেকে একটি সুন্নাত চলে গেছে বা গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে মুজাদ্দিদ আলফেসানীর মাকতুবাৎ থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যায়। তিনি লিখেছেনঃ এক ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করল 'আপনারা বলেছেনঃ যে কোন বিদ'আত নাকি একটি সুন্নাতকে বিলুপ্ত করে। আচ্ছা, যদি মৃত ব্যক্তিকে কাফনের সাথে একটি পাগড়ী পড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে কোন সুন্নাতটি বিলুপ্ত হয়? কি কারণে এটা বিদ'আত বলা হবে?' আমি জবাবে লিখলামঃ অবশ্যই একটি সুন্নাত বিলুপ্ত হয় যদি মৃতের কাফনে পাগড়ী দেয়া

^{৪৫} সূরা ইউনূস, ৩২

হয়। কারণ পুরুষের কাফনের সুন্নাত হল কাপড়ের সংখ্যা হবে তিন। পাগড়ী পড়ালে এ সংখ্যা আর ‘তিন’ থাকেনা, সংখ্যা দাড়ায় ‘চার।’ অতএব, এটি বিদ‘আত ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না। উদাহরণ হিসাবে আরো বলা যায়, এক ব্যক্তি ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ল। ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না। এ সমস্যার জন্য এক পীর সাহেবের কাছে গেল। পীর সাহেব তাকে বললেন, তুমি এক খতম কুরআন বখশে দাও অথবা নির্দেশ দিলেন একটা মীলাদ দাও বা খতমে ইউনূসের ব্যবস্থা কর। সে তাই করল। ফলাফল কি দাড়াল? ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির জন্য একটি দু‘আ রয়েছে যা ‘আমল করা সুন্নাত। বিদ‘আত অনুযায়ী ‘আমল করার কারণে সে সেই সুন্নাতটি পরিত্যাগ করল। জানার চেষ্টা করলনা যে, এ ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন। অন্যদিকে সে মীলাদ, কুরআন খতম ইত্যাদি বিদ‘আতী কাজ করে আরও আর্থিক ঋণভারে জর্জরিত হলো।

রামাযানের শেষ দশ দিনের রাতসমূহে রাত জেগে ইবাদাত-বন্দেগী করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু ১৫ শাবানে রাত জাগাকে যেমন গুরুত্ব দেয়া হয় তেমনভাবে এ সুন্নাতী ‘আমলের প্রচলন দেখা যায় না বরং শবে কদরের মূল্যায়ন শবে বরাতকে করা হচ্ছে। ফরয সালাত আদায়ের পর সর্বদা জামাতবদ্ধ হয়ে মুনাযাত করা একটি বিদ‘আত। এটা ‘আমল করার কারণে ফরয সালাত আদায়ের পর যে সকল যিকর-আযকার সুন্নাত হিসাবে বর্ণিত আছে তা পরিত্যাগ করা হয়। আপনি দেখবেন এভাবে প্রতিটি বিদ‘আত একটি সুন্নাতকে অপসারিত করে উহার স্থান দখল করে নিয়েছে।

(৩) বিদ'আত আল্লাহর দ্বীনকে বিকৃত করেঃ এর জ্বলন্ত উদাহরণ আজকের খৃষ্টান ধর্ম। তারা ধর্মের বিদ'আত প্রচলন করতে করতে উহার মূল কাঠামো পরিবর্তন করে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পথভ্রষ্ট হিসাবে অভিহিত হয়েছে। তাদের বিদ'আত প্রচলনের কথা আল-কুরআনে উলেখ- করা হয়েছেঃ আর সন্ন্যাসবাদ! ইহাতো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় প্রচলন করেছিল। আমি তাদের এ বিধান দেইনি। (সূরা হাদীদ, আয়াত নং - ২৭)^{৪৬}

সন্ন্যাসবাদ তথা বৈরাগ্যবাদের বিদ'আত খৃষ্টানেরা তাদের ধর্মের প্রবর্তন করেছে। তাদের উদ্দেশ্য ভাল ছিল; উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি। কিন্তু ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত যে কোন কাজ করলেই তা গ্রহণযোগ্য হয় না। এ জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমোদন প্রয়োজন। এভাবে যারা ধর্মের বিদ'আতের প্রচলন করে তাদের অনেকেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভাল থাকে। কিন্তু তাতে নাজাত পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানেরা তাদের ধর্মের অন্য জাতির রসম- রেওয়াজ ও বিদ'আত প্রচলন করে ধর্মকে এমন বিকৃত করেছে যে, তাদের নবীগণ যদি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসেন তাহলে তাদের রেখে যাওয়া ধর্ম তাঁরা নিজেরাই চিনতে পারবেন না। ঠিক তেমনিভাবে আমাদের মুসলিম সমাজে শিয়া সম্প্রদায় বিদ'আতের প্রচলন করে দ্বীন ইসলামকে কিভাবে বিকৃত করেছে তা নতুন করে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

(৪) বিদ'আত ইসলামের উপর একটি আঘাতঃ যে ইসলামে কোন বিদ'আতের প্রচলন করল সে মূলতঃ অজ্ঞ লোকদের মত এ কথা স্বীকার

^{৪৬} সূরা হাদীদ, আয়াত নং - ২৭

করে নিল যে, ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান নয়, তাতে সংযোজনের প্রয়োজন আছে। যদিও সে মুখে এ ধরনের বক্তব্য দেয় না, কিন্তু তার কাজ এ কথার স্বাক্ষর দেয়। অথচ আল্লাহ রাসূল আলামীন বলেন: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। (সূরা মায়িদা: আয়াত নং - ৩)^{৪৭}

(৫) বিদ'আত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে খিয়ানাতের এক ধরনের অভিযোগঃ যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতের প্রচলন করল বা 'আমল করল আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন “এ কথা বা কাজটি যে ইসলাম ধর্মের পছন্দের বিষয় এটা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন? তিনি উত্তরে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' বলবেন। যদি 'না' বলেন তাহলে তিনি স্বীকার করে নিলেন যে, ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কম জানতেন। আর যদি 'হ্যাঁ' বলেন তাহলে তিনি স্বীকার করে নিলেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টি জানতেন, কিন্তু উম্মাতের মধ্যে প্রচার করেননি। এ অবস্থায় তিনি তাবলীগে শিথিলতা করেছেন। (নাউ'যুবিল্লাহ!)

(৬) বিদ'আত মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করে ও ঐক্য সংহতিতে আঘাত করেঃ বিদ'আত মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শত্রুতা ও বিবাদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তাদের মারামারি হানাহানিতে লিপ্ত করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, একদল লোক মীলাদ বা মীলাদুন্নবী পালন করল। আরেক দল বিদ'আত হওয়ায় তা বর্জন বা বিরোধিতা করল। যারা এটা পালন করল তারা প্রচার করতে লাগল যে, অমুক দল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

^{৪৭} সূরা মায়িদা: আয়াত নং - ৩

সাল্লামের জন্মদিনে আনন্দিত হওয়া পছন্দ করে না। তাঁর গুণ-গান করা তাদের কাছে ভাল লাগেনা। তাদের অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বত নেই। যাদের অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বত নেই তারা বেঈমান, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুশমন। আর এ ধরনের প্রচারনায় তারা দুটি দলে বিভক্ত হয়েএকে অপরের দুশমনে পরিণত হয়ে হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে পড়ল। এভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই বিদ‘আতকে গ্রহণ ও বর্জনের প্রশ্নে মুসলিম উম্মাহ শিয়া ও সুন্নি এবং পরবর্তী কালে আরো শত দলে বিভক্ত হয়ে গেল। কত প্রাণহানির ঘটনা ঘটল, রক্তপাত হল। তাই মুসলিম উম্মাহকে আবার একত্র করতে হলে সকলকে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর দিকে আহ্বান ও বিদ‘আত বর্জনের জন্য অহিংস ও শান্তিপূর্ণপন্থায় পরম ধৈর্যের সাথে আন্দোলন করতে হবে। আন্দোলন করতে হবে সকল মানুষ ও মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রদর্শন করে। কারো অনুভূতিতে আঘাত লাগে এমন আচরণ করা যাবে না। এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, যা হক ও সত্য তা-ই শুধু টিকে থাকবে। আর যা বাতিল তা দেরীতে হলেও বিলুপ্ত হবে।

(৭) বিদ‘আত ‘আমলকারীর তাওবা করার সুযোগ হয় নাঃ বিদ‘আত যিনি প্রচলন করেন বা সেই অনুযায়ী ‘আমল করেন তিনি এটাকে এক মহৎ কাজ বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন এ কাজে আল্লাহ তা‘আলা সন্তুষ্ট হবেন। যেমন আল্লাহ খৃষ্টানদের সম্পর্কে বলেছেন তারা ধর্মের বৈরাগ্যবাদের বিদ‘আত চালু করেছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। যেহেতু বিদ‘আতে লিপ্ত ব্যক্তি বিদ‘আতকে পাপের কাজ মনে করেন না, তাই তিনি এ কাজ থেকে তাওবা করার প্রয়োজন মনে করেন না।

তাওবা করার সুযোগও হয় না। অন্যান্য পাপের বেলায় কমপক্ষে যিনি পাপে লিপ্ত হন তিনি এটাকে অন্যায় মনে করেই করেন। পরবর্তীতে তার অনুশোচনা আসে, এক সময় তাওবা করে আল্লাহ তা‘আলার ক্ষমা লাভ করেন। কিন্তু বিদ‘আতে লিপ্ত ব্যক্তির এ অবস্থা কখনো হয় না।

(৮) বিদ‘আত প্রচলনকারী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফাআত পাবে নাঃ রাহমাতুলি-ল আলামীন সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গুনাহগার উম্মাতের শাফায়াতের ব্যাপারে হাশরের ময়দানে খুব আগ্রহী হবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অনুমতি লাভ করার পর তিনি বহু গুনাহগার বান্দা-যাদের জন্য শাফাআত করতে আল্লাহ তা‘আলা অনুমতি দিবেন-তাদের জন্য শাফাআত করবেন। কিন্তু বিদ‘আত প্রচলনকারীর জন্য তিনি শাফাআত করবেন না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ শুনে রেখ! হাউজে কাউছারের কাছে তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে। তোমাদের সংখ্যার আধিক্য নিয়ে আমি গর্ব করব। সেই দিন তোমরা আমার চেহারা মলিন করে দিওনা। জেনে রেখ! আমি সেদিন অনেক মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার চেষ্টা চালাব। কিন্তু তাদের অনেককে আমার থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া হবে। আমি বলবঃ হে আমার প্রতিপালক! তারা তো আমার প্রিয় সাথী-সঙ্গী, আমার অনুসারী। কেন তাদের দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে? তিনি উত্তর দিবেনঃ আপনি জানেন না যে, আপনার চলে আসার পর তারা ধর্মের মধ্যে কি কি নতুন বিষয় আবিষ্কার করেছে। (ইবনে মাজাহ) অন্য এক বর্ণনায় আছে এর পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তাদের উদ্দেশে বলবেন: দূর হও! দূর হও!!

(৯) বিদ'আত মুসলিম সমাজে কুরআন ও হাদীসের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়ঃ

কুরআন ও সুন্নাহ হল মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামের রক্ষা কবচ। ইসলাম ধর্মের অস্তিত্বের একমাত্র উপাদান। তাইতো বিদায় হুজ্জেও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যতক্ষণ তোমরা তা আঁকড়ে রাখবে ততক্ষণ বিভ্রান্ত হবে না। বিদ'আত অনুযায়ী 'আমল করলে কুরআন ও সুন্নাহর মর্যাদা মানুষের অন্তর থেকে কমে যায়। 'যে কোন নেক 'আমল কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে' – এ অনুভূতি মানুষের অন্তর থেকে ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। তারা কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি বাদ দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি, পীর-মাশায়েখ ও ইমামদের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকে।

(১০) বিদ'আত প্রচলনকারী অহংকারের দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে ও নিজেদের

ব্যবসায়িক স্বার্থে দ্বীনকে ব্যবহার ও বিকৃত করতে চেষ্টা করেঃ বিদ'আত প্রচলনকারী তার নিজ দলের একটি আলাদা কাঠামো দাঁড় করিয়ে ব্যবসায়িক বা আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য এমন কাজের প্রচলন করে থাকে যা সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় রূপ লাভ করলেও কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত হয় না। কারণ সেই কাজটা যদি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত হয় তাহলে তার দলের আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত 'আমল সকল মুসলিমের জন্যই প্রযোজ্য।

আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য বিদ'আত ও প্রচলিত কুসংস্কার সমূহঃ

উপরোক্ত কাজসমূহ ব্যতীত আমাদের দেশে আরও বহু বিদ'আতী কাজ সংগঠিত হচ্ছে। তাই একজন খাঁটি মুসলিম কোন আমল সম্পাদনের আগে অবশ্যই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে যে, তার কৃত আমলটি কুরআন ও

সহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমানিত কি না? কিন্তু আমাদের দেশের সহজ সরল ধর্মপ্রাণ মানুষ এমন অনেক কাজ বা আমলের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে রেখেছেন যার সাথে শরীয়তে মুহাম্মাদ (ﷺ) আমলের সাথে কোন মিল নেই।

এমন উল্লখযোগ্য বিদ'আতগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো:-

- (১) শবে মি'রাজ ও শবে-বরাত পালন করা।
- (২) ঈদে মিলাদুন্নবী বা মিলাদ মাহফিল এর অনুষ্ঠান করা।
- (৩) প্রচলিত পদ্ধতিতে বিবাহ অনুষ্ঠান যা শরীয়ত সম্মত নয়।
- (৪) মৃত ব্যক্তির কাযা বা ছুটে যাওয়া নামাজ সমূহের কাফফারা আদায় করা
- (৫) মৃত্যুর পর তৃতীয়, সপ্তম, দশম এবং চল্লিমতম দিনে খাওয়া-দাওয়া ও দুআ'র অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- (৬) ইসালে সওয়াব বা সাওয়ার রেসানী বা সওয়াব বখশে দেওয়ার অনুষ্ঠান করা।
- (৭) মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফিরাতের জন্য অথবা কোন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খতমে কুরআন অথবা খতমে জালালীর অনুষ্ঠান করা।

(৮) উচ্চে কণ্ঠে বা চিৎকার করে যিকর করা।

(৯) হালকায়ে যিকিরের অনুষ্ঠান করা।

(১০) মনগড়া তরীকায় পীরের মুরিদ হওয়া

(১১) ফরয, সুন্নত, নফল ইত্যাদি সালাত শুরু করার আগে মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত পড়।

(১২) প্রসাব করার পরে পানি থাকা সত্ত্বেও অধিকতর পবিত্রতা হাসিলের উদ্দেশ্যে কুলুখ নিয়ে ২০/৪০/৭০ কদম হাঁটহাঁটি করা বা জোরে কাশি দেওয়া অথবা উভয় পায়ে কেঁচি দেওয়া বা বেহায়াপনা।

(১৩) ৩টি অথবা ৭টি চিল্লা দিলে ১ হজ্জের সওয়ার হবে এমনটি মনে করা।

(১৪) সম্মিলিত যিকির বা যিকিরে নানা অঙ্গভঙ্গি করা।

(১৫) উত্তম যিকির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কে সংকুচিত করে শুধু আল্লাহ, আল্লাহ বলা বা শুধু ইল্লাল্লাহু বা হু হু করা ইত্যাদি।

(১৬) দোয়া গানজুল আরশ, দোয়া জামিলা, দোয়া সুরযানী, দোয়া আক্বাশাহ, দোয়া হিয়বুল বাহার, দোয়া আমন, দোয়ায়ে হাবীব, আহাদ নামা, দরুদে

তাজ, দুরূদে শাহী, দুরূদে তুনাঙ্গিনা, দুরূদে আকবর, হফত্ হায়কল শরীফ, চেহেল কাফ, কাদহে মুআয্যাম, শশ কুফল, ইত্যাদি ওযীফা সমূহ গুরুত্বের সহিত পড়া। এ সব ওযীফা আমাদের দেশে বাস, ট্রেন, গাড়ী ও সাধারণ দোকান গুলিতে খুবই স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায় যা সাদা-সিধে অজ্ঞ মুসলিম ভায়েরা ক্রয় করে থাকেন। প্রয়োজন বশত দুঃখ-মুসিবতের সময় কাজে লাগিয়ে থাকে। অথচ ইসলামে এর কোন ভিত্তি নেই এবং সম্পূর্ণ বিদ'আত।

নিম্নে উপরোক্ত বিষয়গুলো থেকে কয়েকটি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

(১) শবে মেরাজ এর রাত্রি উদযাপন করাঃ শবে মেরাজ এর রাত্রি উদযাপনের আলোচনা করার প্রাক্কালে আমাদের ইসরা ও মিরাজ সম্বন্ধে জানা অতীব জরুরী। তাই নিম্নে সংক্ষেপে এ বিষয়ে যৎসামান্য আলোচনা করা হলোঃ-

ইসরা ও মিরাজ পরিচিতি: ইসরা শব্দটির অর্থ রাতের সফর। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতের একাংশে মক্কার হারাম থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস এর এলাকায় যে সফর করানো হয়েছে সেটাকে ইসরা বলা হয়। আর মিরাজ হচ্ছে, উপরে আরোহন।

আল্লাহ তাঁর হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভূমি থেকে আকাশে আরোহণ করিয়ে প্রথম আকাশ থেকে শুরু করে সপ্তকাশ ভেদ

করে সিদরাতুল মুত্তাহা পেরিয়ে তাঁর নিজের কাছে ডেকে নিয়েছিলেন।
সেটাকেই মি'রাজ বলা হয়।

ইসরা ও মি'রাজের দলীল: ইসরার দলীল পবিত্র কুরআনের সূরা আল-ইসরা বা বনী ইসরাঈল এর ১ম আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

(سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بُرُكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝۱) [سورة بني إسرائيل: 1]

“পবিত্র ও মহান সে সত্ত্বা যিনি তাঁর বান্দাকে সফর করিয়েছেন রাতের একাংশে মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসার দিকে, যার চতুষ্পার্শ্বকে তিনি করেছেন বরকতময়। যাতে তিনি তাকে দেখাতে পারেন তাঁর নিদর্শনসমূহ। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। [আল-ইসরা:১]। আর মি'রাজের দলীল হচ্ছে, অন্য আয়াত যেখানে বলা হয়েছে,

(وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝۱۳ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝۱۴ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۝۱۵ إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۝۱۶ مَا رَأَى الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۝۱۷ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝۱۸) [سورة النجم: 13-18]

তাছাড়া হাদীসে এসেছে, বুখারীতে সাতটি বর্ণনা এবং মুসলিমে ছয়টি বর্ণনা ছাড়াও বহু হাদীসগ্রন্থে এটি এসেছে।

ইসরা ও মি'রাজের পটভূমি: নবুওয়তের দশম বৎসরে একের পর এক বিপদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে ধরে। রাসূলের চাচা আবু তালেব মারা যান; যিনি কাফের হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সার্বক্ষণিক নিজের তত্ত্বাবধানে রাখতেন। তাঁর

জীবদশায় কেউ তার কোন ক্ষতি করতে চাইলেও সক্ষম হত না। কিন্তু তার মৃত্যুর পর কাফেররা অত্যন্ত বেপরোয়া হয়ে উঠে। এর কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহাও মারা যান। যিনি শুধু রাসূলের স্ত্রীই ছিলেন না; বরং তার দাওয়াতের প্রধান সহযোগীও ছিলেন। তার সমস্ত সম্পত্তি রাসূলের জন্য অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তার উপর প্রথম ঈমান এনেছিলেন। এ পথে যত কষ্ট হয়েছে সবই সহ্য করেছেন। তাদের মৃত্যুর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসহায় বোধ করলেন।

তিনি বিভিন্ন গোত্রপতিদের কাছে নিজেকে পেশ করে বললেন, “কে আমাকে আশ্রয় দিবে যাতে আমি আমার রবের কথা প্রচার করতে পারি?” কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দিল না। এমতাবস্থায় তিনি তায়েফ গেলেন। সেখানে তায়েফের সর্দারদের কাছে তিনি একই কথা ব্যক্ত করলেন। তাদের কেউ তার কথায় কর্ণপাতই করল না। উপরন্তু তারা দুষ্ট শিশুদের তার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল। এমতাবস্থায় যা ঘটায় তা-ই ঘটল। তারা তাকে পাথর মেরে রক্তাক্ত করে দিল। তিনি মক্কায় ফিরে আসলেন। মহান আল্লাহ তাকে সম্মানিত করতে চাইলেন। তিনি তাকে ইসরা ও মি'রাজের মত বিরল সম্মানে সম্মানিত করলেন।

ইসরা ও মি'রাজের সংক্ষিপ্ত কাহিনীঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা শরীফের হিজর বা হাতীমে শোয়া ছিলেন। তার সাথে আরও দু'জন শোয়া ছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় তাদের নাম এসেছে, হামযাহ ও জা'ফর। এমতাবস্থায় তিন ফেরেশতা এসে বললেন, এদের মধ্যে কোনটি সে লোক? একজন বলল, মাঝখানে যিনি শুয়ে আছেন তিনি। তারপর তারা চলে গেলেন। পরবর্তী দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের সালাত আদায় করে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। এমতাবস্থায় ঘরের ছাদ ভেদ করে ফেরেশতাগণ অবতরণ করলেন। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যমযমের কাছে নিয়ে

গেলেন। তারপর তার “সাক্কুস সাদর” বা বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। তারপর তাকে যমযমের পানিতে ধুয়ে আবার যথাস্থানে লাগিয়ে দিয়ে বক্ষ মিলিয়ে দিলেন। এরপর বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে আকাশের দিকে যাত্রা করা হয়। সেখানে প্রথম আকাশে আদম, দ্বিতীয় আকাশে ঈসা ও ইয়াহইয়া, তৃতীয় আকাশে ইউসুফ, চতুর্থ আকাশে ইদরীস, পঞ্চম আকাশে হারুন, ষষ্ঠ আকাশে মুসা এবং সপ্তম আকাশে ইবরাহীম আলাইহিমুস সালাম এর সাথে সাক্ষাত করেন। সেখানে তিনি বাইতুল মা‘মুর দেখতে পেলেন। সেখানে তাকে দুধ, মধু ও মদ এ তিনপ্রকার পানীয় দেয়া হয়। তিনি দুধ পছন্দ করে নেন। তখন জিবরীল বললেন যে, আপনি স্বাভাবিক বিষয় গ্রহণ করতে সমর্থ হলেন। তারপর তিনি সিদরাতুল মুত্তাহায় নীত হলেন। তারপর এত উচুতে গেলেন যে, কলমের লিখার খসখস আওয়াজ শুনতে পেলেন। এরপর আল্লাহ তার ও তার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দিলেন। এরপর মুসা আলাইহিস সালাম এর কাছে আসার পর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাতের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে কমানোর আবেদন করার পরামর্শ দিলেন।

প্রথমে অর্ধেক, তারপর পাঁচ ওয়াক্ত পর্যন্ত কমানো হয়। অপর বর্ণনায়, প্রতিবারে পাঁচ, বর্ণনান্তরে দশ করে কমানোর পর সবশেষে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে এসে তা শেষ হয়। এরপর তিনি দুনিয়াতে ফেরত আসেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, সফরের শুরুতে বোরাক নিয়ে আসা হয়।

‘বোরাক’ বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে সফর করে। সেখানে তিনি নবীদের ইমামতি করেন। তারপর তাকে সেখানে তাকে দুধ মধু ও মদ এ তিনপ্রকার পানীয় দেয়া হয়। তিনি দুধ পছন্দ করে নেন। তখন জিবরীল বললেন যে, আপনি স্বাভাবিক বিষয় গ্রহণ করতে সমর্থ হলেন। তারপর তার জন্য মি‘রাজ বা সিড়ি নামিয়ে দেয়া হলে তিনি তাতে করে আকাশে গমন করলেন।...

ইসরা ও মি'রাজের ফলাফল: ইসরা ও মি'রাজের ফলাফল সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ-

১- ইসরা ও মি'রাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ তার রাসূলকে বান্দা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এটি সৃষ্টিজগতের কারও জন্য সবচেয়ে বড় পাওয়া। মহান আল্লাহ্ বলেন,

(سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝١) [سورة بني إسرائيل: 1]

২- ইসরা ও মি'রাজের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, নবীগণ সবাই বৈমাত্রের ভাই। তাদের মিশন একটিই সেটি হলো, একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত প্রতিষ্ঠা করা।

৩- রাতের একটি অংশে ইসরা ও মি'রাজ সংঘটিত হওয়ার মধ্যে এটাই উদ্দেশ্য যে, মহান আল্লাহ্ কাছে রাতের কাজই বেশী পছন্দ। কারণ তখন প্রকৃতি শান্ত থাকে। কাজে মন বসে। ইবাদতে একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা অর্জিত হয়।

৪- সূরা আল-ইসরার প্রথমে **سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ** বলার পরে নবম আয়াতে কুরআনের মাধ্যমে কারা হিদায়াত প্রাপ্ত হবে তাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এ দুয়ের মাঝখানে ইয়াহুদীদের উপর আপতিত শাস্তি ও তাদের জাতীয় চরিত্রের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, ইয়াহুদী ও নাসারাদের দীনের দাবী শেষ হয়ে গেছে এখন কুরআনের দিন এসেছে।

৫- ইসরা ও মি'রাজে নবীদের ইমামতির মাধ্যমে এ বিষয় প্রমাণিত হলো যে, সমস্ত নবীর নবুওয়তের মাধ্যমে প্রাপ্ত শরী'আত শেষ হয়েছে। এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়ত ও তারই শরীয়ত চলবে। আর তার শরীয়তই সর্বশেষ শরী'আত। তিনিই শেষ নবী ও রাসুল।

৬- দুই কেবলার ইমামতি ও নেতৃত্ব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার উম্মতদের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। এ দু'টির মালিকানা তাদেরই।

৭- এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, দুনিয়ার মানুষ আপনাকে সম্মান করতে কমতি করলেও আকাশে যারা আছে তারা আপনাকে সবচেয়ে বেশী সম্মানিত করে গ্রহণ করে নিচ্ছে। দুনিয়াতে মানুষের কর্মকাণ্ডে আপনি দুঃখিত হলেও আকাশে আপনাকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর জন্য অনেকেই রয়েছে। সর্বোপরি মহান আল্লাহ্ আপনাকে ছেড়ে যাবেন না।

৮- সালাত এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ রুকন যার ফরয হওয়ার ঘোষণা কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন। আর যা দুনিয়াতে ফরয না করে আকাশে প্রিয় নবীকে ডেকে এনে জানিয়ে দিয়েছেন। এটা যেন উম্মতের জন্য এক হাদীয়া। সে হাদীয়া যেন মাটিতে দেয়া যেত না, আকাশেই দিতে হবে।

৯- এর ফলে হিজরতের পথ প্রসারিত হলো, এর মাধ্যমে জানানো হলো যে, মূসা আলাইহিস সালামের উম্মতের চেয়েও তার উম্মত বেশী হবে। ফলে এর মাধ্যমে দাওয়াতের নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হবে এটাই বোঝা গেল।

১০- কারও রক্তচক্ষুর ভয় না করে হকের কথা বলতে সদা সচেষ্টি থাকা। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মে'রাজের কথা সবাইকে জানিয়েছিলেন। সুতরাং বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাও এর লক্ষ্য ছিল।

১১- কারা ঈমানদার ও কারা বেঈমান বা দুর্বল ইমানের অধিকারী সেটা পরিস্কার হয়ে যাওয়া। মহান আল্লাহ বলেন,

(وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْتَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ) [سورة بني إسرائيل: 60]

অর্থাৎ “আর আমরা আপনাকে যে দৃশ্য দেখিয়েছিলাম, তা তো কেবল মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যই”। [সূরা আল-ইসরা: ৬০] কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নতুন মিশনে যাচ্ছেন। সেখানে পাক্কা ইমানদারদের প্রয়োজন হবে।

১২- আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈমানের দৃঢ়তা এখানে প্রকাশ পেল। তিনি নির্দিধায় সেটার উপর ঈমান এনেছিলেন।

১৩- বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি কেমন হতে পারে সেটার এক নির্দেশনা পেলে মানুষের পক্ষে দ্বীন ও ঈমানের উপর মজবুতি আসবে।

১৪- দুধ পান করা ও মদ থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে ইসলাম যে স্বাভাবিক দ্বীন সেটা প্রমানিত হলো।

১৫- মাসজিদুল আকসা সমস্ত মুসলিমের সম্পদ। যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করেছেন। ইমামতি

করেছেন। আকাশে আরোহন করেছেন। সেখানে গেলে সওয়াব হওয়া কথা ঘোষণা করেছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বাইতুল মুকাদ্দাসের মুক্তির সাথেই মুসলিম উম্মাহর সম্মান ও প্রতিপত্তি নিহিত।

আমাদের করণীয়:

১- ঈমান বিল গায়েব। আবু বকরের মত ঈমানদার হওয়া। ইসরা ও মি'রাজের প্রমাণিত কোন কিছুকে অস্বীকার না করা। করলে কুফরী হবে।

২- সালাতের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া। কারণ, এ সালাত আকাশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকে সম্মানের সাথে প্রদান করা হয়েছে। দুনিয়ার কোন স্থানে বা অন্য কোন মাধ্যমে সেটা ফরয করা হয়নি।

৩- মি'রাজের রাত্রিতে পবিত্র কুরআনের সূরা আল-বাকারার শেষ দু'টি আয়াতও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করা হয়েছে। সে দু'টি আয়াত পাঠ করা এবং বাস্তব জীবনে সেগুলোর প্রচার ও প্রসার করা প্রয়োজন।

৪- বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত করার জন্য সচেষ্টিত থাকা।

যা করণীয় নয়:

১- যেহেতু এ রাত্রি নির্ধারণের ব্যাপারে সহীহ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি, সেহেতু তা নির্ধারণ থেকে বিরত থাকা।

২- শুধুমাত্র এ রাত্রিকে নির্ধারণ করে বা কেন্দ্র করে কোনো প্রকার ইবাদত করা।

৩- শুধুমাত্র এ রাত্রে বা এ দিনকে কেন্দ্র করে কোন সালাত বা সাওম রাখা।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মিরাজে গমণ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করা এবং রজব মাসের ২৭ তারিখের রাত্রিতে শবে মিরাজের নামে এ রাত্রি উয্যাপন করা ও এতে বিভিন্ন ইবাদতে লিপ্ত হওয়া বিদআত। এমনভাবে হিজরী নব বর্ষ পালন করা এবং এতে শুভেচ্ছা বিনিময় করার ক্ষেত্রে শরীয়তের কোন দলীল নাই^{৪৪}। তাছাড়া রজব মাস তথা শবে মেরাজ কে কেন্দ্র করে এবং ফজীলতপূর্ণ মনে করে এ মাসে বিভিন্ন ইবাদত করা বিদআত। এ মাসে ওমরাহ্ পালন করা। এটাকে রজবী ওমরাহ্ বলা হয়ে থাকে, বেশী করে নফল নামায পড়া এবং নফল রোযা রাখা, সবই বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা অন্যান্য মাসের উপর রজব মাসের আলাদা কোন ফজীলত নেই। এ মাসের ওমরাহ্, নামায, রোযা এবং অন্য কোন প্রকার ইবাদতে অন্য মাসের চেয়ে অতিরিক্ত কোন সওয়াব পাওয়া যায়না।^{৪৫}

নিম্নে রজব মাসকে কেন্দ্র করে কতিপয় যেসব নতুন আবিষ্কৃত আমল (বিদআত) পালিত হয় তা সংক্ষেপে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:-

^{৪৪} ইসরা ও মিরাজের ফলাফল – আবু মুহাম্মাদ যাকারিয়া, ইসলাম হাউজ।

^{৪৫} তথ্যসূত্রঃ ড: শাইখ সালেহ বিন ফাউযান (হাফিয়াহুল্লাহ)। অনুবাদক: শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী।

দাঈ ও শিক্ষক হিসেবে কর্মরত: জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সৌদী আরব।

১. রজব মাসের রোজাঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবাদের থেকে রজব মাসের রোজার ফজিলতের ব্যাপারে প্রামাণ্য কোন দলিল নেই। তবে অন্যান্য মাসের মত এ মাসেও, সপ্তাহের সোমবার, বৃহস্পতিবার, মাসের তেরো, চৌদ্দ, পনেরো তারিখ, একদিন রোজা রাখা, পরের দিন না রাখা- সওয়াবের, বৈধ ও সুন্নত। ওমর (রাঃ) রজব মাসের রোজা হতে নিষেধ করতেন। কারণ, এতে ইসলাম-পূর্ব কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাহেলি যুগের সাথে সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, রজবের নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট দিনের রোজা, কিংবা রজবের নির্দিষ্ট কোন রাতের রোজার ব্যাপারে প্রমাণ যোগ্য কোন সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়নি। যে কয়টি সুস্পষ্ট অর্থবহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তা দুভাগে বিভক্ত। জইফ বা দুর্বল, মওজু বা (বানোয়াট) জাল হাদিস। তিনি সব কয়টি হাদীস একত্র করেছেন, দেখা গেছে, ১১টি দুর্বল হাদিস, ২১টি জাল হাদীস।

ইবনে কাইয়ুম (রহঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাগাতার তিন মাস (রজব, শাবান, রমজান) রোজা রাখেননি-যেমন কিছু লোক করে থাকে। রজবে কখনো রোজা রাখেননি, রোজা পছন্দও করেননি। লাজনায়ে দায়েমার ফতওয়াতে আছে, রজবের কতক দিনকে রোজার জন্য নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে আমাদের কোন দলিল জানা নেই।

২. রজব মাসে ওমরাঃ কোন হাদিসে প্রমাণ নেই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রজব মাসে ওমরা করেছেন। এ জন্য নির্দিষ্ট ভাবে রজবে

ওমরা করা কিংবা এতে ওমরার বিশেষ ফজিলত আছে-বিশ্বাস করা বেদআত।

শায়েখ মুহাম্মাদ ইব্রাহিম (রহঃ) তার ফতওয়াতে বলেন, রজব মাসকে জিয়ারত ইত্যাদির মত আমল দ্বারা নির্দিষ্ট করার পিছনে কোন মৌলিক ভিত্তি নেই। কারণ, ইমাম আবু শামা স্বীয় কিতাবে **كتاب البدع والحوادث** প্রমাণ করেছেন, শরীয়তকে পাশ কাটিয়ে বিশেষ কোন সময়ের সাথে কোন এবাদত নির্দিষ্ট করা অনুচিত, অবৈধ। কারণ, শরীয়ত কর্তৃক বিশেষ কিংবা সাধারণ আমলের জন্য কোন সময় নির্ধারণ করণ ব্যতীত, সব দিন-ক্ষণ-সময় সমান মর্যাদার। এ জন্যই ওলামায়ে কেরাম রজব মাসে বেশি বেশি ওমরা করতে নিষেধ করেছেন। তবে কেউ যদি স্বাভাবিক নিয়মে (ফজিলতের বিশ্বাস বিহীন) রজব মাসে ওমরা করে, তাতে দোষ নেই। কারণ, এ সময়েই তার জন্য ওমরা করার সুযোগ হয়েছে।

৩. সালাতে রাগায়েবঃ হাদীস শাস্ত্রে কতিপয় মিথ্যাচারের দ্বারা এ নামাজের সূচনা হয়। এ নামাজ রজবের প্রথম রাতে পড়া হয়। এ ব্যাপারে ইমাম নববি রহ. বলেন, এটি নিন্দনীয়, ঘৃণিত, জঘন্যতম বেদআত। যা কয়েকটি অপরাধ ও নিষিদ্ধ কর্মের সমন্বয়ে রচিত। সুতরাং একে পরিত্যাগ করা, এর থেকে বিরত থাকা এবং এর সম্পাদনকারীকে নিষেধ করা কর্তব্য।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, ইমাম মালেক, শাফি, আবু হানিফা, সাওরি, লাইস প্রমুখের মতে সালাতে রাগায়েব বেদআত। হাদিস বিশারদগণের দৃষ্টিতে এ ব্যাপারে বর্ণিত সকল হাদিস জাল, বানোয়াট।

৪. রজব মাসের ২৭ তারিখ রজনী লাইলাতুল মিরাজ মনে করে জমায়েত হওয়া ও মাহফিল করাঃ মেরাজের রজনী কিংবা মেরাজের মাস নির্ধারণের ব্যাপারে কোন প্রমাণ দাঁড় করানো সম্ভব হয়নি। এ নিয়ে অনেক মতভেদ আছে, সত্য অনুদ্ব্যটিত। তাই এ ক্ষেত্রে নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয়। মেরাজের রজনী নির্দিষ্ট করণের ব্যাপারে কোন বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত হয়নি। যা বিদ্যমান আছে, সব জাল, ভিত্তিহীন। (বেদায়া নেহায়া ২:১০৭, মাজমুউল ফতওয়া ২৫:২৯৮) অতএব এ রাতে অতিরিক্ত এবাদত ধার্য করা, যেমন রাত জাগা, দিনে রোজা রাখা, অথবা ঈর্ষা, উল্লাস প্রকাশ করা, নারী-পুরুষ অবাধ মেলা-মেশা, গান-বাদ্যসহ মাহফিলের আয়োজন করা, যা বৈধ, শরিয়ত কর্তৃক স্বীকৃত ঈদেও না-জায়েজ-হারাম, এখানের তো বলার অপেক্ষা রাখে না। উপরন্তু মেরাজ রাত্রি ঐতিহাসিকভাবেও সুনির্দিষ্ট নয়। প্রমাণিত মনে করলেও এতে মাহফিল করার কোন জো নেই। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম এবং আদর্শ পূর্বসূরীগণ হতে এ ব্যাপারে কোন দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়নি।

৫. রজব মাসে গুরুত্বসহকারে কবর জিয়ারত করাঃ এটিও বেদআত। কারণ, কবর জিয়ারত বছরের যে কোন সময় হতে পারে।

৬. রজব মাসে পশু জবাই বা এ জাতীয় কিছু উৎসর্গ করাঃ জাহিলিয়াতে রজব মাসকে নির্দিষ্ট করে এ ধরনের আমল সম্পাদন করা হত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা নিষেধ করেন। ইমাম ইবনে রজব বলেন, রজব মাসে পুণ্য মনে করে জবাই করা, ঈদ-উৎসব উদযাপন করার মত।

অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, রজব মাসের প্রথম জুমু‘আর রাতে অথবা ২৭শে রজব যে বিশেষ শবে মি‘রাজের সালাত ও বিদআত সাব্যস্ত হয়ে থাকে। কারন হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, “সালাফে সালাহীন তথা সাহাবায়ে কিরাম, ও তাবেরীন যদি কোন বাধা না থাকা সত্ত্বেও কোন ইবাদাতের কাজ করা কিংবা বর্ণনা করা অথবা লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত থেকে থাকেন, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে তাদের বিরত থাকার কারণে প্রমাণিত হয় যে, কাজটি তাদের দৃষ্টিতে শরীয়তসিদ্ধ নয়। কারণ তা যদি শরীয়তসিদ্ধ হত তাহলে তাদের জন্য তা করার প্রয়োজন বিদ্যমান ছিল। তা সত্ত্বেও যেহেতু তারা কোন বাধা বিপত্তি ছাড়াই উক্ত আমল ত্যাগ করেছেন, তাই পরবর্তী যুগে কেউ এসে সে ‘আমাল বা ইবাদাত প্রচলন করলে তা হবে বিদআত। হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, “যে সকল ইবাদাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম এর সাহাবাগণ করেন নি তোমরা সে সকল ইবাদাত কর না।”

শবে মেরাজের সালাত প্রসঙ্গেঃ ইমাম ইযযুদীন ইবনু আব্দুস সালাম (রহঃ) এ প্রকার সালাত এর বৈধতা অস্বীকার করে বলেন, “এ প্রকার সালাত যে বিদআত তার একটি প্রমাণ হলো দ্বীনের প্রথম সারির ‘উলামা ও মুসলমানদের ইমাম তথা সাহাবায়ে কিরাম, তাবেরীন, তাবে তাবেরীন ও শরীয়াহ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নকারী বড় বড় ‘আলিমগণ মানুষকে ফরয ও সুন্নাত বিষয়ে জ্ঞান দানের প্রবল আগ্রহ পোষণ করা সত্ত্বেও তাদের কারো কাছ থেকে এ সালাত সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় নি এবং কেউ তাঁর নিজ গ্রন্থে এ সম্পর্কে কিছু লিপিবদ্ধও করেন নি ও কোন বৈঠকে এ বিষয়ে কোন আলোকপাতও করেননি।

বাস্তবে এটা অসম্ভব যে, এ সালাত আদায় শরীয়তে সুন্নাত হিসেবে বিবেচিত হবে অথচ দ্বীনের প্রথম সারির ‘আলিমগণ ও মু’মিনদের যারা আদর্শ, বিষয়টি তাদের সকলের কাছে থেকে যাবে সম্পূর্ণ অজানা”। [তথ্যসূত্রঃ আত তারগীব ‘আন সলাতির রাগাইব আল মাওদুয়া, পৃঃ ৫-৯]^{৯০}

রজব মাসে করণীয় ও বর্জনীয়ঃ নিজের কিংবা অন্যের উপর জুলুম করা হতে বিরত থাকা, যার অর্থ – ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা, বেশি বেশি নেক আমল করা, আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষিত ও নিষিদ্ধ বিষয় বস্তু পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ নিখাদ তওবা করা, আল্লাহ তাআলার শরণাপন্ন হওয়া, রমজান মাসের ভাগ্যবান ও লাইলাতুল কদরের মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়া।

রজব সংক্রান্ত প্রচলিত যঈফ হাদীসসমূহ - পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

প্রথমতঃ রজবের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে ইবন হাজার (রহঃ) এর বক্তব্য মূলনীতির ন্যায়।

ইবন হাজার (রহঃ) বলেন, রজব মাসের ফযীলত, রজব মাসের রোযার ফযীলত বা রজব মাসের নির্দিষ্ট কোন দিনের রোযার ফযীলত বা রজবের নির্দিষ্ট কোন রাতে সালাতের ফযীলত সম্পর্কে বিশুদ্ধ কোন হাদীস নেই যা প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো যায়। (তথ্যসূত্রঃ রজব সংক্রান্ত প্রচলিত হাদীসসমগ্র : একটি পর্যালোচনা - সানাউল্লাহ নজির আহমদ, সম্পাদনা : মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক আলী হাসান তৈয়ব, ইসলাম হাউজ, পৃষ্ঠা নং -

^{৯০} আত তারগীব ‘আন সলাতির রাগাইব আল মাওদুয়া, পৃঃ ৫-৯

৩ - ১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)^{৯১}। হাফেজে হাদীস আবু ইসমাইল আল-হিরাবী আমার পূর্বেই এ ব্যাপারে অনুরূপ মত খুব দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন, ইতিপূর্বে বিশুদ্ধ সূত্রে যার বর্ণনা আমরা দিয়েছি। তিনি আরো বলেছেন, যেসব হাদীস রজবের ফযীলত বা রজবের রোযার ফযীলত বা রজবের নির্দিষ্ট কোন দিনের রোযার ফযীলতের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা দুপ্রকারঃ

(ক) দুর্বল (খ) জাল বা বানোয়াট। আমরা এখানে দুর্বল হাদীসগুলোর উল্লেখ করব আর জাল বা বানোয়াট হাদীসগুলোর প্রতি সামান্য ইঙ্গিত দেব। [দেখুনঃ হাফেজ ইবন হাজার রচিত ‘তাবইনুল উজব ফিমা ওরাদা ফী ফাজলে রজব’ (পৃষ্ঠাঃ ৬ ও ৮) এবং আল্লামা শাকিরী রচিত ‘কিতাবুস সুনান ওয়াল মুবতাদিআত’ (পৃষ্ঠাঃ ১২৫)]^{৯২}

দ্বিতীয়তঃ এখন লক্ষ্য করুন দুর্বল হাদীসগুলো, যা মানুষের মুখে, সভা ও মাহফিলে বারবার উচ্চারিত হয়, অথচ তা বিশুদ্ধ সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। যেমনঃ-

১. হাদীসঃ

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي رَمَضَانَ

^{৯১} রজব সংক্রান্ত প্রচলিত হাদীসসমগ্র : একটি পর্যালোচনা - সানাউল্লাহ নজির আহমদ, সম্পাদনা :

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক আলী হাসান তৈয়ব, ইসলাম হাউজ, পৃষ্ঠা নং - ৩ - ১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

^{৯২} দেখুনঃ হাফেজ ইবন হাজার রচিত ‘তাবইনুল উজব ফিমা ওরাদা ফী ফাজলে রজব’ (পৃষ্ঠাঃ ৬ ও ৮)

এবং আল্লামা শাকিরী রচিত ‘কিতাবুস সুনান ওয়াল মুবতাদিআত’ (পৃষ্ঠাঃ ১২৫)

অর্থঃ হে আল্লাহ, রজব ও শাবান মাসে আমাদের বরকত দান করুন এবং রমজান পর্যন্ত পোঁছার তাওফীক দান করুন। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ তার মুসনাদ গ্রন্থে এবং ইমাম তাবরানী তার আওসাত গ্রন্থে। হায়সামী (রহ). বলেন, এ হাদীসটি বাযযার বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের একজন রয়েছেন জায়েদা বিন আবি রাকাদ, তার ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, মুনকারুল হাদীস।

ইবন হাজার (রহঃ) স্বয়ং ইমাম বুখারী থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেন, যার ব্যাপারে আমি মুনকারুল হাদীস বলব, তার হাদীস গ্রহণ করা বৈধ নয়। [দেখুনঃ ‘আলফায় ও ইবারাতুল জারহি ওয়াত-তা‘দিল বাইনাল ইফরাদ ওয়াত-তাকরীর ওয়াত-তারকীব’: ২৬৭]। হাদীস বর্ণনাকারীদের বৃহৎ একটি জামাত তাকে অখ্যাত বলেছেন। অখ্যাত বলার অর্থও তার হাদীস দুর্বল। খুব যাচাই বাছাই করে প্রমাণিত হলে গ্রহণ করা যায়। দেখুনঃ মাজমাউয - যাওয়ায়েদঃ ২/১৬৫, প্রকাশকঃ দারুল-রাইয়ান, সনঃ ১৪০৭ হিঃ)। ইমাম নববী (রহঃ) তার ‘আযকার’ নামক গ্রন্থে এ হাদীসটি দুর্বল বলেছেন। ইমাম যাহাবী (রহঃ) ও তাঁর রচিত মিয়ান (খ. ৩, পৃ. ৯৬, মুদ্রণঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, সনঃ ১৯৯৫ ইং) গ্রন্থে এ হাদীসটি দুর্বল বলেছেন।

২. হাদীসঃ

فَضْلُ شَهْرِ رَجَبٍ عَلَى الشُّهُورِ كَفَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ

অর্থঃ রজব মাসের ফযীলত অন্যসব মাসের তুলনায় তেমন, যেমন কুরআনের ফযীলত অন্যসব কালামের ওপর। এ হাদীসের ব্যাপারে ইবন

হাজার (রহঃ) বলেছেন, এটা জাল ও বানোয়াট। দেখুনঃ ‘আজলুনী কর্তৃক রচিত কিতাব ‘কাশফুল খাফা’ (খ. ২, পৃঃ ১১০, প্রকাশকঃ মুআসসাসাতুর-রিসালা, সনঃ ১৪০৫ হিঃ) এবং আলী ইবন সুলতান আল-কারী কর্তৃক রচিত, কিতাব আল-মাসনু’ (খ. ১, পৃঃ ১২৮, প্রকাশকঃ মাকতাবাতুর রুশদ, সনঃ ১৪০৪ হিঃ)

৩. হাদীসঃ

إِنَّ شَهْرَ رَجَبٍ شَهْرُ اللَّهِ وَشَعْبَانَ شَهْرِي، وَرَمَضَانَ شَهْرُ أُمَّتِي

অর্থঃ রজব আল্লাহর মাস, শাবান আমার মাস আর রমযান আমার উম্মতের মাস।

এ হাদীসটি দায়লামী (রহঃ) ও আরো কতক মুহাদ্দিস, সাহাবী আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনুল জাওয়ী (রহঃ) এ হাদীসটি তার রচিত জাল হাদীস সমগ্র কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এ হাদীস বর্ণনার বেশ কয়েকটি সূত্র পর্যালোচনা করার পর।

তদ্রূপ হাফেজ ইবন হাজার (রহঃ) ও এ হাদীসটি তার রচিত ‘তাবইনুল উজব ফিমা অরাদা ফী রজব’ কিতাবে জাল বলেছেন। দেখুনঃ ইমাম মুনাবী (রহঃ) রচিত ‘ফয়যুল কাদীর’ (খ. ৪, পৃ. ১৬২ ও ১৬৬, প্রকাশকঃ মাকতাবা তিজারিয়া কুবরা, সনঃ ১৩৫৬ হিঃ)

৪. হাদীসঃ

لا تَغْفُلُوا عَنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ فِي رَجَبٍ فَإِنَّهَا لَيْلَةٌ تُسَمِّيهَا الْمَلَائِكَةُ الرَّغَائِبَ

অর্থঃ রজবের প্রথম জুমার ব্যাপারে তোমরা উদাসীন থেকে না, কারণ, তা এমন একটি রাত, ফেরেশতারা যার নামকরণ করেছে রাগায়েব হিসেবে ...। এটা দীর্ঘ হাদীস, এর মাধ্যে আরো মিথ্যাচার রয়েছে। দেখুনঃ আজলুনী কর্তৃক রচিত ‘কাশফুল খাফা’ গ্রন্থ। (খ. ১, পৃ. ৯৫, প্রকাশকঃ মুআসসাসাতুর রিসালা, সনঃ ১৪০৫ হিঃ) ইমাম ইবনুল কায়্যিম রচিত ‘আল-মানারুল মুনীফ’ গ্রন্থ, (খ. ১, পৃঃ ৮৩, প্রকাশকঃ দারুল কাদেরী, সনঃ ১৪১১ হিঃ)

৫. হাদীসঃ

رَجَبٌ شَهْرٌ عَظِيمٌ، يُضَاعَفُ اللَّهُ فِيهِ الْحَسَنَاتِ، فَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبٍ « فَكَأَنَّمَا صَامَ سَنَةً، وَمَنْ صَامَ مِنْهُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ غُلِقَتْ عَنْهُ سَبْعَةُ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ صَامَ مِنْهُ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ فَتَحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ صَامَ مِنْهُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَمَنْ صَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا نَادَى مُنَادٌ فِي السَّمَاءِ قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى فَاسْتَنْفِ الْعَمَلَ، وَمَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَفِي رَجَبٍ حَمَلَ اللَّهُ نُوحًا فِي السَّفِينَةِ فَصَامَ رَجَبًا، وَأَمَرَ مَنْ مَعَهُ أَنْ يَصُومُوا، فَجَرَبَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ سَنَةً أَشْهُرَ، آخِرُ ذَلِكَ يَوْمٌ عَاشُورَاءُ أَهْبَطَ عَلَى الْجُودِيِّ فَصَامَ نُوحٌ وَمَنْ مَعَهُ وَالْوَحْشُ شُكْرًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَفِي يَوْمٍ عَاشُورَاءَ أَفْلَقَ اللَّهُ الْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَفِي يَوْمٍ عَاشُورَاءَ تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مَدِينَةِ يُونُسَ، وَفِيهِ وَلِدَ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »

অর্থঃ রজব মাস একটি মহৎ মাস। আল্লাহ তা‘আলা এতে নেকীর পরিমাণ খুব বৃদ্ধি করেন। যে ব্যক্তি রজবের একদিন রোযা রাখল, সে প্রায় এক বৎসর রোযা রাখল। যে ব্যক্তি রজবে সাত দিন রোযা রাখবে, তার জন্য জাহান্নামের সাতটি দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি রজবের আট দিন রোযা রাখবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা সুসজ্জিত করা হবে। যে ব্যক্তি রজবের দশ দিন রোযা রাখবে, সে যা চাইবে আল্লাহ তাকে তাই দেবেন। যে ব্যক্তি রজবের পনের দিন রোযা রাখবে, তাকে আসমান থেকে একজন ঘোষণাকারী বলবে, আল্লাহ তোমার পিছনের সব কিছু মাফ করে দিয়েছেন, তুমি নতুন করে আমল কর। আর যে আরো বেশি রোযা রাখবে আল্লাহ তাকে আরো বেশি দেবেন।

এ রজব মাসেই আল্লাহ নূহ (আ.) কে নৌকায় আরোহন করিয়েছেন। তিনি রজব মাসে রোযা রাখেন এবং যারা তার সঙ্গে ছিল তাদেরকেও তিনি রোযা রাখার নির্দেশ দেন। যার ফলে সাত মাস পানিতে নৌকা বিচরণ করে, যার সর্বশেষ দিন হচ্ছে আশুরা। তারা জুদি পাহাড়ে অবতরণ করেন। অতঃপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার জন্য নূহ (আ.) রোযা রাখেন এবং যারা তার সঙ্গে ছিল তারা, এমনকি অন্যান্য জীবজন্তুও।

আশুরার দিন আল্লাহ তা‘আলা বনী ইসরাইলের জন্য সমুদ্র বিদীর্ণ করেছিলেন। এ আশুরার দিনই আল্লাহ তা‘আলা আদম (আঃ) এর তওবা ও নবী ইউনুস (আঃ) -এর সম্প্রদায়ের তওবা কবুল করেছেন এবং আশুরাতেই ইবরাহীম (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেছেন।

যাহাবী (রহঃ) বলেছেন, এ হাদীস বাতিল ও ভ্রান্ত, এর সনদ অস্পষ্ট।
হায়সামী (রহঃ) বলেছেন, এ হাদীস তাবরানী তার ‘কাবীর’ গ্রন্থে উল্লেখ
করেছেন। এ হাদীসের সনদে আব্দুল গাফুর নামক একজন বর্ণনাকারী
রয়েছে যে মুহাদ্দিসীনের নিকট পরিত্যক্ত। [দেখুনঃ ইমাম যাহাবী রচিত
‘মীযান’ গ্রন্থ। (খ. ৫, পৃ. ৬২, প্রকাশকঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, সনঃ
১৯৯৫ ই.) ইমাম হায়সামী রচিত ‘মাজমাউয-যাওয়ায়েদ’ গ্রন্থ। (খ. ৩, পৃঃ
১৮৮, প্রকাশকঃ দারুল রাইয়ান, সনঃ ১৪০৭ হিঃ)]^{৭৩}।

৬. (ক) রজবের প্রথম জুমার রাতে প্রচলিত সালাতে রাগায়েবের ব্যাপারে
যত হাদীস রয়েছে, তা সব বাতিল ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
এর ওপর মিথ্যাচার।

(খ) রজবের রোযা বা রজবের কতক রাতের নির্দিষ্ট রোযার ব্যাপারে যেসব
হাদীস রয়েছে, তার সব মিথ্যা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
ওপর মিথ্যাচার।

(গ) রজব মাসের প্রথম রাতে মাগরিবের পর যে ব্যক্তি বিশ রাকাত সালাত
পড়বে, সে নাপাকবিহীন পুলসিরাত পার হবে।

^{৭৩} দেখুনঃ ইমাম যাহাবী রচিত ‘মীযান’ গ্রন্থ। (খ. ৫, পৃ. ৬২, প্রকাশকঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, সনঃ
১৯৯৫ ই.) ইমাম হায়সামী রচিত ‘মাজমাউয-যাওয়ায়েদ’ গ্রন্থ। (খ. ৩, পৃঃ ১৮৮, প্রকাশকঃ দারুল
রাইয়ান, সনঃ ১৪০৭ হিঃ)

(ঘ) যে ব্যক্তি রজবের কোন একদিন রোযা রাখল এবং তাতে দুরাকাত সালাত আদায় করল, যার প্রথম রাকাতে একশতবার আয়াতুল কুরসী পড়ল ও দ্বিতীয় রাকাতে একশত বার সুরায়ে ইখলাস পড়ল, সে জান্নাতে তার স্থান না দেখে মারা যাবে না।

(ঙ) যে রজব মাসে রোযা রাখল, সে ..., সে ...। ইমাম ইবনুল কায়্যিম (মৃতঃ ৬৯১ হি.) বলেন, এসব হাদীস মিথ্যা ও বানোয়াট। [দেখুনঃ ইবনুল কায়্যিম রচিত ‘আল-মানারুল মুনীফ’ (খ. ১, পৃ. ৮৩-৮৪, প্রকাশকঃ দারুল কাদেরী, সনঃ ১৪১১ হিঃ)]^{৯৪}।

৭. হাদীসঃ

« مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِ حَرَامِ الْخَمِيسِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ كُتِبَتْ لَهُ عِبَادَةٌ سَبْعِمِائَةِ سَنَةٍ »

অর্থঃ যে ব্যক্তি সম্মানিত মাসে (ফিলকদ, ফিলহজ, মুহাররম ও রজব) বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার তিনটি রোযা রাখবে, আল্লাহ তাকে সাত শত বৎসরের ইবাদত দেবেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তাকে ষাট বৎসরের ইবাদত দেবেন।

তাবরানী তার আওসাদ (খ. ২, পৃ. ২১৯, প্রকাশকঃ দারুল হারামাইন, সনঃ ১৪১৫ হি.) গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি

^{৯৪} ইবনুল কায়্যিম রচিত ‘আল-মানারুল মুনীফ’ (খ. ১, পৃ. ৮৩-৮৪, প্রকাশকঃ দারুল কাদেরী, সনঃ ১৪১১ হিঃ)

মাসলামা থেকে একমাত্র ইয়াকুব বর্ণনা করেছে এবং তার থেকে শুধু মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া বর্ণনা করেছে। হায়সামী (রহঃ) বলেছেন, এ হাদীসটি তাবরানী তার আওসাত গ্রন্থে ইয়াকুব বিন মুসা আল-মাদানি থেকে বর্ণনা করেছেন, সে বর্ণনা করেছে মাসলামা থেকে। বর্ণনাকারী ইয়াকুব মুহাদ্দিসীনের নিকট অখ্যাত। আর মাসলামার পুরো না হচ্ছে মাসলামা বিন রাশেদ আল-হামানি। তার ব্যাপারে ইমাম হাতেম বলেছেন, সে হাদীসের ব্যাপারে দুদোল্যমান। ইমাম আযদী বলেছেন, সে হাদীসের ব্যাপারে খুবই দুর্বল, তার হাদীস দলিলের উপযুক্ত নয়। [দেখুনঃ মাজমাউজ জাওয়ায়েদ (খ. ৩, পৃ. ১৯১, প্রকাশকঃ দারুল রাইয়ান, সনঃ ১৪০৭)]^{৭৫}।

ইবন জাওয়াযী (রহঃ) তাঁর রচিত ‘আল-ইলাল আল-মুতানাহিয়াহ’ (খ. ২, পৃ. ৫৫৪, প্রকাশকঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, সনঃ ১৪০৩ হিঃ) গ্রন্থে এ হাদীসটি বিশুদ্ধ নয় বলে প্রমাণ করেছেন।

৮. হাদীসঃ

صَوْمُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ كَفَّارَةٌ ثَلَاثَ سِنِينَ، وَالثَّانِي كَفَّارَةٌ سَنَتَيْنِ، وَالثَّالِثُ
كَفَّارَةٌ سَنَةٍ ثُمَّ كُلُّ يَوْمٍ شَهْرًا

অর্থঃ রজব মাসের প্রথম রোযা তিন বৎসরের কাফ্ফারা স্বরূপ। দ্বিতীয় দিনের রোযা দুই বছরের কাফ্ফারা স্বরূপ। অতঃপর প্রত্যেক দিনের রোযা এক মাসের কাফ্ফারা স্বরূপ। [দেখুনঃ মুনাবী রচিত ‘ফায়জুল বারী’ গ্রন্থ।

^{৭৫} মাজমাউজ জাওয়ায়েদ (খ. ৩, পৃ. ১৯১, প্রকাশকঃ দারুল রাইয়ান, সনঃ ১৪০৭)

(খ. ৪, পৃ. ২১০, প্রকাশকঃ মাকতাবা তিজারিয়া কুবরা, সনঃ ১৩৫৬ হিঃ)]^{৯৬}।

৯. ইমাম ‘আজলুনী (রহঃ) বলেন, আরেকটি বানোয়াট হাদীস হচ্ছে, রজবের প্রথম জুমার রাতে বানোয়াট সালাত। যার নামকরণ করা হয়েছে সালাতে রাগায়েব হিসেবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ও মুহাদ্দিসীদের নিকট এর কোন ভিত্তি নেই। দেখুনঃ তার রচিত ‘কাশফুল খাফা’ (খ. ২, পৃ. ৫৬৩, প্রকাশকঃ মুআসসাসাতুর রিসালা, সনঃ ১৪০৫ হিঃ)

১০. হাফেযে হাদীস আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবু বকর দিমাশকী (মৃত : ৬৯১ হিঃ) বলেছেন, রজব মাসে রোযার ব্যাপারে ও তার বিশেষ রাতের সালাতের ব্যাপারে যে হাদীস রয়েছে, তা সব মিথ্যা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অপবাদ। তার মধ্যে একটি হাদীস যেমন, যে ব্যক্তি রজবের প্রথম রাতে বিশ রাকাত সালাত আদায় করবে, সে নাপাকবিহীন পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। দেখুনঃ ‘আল-মানার আল-মুনিফ গ্রন্থ। (খ. ১, পৃ. ৯৬, প্রকাশকঃ মাকতাবা মাতবুআতুল ইসলামিয়া, সনঃ ১৪০৩ হিঃ)।

আল্লাহ ভাল জানেন। সমস্ত প্রসংশা তার জন্য এবং সালাত ও সালাম নাজিল হোক তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তার বংশধর, সাহাবা ও সবার ওপর।

^{৯৬} মুনাব্বী রচিত ‘ফায়জুল বারী’ গ্রন্থ। (খ. ৪, পৃ. ২১০, প্রকাশকঃ মাকতাবা তিজারিয়া কুবরা, সনঃ ১৩৫৬ হিঃ)

(২) মাহে শাবান ও শবে বরাত (شب براءت) করণীয় ও বর্জনীয় -

শবে বরাত আভিধানিক অর্থ অনুসন্ধানঃ শব ফারসী শব্দ। অর্থ রাত বা রজনী। বরাত শব্দটিও মূলে ফারসি। অর্থ ভাগ্য। দুশব্দের একত্রে অর্থ হবে, ভাগ্য-রজনী। বরাত শব্দটি আরবী ভেবে অনেকেই ভুল করে থাকেন। কারণ বরাত বলতে আরবী ভাষায় কোন শব্দ নেই। যদি বরাত শব্দটি আরবী বারাআত শব্দের অপভ্রংশ ধরা হয় তবে তার অর্থ হবে—সম্পর্কচ্ছেদ বা বিমুক্তিকরণ। কিন্তু কয়েকটি কারণে এ অর্থটি এখানে অগ্রাহ্য, মেনে নেয়া যায় নাঃ

১. আগের শব্দটি ফারসি হওয়ায় বরাত শব্দটিও ফারসি হবে, এটাই স্বাভাবিক

২. শাবানের মধ্যরজনীকে আরবি ভাষার দীর্ঘ পরম্পরায় কেউই বারা'আতের রাত্রি হিসাবে আখ্যা দেননি।

৩. রমযান মাসের লাইলাতুল ক্বাদরকে কেউ-কেউ লাইলাতুল বারাআত হিসাবে নামকরণ করেছেন, শাবানের মধ্য রাত্রিকে নয়।

মূলতঃ আরবী ভাষায় এ রাতটিকে লাইলাতুন নিছফি মিন শাবান শাবান মাসের মধ্য রজনী — হিসাবে অভিহিত করা হয়। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, যেমন কুরআন মাজীদে সূরা বারায়াত রয়েছে যা সূরা তাওবা নামেও পরিচিত। ইরশাদ হয়েছেঃ

بِرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

অর্থঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা। (সূরা তাওবা, আয়াত নং - ১)^{৭৭}। এখানে বারায়াতের অর্থ হল সম্পর্ক ছিন্ন করা। ‘বারায়াত’ মুক্তি অর্থেও আল-কুরআনে এসেছে যেমনঃ

أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكَمْ أَمْ لَكُمْ بِرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ

অর্থঃ তোমাদের মধ্যকার কাফিররা কি তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? না কি তোমাদের মুক্তির সনদ রয়েছে কিতাবসমূহে? (সূরা কামার, আয়াত নং - ৩৪)^{৭৮}।

আর ‘বারায়াত’ শব্দটি যদি ফারসী শব্দ ধরা হয় তাহলে উহার অর্থ হবে সৌভাগ্য।

অতএব শবে বরাত শব্দটার অর্থ দাড়ায় মুক্তির রজনী, সম্পর্ক ছিন্ন করার রজনী। অথবা সৌভাগ্যের রাত, যদি ‘বরাত’ শব্দটিকে ফার্সী শব্দ ধরা হয়।

শবে বরাত শব্দটাকে যদি আরবীতে তর্জমা করতে চান তাহলে বলতে হবে ‘লাইলাতুল বারায়াত’। এখানে বলে রাখা ভাল যে এমন অনেক শব্দ আছে যার রূপ বা উচ্চারণ আরবী ও ফারসী ভাষায় একই রকম, কিন্তু অর্থ ভিন্ন। যেমন ‘গোলাম’ শব্দটি আরবী ও ফারসী উভয় ভাষায় একই রকম লেখা হয় এবং একইভাবে উচ্চারণ করা হয়। কিন্তু আরবীতে এর অর্থ হল

^{৭৭} সূরা তাওবা, আয়াত নং - ১

^{৭৮} সূরা কামার, আয়াত নং - ৩৪

কিশোর আর ফারসীতে এর অর্থ হল দাস। সার কথা হল ‘বারায়াত’ শব্দটিকে আরবী শব্দ ধরা হলে এর অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ বা মুক্তি। আর ফারসী শব্দ ধরা হলে এর অর্থ হবে সৌভাগ্য। অতএব, হিজরী সনের ৮ম মাস হচ্ছে শাবান মাস। তার পরই আসে বছরের শ্রেষ্ঠ রামাযান মাস। সে হিসেবে মুসলিমের জীবনে এ মাসের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। দীর্ঘ টানা একমাস তাকে সিয়াম সাধনা করতে করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন মানসিক, শারিরিক ও আর্থিক প্রস্তুতি।

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাযানে প্রস্তুতি স্বরূপ অন্য মাসের তুলনায় শাবান মাসে বেশী বেশী নফল রোযা রাখতেন।

শাবান মাসে রোজা রাখার বিধানঃ

কুতায়বা (রহঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا " . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ . وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُفْطِرًا فَإِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْءٌ أَخَذَ فِي الصَّوْمِ لِحَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُشَبِّهُ قَوْلَهُمْ حَيْثُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَقْدَمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ " . وَقَدْ دَلَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْكَرَاهِيَّةَ عَلَى مَنْ يَتَعَمَّدُ الصِّيَامَ لِحَالِ رَمَضَانَ .

যখন শাবান মাসের অর্ধেক অতিবাহিত হয় তখন তোমরা রোযা রেখোনা।
(আবু দাউদ হাদীস -৩২৩৭, তিরমিযী হাদীস ৭৩৮, ইবনে মাযা হাদীস -
১৬৫১)

আল্লামা আলবানী (রহ.) সহীহ তিরমিযী নামক কিতাবে হাদিসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। (পৃ: ৫৯০)

হাদীসটি দ্বারা সুপষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, শাবানের পনের দিনঅতিবাহিত হওয়ার পর ১৬ তারিখ থেকে রোযা রাখা নিষিদ্ধ। (তথ্যসূত্রঃ শাবান মাসের শেষার্ধে রোজা রাখার বিধান, জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের, পৃষ্ঠা নং - ২ - ৫)^{৯৯}। তবে এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, এ বিষয়ে বিপরীতমুখী হাদিসও বৃদ্ধমান আছে, যেগুলো রোযা রাখা জায়েয হওয়াকে প্রমাণ করে। যেমন বোখারী - ১৯১৪, মুসলিম - ১০৮২ নং হাদীসে বর্ণনা করেন, আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: তোমরা রমজানের একদিন বা দুইদিন পূর্ব থেকে রোযা রাখা আরম্ভ করে রমজান মাসকে এগিয়ে এনো না। তবে কারো পূর্ব থেকেই ঐ দিনে রোযা রাখার অভ্যাস থাকলে তার বিষয়টি ব্যতিক্রম, তার জন্য রোযা রাখাই উচিত, সে যেন রোযা রাখে।

হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় অর্ধ শাবানের পর রোযা রাখতে অভ্যস্ত এমন ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা জায়েয আছে। যেমন- কোন ব্যক্তির অভ্যাস হলো

^{৯৯} শাবান মাসের শেষার্ধে রোজা রাখার বিধান, জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের, পৃষ্ঠা নং - ২ - ৫

প্রতি সোমবার অথবা বৃহস্পতিবারে রোযা রাখা। ঘটনাক্রমে শাবানের ২৯ তারিখ সোমবার অথবা বৃহস্পতিবার, তখন তার জন্য তার অভ্যাসানুযায়ী সেদিন নফল রোযা রাখাতে কোন অসুবিধা নাই। অথবা কোন ব্যক্তি একদিন পরপর রোযা রাখতো তার জন্যও রোযা রাখাতে কোন অসুবিধা নাই। ইমাম বুখারী - ৯৭০ এবং ইমাম মুসলিম ১১৫৬ - নং হাদীসে আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ শাবান মাস রোযা রাখতেন। তিনি শাবান মাসে রোযা রাখতেন তবে খুব কম সংখ্যক দিনই রোযা থেকে বিরত থাকতেন।

ইমাম নববী বলেন كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا এ বাক্যটি প্রথম বাক্যের ব্যাখ্যা স্বরূপ পুরো শাবান মাস রোযা রাখতেন এ কথা দ্বারা অধিকাংশ সময় রোযা রাখতেন বলাই উদ্দেশ্য। অন্যথায় তিনি একে বারে ধারাবাহিকভাবে পূর্ণ মাস কখনোই রোযা রাখতেন না।

হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় অর্ধ শাবানের পরও রোযা রাখা জায়েয আছে। তবে শর্ত হলো অর্ধ শাবানের পূর্বের ধারাবাহিকতা বা যোগসূত্রতা থাকতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) উল্লেখিত সব হাদীসের উপরই আমল করেন; তিনি বলেন, অর্ধ শাবানের পর রোযা রাখা বৈধ হবে না। তবে যদি কারো রোযা রাখার অভ্যাস থাকে অথবা যোগসূত্র থাকে তাহলে তার বিষয়টি ব্যতিক্রম। তার জন্য তার অভ্যাস অনুযায়ী অথবা যোগসূত্রতা ধরে রোযা রাখা বৈধ। এ মতটি -হাদীসের মধ্যে নিষেধটি হারাম বর্ণনার নিষেধ-শাফেয়ীদের অধিকাংশের মতে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য এবং বিশুদ্ধ মত। আবার কারো মতে

যেমন - রোয়ানী (রহ.) - এখানে নিষেধটি হারামের জন্য নয় বরং নিষেধটি মাকরুহের জন্য নির্ধারিত। (আল মাজমু-৬/৩৯৯-৪০০) ফতহুল বারী ৪/১২৯

ইমাম নববী এ অধ্যায়ের আলোচনা করতে গিয়ে রিয়াজুসসালিহীনের পৃ: ৪১২ বলেন,

وذهب جمهور العلماء إلى تضعيف حديث النهي عن الصيام بعد نصف شعبان ، وبناءً عليه قالوا : لا يكره الصيام بعد نصف شعبان .

অর্থাৎ; জমহুর ওলামার মতে অর্ধ শাবানের পর রোযা রাখা নিষেধ হওয়া সম্পর্কিত হাদিসগুলো দুর্বল। ফলে তারা বলেন অর্ধ শাবানের পর রোযা রাখা মাকরুহ নয়।

قال الحافظ : وَقَالَ جُمُهورُ الْعُلَمَاءِ : يَجُوزُ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِيهِ، وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ إِنَّهُ مُنْكَرٌ أَه مِنْ فَتْحِ الْبَارِي . وَمِنْ ضَعْفِهِ كَذَلِكَ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ .

হাফেজ (রহ.) বলেন, জমহুরে ওলামাদের মতে অর্ধ শাবানের পর নফল রোযা রাখা জায়েয আছে। আর নিষেধাজ্ঞা হাদিসগুলোকে তারা দুর্বল হাদিস বলে আখ্যায়িত করেন। আহমাদ বিন (রহ.) এবং ইবনে মুগ্নিন (রহ.) উভয়ে বলেন এ সব হাদিস মুনকার ...। ফতহুল বারী হতে সংগৃহীত। এ ছাড়া ইমাম বাইহাকী (রহ.) এবং ইমাম তাহাবী (রহ.) ও হাদিস গুলোকে দুর্বল বলে সাব্যস্ত করেন।

আল্লামা ইবনে কুদামাহ (রহ.) বলেন, হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন, হাদীসটি সমালোচনা মুক্ত নয়। আমরা আব্দুর রহমান বিন মাহদির নিকট প্রশ্ন করলে তিনি হাদীসটিকে সহীহ আখ্যা দেননি এবং তার থেকে তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কোন হাদীস বর্ণনা করেননি। আর ইমাম আহমাদ বলেন আলা (রহ.) একজন নির্ভর যোগ্য বর্ণনাকারি তার থেকে বর্ণিত এ একটি হাদীসকেই প্রত্যাখান করা যেতে পারে।

আলা হলো আব্দুর রহমানের ছেলে সে হাদীসটি তার পিতা হতে এবং তার পিতা আবু হুরাইরা (রা.) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

ইবনুল কাইয়ুম (রহ.) তাহজিবুসসুনান কিতাবে যারা হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন তাদের কথার উত্তর দিয়েছেন। তার উত্তরের সারাংশ নিম্নরূপ:

মূলতঃ ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ। আলা রহ. বর্ণনাকারির একা (তাফাররুদ) দ্বারা হাদীসটি সম্পর্কে কোন মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারি। ইমাম মুসলিম তার মুসলিম শরিফ কিতাবে - আলা তার পিতা হতে এবং তার পিতা আবুহুরাইরা হতে - এ সনদে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আলা (রহ.) এর তাফাররুদ কোন দোষনীয় বিষয় নয়।

এ ছাড়াও অনেক হাদীস এ রকম পাওয়া যায় যে, নির্ভর যোগ্য বর্ণনাকারি এখানে একা। তা সত্ত্বেও উম্মাত এ ধরনের হাদীসকে গ্রহণ করেছে এবং তদনুযায়ী আমল করে আসছেন। সুতরাং, হাদীসটি অগ্রাহ্য হওয়ার মত যৌক্তিক কোন কারণ বিদ্যমান না থাকায় গ্রহণ করাই হলো ইনসাফ।

অতঃপর তিনি বলেন, তবে এ ক্ষেত্রে দুই ধরনের হাদীস পাওয়া যাওয়ায় দ্বন্ধের যে অবকাশ দেখা দিয়েছে মূলত; এখানে কোন দ্বন্ধই নাই। কারণ, যে সব হাদীসে রোযা রাখার কথা এসেছে এসব হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি রোযা রাখতে অভ্যস্ত অথবা পূর্বের যোগসূত্র ধরে রোযা রাখেন তাকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তার জন্য অর্ধ শাবানের পরে এ ধরনের রোযা রাখতে কোন অসুবিধা নাই। আর আলা বর্ণনা কারীর হাদীসে যে নিষেধ পাওয়া যাচ্ছে, তা হলো ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি নতুনভাবে রোযা রাখা আরম্ভ করে এবং তার পূর্ব রোযা রাখার কোন যোগসূত্রও নাই। ...

বিন বায (রহ.) কে অর্ধ শাবানের পর রোযা রাখা নিষেধ করা হয়েছে। হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, হাদীস সহীহ যেমনটি আল্লামা নাসের উদ্দিন আল আলবানী বলেছেন। আর হাদীসের উদ্দেশ্য হলো অর্ধ শাবানের পর নতুনভাবে রোযা রাখতে আরম্ভ করা। তবে যদি কেউ অধিকাংশ মাস রোযা রাখে অথবা পুরো মাস রোযা রাখে সে অবশ্যই সুন্নাতের অনুসারী বলে গণ্য হবে। মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া শেখ বিন বাজ- ১৫/৩৪৯।

শেখ ইবনে উসাইমিন (রহ.) রিয়াদুস্সালেহীন কিতাবের ব্যাখ্যায় লিখেন, এমনকি যদি ধরে নেয়া হয় যে হাদীসটি সহীহ তবে হাদীসের নিষেধটি হারামের জন্য নয় বরং এখানে নিষেধটি শুধু মাকরুহ বুঝানোর জন্য অধিকাংশ আহলে ইলম এ মতটিকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যদি কেউ রোযা রাখতে অভ্যস্ত তবে তার জন্য অর্ধ শাবানের পর রোযা রাখা মাকরুহ হবে না।

উত্তরের সারাংশঃ মোট কথা শাবান মাসের দ্বিতীয়র্ধে রোযা রাখা নিষেধ। যদি কেউ রোযা রাখে তবে তার রোযা হয়তো মাকরুহ হবে অথবা কারো মতে হারাম হবে। একমাত্র যে ব্যক্তি রোযা রাখতে পূর্ব থেকে অভ্যস্ত অথবা যার পূর্ব থেকে যোগসূত্র আছে, তার রোযা মাকরুহ বা হারাম হবে না। আল্লাহই সর্ব জ্ঞাত।

এখানে নিষেধের হিকমত হল, লাগাতার রোযা রাখার দ্বারায় হয়তবা রমজানের রোযা রাখতে দুর্বল হয়ে যাবে, ফলে তার রমজানের রোজা রাখা ব্যাহত হবে।

যদি বলা হয়, অনেক সময় এমন হয়, মাসের শুরুতে রোযা রাখার কারণে সে বেশি দুর্বল হয়ে যাওব তখন কি করা যাবে?

উত্তরে বলা হবে, যে ব্যক্তি শুরু থেকে রোযা রাখে সে রোযা রাখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে ফলে তার জন্য রোযা রাখতে কষ্ট কম হবে।

মোল্লা আলী কারী বলেন, এখানে নিষেধটা মাকরুহে তানজিহি। এতেই উম্মাতের জন্য অনুগ্রহ যাতে সে রমজানের রোযা রাখতে দুর্বল হয়ে না যায় এবং রমজানের রোযা রাখতে পারে। আর যে শাবানের পুরো রোযা রাখবে সে রমজানের রোজা রাখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং তার থেকে কষ্ট দূর হয়ে যাবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

শাবানের মধ্যরাত্রির কি কোন ফযীলত বর্ণিত হয়েছে? শাবান মাসের মধ্য রাত্রির ফযীলত সম্পর্কে কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমনঃ আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ

فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرِ إِلَّا رَمَضَانَ ،
وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রামাযন ব্যতীত অন্য কোন পূর্ণ মাসে রোযা রাখতে দেখে নি। আর তাঁকে আমি শাবান মাসের চেয়ে অধিক রোযা অন্য কোন মাসে রাখতে দেখি নি। (সহীহুল বুখারী)¹⁰⁰।

সুতরাং শাবান মাসে আমরাও রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী বেশী বেশী করে রাখবো এবং আল্লাহর কাছে প্রাণ খুলে দুআ করবো, তিনি যেন আমাদেরকে রামাযান পর্যন্ত হায়াত দান করেন এবং রামাযানের ফজীলত ও বরকত হাসিল করার তাওফীক দেন। আমীন।

আল-কুরআনে শবে বরাতের কোন উল্লেখ নেই। শবে বরাত বলুন আর লাইলাতুল বারায়াত বলুন কোন আকৃতিতে শব্দটি কুরআন মাজীদে খুজে পাবেন না। সত্য কথাটাকে সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায় পবিত্র কুরআন মাজীদে শবে বরাতের কোন আলোচনা নেই।

সরাসরি তো দূরের কথা আকার ইংগিতেও নেই। অনেককে দেখা যায় শবে বরাতের গুরুত্ব আলোচনা করতে যেয়ে সূরা দুখানের প্রথম চারটি আয়াত পাঠ করেন। আয়াতসমূহ নিম্নরূপঃ

حَم

১.) হা-মীম।

وَالتَّكْوِيْنِ

¹⁰⁰ সহীহুল বুখারী

২) এই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ

৩) আমি এটি এক বরকত ও কল্যাণময় রাতে নাযিল করেছি। কারণ,
আমি মানুষকে সতর্ক করতে চেয়েছিলাম।

فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

৪) এটা ছিল সেই রাত যে রাতে আমার নির্দেশে প্রতিটি বিষয়ের
বিজ্ঞোচিত ফায়সালা দেয়া হয়ে থাকে।

আলোচ্য আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, কিতাবুম মুবীন বা সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ করা হয়েছে তা হলো এ কিতাবের রচয়িতা মুহাম্মাদ صلی اللہ علیہ وسلم নন, আমি (আল্লাহ) নিজে। অর্থাৎ কুরআন যে আল্লাহর বাণী এ বৈশিষ্ট্যের জন্য কুরআনেরই শপথ করা স্বতই এ অর্থ প্রকাশ করে যে, হে লোকজন, এই সুস্পষ্ট কিতাব তোমাদের সামনে বিদ্যমান। চোখ মেলে তা দেখো; এর সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন বিষয়বস্তু, এর ভাষা, এর সাহিত্য, এর সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য সূচনাকারী শিক্ষা, সব কিছুই এ সত্যের সাক্ষ্য পেশ করছে যে, আল্লাহ ছাড়া এর রচয়িতা আর কেউ হতে পারে না। তার প্রমাণ অন্য কোথাও অনুসন্ধান করার দরকার নেই, এ কিতাবই তার প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। এর পর আরো বলা হয়েছে, যে রাতে তা নাযিল করা হয়েছে সে রাত ছিল অত্যন্ত বরকত ও কল্যাণময়। অর্থাৎ যেসব নির্বোধ লোকদের নিজেদের ভালমন্দের বোধ পর্যন্ত নেই তারাই এ কিতাবের আগমনে নিজেদের জন্য আকস্মিক বিপদ মনে করছে এবং এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বড়ই চিন্তিত। কিন্তু গাফলতির মধ্যে পড়ে থাকা লোকদের

সতর্ক করার জন্য আমি যে মুহূর্তে এই কিতাব নাযিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তাদের ও গোটা মানব জাতির জন্য সেই মুহূর্তটি ছিল অত্যন্ত সৌভাগ্যময়।

কোন কোন মুফাসসির সেই রাতে কুরআন নাযিল করার অর্থ গ্রহণ করেছেন এই যে, ঐ রাতে কুরআন নাযিল শুরু হয় আবার কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ গ্রহণ করেন, ঐ রাতে সম্পূর্ণ কুরআন ‘উম্মুল কিতাব’ থেকে স্থানান্তরিত করে অহীর ধারক ফেরেশতাদের কাছে দেয়া হয় এবং পরে তা অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজন মত ২৩ বছর ধরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করা হতে থাকে।

প্রকৃত অবস্থা কি তা আল্লাহই ভাল জানেন। ঐ রাত অর্থ সূরা কদরে যাকে ‘লাইলাতুল কদর’ বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ** আর এখানে বলা হয়েছে **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ** তাছাড়া কুরআন মজীদেই একথা বলা হয়েছে যে সেটি ছিল রমযান মাসের একটি **شَهْرٌ** (رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (البقرة : 185)

সূরা দুখানের ৪নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ

(فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ)

৪) এটা ছিল সেই রাত যে রাতে আমার নির্দেশে প্রতিটি বিষয়ের বিজ্ঞোচিত ফায়সালা দেয়া হয়ে থাকে।

আয়াতটির ব্যাখ্যাঃ মূল আয়াতে আরবী **أَمْرٍ حَكِيمٍ** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার

দু'টি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, সেই নির্দেশটি সরাসরি জ্ঞানভিত্তিক হয়ে থাকে। তাতে কোন ত্রুটি বা অপূর্ণতার সম্ভাবনা নেই। অপর অর্থটি হচ্ছে, সেটি অত্যন্ত দৃঢ় ও পাকাপোক্ত সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে। তা পরিবর্তন করার সাধ্য কারো নেই। এ বিষয়টি সূরা কদরে বলা হয়েছে এভাবেঃ

تَنْزِيلُ الْمَلَايِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

সেই রাতে ফেরেশতারা ও জিবরাঈল তাদের রবের আদেশে সব রকম নির্দেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়।

এ থেকে জানা যায়, আল্লাহর রাজকীয় ব্যবস্থাপনায় এটা এমন এক রাত যে রাতে তিনি ব্যক্তি, জাতি এবং দেশসমূহের ভাগ্যের ফয়সালা অনুসারে কাজ করতে থাকে। কতিপয় মুফাসসিরের কাছে এ রাতটি শা'বানের পনের তারিখের রাত বলে সন্দেহ হয়েছে তাদের মধ্যে হযরত ইকরিমার নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। কারণ, কোন কোন হাদীসে এ রাত সম্পর্কে এ কথা উল্লেখ আছে যে, এ রাতেই ভাগ্যের ফয়সালা করা হয়। কিন্তু ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, মুজাহিদ, কাতাদা, হাসান বাসারী, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইবনে যায়েদ, আবু সালেক, দাহ্‌হাক এবং আরো অনেক মুফাসসির এ ব্যাপারে একমত যে, এটা রমযানের সেই রাত যাকে “লাইলাতুল কদর” বলা হয়েছে। কারণ, কুরআন মজীদ নিজেই সুস্পষ্ট করে তা বলছে। আর যে ক্ষেত্রে কুরআনের সুস্পষ্ট উক্তি বিদ্যমান সে ক্ষেত্রে “আখবারে আহাদ”^{*} ধরনের হাদীসের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। ইবনে কাসীর বলেনঃ এক শা'বান থেকে অন্য

শা'বান পর্যন্ত ভাগ্যের ফয়সালা হওয়া সম্পর্কে উসমান ইবনে মুহাম্মাদ বর্ণিত যে হাদীস ইমাম যুহরী উদ্ধৃত করেছেন তা একটি 'মুরসাল'^{**} হাদীস। কুরআনের সুস্পষ্ট উক্তির (نص) বিরুদ্ধে এ ধরনের হাদীস পেশ করা যায় না। কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী বলেনঃ শা'বানের পনের তারিখের রাত সম্পর্কে কোন হাদীসই নির্ভরযোগ্য নয়, না তার ফযীলত সম্পর্কে, না ঐ রাতে ভাগ্যের ফয়সালা হওয়া সম্পর্কে। তাই সেদিকে দ্রষ্টব্য না করা উচিত। (আহকামুল কুরআন)

* আখবারে আহাদ বলতে এমন হাদীস বুঝায় যে হাদীসের বর্ণনা সূত্রের কোনো এক স্তরে বর্ণনাকারী মাত্র একজন থাকে। এ বিষয়টি হাদীসের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কিছুটা দুর্বলতা সঞ্চার করে।

** যে হাদীসে মূল রাবী সাহাবীর নাম উল্লেখিত থাকে না বরং তাবেঈ নিজেই রাসূলের (ﷺ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তাকে মুরসাল হাদীস বলে। ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানীফা ছাড়া অন্য কোনো ইমামই এ ধরনের হাদীসকে নিঃসংকোচে গ্রহণ করেননি। (সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমুল কুরআন, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা)¹⁰¹।

বস্তুতঃ শবে বরাত পন্থী আলেম উলামারা এখানে বরকতময় রাত বলতে ১৫ শাবানের রাতকে বুঝিয়ে থাকেন। আমি এখানে স্পষ্টভাবেই বলব যে, যারা এখানে বরকতময় রাতের অর্থ ১৫ শাবানের রাতকে বুঝিয়ে থাকেন তারা এমন বড় ভুল করেন যা আল্লাহর কালাম বিকৃত করার মত অপরাধ।

¹⁰¹ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমুল কুরআন, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা

অতএব বরকতময় রাত হল লাইলাতুল কদর। লাইলাতুল বারায়াত নয়। সূরা দুখানের প্রথম সাত আয়াতের ব্যাখ্যা হল এই সূরা আল-কদর। আর এ ধরনের ব্যাখ্যা অর্থাৎ আল-কুরআনের এক আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য আয়াত দ্বারা করা হল সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। শবে বরাত পন্থী আলেম উলামারা এখানে বরকতময় রাত বলতে ১৫ শাবানের রাতকে বুঝিয়ে থাকেন। আমি এখানে স্পষ্টভাবেই বলব যে, যারা এখানে বরকতময় রাতের অর্থ ১৫ শাবানের রাতকে বুঝিয়ে থাকেন তারা এমন বড় ভুল করেন যা আল্লাহর কালাম বিকৃত করার মত অপরাধ। কারণঃ

(এক) কুরআন মাজীদের এ আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যা সূরা আল-কদর দ্বারা করা হয়। সেই সূরায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
تَنْزِيلُ الْمَلَكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ
هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

অর্থঃ আমি এই কুরআন নাযিল করেছি লাইলাতুল কদরে। আপনি জানেন লাইলাতুল কদর কি? লাইলাতুল কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্য মালাইকা (ফেরেশতাগণ) ও রুহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশে। এই শান্তি ও নিরাপত্তা ফজর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। (সূরা কাদর, আয়াত - ১-৫)

অতএব বরকতময় রাত হল লাইলাতুল কদর। লাইলাতুল বারায়াত নয়। সূরা দুখানের প্রথম সাত আয়াতের ব্যাখ্যা হল এই সূরা আল-কদর। আর এ ধরনের ব্যাখ্যা অর্থাৎ আল-কুরআনের এক আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য আয়াত দ্বারা করা হল সর্বোত্তম ব্যাখ্যা।

(দুই) সূরা দুখানের লাইলাতুল মুবারাকার অর্থ যদি শবে বরাত হয় তাহলে এ আয়াতের অর্থ দাড়ায় আল কুরআন শাবান মাসের শবে বরাতে নাযিল হয়েছে। অথচ আমরা সকলে জানি আল-কুরআন নাযিল হয়েছে রামাযান মাসের লাইলাতুল কদরে। যেমন সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

অর্থঃ রামাযান মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে আল-রআন।

(তিন) অধিকাংশ মুফাচ্ছিরে কিরামের মত হল উক্ত আয়াতে বরকতময় রাত বলতে লাইলাতুল কদরকেই বুঝানো হয়েছে।

শুধু মাত্র তাবেয়ী ইকরামা (রহঃ) এর একটা মত উল্লেখ করে বলা হয় যে, তিনি বলেছেন বরকতময় রাত বলতে শাবান মাসের পনের তারিখের রাতকেও বুঝানো যেতে পারে। তিনি যদি এটা বলে থাকেন তাহলে এটা তার ব্যক্তিগত অভিমত। যা কুরআন ও হাদীসের বিরোধী হওয়ার কারণে পরিত্যাজ্য। এ বরকতময় রাতের দ্বারা উদ্দেশ্য যদি শবে বরাত হয় তাহলে শবে কদর অর্থ নেয়া চলবেনা।

(চার) উক্ত আয়াতে বরকতময় রাতের ব্যাখ্যা শবে বরাত করা হল তাফসীর বির-রায় (মনগড়া ব্যাখ্যা), আর বরকতময় রাতের ব্যাখ্যা লাইলাতুল কদর দ্বারা করা হল কুরআন ও হাদীস সম্মত তাফসীর। সকলেই জানেন কুরআন ও হাদীস সম্মত ব্যাখ্যার উপস্থিতিতে মনগড়া ব্যাখ্যা (তাফসীর বির-রায়) গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই।

(পাঁচ) সূরা দুখানের ৪ নং আয়াত ও সূরা কদরের ৪ নং আয়াত মিলিয়ে দেখলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বরকতময় রাত বলতে লাইলাতুল কদরকেই বুঝানো হয়েছে। সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে কাসীর, কুরতুবী প্রমুখ মুফাছিহের কিরাম এ কথাই জোর দিয়ে বলেছেন এবং সূরা দুখানের ‘লাইলাতুম মুবারাকাহ’র অর্থ শবে বরাত নেয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। (তাফসীরে মাযারেফুল কুরআন দ্রষ্টব্য)। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) তাঁর তাফসীরে বলেছেনঃ “কোন কোন আলেমের মতে ‘লাইলাতুম মুবারাকাহ’ দ্বারা উদ্দেশ্য হল মধ্য শাবানের রাত (শবে বরাত)। কিন্তু এটা একটা বাতিল ধারণা।”

অতএব এ আয়াতে ‘লাইলাতুম মুবারাকাহ’ এর অর্থ লাইলাতুল কদর। শাবান মাসের পনের তারিখের রাত নয়।

(ছয়) ইকরামা (রঃ) বরকতময় রজনীর যে ব্যাখ্যা শাবানের ১৫ তারিখ দ্বারা করেছেন তা ভুল হওয়া সত্ত্বেও প্রচার করতে হবে এমন কোন নিয়ম-কানুন নেই। বরং তা প্রত্যাখ্যান করাই হল হকের দাবী। তিনি যেমন ভুলের উর্ধ্বে নন, তেমনি যারা তার থেকে বর্ণনা করেছেন তারা ভুল শুনে থাকতে পারেন অথবা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বানোয়াট বর্ণনা দেয়াও অসম্ভব নয়।

(সাত) শবে বরাতের গুরুত্ব বর্ণনায় সূরা দুখানের উক্ত আয়াত উল্লেখ করার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এ আকীদাহ বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, শবে বরাতে সৃষ্টিকূলের হায়াত-মাউত, রিয়ক-দৌলত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ও লিপিবদ্ধ করা হয়। আর শবে বরাত উদযাপনকারীদের শতকরা নিরানব্বই জনের বেশী এ ধারণাই পোষণ করেন। তারা এর উপর ভিত্তি করে লাইলাতুল কদরের চেয়ে ১৫ শাবানের রাতকে বেশী গুরুত্ব দেয়। অথচ কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ বিষয়গুলি লাইলাতুল কদরের সাথে সম্পর্কিত। তাই যারা শবে বরাতের গুরুত্ব বুঝাতে উক্ত আয়াত উপস্থাপন করেন তারা মানুষকে সঠিক ইসলামী আকীদাহ থেকে দূরে সরানোর কাজে লিপ্ত, যদিও মনে-প্রাণে তারা তা ইচ্ছা করেন না।

(আট) ইমাম আবু বকর আল জাসসাস তার আল-জামে লি আহকামিল কুরআন তাফসীর গ্রন্থে লাইলাতুল মুবারাকা দ্বারা মধ্য শাবানের রাত উদ্দেশ্য করা ঠিক নয় বলে বিস্তারিত আলোচনা করার পর বলেনঃ লাইলাতুল কদরের চারটি নাম রয়েছে, তা হলঃ লাইলাতুল কদর, লাইলাতুল মুবারাকাহ, লাইলাতুল বারাতাত ও লাইলাতুল সিক। (তথ্যসূত্রঃ আল জামে লি আহকামিল কুরআন, সূরা আদ-দুখানের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

লাইলাতুল বারাতাত হল লাইলাতুল কদরের একটি নাম। শাবান মাসের পনের তারিখের রাতের নাম নয়। ইমাম শাওকানী (রহঃ) তার তাফসীর ফতহুল কাদীরে একই কথাই লিখেছেন। (তাফসীর ফতহুল কাদীরঃ ইমাম শাওকানী দ্রষ্টব্য)

এ সকল বিষয় জেনে বুঝেও যারা ‘লাইলাতুম মুবারাকা’র অর্থ করবেন শবে বরাত, তারা সাধারণ মানুষদের গোমরাহ করা এবং আল্লাহর কালামের অপব্যাখ্যা করার দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না।

হাদীসের দৃষ্টিতে শবে বরাতঃ শবে বরাত নামটি হাদীসের কোথাও উল্লেখ হয়নি প্রশ্ন থেকে যায় হাদীসে কি লাইলাতুল বরাত বা শবে বরাত নেই? সত্যিই হাদীসের কোথাও আপনি শবে বরাত বা লাইলাতুল বারায়াত নামের কোন রাতের নাম খুঁজে পাবেন না। যে সকল হাদীসে এ রাতের কথা বলা হয়েছে তার ভাষা হল ‘লাইলাতুন নিফ মিন শাবান’ অর্থাৎ মধ্য শাবানের রাত্রি। শবে বরাত বা লাইলাতুল বারায়াত শব্দ আল-কুরআনে নেই, হাদীসে রাসূলেও নেই। এটা মানুষের বানানো একটা শব্দ। ভাবলে অবাক লাগে যে, একটি প্রথা ইসলামের নামে শত শত বছর ধরে পালন করা হচ্ছে অথচ এর আলোচনা আল-কুরআনে নেই। সহীহ হাদীসেও নেই। অথচ আপনি দেখতে পাবেন যে, সামান্য নফল ‘আমলের ব্যাপারেও হাদীসের কিতাবে এক একটি অধ্যায় বা শিরোনাম লেখা হয়েছে।

ফিক্হের কিতাবের দৃষ্টিতে শবে বরাতঃ শুধু আল-কুরআনে কিংবা সহীহ হাদীসে নেই, বরং আপনি ফিক্হের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলো পড়ে দেখুন, কোথাও শবে বরাত নামের কিছু পাবেন না। বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে দ্বিনি মাদ্রাসাগুলিতে ফিক্হের যে সিলেবাস রয়েছে যেমন মালাবুদ্দা মিনছ, নুরুল ইজাহ, কদুরী, কানযুদ্ দাকায়েক, শরহে বিকায়া ও হিদায়াহ খুলে দেখুন না! কোথাও শবে বরাত নামের কিছু পাওয়া যায় কিনা! অথচ আমাদের পূর্বসূরী ফিকাহবিদগণ ইসলামের অতি সামান্য বিষয়গুলো আলোচনা করতেও কোন ধরনের কার্পণ্যতা দেখাননি। তারা

সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণের সালাত সম্পর্কেও অধ্যায় রচনা করেছেন। অনুচ্ছেদ তৈরী করেছেন কবর যিয়ারতের মত বিষয়েরও। শবে বরাতের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর সামান্যতম ইশারা থাকলেও ফিকাহবিদগণ এর আলোচনা মাসয়ালা-মাসায়েল অবশ্যই বর্ণনা করতেন। অতএব এ রাতকে শবে বরাত বা লাইলাতুল বারায়াত অভিহিত করা মানুষের মনগড়া বানানো একটি বিদ'আত যা কুরআন বা হাদীস দ্বারা সমর্থিত নয়।

শবে বরাত সম্পর্কে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তা'আলা এ রাতে আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, তিনি এ রাতে মানুষের হায়াত, রিয্ক ও ভাগ্যের ফায়সালা করে থাকেন, এ রাতে ইবাদাত-বন্দেগীতে লিপ্ত হলে আল্লাহ হায়াত ও রিয্ক বাড়িয়ে সৌভাগ্যশালী করেন ইত্যাদি আকীদা কি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি মিথ্যা আরোপ করার মত অন্যায় নয় কি? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ.

অর্থঃ তার চেয়ে বড় যালিম আর কে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে? (সূরা সাফ, আয়াত নং -৭)

শবে বরাত সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের বক্তব্য এ শিরোনামে আমি শবে বরাত সম্পর্কে বিশ্ব বরেণ্য আলেম শায়খ আবদুল আযীয আবদুল্লাহ বিন বায (রহঃ) এর প্রবন্ধ -

حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله

‘মধ্য শাবানের রাত উদযাপনের বিধান’ এর সার-সংক্ষেপ তুলে ধরব। তার এ প্রবন্ধে অনেক উলামায়ে কিরামের মতামত তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً. (المائدة : ٣)

অর্থঃ আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের জন্য আমার নেআমাত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম। (সূরা মায়িদা, ৩)। আল্লাহ তা’আলা আরো বলেনঃ

(٢١) : أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. (الشورى)

অর্থঃ তাদের কি এমন কতগুলো শরীক আছে যারা তাদের জন্য ধর্মের এমন বিধান দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? (সূরা শুরা, ২১)

হাদীসে এসেছেঃ

عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من (أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (رواه البخاري ومسلم

অর্থঃ যে আমাদের এ ধর্মে এমন কিছু প্রচলন করবে যা দ্বীনের মধ্যে ছিল না তা প্রত্যাখ্যাত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)।

হাদীসে আরও এসেছেঃ

عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة يوم الجمعة: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. (رواه مسلم)

অর্থঃ সাহাবী জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু‘আর খুতবায় বলতেনঃ আর শুনে রেখ! সর্বোত্তম কথা হল আল্লাহর কিতাব ও সর্বোত্তম পথ-নির্দেশ হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ-নির্দেশ। আর ধর্মে নতুন বিষয় প্রচলন করা হল সর্ব নিকৃষ্ট বিষয়। এবং সব ধরনের বিদ‘আতই পথভ্রষ্টতা। (মুসলিম)

এ বিষয়ে অনেক আয়াতে কারীমা ও হাদীস রয়েছে যা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে কোন রকম অলসতা করেননি বা কার্পণ্যতা দেখাননি। ইসলাম ধর্মের সকল খুটিনাটি বিষয় তিনি স্পষ্টভাবে তাঁর উম্মতের সামনে বর্ণনা করে গেছেন যা আজ পর্যন্ত সুরক্ষিত রয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর যে সমস্ত নতুন আচার-অনুষ্ঠান, কাজ ও বিশ্বাস ধর্মের আচার বলে যা চালিয়ে দেয়া হবে তা সবগুলো প্রত্যাখ্যাত বিদ‘আত বলেই পরিগণিত হবে, তা উহার প্রচলনকারী যে কেউ হোক না কেন এবং উদ্দেশ্য যত মহৎ হোক না কেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ও তাদের পরবর্তী উলামায়ে ইসলাম এ ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন বলে তারা বিদ‘আতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন ও অন্যদের বিদ‘আতের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এ ধারাবাহিকতায় উলামায়ে কিরাম মধ্য শাবানের রাত উদযাপন ও ঐদিন সিয়াম পালন করাকে বিদ‘আত বলেছেন। কারণ এ বিষয়ের উপর ভিত্তি

করে ‘আমল করা যেতে পারে এমন কোন দলীল নেই। যা আছে তা হল কিছু দুর্বল হাদীস যার উপর ভিত্তি করে ‘আমল করা যায় না। উক্ত রাতে সালাত আদায়ের ফাযীলাতের যে সকল হাদীস পাওয়া যায় তা বানোয়াট। এ ব্যাপারে হাফেয ইবনে রজব তার কিতাব লাতায়িফুল মায়ারিফে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। একটি কথা অবশ্যই বলতে হয় যে, দুর্বল হাদীস ঐ সকল ‘আমল ও ইবাদাতের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যায় যে সকল ‘আমল কোন সহীহ হাদীস দ্বারা ইতোপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু মধ্য শাবানের রাতে একত্র হয়ে ইবাদাত-বন্দেগী করার ক্ষেত্রে কোন সহীহ হাদীস নেই। এ মূল নীতিটি ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) উল্লেখ করেছেন।

সকল উলামায়ে কিরামের একটি ব্যাপারে ইজমা (ঐকমত্য) হয়েছে যে, যে সকল ব্যাপারে বিতর্ক বা ইখতিলাফ রয়েছে সে সকল বিষয় কুরআন ও সুন্নাহর কাছে ন্যস্ত করা হবে। কুরআন অথবা হাদীস যে সিদ্ধান্ত দিবে সেই মোতাবেক ‘আমল করা ওয়াজিব। এ কথা তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই বলেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. (النساء)

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তাহলে আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে (ধর্মীয় জ্ঞানে ও শাসনের ক্ষেত্রে) ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হলে তা ন্যস্ত কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের

উপর। এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্টতর। (সূরা নিসা, ৫৯)। এ বিষয়ে অসংখ্য আয়াত ও হাদীস রয়েছে।

হাফেয ইবনে রজব (রহঃ) তার কিতাব লাতায়িফুল মাযারিফে লিখেছেনঃ “তাবেয়ীদের যুগে সিরিয়ায় খালিদ ইবনে মা’দান, মকহুল, লুকমান ইবনে আমের প্রমুখ আলিম এ রাতকে মর্যাদা দিতে শুরু করেন এবং এ রাতে বেশী পরিমাণে ইবাদাত-বন্দেগী করতেন। তখন লোকেরা তাদের থেকে এটা অনুসরণ করতে আরম্ভ করল। এরপর লোকদের মধ্যে মতানৈক্য শুরু হল; বসরা অঞ্চলের অনেক আবেদগণ এ রাতকে গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু মক্কা ও মদীনার আলিমগণ এটাকে বিদ’আত বলে প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর সিরিয়াবাসী আলিমগণ দুই ভাগ হয়ে গেলেন। একদল এ রাতে মাসজিদে একত্র হয়ে ইবাদাত-বন্দেগী করতেন। এদের মধ্যে ছিলেন খালেদ ইবনে মা’দান, লোকমান ইবনে আমের। ইসহাক ইবনে রাহভিয়াহও তাদের অনুরূপ মত পোষণ করতেন। আলেমদের অন্যদল বলতেনঃ এ রাতে মাসজিদে একত্র হয়ে ইবাদাত-বন্দেগী করা মাকরুহ, তবে কেহ ব্যক্তিগতভাবে ইবাদাত-বন্দেগী করলে তাতে দোষের কিছু নেই। ইমাম আওয়ামী এ মত পোষণ করতেন।

মোট কথা হল, মধ্য শাবানের রাতের ‘আমল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামদের থেকে কোন কিছু প্রমাণিত নয়। যা কিছু পাওয়া যায় তা তাবেয়ীগণের যুগে সিরিয়ার একদল আলেমের ‘আমল।” বিসৃদ্ধ কথা হল, এ রাতে ব্যক্তিগত ‘আমল সম্পর্কে ইমাম আওয়ামী ও ইবনে রজব (রহঃ) এর মতামত যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তা তাদের ব্যক্তিগত অভিমত যা সহীহ নয়। আর এটাতো সকল আলেমে

দ্বীনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, শরয়ীভাবে প্রমাণিত নয় তা ব্যক্তিগত হোক বা সমষ্টিগত, প্রকাশ্যে হোক অথবা গোপনে হোক তা কোন মুসলিমের ধর্মীয় ‘আমল হিসাবে পালন করা জায়েয নয়। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত নিম্নের হাদীস হল আম তথা ব্যাপক অর্থবোধক। তিনি বলেছেনঃ

(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. (رواه مسلم)

অর্থঃ যে কেহ এমন ‘আমল করবে যা করতে আমরা (ধর্মীয়ভাবে) নির্দেশ দেইনি তা প্রত্যাখ্যাত। (মুসলিম)

ইমাম আবু বকর আত-তারতুশী (রহঃ) তার কিতাব (الحوادث والبدع) ‘আল-হাওয়াদিছ ওয়াল বিদ‘আ’তে উল্লেখ করেনঃ ইবনে ওয়াদ্দাহ যায়েদ বিন আসলাম সূত্রে বর্ণনা করে বলেনঃ আমাদের কোন উস্তাদ বা কোন ফকীহকে মধ্য শাবানের রাতকে কোন রকম গুরুত্ব দিতে দেখিনি। তারা মাকহূলের হাদীসের দিকেও তাকাননি এবং এ রাতকে অন্য রাতের চেয়ে ‘আমলের ক্ষেত্রে মর্যাদা সম্পন্ন মনে করতেন না। হাফেয ইরাকী (রহঃ) বলেনঃ মধ্য শাবানের রাতে সালাত আদায় সম্পর্কিত হাদীসগুলো বানোয়াট বা জাল এবং এটা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপের শামিল। এ সম্পর্কে সকল উলামাদের মতামত যদি উল্লেখ করতে যাই তাহলে বিরাট এক গ্রন্থ হয়ে যাবে। তবে সত্যানুরাগীদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

মধ্য শাবানের রাতে সালাত আদায়ের জন্য একত্র হওয়া, ঐ দিন সিয়াম পালন করা ইত্যাদি নিকৃষ্ট বিদ‘আত। অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এটাই

বলেছেন। এ ধরনের ‘আমল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যেমন ছিল না তেমনি ছিল না তাঁর সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এর সময়ে। যদি এ রাতে ইবাদাত- বন্দেগী করা সওয়াবের কাজ হত তাহলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে সে সম্পর্কে সতর্ক ও উৎসাহিত করতে কার্পণ্য করতেন না, যেমন তিনি কার্পণ্য করেননি লাইলাতুল কদর ও রামাযানের শেষ দশ দিন ইবাদাত- বন্দেগী করার ব্যাপারে মুসলিমদের উৎসাহিত করতে। যদি মধ্য শাবানের রাতে অথবা রজব মাসের প্রথম জুমু‘আর রাতে বা মি‘রাজের রাতে ইবাদাত-বন্দেগী করা সওয়াবের কাজ হত তাহলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে এ ব্যাপারে অবশ্যই দিক-নির্দেশনা দিতেন। আর তিনি যদি দিক-নির্দেশনা দিতেন তাহলে তার সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) কোনভাবেই তা গোপন করতেন না। তারা তা অবশ্যই জোরে শোরে প্রচার করতেন। তারা তো নবীগণের পর উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।”

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! চলমান শিরোনামে এতক্ষণ যা বলা হল তা ছিল শায়খ আবদুল আযীয আবদুল্লাহ বিন বাযের বক্তব্যের সার কথ। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, শবে বরাতের বিপক্ষে উলামাদের বক্তব্য উল্লেখ করলেন, কিন্তু শবে বরাত উদযাপনের পক্ষেও তো অনেক বিখ্যাত উলামাদের বক্তব্য আছে তা তো উল্লেখ করলেন না। তাই ব্যাপারটা কি একপেশে ও ইনসাফ বহির্ভূত হয়ে গেল না? এর জবাবে আমি বলবঃ দেখুন, কোন বিষয় বিদ‘আত হওয়ার ক্ষেত্রে উলামাদের বক্তব্য যথেষ্ট। কেননা কুরআন ও হাদীসে কোন বিষয়কে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি যে, অমুক কাজটি বিদ‘আত। তাই আলেমগণ যেটাকে বিদ‘আত বলে রায় দিবেন সেটা বিদ‘আতই হবে। বিদ‘আত নির্ধারণের দায়িত্ব আলেমদের।

কিন্তু কোন বিষয়কে ওয়াজিব, সুন্নাত বা মুস্তাহাব অথবা সওয়াবের কাজ বলে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আলেমদের বক্তব্য যথেষ্ট হবে না যদি না তার পক্ষে কুরআন ও হাদীসের সহীহ দলীল থাকে।

অতএব কোন বিষয় বিদ'আত হওয়ার ক্ষেত্রে উলামাদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য, কিন্তু সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে নয়। আর এ কারণে আমরা শবে বরাত প্রচলনের সমর্থনে আলেমদের বক্তব্য উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিনা। এ বিবেচনায় যে সকল আলেম শবে বরাত উদযাপন করাকে বিদ'আত বলেছেন তাদের বক্তব্য গ্রহণ করতে হবে। যারা শবে বরাতের পক্ষে বলেছেন তাদের বক্তব্য এ জন্য গ্রহণ করা যাবে না যে, তা কুরআন ও সুন্নাহর সহীহ দলীলে উত্তীর্ণ নয়।

শবে বরাত নামাযের প্রথম প্রচলনঃ এ নামাযের প্রথম প্রচলন হয় হিজরী ৪৪৮ সনে। ফিলিস্তিনের নাবলুস শহরের ইবনে আবিল হামরা নামীয় একলোক বায়তুল মুকাদ্দাস আসেন। তার তিলাওয়াত ছিল সুমধুর। তিনি শাবানের মধ্যরাত্রিতে নামাযে দাঁড়ালে তার পিছনে এক লোক এসে দাঁড়ায়, তারপর তার সাথে তৃতীয় জন এসে যোগ দেয়, তারপর চতুর্থ জন। তিনি নামায শেষ করার আগেই বিরাট একদল লোক এসে তার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে।

পরবর্তী বছর এলে, তার সাথে অনেকেই যোগ দেয় ও নামায আদায় করে। এতে করে মাসজিদুল আক্সাতে এ নামাযের প্রথা চালু হয়। কালক্রমে এ নামায এমনভাবে আদায় হতে লাগে যে অনেকেই তা সুন্নাত মনে করতে শুরু করে। (দ্বারতুসীঃ হাওয়াদেস ও বিদআ পৃঃ ১২১, ১২২, ইবনে কাসীরঃ

বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৪/২৪৭, ইবনুল কাইয়েমঃ আল-মানারুল মুনিফ পৃঃ৯৯)¹⁰²।

আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে, এরাতে একশত রাকাত নামাযের ব্যাপারে যত হাদীস রয়েছে, তার সবই জাল বা বানোওয়াট। এ নামায সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) থেকে কোন হাদীস প্রমাণিত নেই। একশত রাকাত নামায পড়ার বিদআতটি ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম জেরুজালেমের বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদে প্রবর্তিত হয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম মাকদেসী (রহঃ) বলেনঃ “৪৪৮ হিজরীতে বাইতুল মাকদিসে আমাদের নিকট ইবনে আবী হুমায়রা নামক একজন লোক আগমণ করলো। তার তেলাওয়াত ছিল খুব সুন্দর। অর্ধ শাবানের রাতে সে মসজিদে আকসায় নামাযে দাড়িয়ে গেল। তার পিছনে একজন এসে দাড়ালো। তারপর আরেকজন আসলো। এভাবে এক, দুই তিন করে নামায শেষ করা পর্যন্ত বিরাট এক জামাতে পরিণত হলো।” (দেখুন [والحوادث البدع انكار على الباعث](#) ১২৪-১২৫) পরবর্তীতে মসজিদের ইমামগণ অন্যান্য নামাযের ন্যায় এ নামাযও চালু করে দেয়।

শবে বরাত নামাযের পদ্ধতিঃ প্রথা অনুযায়ী এ নামাযের পদ্ধতি হলো, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস দশবার করে পড়ে মোট একশত রাকাত নামায পড়া। যাতে করে সূরা ইখলাস ১০০০ বার পড়া হয়। (এহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন (১/২০৩)¹⁰³। এ ধরনের নামায সম্পূর্ণ বিদআত। কারণ এ ধরনের নামাযের বর্ণনা কোন হাদীসের কিতাবে আসেনি। কোন

¹⁰² ত্বারতুসীঃ হাওয়াদেস ও বিদআ পৃঃ ১২১, ১২২, ইবনে কাসীরঃ বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৪/২৪৭, ইবনুল কাইয়েমঃ আল-মানারুল মুনিফ পৃঃ ৯৯

¹⁰³ এহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন (১/২০৩

কোন বইয়ে এ সম্পর্কে যে সকল হাদীস উল্লেখ করা হয় সেগুলো কোন হাদীসের কিতাবে আসেনি। আর তাই আল্লামা ইবনুল জাওযী (মাওদুআত ১/১২৭-১৩০)¹⁰⁴, হাফেয ইরাকী (তাখরীজুল এহইয়া), ইমাম নববী (আল-মাজমু ৪/৫৬)¹⁰⁵, আল্লামা আবু শামাহ (আল-বায়স পৃঃ ৩২-৩৬), শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, (ইকতিদায়ে ছিরাতুল মুস্তাকীম ২/৬২৮), আল্লামা ইবনে আররাক (তানযীহশ শরীয়াহ ২/৯২), ইবনে হাজার আল-আসকালানী, আল্লামা সূয়ুতী (আল-আমর বিল ইত্তেবা পৃঃ ৮১, আল-লাআলিল মাসনূআ ২/৫৭)¹⁰⁶, আল্লামা শাওকানী (ফাওয়ায়েদুল মাজমু‘আ পৃঃ ৫১)¹⁰⁷ সহ আরো অনেকেই এ গুলোকে “বানোয়াট হাদীস” বলে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন।

শবে বরাত নামাযের হুকুমঃ সঠিক জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণের মতে এ ধরনের নামায বিদআত; কেননা এ ধরনের নামায আল্লাহর রাসূলও পড়েননি। তার কোন খলীফাও পড়েননি। সাহাবাগণও পড়েননি। হেদায়াতের ইমাম তথা আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ী, আহমাদ, সাওরী, আওয়ামী, লাইসসহ অন্যান্যগণ কেউই এ ধরনের নামায পড়েননি বা পড়তে বলেননি। আর এ ধরনের নামাযের বর্ণনায় যে হাদীসসমূহ কেউ কেউ উল্লেখ করে থাকেন তা উম্মাতের আলেমদের ইজমা অনুযায়ী বানোয়াট। (এর জন্য দেখুনঃ ইবনে তাইমিয়ার মাজমুল ফাতাওয়া ২৩/১৩১, ১৩৩, ১৩৪, ইকতিদায়ে ছিরাতে মুস্তাকীম ২/৬২৮, আবু শামাহঃ

¹⁰⁴ মাওদুআত ১/১২৭-১৩০

¹⁰⁵ আল-মাজমু ৪/৫৬

¹⁰⁶ আল-আমর বিল ইত্তেবা পৃঃ ৮১, আল-লাআলিল মাসনূআ ২/৫৭

¹⁰⁷ ফাওয়ায়েদুল মাজমু‘আ পৃঃ ৫১

আল-বায়েছ পৃঃ ৩২-৩৬, রশীদ রিদাঃ ফাতাওয়া ১/২৮, আলী মাহফুজ, ইবদা' পৃঃ ২৮৬,২৮৮, ইবনে বাযঃ আত্‌তাহযীর মিনাল বিদআ পৃঃ ১১-১৬)¹⁰⁸।

ভ্রান্ত ধারণা ও সংশয় নিরসনঃ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই শাবান মাস সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। বিশেষ করে প্রচলিত আছে সমাজের বিরাট এক অংশে শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে কিয়াম করা তথা নফল নামায পড়া এবং পরের দিন সিয়াম পালন করার চিরাচরিত নিয়ম। যদিও রাসূল (সাঃ) থেকে এই রাতের নফল নামায এবং দিনের বেলা রোযা রাখার ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায়না। এ রাতকে আমাদের দেশের পরিভাষায় শবে বরাত বলা হয়ে থাকে। এ রাত সম্পর্কে মানুষের বিদআতী ধারণা এবং এ রাতে মানুষ যে সমস্ত বিদআতী আমল করে তার বিস্তারিত কিছু বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

শবে বরাতে কুরআন নাযিল হয়েছে বলে ধারণাঃ শবে বরাত পালনকারীদের বক্তব্য হল, শবে বরাতের রাতেই কুরআন নাযিল হয়েছে। সূরা দুখানের ৩নং আয়াতকে তারা দলীল হিসাবে পেশ করে থাকে। আল্লাহ বলেন,-

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ

¹⁰⁸ ইবনে তাইমিয়ার মাজমুল ফাতাওয়া ২৩/১৩১,১৩৩,১৩৪, ইকতিদায়ে ছিরাতে মুস্তাকীম ২/৬২৮, আবু শামাহঃ আল-বায়েছ পৃঃ ৩২-৩৬, রশীদ রিদাঃ ফাতাওয়া ১/২৮, আলী মাহফুজ, ইবদা' পৃঃ ২৮৬,২৮৮, ইবনে বাযঃ আত্‌তাহযীর মিনাল বিদআ পৃঃ ১১-১৬

“আমি কুরআনুল কারীমকে একটি বরকতপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি” ¹⁰⁹
এ বরকতপূর্ণ রাতই হল শবে বরাতের রাত। কতিপয় আলেম এভাবেই
অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের এ ব্যাখ্যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়
বরং এখানে বরকতপূর্ণ রাত বলতে লাইলাতুল কদর উদ্দেশ্য। আল্লামা
ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, অত্র বরকতপূর্ণ রাতই হল লাইলাতুল কদর বা
কদরের রাত। যেমন অন্যত্র সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য কথা হল, কুরআনের কোন অস্পষ্ট
আয়াতের ব্যাখ্যা যদি অন্য কোন আয়াতে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়, তাহলে
কুরআনের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করতে হবে। আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ সূরা
কদরের শুরুতে বলেন,

إِنَّ أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

“আমি কুরআনকে কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। (সূরা কদরঃ ১)¹¹⁰ আর
এ কথা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে, লাইলাতুল কদর রামাযান মাস ব্যতীত
অন্য কোন মাসে নয়।

এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা রামাযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কথা
সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে সূরা বাকারায় বলেন,-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

¹⁰⁹ সূরা দুখান, আয়াত নং - ৩

¹¹⁰ সূরা কদর, আয়াত নং - ১

“রামাযান মাস এমন একটি মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। (সূরা বাকারাঃ ১৮৫)।¹¹¹ সুতরাং শবে বরাতে কুরআন নাযিল হওয়ার কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা।

শবে বরাতে রাত্রে আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসার ধারণাঃ শবে বরাতে ইবাদতের পক্ষের আলেমগণ বলে থাকে, এরাতে শেষের দিকে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং কলব গোত্রের বকরীগুলোর লোম সংখ্যার চেয়ে অধিক সংখ্যক লোকের গুনাহ ক্ষমা করে থাকেন।

উপরোক্ত অর্থ বহনকারী হাদীসটি কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সকল বর্ণনাই যঈফ বা দুর্বল। দেখুনঃ ইমাম আলবানীর তাহকীকসহ মিশকাত (১/২৮৯) হাদীস নং- ১২৯৯।¹¹²

ইমাম তিরমিযী বলেন, “আমি আমার উস্তাদ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, এই হাদীসটি যঈফ।” [দেখুনঃ তিরমিযী (২/২৫৯) হাদীস নং- ৭৪৪]¹¹³। নির্দিষ্টভাবে এ রাতে আল্লাহর দুনিয়ার আকাশে নেমে আসার এবং সকল বান্দাকে ক্ষমা চাওয়ার প্রতি আহবান জানানোর হাদীসটি সুনানের কিতাবে যঈফ ও জাল সনদে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া হাদীসটি বুখারীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত সহীহ হাদীসের বিরোধী। সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, “কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি ক্ষমা করে দিব। অমুক আছে

¹¹¹ সূরা বাকারা, আয়াত নং - ১৮৫

¹¹² ইমাম আলবানীর তাহকীকসহ মিশকাত (১/২৮৯) হাদীস নং- ১২৯৯

¹¹³ তিরমিযী (২/২৫৯) হাদীস নং- ৭৪৪

কি? অমুক আছে কি? এভাবে প্রতি রাতেই ঘোষণা করতে থাকেন।”
(দেখুন বুখারী, হাদীস নং- ১০৯৪, মুসলিম, হাদীস নং- ১৬৮)¹¹⁴

সুতরাং জাল হাদীসের উপর ভিত্তি করে সহীহ হাদীসের মর্ম প্রত্যাখ্যান করে
শবে বরাতের রাতে আল্লাহ্ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসার আকীদা পোষণ
করা এবং সে রাতে বিশেষ ইবাদত করা সম্পূর্ণ বিদআত। আরও
বিস্তারিতভাবে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. আলী (রাঃ)-এর বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ
করেছেনঃ “১৫ শা’বানের রাতে তোমরা বেশী বেশী করে ইবাদত কর এবং
দিনের বেলায় রোযা রাখ। এ রাতে আল্লাহ তা’আলা সূর্যাস্তের সাথে সাথেই
দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেনঃ ‘কে আছে আমার
কাছে গুনাহ মাফ চাইতে? আমি তাকে মাফ করতে প্রস্তুত। কে আছে রিয়ক
চাইতে? আমি তাকে রিয়ক দিতে প্রস্তুত। কে আছে বিপদগ্রস্ত? আমি তাকে
বিপদমুক্ত করতে প্রস্তুত। কে আছে ...’ এভাবে (বিভিন্ন প্রয়োজনের নাম
নিয়ে) ডাকা হতে থাকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত”। (ইবনে মাজাহ কর্তৃক
হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে)¹¹⁵ এ হাদীসটি যে আদৌ সহীহ নয়, সে ব্যাপারে
মন্তব্য করতে গিয়ে প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমাম হাফেজ শিহাব উদ্দিন
তাঁর যাওয়ায়েদে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, হাদীসটির সনদ যইফ
(দুর্বল), কারণ হাদীসটির সনদের মাঝখানে আবু বকর বিন আবু সাবরা
নামে একজন রাবী (বর্ণনাকারী) অনির্ভরযোগ্য। এমনকি ইমাম আহমদ বিন
হাম্বল এবং প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইবনু মাইন তার ব্যাপারে মন্তব্য

¹¹⁴ বুখারী, হাদীস নং- ১০৯৪, মুসলিম, হাদীস নং- ১৬৮।

¹¹⁵ ইবনে মাজাহ

করেছেনঃ “লোকটি মিথ্যা হাদীস রচনা করে থাকে।” (দেখুনঃ সুনান ইবনে মাজাহ, মন্তব্য ও সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বারী, পৃষ্ঠা ৪৪৪)।^{১১৬}

২. আয়েশা (রাঃ) - এর বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ “আমি এক রাতে দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার পাশে নেই। আমি উনার সন্ধানে বের হলাম। দেখি যে তিনি জান্নাতুল বাকী (কবর স্থানে) অবস্থান করছেন। উর্ধ্বাকাশপানে তাঁর মস্তক ফেরানো। আমাকে দেখে বললেন, ‘আয়েশা, তুমি কি আশঙ্কা করেছিলে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) তোমার প্রতি অবিচার করেছেন?’ আমি বললাম, ‘এমন ধারণা করিনি, তবে মনে করেছিলাম, আপনার অন্য কোন বিবির সান্নিধ্যে গিয়েছেন কিনা।’ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ‘আল্লাহ তা’আলা ১৫ই শা’বানের রাতে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং কালব গোত্রের সমুদয় বকরীর সকল পশমের পরিমাণ মানুষকে মাফ করে দেন।’” (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)^{১১৭}। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করে নিজেই মন্তব্য করেছেনঃ আয়েশা (রাঃ) - এর বরাত দিয়ে বর্ণিত এই হাদীসটি হাজ্জাজ বিন আয়তাহ্ ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেছেন বলে জানা নেই। ইমাম বুখারী বলেছেনঃ এ হাদীসটি যইফ (দুর্বল)। হাজ্জাজ বিন আয়তাহ্ বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া বিন আবি কাসির থেকে অথচ হাজ্জাজ ইয়াহইয়া থেকে আদৌ কোন হাদীস শুনেনি। ইমাম বুখারী আরও বলেছেনঃ এমনকি ইয়াহইয়া বিন আবি কাসিরও রাবী ওরওয়া থেকে আদৌ কোন

^{১১৬} সুনান ইবনে মাজাহ, মন্তব্য ও সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বারী, পৃষ্ঠা ৪৪৪

^{১১৭} তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

হাদীস শুনেনি। (দেখুনঃ জামে' তিরমিজী, সাওম অধ্যায়, মধ্য শা'বানের রাত, পৃষ্ঠা ১৬৫-১৬৮)।¹¹⁸

৩. আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “১৫-ই শা'বানের রাতে আল্লাহ তা'আলা নিচে নেমে আসেন এবং সকল মানুষকেই মাফ করে দেন। তবে মুশরিককে এবং মানুষের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টিকারীকে মাফ করেন না” (ইবনে মাজাহ)। এ হাদিসটির ব্যাপারে হাফেজ শিহাব উদ্দিন তাঁর যাওয়ায়েদে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেনঃ এর সনদ যইফ (দুর্বল)। একজন রাবী (বর্ণনাকারী) আব্দুল্লাহ বিন লাহইয়াহ্ নির্ভরযোগ্য নন। আরেকজন রাবী ওয়ালিদ বিন মুসলিম তাফলীসকারী (সনদের মাধ্যে হেরফের করতে অভ্যস্ত) হিসেবে পরিচিত।

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আসসিন্দী বলেছেনঃ আরেকজন রাবী আদদাহহাক কখনও আবু মুসা থেকে হাদিস শুনেনি। শবে বরাত সংক্রান্ত বর্ণিত সবগুলো হাদীসের সনদের মাধ্যেই এ জাতীয় দুর্বলতা বিদ্যমান থাকার কারণে একটি হাদীসও সহীহ'র মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

মৃত ব্যক্তির রুহ দুনিয়াতে আগমনের বিশ্বাসঃ শবে বরাত পালনের পিছনে যুক্তি হল, এরাতে মানুষের মৃত আত্মীয়দের রুহসমূহ দুনিয়াতে আগমন করে স্ব স্ব আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করে। এটি একটি অবান্তর ধারণা যা কুরআন-সুন্নার সুস্পষ্ট বিরোধী। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ-

وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

¹¹⁸ জামে' তিরমিজী, সাওম অধ্যায়, মধ্য শা'বানের রাত, পৃষ্ঠা ১৬৫-১৬৮

অনুবাদ:- ওদের (মৃতদের) পিছনে রয়েছে অন্তরায়, তারা সেখানে কিয়ামত দিবস অবদি অবস্থান করবে। (সূরা মুমেনুনঃ ১০০)¹¹⁹।

এ রাতে মানুষের হায়াত, মউত ও রিয়কের বার্ষিক ফয়সালা ভাগ্য লিখা হয় বলে ধারণাঃ তাদের এধারগাটিও ঠিক নয়। এ কথার পিছনে কুরআন হাদীছের কোন দলীল নেই। সহীহ হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেছেন,-

كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

অনুবাদঃ “আসমান-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মাখলুকের তাকদীর লিখে রেখেছেন। (সহীহ মুসলিম)¹²⁰। শবে বরাতে মানুষের হায়াত, মউত ও রিয়কের বার্ষিক ফয়সালা হওয়া সংক্রান্ত যে হাদিসটি উসমান বিন মোহাম্মদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন, হাদীসটি মুরসাল। অর্থাৎ, হাদীসের প্রথম বর্ণনাকারী হিসাবে যে সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে হাদীসটি শুনেছেন, তার কোন উল্লেখ নেই। ফলে এমন দুর্বল হাদীস দিয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের অকাট্য বক্তব্যকে খণ্ডন করা যায়না। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ডঃ ৭, পৃষ্ঠা ৩১৬১)¹²¹।

ইমাম কুরতুবী বলেনঃ “বরকতময় রাত্রি বলতে ক্বদরতের রাতকে বোঝানো হয়েছে, যদিও কেউবা বলেছেন সেটা মধ্য শা’বানের রাত। ইকরামাও বলেছেন সেটি হচ্ছে মধ্য শা’বানের রাত। তবে প্রথম মতটি অধিকতর

¹¹⁹ সূরা মুমেনুনঃ ১০০

¹²⁰ সহীহ মুসলিম

¹²¹ তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ডঃ ৭, পৃষ্ঠা ৩১৬১

শুদ্ধ। কেননা আল্লাহ বলেছেনঃ ‘আমি এই কুরআনকে লাইলাতুল কদর-এ নাযিল করেছি।’” এ প্রসঙ্গে মানুষের হায়াত, মউত, রিয়ক, ইত্যাদির ফয়সালা শবে বরাতে সম্পন্ন হয় বলে যে রেওয়ায়েত এসেছে, সেটাকে তিনি অগ্রহণযোগ্য বলে বর্ণনা করেন। তিনি পূণরায় উল্লেখ করেনঃ “সহীহ-শুদ্ধ কথা হচ্ছে, এ রাতটি লাইলাতুল কদর।” অতঃপর তিনি প্রখ্যাত ফকীহ কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবীর উদ্ধৃতি পেশ করেনঃ জমহুর আলীমদের মতামত হচ্ছে, এ রাতটি লাইলাতুল কদর। কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন এটা মধ্য শা’বানের রাত। এ কথাটি একেবারেই বাতিল। কারণ, আল্লাহ স্বয়ং তাঁর অকাট্য বাণী কুরআনে বলেছেনঃ “রমজান হচ্ছে ঐ মাস যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।” এখানে তিনি মাস উল্লেখ করে দিয়েছেন। আর বরকতময় রাত বলে লাইলাতুল কদরকে উল্লেখ করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এ মাসটিকে রমজান থেকে সরিয়ে অন্য মাসে নিয়ে যায়, সে মূলতঃ আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে বসে। মধ্য শা’বানের রাতটির ফজিলত এবং এ রাতে হায়াত-মউতের ফয়সালা সংক্রান্ত কোন একটি হাদিসও সহীহ এবং নির্ভরযোগ্য নয়। কাজেই কেউ যেন সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত না করে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ডঃ ১৬, পৃষ্ঠাঃ ১২৬-১২৮)¹²²।

হালুওয়া রুটির রহস্যঃ তাদের বক্তব্য হচ্ছে শবে বরাতের দিন ওহুদ যুদ্ধে নবী (সাঃ) এর দাঁত মোবারক শহীদ হয়েছিল। তাই নবী (সাঃ) শক্ত খাবার খেতে না পারায় নরম খাদ্য হিসাবে হালুওয়া-রুটি খেয়েছিলেন।¹²³ তাই

¹²² তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ডঃ ১৬, পৃষ্ঠাঃ ১২৬-১২৮

¹²³ বইটির মূল লেখক: ড: শাইখ সালেহ বিন ফাউযান (হাফিযাহুল্লাহ)। অনুবাদক: শাইখ আব্দুল্লাহ

শাহেদ মাদানী -দাঈ ও শিক্ষক হিসেবে কর্মরত: জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সৌদী

আমরাও নবীর দাঁত ভাঙ্গার ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করে হালুওয়া-রুটি খেয়ে থাকি। এটি একটি কাল্পনিক কথা। কারণ ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে, শাবান মাসে নয়। যাই হোক, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রশংসায় আজকাল বাংলাদেশের মুসলিমদের মাঝে মারাত্মক অতিরঞ্জন ও সীমালংঘন করা হয়ে থাকে। অথচ এসব বিষয় থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

لَا تُطْرُونِي، كَمَا أَطَرْتُ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ،
وَرَسُولُهُ.

অর্থ- আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করো না যেভাবে নাসারাগণ মারইয়াম পুত্রের (ঈসা ইবনু মারইয়াম- এর) প্রশংসায় অতিরঞ্জন করেছিল। আমি তো কেবল তাঁর (আল্লাহর) বান্দাহ্ হই, অতএব তোমরা (আমাকে) বলো- “আল্লাহর বান্দাহ্ ও তাঁর রাসূল”।

এ রাতে কবর যিয়ারতের পিছনে যুক্তি ও তা খন্ডনঃ এরাতে রাসূল (সাঃ) বাকী কবরস্থান যিয়ারত করেছেন। তাই আমাদেরকেও এরাতে কবর যিয়ারত করতে হবে। এ মর্মে ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত হাদীসটি যঈফ। হাদীসের সনদে হাজ্জাজ ইবনে আরত্বাত নামক একজন যঈফ রাবী রয়েছে। ইমাম বুখারী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন।

শাবানের মধ্যরাত্রির পরদিন কি রোযা রাখা যাবেঃ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ.

আহমদ ইবন আব্বল - আব্দুল্লাহ ইবন কায়স আয়েশা (রাঃ) - কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর নিকট মাসসমূহের মধ্যে (নফল) রোযার জন্য প্রিয়তম মাস ছিল শা'বান মাস। এরপর তিনি রামাযানের রোযা রাখা শুরু করতেন। (তথ্যসূত্রঃ সুনান আবু দাউদ :: সাওম বা রোজা অধ্যায় ১৪, হাদীস ২৪৩১)¹²⁴। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বহু সহীহ হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি শাবান মাসে সবচেয়ে বেশী রোযা রাখতেন। (এর জন্য দেখুনঃ বুখারী, হাদীস নং ১৯৬৯, ১৯৭০, মুসলিম, হাদীস নং ১১৫৬, ১১৬১, মুসনাদে আহমাদ ৬/১৮৮, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৪৩১, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস নং ২০৭৭, সুনানে তিরমিযি, হাদীস নং ৬৫৭)¹²⁵।

সে হিসাবে যদি কেউ শাবান মাসে রোযা রাখেন তবে তা হবে সুন্নাত। শাবান মাসের শেষ দিন ছাড়া বাকী যে কোন দিন রোযা রাখা জায়েয বা সওয়াবের কাজ। তবে রোজা রাখার সময় মনে করতে হবে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেহেতু শাবান মাসে রোজা রেখেছিলেন তাকে অনুসরণ করে রোযা রাখা হচ্ছে অথবা যদি কারও আইয়ামে বিদের নফল রোযা তথা মাসের ১৩, ১৪, ১৫ এ তিনদিন রোযা রাখার নিয়ম থাকে

¹²⁴ সুনান আবু দাউদ :: সাওম বা রোজা অধ্যায় ১৪, হাদীস ২৪৩১

¹²⁵ বুখারী, হাদীস নং ১৯৬৯, ১৯৭০, মুসলিম, হাদীস নং ১১৫৬, ১১৬১, মুসনাদে আহমাদ ৬/১৮৮, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৪৩১, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস নং ২০৭৭, সুনানে তিরমিযি, হাদীস নং ৬৫৭

তিনিও রোযা রাখতে পারেন। কিন্তু শুধুমাত্র শাবানের পনের তারিখ রোযা রাখা বিদআত হবে। কারণ শরীয়তে এ রোযার কোন ভিত্তি নেই। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর রাসূলের পরিপূর্ণ পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন। আমীন।

নিসফে শাবানের নামায সম্পর্কে বিন বায (রহঃ) এর একটি ফতোয়াঃ
আল্লামা আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) কে নিসফে শাবানের রাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো- এ রাতে কোন বিশেষ নামায আছে কি না? উত্তরে তিনি বলেনঃ অর্ধ শাবানের রাত সম্পর্কে একটি সহীহ হাদীসও পাওয়া যায় নি। এ ব্যাপারে বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট ও যঈফ, যার কোন ভিত্তি নেই। আর এটি এমন রাত্রি যার অতিরিক্ত কোন মর্যাদা নেই। তাতে কুরআন পাঠ, একাকী কিংবা জামাত বদ্ধ হয়ে কোন নামায আদায় করা যাবে না। কতিপয় আলেম এই রাতের যে ফজীলতের কথা বলেছেন, তা দুর্বল। সুতরাং এ রাতের কোন অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য নেই। এটিই সঠিক কথা। আল্লাহ্ সকলকে তাওফীক দিন। (দেখুনঃ ইবনে বায (রঃ) এর ফতোয়া সিরিজ প্রথম খন্ড)¹²⁶ ইমাম আলবানী (রহঃ) বলেনঃ অর্ধ শাবানের রাতের ফজীলতে অনেকগুলো দুর্বল হাদীছ এসেছে। সবগুলো হাদীছ এক সাথে মিলালে সহীহর স্তরে পৌঁছে যায়। (দেখুন সিলসিলায়ে সহাহা, হাদীস নং- ১১৪৪)¹²⁷ তবে তিনি এ রাতে বিশেষ কোন এবাদত করাকে বিদআত বলে উল্লেখ করেছেন এবং কঠোর ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছেন। (দেখুনঃ ইমাম আলবানীর ফতোয়া সিরিজ)¹²⁸।

¹²⁶ ইবনে বায (রঃ) এর ফতোয়া সিরিজ প্রথম খন্ড

¹²⁷ সিলসিলায়ে সহাহা, হাদীস নং- ১১৪৪

¹²⁸ ইমাম আলবানীর ফতোয়া সিরিজ

শবে বরাতের রোযাঃ শবে বরাতের রোযা রাখার প্রমাণ স্বরূপ দু'টি হাদীস পেশ করা হয়ে থাকে।

প্রথম হাদীসঃ শাবান মাসের মধ্যরাত এলে তোমরা রাতে কিয়াম কর এবং দিনে সিয়াম পালন কর। (সুনানে ইবনে মাজাহ)¹²⁹। এই হাদীসের সনদে ইবনে আবু সাব্রাহ নামক একজন জাল হাদীস রচনাকারী রাবী থাকার কারণে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। (দেখুনঃ সিলসিলায়ে যাঈফা, হাদীস নং- ২১৩২)¹³⁰

দ্বিতীয় হাদীসঃ ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) বলেন, একবার রাসূল (সাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি সিরারে শাবানের রোযা রেখেছ? লোকটি বলল না। অতপর নবী (সাঃ) রামাযানের পরে রোযা দু'টি কাযা আদায় করতে বললেন। (সহীহ মুসলিম) তারা এ হাদীস থেকে বুঝতে চেয়েছেন যে, এখানে সিরারে শাবান বলতে শবে বরাতের রোযা উদ্দেশ্য। অধিকাংশ আলেমদের মতে সিরার অর্থ মাসের শেষ।

উক্ত ব্যক্তি শাবানের শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত রোযা পালনে অভ্যস্ত ছিল অথবা এটা তার মানতের রোযা ছিল। রামাযানের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ভয়ে সে রোযা রাখা ছেড়ে দিয়েছিল। কারণ শাবান মাসের শেষের দিকে রামাযানের রোযার সাথে মিশিয়ে রোযা রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাই রাসূল

¹²⁹ সুনানে ইবনে মাজাহ

¹³⁰ সিলসিলায়ে যাঈফা, হাদীস নং- ২১৩২

(সাঃ) তাকে রোযা দু'টি কাযা আদায় করতে বলেছিলেন। [(দেখুন শরহুন্ নববী আলা সহীহ মুসলিম, (৪/১৮১)]¹³¹

শবে বরাতের প্রচলনঃ এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, শবে বরাতের এ আয়োজন শুধুমাত্র বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ অনারব দেশসমূহেই দেখা যায়। প্রিয় পাঠক মন্ডলী! শবে বরাত উপলক্ষে আমাদের দেশের রেডিও, টেলিভিশন, ওয়াজ মাহফিল ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে শবে বরাতের পক্ষে বিশেষ প্রচারণা চালনা হয় এমনকি ঐ দিন সরকারী ছুটি পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়। লক্ষ লক্ষ টাকা এর পিছনে ব্যয় করা হয়ে থাকে। অথচ এর কোন শরঈ ভিত্তি নেই। মুসলিম জাতির উচিত এ বিদআত থেকে বিরত থাকা। পরিতাপের বিষয় এই যে, অনেকেই এ বিদআতকে বিদআতে হাসানাহ বলে থাকে। আসলে বিদআতে হাসানাহ বলতে কিছু নেই। ইসলামের নামে তৈরীকৃত সকল বিদআতই মন্দ, হাসানাহ বা ভাল বিদআত নামে কোন বিদআতের অস্তিত্ব নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ-

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

“প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সমস্ত ভ্রষ্টতার পরিণাম হল জাহান্নাম” (নাসাঈ)¹³²

ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, “সমস্ত বিদআতই ভ্রষ্টতা যদিও মানুষ তাকে

¹³¹ শরহুন্ নববী আলা সহীহ মুসলিম, (৪/১৮১)

¹³² নাসাঈ

উত্তম বলে থাকে। (দেখুন: **خطر الشرع كمال بيان في الإبداع** 133) **داعالابت** পৃষ্ঠা নং ২১-২১)

অথচ আরব দেশসমূহে এর তৎপরতা নেই বললেই চলে। বিশেষ করে ইসলামের প্রাণ কেন্দ্র সৌদী আরবে শবে বরাত পালনের কোন অস্তিত্বই দেখা যায়না। মক্কা-মদীনার সম্মানিত ইমামগণের কেউ কোন দিন শবে বরাত উদযাপন করার প্রতি জনগণকে উৎসাহিত করেন না। কারণ তারা ভাল করেই জানেন যে ইহা দ্বীনের কোন অংশ নয় বরং তা একটি নব আবিষ্কৃত বিদআত। এজন্যই তাঁরা শবে বরাতসহ অন্যান্য সকল বিদআত থেকে মুসলিম জাতিকে সতর্ক করে থাকেন এবং তাদের সকল জুমআর খুৎবা ও অন্যান্য আলোচনা ও ভাষণে বিনা শর্তে কুরআন-সুন্নার অনুসরণের আহবান জানান।

সুতরাং, আলোচনার সারাংশে বলা যায় যে, আসুন আমরা ইবাদতের নামে এই নব আবিষ্কৃত বিদআতকে পরিহার করি এবং অপরকে তা থেকে সাবধান করে দ্বীনি দায়িত্ব পালন করি।

অতএব, কুরআন, হাদীস ও গ্রহণযোগ্য প্রখ্যাত আলেমদের উদ্ধৃত থেকে আমরা জানতে পারলাম শাবানের মধ্য রাত্রিকে ঘটা করে উদযাপন করা চাই তা নামাযের মাধ্যমে হোক অথবা অন্য কোন ইবাদতের মাধ্যমে অধিকাংশ আলেমদের মতে জগন্যতম বিদআত। শরীয়তে যার কোন ভিত্তি নেই। বরং তা সাহাবাদের যুগের পরে প্রথম শুরু হয়েছিল। যারা সত্যের

¹³³ **خطر الشرع كمال بيان في الإبداع** পৃষ্ঠা নং ২১-২১

অনুসরণ করতে চায় তাদের জন্যদ্বীনের মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা করতে বলেছেন তাই যথেষ্ট। এবার প্রশ্ন আসে যইফ (দুর্বল) হাদীসের ভিত্তিতে কোন আমল করা যায় কি-না।

অধিকাংশ মুহাদ্দেসীনের মতে যইফ হাদীসের উপর কোন আমল করা শরীয়তে জায়েয নেই। অধিকাংশ ফুকাহা আইম্মায়ে কেরাম যইফ (দুর্বল) হাদিস দ্বারা শর্ত সাপেক্ষে আমল করা যেতে পারে বলে মত দিয়েছেন।

শর্তগুলো নিম্নরূপঃ

- ১। খুব বেশী যইফ (দুর্বল) পর্যায়ের না হওয়া।
- ২। শুধুমাত্র ফাযায়েল অধ্যায়ের হওয়া। অর্থাৎ ফাজায়েল অধ্যায় ব্যতীত অন্য কোন অধ্যায়ের যইফ হাদিসের ভিত্তিতে কোন প্রকার আমল করা যাবে না।
- ৩। আমল করার সময় সহীহভাবে প্রমাণিত হওয়ার ধারণা না রাখা। অর্থাৎ, এ ধারণা রাখতে হবে যে হাদিসটি সহীহভাবে প্রমাণিত নয়।
- ৪। কুরআন ও সহীহ হাদিসের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া। অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট যইফ হাদিসটি কুরআন বা সহীহ হাদিসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

উক্ত মূলনীতিগুলোর আলোকে শবে বরাতের আমল করা যেতে পারে বলে অনেক ওলামায়ে কেরাম মতামত দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন আসে আমল করতে হলে কিভাবে করা যাবে?

প্রথমতঃ ব্যক্তিগতভাবে বিছু ইবাদত বন্দেগী করা যেতে পারে। সে জন্যে মসজিদে সমবেত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করার জন্য ওয়াজ নসীহত, যিকির ইত্যাদির আয়োজন করা যাবে। (দেখুনঃ ফাতাওয়া শামীয়া, ইমাম বিন আবেদীন, পৃষ্ঠা ৬৪২)। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কিরামগণ এমনটি করেননি। তাই সে ত্বরিকার বাইরে ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতা আবিষ্কার করলে সেটা হয়ে যাবে বিদ'আত।

দ্বিতীয়তঃ হায়াত, মউত, রিয়ক ইত্যাদির ফয়সালা এ রাতে হয়, এটা বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ, এসব ফয়সালা যে লাইলাতুল ক্বদরে হয়, তা সুস্পষ্টভাবে কুরআন ও সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

তৃতীয়তঃ আমাদের দেশে (বাংলাদেশে) আলোকসজ্জা ও আতশবজির যে তামাশা করা হয়, তা প্রকাশ্যে বিদ'আত। সে ধারণা থেকে কোন এলাকায় এ রাতের নাম হচ্ছে বাতির রাত। এ সব ধারণা ইসলামী শরীয়তে হিন্দুদের দিওয়ালী অনুষ্ঠান থেকে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)। হালুয়া-রুটি বিলি-বণ্টনের কার্যক্রমও বিদ'আত। (দেখুনঃ ফাতাওয়া শামীয়া, ইমাম বিন আবেদীন, পৃষ্ঠা ৬৪২)। ইবাদতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

এসব অনেক আমল শিয়াদের কাছ থেকে উপ-মহাদেশের মুসলমানরা গ্রহণ করেছেন বলে মুফতী রশীদ আহমদ লুদিয়ানী উল্লেখ করেছেন। (দেখুনঃ সাত মাসায়েলঃ শবে বরাতে শিয়াদের ভ্রষ্টতা, পৃষ্ঠা ৩৯-৪২)¹³⁴।

চতুর্থতঃ নফল ইবাদতের জন্য সারা রাত মসজিদে এসে জেগে থাকা রাসূল (সাঃ) - এর সুন্নত বিরোধী। তিনি নফল ইবাদত ঘরে করতে এবং ফরয ইবাদত জামা'আতের সাথে মসজিদে আদায় করতে তাগিদ করেছেন। আর সারা রাত জেগে থেকে ইবাদত করাটাও সুন্নত বিরোধী। প্রিয় নবীজী (সাঃ) সব রাতেরই কিছু অংশ ইবাদত করতেন, আর কিছু অংশ ঘুমাতে। উনার জীবনে এমন কোন রাতের খবর পাওয়া যায়না, যাতে তিনি একদম না ঘুমিয়ে সারা রাত জেগে ইবাদত করেছেন।

পঞ্চমতঃ শবে বরাতের দিনের বেলায় রোযা রাখার হাদিস একেবারেই দুর্বল। এর ভিত্তিতে আমল করা যায় না বলে পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেম ও ফকীহ মুফতী মাওলানা তাকী উসমানী সাহেবের সুস্পষ্ট ফাতাওয়া রয়েছে। শবে বরাত, কবর যিয়ারত, ইত্যাদি অনেক আমলেরই কোন সহীহ দলিল না থাকার কারণে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম ও ফকীহ মুফতী রশীদ আহমদ লুদিয়ানবী, হাকীকুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) - এর সাথে বহু বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রাহঃ) শেষের দিকে কিছু কিছু বিষয় অবশ্য প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

¹³⁴ সাত মাসায়েলঃ শবে বরাতে শিয়াদের ভ্রষ্টতা, পৃষ্ঠা ৩৯-৪২

ষষ্ঠতঃ শবে বরাতের রোযার পক্ষে যেহেতু কোন মজবুত দলিল নেই, তাই যারা নফল রোযা রাখতে চান, তারা আইয়ামে বীজের তিনটি রোযা – ১৩, ১৪, ১৫ – রাখতে পারেন। এর পক্ষে সহীহ হাদিসের দলিল রয়েছে। শুধু একটি না রেখে এ তিনটি বা তার চেয়েও বেশী রোযা রাখতে পারলে আরও ভাল। কারণ, শা'বান মাসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সবচেয়ে বেশী পরিমাণ নফল রোযা রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদিসের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন এবং সমস্ত নব্য আবিষ্কৃত বিদ'আতী কাজ থেকে হেফাযত রাখুন।

শাবানের মধ্যরজনীর ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের

পর্যালোচনাঃ ১ নং হাদীস = ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেনঃ আমাদের কাছে আহমাদ ইবনে মুনী' হাদীস বর্ণনা করেছেন যে তিনি ইয়াযীদ ইবনে হারুন থেকে, তিনি হাজ্জাজ ইবনে আরতাহ থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসির থেকে, তিনি উরওয়াহ থেকে, তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেনঃ

حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نساءك فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب.

قال أبو عيسى: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج،
وسمعت محمدا يقول يضعف هذا الحديث، وقال: يحيى بن كثير لم يسمع من
عروة، قال محمد والحجاج لم يسمع من يحيى بن كثير، انتهى كلامه، فهذا
السند منقطع بوجهين.

আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিছানায়
পেলাম না তাই আমি তাকে খুঁজতে বের হলাম, ‘বাকী’ নামক কবরস্থানে
তাকে পেলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তুমি কি
আশংকা করেছো যে আল্লাহ ও তার রাসূল তোমার সাথে অন্যায় আচরণ
করবেন? আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি মনে করেছি আপনি
আপনার অন্য কোন স্ত্রীর কাছে গিয়েছেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ রাসূল
আলামীন মধ্য শাবানের রাতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন, অতঃপর
কালব গোত্রের পালিত বকরীর পশমের পরিমানের চেয়েও অধিক পরিমান
লোকদের ক্ষমা করেন।

ইমাম তিরমিযী বলেনঃ আয়িশা (রাঃ) এর এই হাদীস আমি হাজ্জাজের
বর্ণিত সনদ (সূত্র) ছাড়া অন্য কোনভাবে চিনি না। আমি মুহাম্মাদকে (ইমাম
বুখারী) বলতে শুনেছি যে, তিনি হাদীসটিকে দুর্বল বলতেন। ইমাম তিরমিযী
(রহঃ) বলেনঃ ইয়াহুইয়া ইবনে কাসীর উরওয়াহ থেকে হাদীস শুনেননি।
এবং মুহাম্মদ (ইমাম বুখারী) বলেছেনঃ হাজ্জাজ ইয়াহুইয়াহ ইবনে কাসীর
থেকে শুনেননি। এখানে শুনেননি অর্থ হচ্ছে বয়সের পার্থক্যের হিসেবে
একজনের সাথে আরেকজনের দেখা হওয়ার সুযোগ হয় নি বলে বুঝানো
হয়েছে। তাছাড়া ইমাম বুখারী (রহঃ) যে হাদীসটিকে সহীহ বলেন নি বরং

বলেছেন রাবীদের মধ্যে সমস্যা রয়েছে সেখানে এ হাদীসটি গ্রহণের আর কোন সুযোগই থাকছে না।¹³⁵

অতএব, এ হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইমাম তিরমিযীর মন্তব্যে প্রমাণিত হয় যে, হাদীসটি দুটো দিক থেকে মুনকাতি অর্থাৎ উহার সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন। অপর দিকে এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী হাজ্জাজ ইবনে আরতাহ মুহাদ্দিসীনদের নিকট দুর্বল বলে পরিচিত। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! যারা শবে বরাতের বেশী বেশী ফাযীলাত বয়ান করতে অভ্যস্ত তারা তিরমিযী বর্ণিত এ হাদীসটি খুব গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করেন অথচ যারা হাদীসটির অবস্থা সম্পর্কে ভাল জানেন তাদের এ মন্তব্যটুকু গ্রহণ করতে চাননা।

এ হাদীসটি ‘আমলের ক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য হওয়ার জন্য ইমাম তিরমিযীর এ মন্তব্যটুকু কি যথেষ্ট নয়? যদি তর্কের খাতিরে এ হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে কি প্রমাণিত হয়? আমরা যারা ঢাকঢোল পিটিয়ে মাসজিদে একত্র হয়ে যেভাবে শবে বরাত উদযাপন করি তাদের ‘আমলের সাথে এ হাদীসটির মিল কোথায়? বরং এ হাদীসে দেখা গেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিছানা ছেড়ে চলে গেলেন, আর পাশে শায়িত আয়িশা (রাঃ) কে ডাকলেন না। ডাকলেন না অন্য কাউকে। তাকে জাগালেন না বা সালাত আদায় করতে বললেন না। অথচ আমরা দেখতে পাই যে, রামাযানের শেষ দশকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে রাত জেগে ইবাদাত-বন্দেগী করতেন এবং পরিবারের সকলকে জাগিয়ে দিতেন।

¹³⁵ বিদ’আত – মোসাদ্দেক আহমদ, পৃষ্ঠা নং – ১১২

বেশী পরিমাণে ইবাদাত-বন্দেগী করতে বলতেন। যদি ১৫ শাবানের রাতে কোন ইবাদাত করার ফায়ীলাত থাকত তাহলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন আয়িশাকে (রাঃ) বললেন না? কেন রামাযানের শেষ দশকের মত সকলকে জাগিয়ে দিলেন না, তিনি তো নেক কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে আমাদের সকলের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি তো কোন অলসতা বা কৃপণতা করেননি।

২ নং হাদীস - আলা ইবনে হারিস থেকে বর্ণিত, আয়িশা (রাঃ) বলেনঃ

عن العلاء بن الحارث أن عائشة رضي الله عنها قالت : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي، فأطال السجود، حتى ظننت أنه قد قبض، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجعت فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال: يا عائشة أو يا حميراء أظننت أن النبي قد خان بك؟ قلت لا والله يا رسول الله، لكنني ظننت أنك قبضت لطول سجودك، فقال أتدريين أي ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذه ليلة النصف من شعبان إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هو. (رواه البيهقي في شعب الإيمان، وهذا حديث مرسل لأن علاء ما سمع عن عائشة)

অর্থঃ এক রাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। সিজদাহ এত দীর্ঘ করলেন যে, আমি ধারণা করলাম তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আমি এ অবস্থা দেখে দাড়িয়ে তার বৃদ্ধাঙ্গুল ধরে নাড়া দিলাম, অঙ্গুলটি নড়ে উঠল। আমি চলে এলাম। সালাত শেষ করে তিনি বললেনঃ হে আয়িশা অথবা বললেন হে হুমায়রা! তুমি কি মনে করেছ আল্লাহর নবী তোমার সাথে বিশ্বাস ভংগ করেছেন? আমি

বললামঃ আল্লাহর কসম হে রাসূল! আমি এমন ধারণা করিনি। বরং আমি ধারণা করেছি আপনি না জানি ইন্তেকাল করলেন!

অতঃপর তিনি বললেনঃ তুমি কি জান এটা কোন রাত? আমি বললামঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ এটা মধ্য শাবানের রাত। এ রাতে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের প্রতি মনোনিবেশ করেন।

ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং রাহমাত প্রার্থনাকারীদের রহম করেন। আর হিংসুকদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেন। (বাইহাকী তার শুয়াবুল ঈমান কিতাবে বর্ণনা করেছেন)। হাদীসটি মুরসাল। সহীহ বা বিশ্বুদ্ধ নয়। কেননা বর্ণনাকারী 'আলা' আয়িশা (রাঃ) থেকে শুনেছেন। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, এ হাদীসটি কোন হাদীস গ্রন্থের হাদীস নয়। মিশকাতুল মাসাবীহ এর ভারতীয় ভাষ্যকার এর রচিত উদ্ধৃতি এটি বর্ণিত হলেও এখানে কোন রাবীর উল্লেখ নেই।

অতএব, এসব হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, নাবী করিম (সাঃ) এর কবরস্থানে সিজদারত থাকার বিষয়টি কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা বিশ্লেষকগণই ভালো বিবেচনা করার সুযোগ রাখেন কারন রাসূল (সাঃ) বারংবার বলেছেন যে, তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে রূপান্তর করো না। তাই কবরস্থানে তাঁর সিজদারত থাকার বিষয়টি নিঃসন্দেহে প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার দাবী রাখে। আর বর্ণিত হাদীসটি সনদের দিক থেকেও অত্যন্ত দুর্বল হিসেবে প্রমানিত হয়েছে যা উপরেও উল্লেখ করেছি। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে চলার তৌফিক দিন, আমীন।

৩ নং হাদীস - আলী ইবনে আবী তালেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله : وسلم
ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول : ألا من مستغفر فأغفر له
ألا من مسترزق فأرزق له ألا من مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع
رواه ابن ماجه، والبيهقي في شعب الإيمان. وهذا حديث ضعيف لأن (.الفجر
في سننه ابن أبي سبرة وهو معروف بوضع الحديث عند المحدثين. المرجع :
تحفة الأحمدي بشرح جامع الترمذي وقال ناصر الدين الألباني في هذا
(الحديث: إنه واه جداً

যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন তোমরা রাত জেগে সালাত আদায়
করবে আর দিবসে সিয়াম পালন করবে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা সূর্যাস্তের
পর দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করে বলেনঃ আছে কি কোন ক্ষমা
প্রার্থনাকারী আমি তাকে ক্ষমা করব। আছে কি কোন রিষক প্রার্থনাকারী
আমি রিষক দান করব। আছে কি কোন বিপদে নিপতিত ব্যক্তি আমি তাকে
সুস্থতা দান করব। এভাবে ফজর পর্যন্ত বলা হয়ে থাকে। (ইবনে মাজাহ ও
বাইহাকী)¹³⁶।

প্রথমতঃ এ হাদীসটি দুর্বল। কেননা এ হাদীসের সনদে (সূত্রে) ইবনে আবী
সাবুরাহ নামে এক ব্যক্তি আছেন, যিনি অধিকাংশ হাদীস বিশারদের নিকট
হাদীস জালকারী হিসাবে পরিচিত। এ যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন
আল-বানী (রহঃ) বলেছেন, হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে একেবারেই দুর্বল।

¹³⁶ ইবনে মাজাহ ও বাইহাকী

দ্বিতীয়তঃ অপর একটি সহীহ হাদীসের বিরোধী হওয়ার কারণে এ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। সে সহীহ হাদীসটি হাদীসে নুযুল নামে পরিচিত, যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হলঃ

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. ((أخرجه البخاري ومسلم))

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমাদের রব আল্লাহ তা‘আলা প্রতি রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন ও বলতে থাকেনঃ কে আছ আমার কাছে দু‘আ করবে আমি কবুল করব। কে আছ আমার কাছে চাইবে আমি দান করব। কে আছ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করব। (বুখারী ও মুসলিম)¹³⁷।

আর উল্লিখিত ৩ নং হাদীসের বক্তব্য হল আল্লাহ তা‘আলা মধ্য শাবানের রাতে নিকটতম আকাশে আসেন ও বান্দাদের দু‘আ কবুলের ঘোষণা দিতে থাকেন। কিন্তু বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত এই সহীহ হাদীসের বক্তব্য হল আল্লাহ তা‘আলা প্রতি রাতের শেষের দিকে নিকটতম আকাশে অবতরণ করে দু‘আ কবুলের ঘোষণা দিতে থাকেন। আর এ হাদীসটি সর্বমোট ৩০ জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন এবং বুখারী এবং মুসলিম ও সুনানের প্রায় সকল কিতাবে এসেছে। তাই হাদীসটি প্রসিদ্ধ। অতএব এই মশহুর

¹³⁷ বুখারী ও মুসলিম

হাদীসের বিরোধী হওয়ার কারণে ৩ নং হাদীসটি পরিত্যাজ্য হবে। কেহ বলতে পারেন যে, এই দু হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ ৩ নং হাদীসের বক্তব্য হল আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন মধ্য শাবানের রাতের শুরু থেকে। আর এ হাদীসের বক্তব্য হল প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। অতএব দু হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই যে কারণে ৩ নং হাদীসকে পরিত্যাগ করতে হবে। আমি বলব আসলেই এ দু হাদীসের মধ্যে বিরোধ আছে। কেননা আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীসের বক্তব্য হল আল্লাহ তা‘আলা প্রতি রাতের শেষ অংশে দুনিয়ার আকাশে আসেন। আর প্রতি রাতের মধ্যে শাবান মাসের পনের তারিখের রাতও অন্তর্ভুক্ত। অতএব এ হাদীস মতে অন্যান্য রাতের মত শাবান মাসের পনের তারিখের রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার আকাশে আসেন। কিন্তু ৩ নং হাদীসের বক্তব্য হল শাবান মাসের পনের তারিখের রাতের প্রথম প্রহর থেকে আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন।

৪ নং হাদীস - উসমান ইবনে আবিল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد : هل من مستغفر فأغفرله، هل من سائل فأعطيه ، فلا يسأل أحد إلا أعطي إلا زانية بفرجها أو مشرك. (أخرجه ٥٢٤) البيهقي في شعب الإيمان وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم

অর্থঃ যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেয়ঃ আছে কি কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আমি তাকে ক্ষমা করব। আছে কি কেহ কিছু চাইবার আমি তাকে তা দিয়ে দিব। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ মুশরিক ও ব্যভিচারী বাদে সকল প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করা হয়। (বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান)। বিখ্যাত মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আল-বানী (রহঃ) হাদীসটিকে তার সংকলন ‘যয়ীফ আল-জামে’ নামক কিতাবের ৬৫২ নং ক্রমিকে দুর্বল প্রমাণ করেছেন। শবে বরাত সম্পর্কে এ ছাড়া বর্ণিত অন্যান্য সকল হাদীস সম্পর্কে ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেনঃ এ মর্মে বর্ণিত অন্য সকল হাদীসই দুর্বল।

শাবানের মধ্যরজনীর সম্পর্কিত হাদীসসমূহ পর্যালোচনার সারকথা-

শবে বরাত সম্পর্কিত হাদীসগুলো উল্লেখ করা হল। আমি মনে করি এ সম্পর্কে যত হাদীস আছে তা এখানে এসেছে। বাকী যা আছে সেগুলোর অর্থ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত। এ সকল হাদীসের দিকে লক্ষ্য করে আমরা কয়েকটি বিষয় স্পষ্টভাবেই বুঝে নিতে পারি।

(১) এ সকল হাদীসের কোন একটি দ্বারাও প্রমাণিত হয়নি যে, ১৫ শাবানের রাতে আল্লাহ তা’আলা আগামী এক বছরে যারা ইন্তেকাল করবে, যারা জন্ম গ্রহণ করবে, কে কি খাবে সেই ব্যাপারে ফায়সালা করেন। যদি থাকেও তাহলে তা আল-কুরআনের বক্তব্যের বিরোধী হওয়ায় তা গ্রহণ করা যাবে না। কারণ আল-কুরআনের স্পষ্ট কথা হল এ বিষয়গুলির ফায়সালা হয় লাইলাতুল কদরে।

(২) এ সকল হাদীসের কোথাও বলা হয়নি যে, এ রাতে মৃত ব্যক্তিদের আত্মা তাদের গৃহে আসে। বরং এটি একটি প্রচলিত বানোয়াট কথা। মৃত ব্যক্তির আত্মা কোন কোন সময় গৃহে ফিরে আসার ধারণাটা হিন্দুদের ধর্ম-বিশ্বাস।

(৩) এ সকল হাদীসের কোথাও এ কথা নেই যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম এ রাতে গোসল করেছেন, মাসজিদে উপস্থিত হয়ে নফল সালাত আদায় করেছেন, যিক্র-আযকার করেছেন, কুরআন তিলাওয়াত করেছেন, সারারাত জাগ্রত থেকেছেন, ওয়াজ নাসীহাত করেছেন কিংবা অন্যদের এ রাতে ইবাদাত বন্দেগীতে উৎসাহিত করেছেন অথবা শেষ রাতে জামাতের সাথে দু‘আ-মুনাজাত করেছেন।

(৪) এ হাদীসসমূহের কোথাও এ কথা নেই যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এ রাতের সাহরী খেয়ে পরের দিন সিয়াম (রোযা) পালন করেছেন।

(৫) আলোচিত হাদীসসমূহে কোথাও এ কথা নেই যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাহাবায়ে কিরাম এ রাতে হালুয়া-রুটি বা ভাল খানা তৈরী করে বিলিয়েছেন, বাড়ীতে বাড়ীতে যেয়ে মীলাদ পড়েছেন।

(৬) এ সকল হাদীসের কোথাও নেই যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এ রাতে দলে দলে কবরস্থানে গিয়ে কবর যিয়ারত করেছেন কিংবা কবরে মোমবাতি জ্বালিয়েছেন। এমনকি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের

যুগ বাদ দিলে খুলাফায়ে রাশেদীনের ত্রিশ বছরের ইতিহাসেও কি এর কোন একটা ‘আমল পাওয়া যাবে? যদি না যায় তাহলে শবে বরাত সম্পর্কিত এ সকল ‘আমল ও আকীদা কি বিদ’আত নয়? এ বিদ’আত সম্পর্কে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে সতর্ক করার দায়িত্ব কারা পালন করবেন?

এ দায়িত্ব পালন করতে হবে আলেম-উলামাদের, দ্বীন প্রচারক, মাসজিদের ইমাম ও খতীবদের। যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের ইশারা নেই সে সকল ‘আমল থেকে সাধারণ মুসলিম সমাজকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করতে হবে নবী-রাসূলগণের উত্তরসূরীদের তথা উত্তম আলেমদের।

ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা সম্পর্কিত একটি হাদীস ও পর্যালোচনাঃ

“শবে বরাতে সৌভাগ্য বা এক বছরের তাকদীর লেখা সম্পর্কিত কোন হাদীস নেই” বলে আপনি যে দাবী করা হচ্ছে তা সঠিক নয়। ‘মিশকাত আল-মাসাবীহ’ কিতাবে এ সম্পর্কে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

পাঠকগণের অবগতির জন্য উক্ত হাদীসটির পর্যালোচনা নিচে তুলে ধরলাম।
হাদীসটি হলঃ

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدريين ما هذه الليلة؟ يعني ليلة النصف من شعبان

قالت ما فيها يا رسول الله ؟ فقال : فيها أن يكتب كل مولود (من) بني آدم في

هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة وفيها ترفع
أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم.
من مشكاة المصابيح في باب قيام شهر رمضان، رواه البيهقي في الدعوات
الكبير.

অর্থঃ তুমি কি জানো এটা (অর্থাৎ মধ্য শাবানের রাত) কোন্ রাত? তিনি
জিজ্ঞেস করলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ রাতে কি রয়েছে? তিনি বললেনঃ এ
রাতে এই বছরে যে সকল মানব-সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে তাদের ব্যাপারে
লিপিবদ্ধ করা হয়, যারা মৃত্যু বরণ করবে তাদের তালিকা তৈরী হয়, এ
রাতে ‘আমলসমূহ পেশ করা হয়, এ রাতে রিযিক নাযিল করা হয়।

আলোচ্য হাদীসটি আল-মিশকাতুল মাসাবীহ কিতাবে ‘রামাযান মাসে কিয়াম’
(রামাযান মাসের রাতের সালাত) অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি
লিখেছেন যে, ইমাম বাইহাকী (রঃ) তার ‘আদ-দাওআত আল-কাবীর’ গ্রন্থে
হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির পর্যালোচনা নিূে তুলে ধরলামঃ

(এক) উল্লিখিত হাদীসে ‘অর্থাৎ মধ্য শাবানের রাত’ বাক্যটি রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা নয়। এ বাক্যটি পরবর্তী কালের
বর্ণনাকারীর নিজস্ব বক্তব্য বলে। আর আয়িশা (রাঃ) এমন কোন অজ্ঞ
মহিলা ছিলেন না যে তাকে তারিখ বলে দিতে হবে।

(দুই) এ হাদীসে বর্ণিত ‘অর্থাৎ মধ্য শাবানের রাত’ কথাটি আয়িশার (রাঃ)
বক্তব্য নয়। কারণ তার বক্তব্য শুরু হয়েছে ‘তিনি জিজ্ঞেস করলেন’
বাক্যটির পর। তাহলে এ বক্তব্যটি কার? এ বক্তব্যটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আয়িশা (রাঃ) ব্যতীত অন্য কোন বর্ণনাকারীর নিজস্ব মন্তব্য, যা মেনে নেয়া আমাদের জন্য যরুরী নয়।

(তিন) এ হাদীসের বিষয়বস্তুর দিকে তাকালে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, হাদীসে ভাগ্য লেখার বিষয়টি লাইলাতুল কদরের সাথে সম্পর্কিত। কেননা জন্ম, মৃত্যু, ‘আমল পেশ, রিয্ক ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী রামাযান মাসে লাইলাতুল কদরে স্থির করা হয়। এ কথা যেমন কুরআনের একাধিক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত তেমনি বহু সংখ্যক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

(চার) আল-মিশকাত আল-মাসাবীহর সংকলক বিষয়টি ভালভাবে বুঝেছেন বলে তিনি হাদীসটিকে রামাযান মাসের সালাত (কিয়ামে শাহরি রামাযান) অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। বুঝা গেল যে, তার মত হল হাদীসটি রামাযান মাসের লাইলাতুল কদর সম্পর্কিত। যদি তিনি বুঝতেন যে, হাদীসটি মধ্য শাবানের তাহলে তিনি তা রামাযান মাসের অধ্যায়ে আলোচনা করবেন কেন?

(পাঁচ) এ হাদীসটি আল-মিশকাত আল-মাসাবীহর সংকলক উল্লেখ করার পর বলেছেন, তিনি হাদীসটি ইমাম বাইহাকীর ‘আদ-দাওআত আল-কাবীর’ কিতাব থেকে নিয়েছেন। ইমাম বাইহাকী তার ‘আদ-দাওআত আল-কাবীর’ গ্রন্থে শবে বরাত সম্পর্কে মাত্র দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তার একটি হল এই হাদীস। তিনি তার ‘শুআ’বুল ঈমান’ গ্রন্থে শবে বরাত সম্পর্কিত এই বইয়ে আলোচিত ৫ নং হাদীসটি উল্লেখ করার পর লিখেছেনঃ

وقد روي في هذا الباب أحاديث مناكير، رواها قوم مجهولون ذكرنا في كتاب الدعوات منها حديثين

অর্থঃ এ বিষয়ে বহু মুনকার হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যার বর্ণনাকারীরা অপরিচিত। আমি তা থেকে দু'টি হাদীস 'আদ-দাওআত আল-কাবীর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তাহলে ফলাফল দাড়াল কি? ইমাম বাইহাকীর এ মন্তব্যে যা প্রমাণিত হলঃ

(১) শবে বরাত সম্পর্কে অনেক মুনকার (অগ্রহণযোগ্য) হাদীস রয়েছে।

(২) আদ-দাওআত আল-কাবীর গ্রন্থে শবে বরাত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস দুটি মুনকার।

(৩) তাই আলোচ্য হাদীসটি হাদীসে মুনকার।

(৪) তিনি 'আদ-দাওআত আল-কাবীর' গ্রন্থটি আগে সংকলন করেছেন, তারপরে শুআবুল ঈমান সংকলন করেছেন। এ কারণে তিনি পরবর্তী কিতাবে আগের কিতাবের ভুল সম্পর্কে পাঠকদের সতর্ক করেছেন। এটা তার আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার একটি বড় প্রমাণ।

(৫) মুনকার হাদীস 'আমলের জন্য গ্রহণ করা যায় না।

(৬) যিনি হাদীসটি আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন তিনি নিজেই যখন হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয় বলে মতামত দিয়েছেন তখন আমরা তা সঠিক বলে গ্রহণ করব কেন?

সৌভাগ্য রজনী ধর্ম বিকৃতির শামিলঃ ইসলাম ধর্মে সৌভাগ্য রজনী বলতে কিছু নেই। নিজেদের সৌভাগ্য রচনার জন্য কোন অনুষ্ঠান বা ইবাদাত-বন্দেগী ইসলামে অনুমোদিত নয়। শবে বরাতকে সৌভাগ্য রজনী বলে বিশ্বাস করা একটি বিদ'আত তথা ধর্মে বিকৃতি ঘটানোর শামিল। এ ধরনের বিশ্বাস খুব সম্ভব হিন্দু ধর্ম থেকে এসেছে। তারা সৌভাগ্য লাভের জন্য গণেশ পূজা করে থাকে। সৌভাগ্য অর্জন করতে হলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে। কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে এবং সারা জীবন সালাত-সিয়াম-যাকাত ত্যাগ করে শুধুমাত্র একটি রাতে মাসজিদে উপস্থিত হয়ে রাত জেগে ভাগ্য বদল করে সৌভাগ্য হাসিল করে নিবেন এমন ধারণা ইসলামে একটি হাস্যকর ব্যাপার। ধর্মে বিকৃতির কৃতিত্বে শিয়া মতাবলম্বীদের জুড়ি নেই। এ শবে বরাত প্রচলনের কৃতিত্বও তাদের। ফারসী ভাষার “শবে বরাত” নামটা থেকে এ বিষয়টা বুঝতে কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়। তারা এ দিনটাকে ইমাম মাহদীর জন্ম দিন হিসাবে পালন করে থাকে। তারা বিশ্বাস করে যে, এ রাতে ইমাম মাহদীর জন্ম হয়েছে। এ রাতে তারা এক বিশেষ ধরনের সালাত আদায় করে। যার নাম দিয়েছে “সালাতে জাফর”।

শবে বরাত সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর অবস্থানঃ শবে বরাত উদযাপন করা ও না করার ক্ষেত্রে বিশ্বের মুসলিমদেরকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমতঃ যারা কোনভাবেই শবে বরাত উদযাপন করেন না ও উদযাপন করাকে ইসলাম সম্মত মনে করেন না।

দ্বিতীয়তঃ যারা সম্মিলিতভাবে শবে বরাত উদযাপন করেন না ঠিকই, কিন্তু এ রাতে ব্যক্তিগতভাবে চুপে চুপে ‘আমল করা ফাযীলাতপূর্ণ মনে করেন, দিবসে সিয়াম পালন করেন ও রাত্রি জাগরণ করেন।

তৃতীয়তঃ যারা ১৫ শাবানের রাতে মাসজিদে জমায়েত হয়ে ইবাদাত-বন্দেগী করেন, কবর যিয়ারত করেন, মাসজিদে ওয়াজ-নাসীহাতে শরীক হন, পরের দিন সিয়াম পালন করেন, এই রাতে হায়াত-মউত, রিযক-দৌলত সম্পর্কে আল্লাহ সিদ্ধান্ত নেন বলে বিশ্বাস করেন। সারা রাত জেগে ইবাদাত-বন্দেগী করেন। তবে আতশ-বাযি, মোমবাতি জ্বালানো ও আলোকসজ্জা ইত্যাদিকে নাজায়েয বলে জানেন।

চতুর্থতঃ যারা ১৫ শাবানের রাতে আতশবাজি, আলোক সজ্জা ও আমোদ ফুর্তি করেন ও সময় সুযোগ মত ইবাদাত-বন্দেগীও করেন।

এ চার প্রকার লোকদের মধ্যে প্রথম প্রকারের মানুষের সংখ্যাই বেশী। আমি কিন্তু এ কথা বলতে চাচ্ছি না যে, অধিকাংশ মুসলিম শবে বরাত পালন করেন না বলে তা করা ঠিক নয়। বরং আমি বলতে চাচ্ছি যে, শবে বরাত সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর এ বিভক্তি শবে বরাত উদযাপন বিদ‘আত হওয়ার একটা স্পষ্ট আলামত। এ ক্ষেত্রে আমি বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) এর কিতাব ‘শরীক ও বিদ‘আত’ থেকে একটি উদ্ধৃতি দেয়া যথার্থ মনে করছি। তিনি লিখেছেনঃ “আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো বিশ্বব্যাপী সম-আদর্শতা। এই সমাদর্শ ও স্বাদৃশ্যতা যেমন কাল ও সময়ের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় তেমনি স্থানের ক্ষেত্রেও। আল্লাহ হচ্ছেন রাব্বুল মাশরিকাইন ওয়া রাব্বুল মাগরিবাইন; পূর্ব-

পশ্চিম সকল কিছুর রব ও মালিক। তিনি স্থান ও কালের সীমা ও বাঁধার উদ্ধে। তাই তাঁর শরীয়াত ও তাঁর দ্বীনে এক অত্যাশ্চর্য সমতা ও সমাদর্শ বিদ্যমান। তাঁর আখিরী শরীয়াত ও আখিরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শে এসে যা হয়েছে তাকমীল -পূর্ণতা প্রদীপ্ত সূর্যের মতই সকলের জন্য সমান এবং আকাশ ও মাটির মত সকলের জন্য সম উপযোগীতাপূর্ণ। প্রথম যুগে এর যে রূপ ও আকৃতি ছিল হিজরী পনের শতকেও উহার রূপ ও আকৃতি সেই একই। প্রাচ্যবাসীদের জন্য এটি যেমন ও যতটুকু, ঠিক তেমন ও ততটুকুই প্রতীচ্যের জন্য। যে সমস্ত নীতি ও নির্দেশ, ইবাদাতের যে রূপ ও আকৃতি, আল্লাহর নৈকট্য লাভের যে সমস্ত সুনির্ধারিত পন্থা ও উপায় আরবদের জন্য ছিল ঠিক তদ্রূপ আছে তা ভারতবাসীর জন্যও। তাই দুনিয়ার যে কোন অংশের একজন মুসলিম অধিবাসী অপর কোন অংশে যদি চলে যায় তাহলে ইসলামী ফরয আদায় এবং ইবাদাত-বন্দেগী করার ক্ষেত্রে তার কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। তার জন্য কোন স্থানীয় গাইডের প্রয়োজন পড়ে না। তিনি যদি আলিম হন, শরীয়াত সম্পর্কে বিজ্ঞ হন তাহলে কেবল মুক্তাদীই নয় অধিকন্তু যে কোন স্থানে তিনি ইমামও হতে পারেন।

বিদ‘আতের অবস্থা এর বিপরীত। এতে সমদৃশ্যতা ও একত্বতা নেই। স্থান ও কালের প্রভাব এতে পরিস্ফুট থাকে। গোটা মুসলিম বিশ্বে এর একটিমাত্র রূপে প্রচলনও হয়ে ওঠে না।”

সকল ধরনের বিদ‘আতের ক্ষেত্রে উপরোক্ত কথা প্রযোজ্য। শবে বরাত এমনি একটা বিষয় যা আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের লোকেরা মহা ধুমধামে উদযাপন করছি, কিন্তু অন্য এলাকার মুসলিমদের কাছে এ সম্পর্কে

কোন খবর নেই। কি আশ্চর্য! এমন এক মহা-নিয়ামাত যা মক্কা-মদীনার লোকেরা পেলনা, অন্যান্য আরবরা পেলনা, আফ্রিকানরা পেলনা, ইন্দোনেশীয়, মালয়েশীয়রা পেলনা, ইউরোপ-আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের লোকেরা পেলনা; অথচ ভাগ্যক্রমে সৌভাগ্যের মহান রাত পেয়ে গেলাম আমরা উপ-মহাদেশের কিছু লোকেরা ও শিয়া মতাবলম্বীরা! এ বিষয়টি যদি বিভ্রান্তিকর না হত তাহলে সকল মুসলিমের পাওয়ার কথা ছিল। হাদীসে এসেছেঃ

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة. (رواه الترمذي وصححه الألباني في ١٥٨٨٢ صحيح الجامع رقم)

অর্থঃ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা‘আলা আমার উম্মতকে কোন গোমরাহী বা বিভ্রান্তিতে একমত হতে দিবেন না। (তিরমিযী)

অন্য বর্ণনায় এসেছেঃ সাহাবী আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ١٩٨٦ رقم ١٩٨٦ قد أجاز أمتي أن تجمع على ضلالة. (صحيح الجامع)

অর্থঃ আল্লাহ তা‘আলা আমার উম্মতকে কোন ভ্রান্ত বিষয়ে একমত হওয়া থেকে মুক্তি দিয়েছেন। (সহীহ জামেয়)। এ হাদীসের অর্থ হল আমার উম্মত যদি কোন বিষয়ে একমত হয় তাহলে সে বিষয়টি বিভ্রান্তিকর হতে পারে

না। আর আমার উম্মতের কোন বিষয়ে একমত না হওয়ার বিষয়টি বিভ্রান্ত হওয়ার একটা আলামত হতে পারে। শবে বরাত এমনি একটি ‘আমল যে উম্মতে মুসলিমাহ এ বিষয়ে কখনো একমত হয়নি, হওয়া সম্ভবও নয়। আবার যারা উদযাপন করেন তাদের মধ্যেও দেখা যায় ‘আমল ও বিশ্বাসের বিভিন্নতা।

শবে বরাত সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করার দায়িত্ব উলামায়ে কিরামের ইসলাম ধর্মে যতগুলো বিদ‘আত চালু হয়েছে তা কিন্তু সাধারণ মানুষ বা কাফির মুশরিকদের মাধ্যমে প্রসার ঘটেনি। উহার প্রসারের জন্য দায়ী যেমন এক শ্রেণীর উলামা, তেমনি উলামায়ে কিরামই যুগে যুগে বিদ‘আতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন, দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, জেল-যুল্ম বরদাশত করেছেন।

তাই বিদ‘আত যে নামেই প্রতিষ্ঠা লাভ করুক না কেন উহার বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করতে হবে আলেমদেরকেই। তারা যদি এটা না করে কারো অন্ধ অনুসরণ বা অনুকরণ করেন, বিভ্রান্তি ছড়ান বা কোন বিদ‘আতী কাজ-কর্ম প্রসারে ভূমিকা রাখেন, তাহলে এ জন্য তাদেরকে আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে। যে দিন বলা হবেঃ

(٦٥: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. (القصص)

অর্থঃ আর সে দিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা রাসূলদের আহ্বানে কিভাবে সাড়া দিয়েছিলে? (সূরা কাসাস, ৬৫)। সেদিন তো এ প্রশ্ন করা হবে না যে, তোমরা অমুক পীরের মত অনুযায়ী বা অমুক

ইমামের মত অনুযায়ী ‘আমল করেছিলে কিনা। যারা সহীহ সুন্নাহ মত ‘আমল করবে তারাই সেদিন সফলকাম হবে।

শবে বরাত সম্পর্কে একটি বিভ্রান্তির নিরসনঃ ১৫ শাবানে দিনের সিয়াম ও রাতের ইবাদাত-বন্দেগী, কুরআন তেলাওয়াত, নফল সালাত, কান্নাকাটি, দু‘আ-মুনাজাত, কবর যিয়ারাত, দান-সাদকাহ, ওয়াজ-নাসীহাত প্রভৃতি নেক ‘আমল গুরুত্বসহকারে পালন করাকে যখন কুরআন ও হাদীস সম্মত নয় বলে আলোচনা করা হয় তখন সাধারণ ধর্ম-প্রাণ ভাই-বোনদের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন আসে যে, জনাব! আপনি শবে বরাতে উল্লিখিত ইবাদাত-বন্দেগীকে বিদ‘আত বা কুরআন ও সুন্নাহ সম্মত নয় বলেছেন, কিন্তু রোযা রাখা সওয়াবের কাজ ও রুটি তৈরী করে গরীব দুঃখীকে দান করা ভাল কাজ নয় কি? আমরা কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে দোষের কি?

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দু‘আ-মুনাজাত, সালাত, সিয়াম, দান-ছাদাকাহ, কুরআন তিলাওয়াত, রাত্রি জাগরণ হল নেক আমল। এতে কারও দ্বি-মত নেই।

আমরা কখনো এগুলিকে বিদ‘আত বলি না। যা বিদ‘আত বলি এবং যে সম্পর্কে উম্মাহকে সতর্ক করতে চাই তা হল এ রাতকে শবে বরাত বা সৌভাগ্য রজনী অথবা মুক্তি রজনী মনে করে বিভিন্ন প্রকার আমল ও ইবাদাত বন্দেগীর মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা। এটা কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী। এটাই ধর্মে বাড়াবাড়ি। যা ধর্মে নেই তা উদযাপন করা ও প্রচলন করার নাম বিদ‘আত।

সুতরাং, আলোচনার সারাংশে বলা যায় যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নবুওয়াতের তেইশ বছরের জীবনে কখনো তার সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে মক্কায় মাসজিদুল হারামে অথবা মদীনায় মাসজিদে নবুবীতে কিংবা অন্য কোন মাসজিদে একত্র হয়ে উল্লিখিত ইবাদাত-বন্দেগীসমূহ করেছেন এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁর সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) তথা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে কেহ জানতো না শবে বরাত কি এবং এতে কি করতে হয়। তারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ‘আমল প্রত্যক্ষ করেছেন।

আমাদের চেয়ে উত্তম রূপে কুরআন অধ্যয়ন করেছেন। তারা তাতে শবে বরাত সম্পর্কে কোন দিক-নির্দেশনা পেলেন না। তারা তাদের জীবন কাটালেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে, অথচ জীবনের একটি বারও তাঁর কাছ থেকে শবে বরাত বা মুক্তির রজনীর ছবক পেলেন না? যা পালন করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে যাননি, যা কুরআনে নেই, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের তা’লীমে নেই, সাহাবীগণের ‘আমলে নেই, তাদের সোনালী যুগের বহু বছর পরে প্রচলন করা শবে বরাতকে আমরা বিদ‘আত বলতে চাই। আমরা বলতে চাই, এটা একটা মনগড়া পর্ব। আমরা মানুষকে বুঝাতে চাই, এই সব প্রচলিত ও বানোয়াট মুক্তির রজনী উদযাপন থেকে দূরে থাকতে হবে।

অতএব, আমরা উম্মতকে কুরআন ও সুন্নাহমুখী করতে এবং সেই অনুযায়ী ‘আমল করাতে অভ্যস্ত করতে চাই। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

সন্দেহজনক নফল আমল থেকে দূরে থাকা উত্তমঃ যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেই যে, শবে বরাত শর'য়ীভাবে প্রমাণিত, তাহলে উহার মর্যাদা কতটুকু হবে? বেশী হলে মুস্তাহাব। কেহ যদি সারা জীবন মুস্তাহাব শবে বরাতটা বর্জন করে তাহলে তার কি ক্ষতি হবে? কিন্তু যদি এটা বিদ'আত হয়, আর যারা এর দিকে মানুষকে আহ্বান করল, উৎসাহিত করল, মানুষকে বিভ্রান্ত হতে প্ররোচিত করল, আকীদা-বিশ্বাসে বিকৃতি ঘটালো, এর প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রাখল তাহলে তাদের পরিণাম কি হবে? একটু ভেবে দেখবেন কি? (তথ্যসূত্রঃ শবে বরাত – লেখকঃ আব্দুল্লাহ শহীদ)¹³⁸।

ফিকাহর মূলনীতিতে একটি কথা আছে, “নতীজা আরজালের তাবে হয়” অন্যভাবে বলা যায়ঃ

دفع المضر أقدم من جلب المنافع

অর্থাৎ একটা বিষয় লাভ ও ক্ষতি উভয়ের সম্ভাবনা থাকলে ক্ষতির বিষয়টি প্রাধান্য পাবে এবং বিবেচনায় আনা হবে।

হাদীসে এসেছেঃ

আবু আব্দুল্লাহ নুমান ইবনে বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছিঃ

عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبّهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه

¹³⁸ শবে বরাত – লেখকঃ আব্দুল্লাহ শহীদ

وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. (رواه البخاري ومسلم)

অর্থঃ নিশ্চয়ই হালাল স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ও হারাম পরিস্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ দুটোর মাঝে কিছু সন্দেহজনক বিষয় আছে যা অনেক মানুষই জানে না। সুতরাং যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকল সে নিজের দীন ও ইয়্যাত আবরুকে বাঁচাল। আর যে সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হয় সে প্রকারান্তরে হারামে লিপ্ত হয়ে পড়ল। যেমন কোন রাখাল যদি তার গবাদিপশু নিষিদ্ধ চারণভূমির পাশে নিয়ে যায় তাহলে তার অচিরেই নিষিদ্ধ চারণভূমিতে ঢুকে যাওয়ার আশংকা থাকে। তোমরা সাবধানতা অবলম্বন কর! প্রত্যেক রাজা-বাদশার সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে, আর আল্লাহ তা‘আলার সংরক্ষিত এলাকা হল তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ। (বুখারী ও মুসলিম)

উপরোক্ত আলোচনার শেষ কথা হল, শবে বরাত একটি বিদ‘আতী পর্ব। অতএব আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হলাম যেঃ

(১) এ রাতকে কেন্দ্র করে কোন ধরনের ‘আমল করার সমর্থনে কোন সহীহ হাদীস নেই।

(২) এ রাত সম্পর্কে যা কিছু আকীদাহ বিশ্বাস প্রচলিত আছে তা পোষণ করা জায়েয নয়।

(৩) এ রাতে ইবাদাত বন্দেগী করলে সৌভাগ্য খুলে যায় এমন ধারণা একটি বাতিল আকীদাহ।

(৪) এ রাতে হায়াত, মউত ও রিযিক বন্টনের বিষয় লেখা হয় বলে যে বিশ্বাস তা কুরআন ও হাদীসের বিরোধী। তাই তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

(৫) এ রাতকে কেন্দ্র করে যেমন সম্মিলিতভাবে ইবাদাত বন্দেগী করা, রাত্রি জাগরণ করা ঠিক নয় তেমনি ব্যক্তিগত ইবাদাত বন্দেগী করাও ঠিক হবে না। তবে নিয়ম বা রুটিন মাসিক ইবাদাত বন্দেগীর কথা আলাদা। যেমন কেহ সপ্তাহের দু দিন রাত্রি জাগরণ করে থাকে। ঘটনাচক্রে এ রাত সেদিনের মধ্যে পড়লে অসুবিধা নেই। কিন্তু এ রাতে ইবাদাত-বন্দেগী করলে অধিক সওয়াব হবে এমন ধারণায় ব্যক্তিগতভাবে বা চুপিসারে কিছু করাও ঠিক হবে না।

(৬) ১৫ শাবানের রাতই দু'আ কবুলের রাত নয় বরং প্রতি রাতের শেষ অংশ দু'আ কবুলের সময়।

(৭) শুধু ১৫ শাবানের রাতেই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন প্রথম আকাশে অবতরণ করেন না, বরং প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তিনি প্রথম আকাশে অবতরণ করে বান্দাদেরকে তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করতে আহ্বান জানান।

(৮) শবে বরাতের 'আমল সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো কোনটা জাল, আবার কোনটা যঈফ বা দুর্বল সূত্রের।

অতএব এ রাত উদযাপন করা থেকে মানুষদেরকে নিষেধ করতে হবে। যে কোন ধরনের বিদ'আতী কাজ থেকে মানুষকে সাধ্যমত বিরত রাখা 'আল-আমর বিল-মারুফ ওয়ান নাহয়ি আনিল মুনকার' এর অন্তর্ভুক্ত। আর এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করতে পারেন মুহতারাম উলামায়ে কিরাম, শ্রদ্ধেয় আইয়েম্মায়ে মাসাজিদ, দায়ী'গণ ও ইসলামী আন্দোলনে শরীক ব্যক্তিবর্গ।

(৩) শারী'য়াতের দৃষ্টিতে 'ঈদে মীলাদুন্নবী (عيد ميلاد النبي) বা মীলাদ মাহফিল এবং কিয়াম - নব আবিস্কৃত বিদ'আতঃ

ঈদে মীলাদুন্নবী কিংবা মীলাদ মাহফিল পালন করা বিদআত। তেমনিভাবে জন্মদিন পালন করা, জন্মঅস্টমী (হিন্দু), বড়দিন (খ্রিস্টান), মীলাদুন্নবী একই কথা একই কাজ। সুরা আল ইমরান (৩) ১৪৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন - হে মানুষ, তোমরা যারা (আল্লাহর উপর) ইমান এনেছো, তোমরা যদি অমুসলিমদের অনুসরণ করতে শুরু করো তাহলে এরা তোমাদের পূর্ববর্তী (জাহেলিয়াতের) অবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ফলে তোমরা নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পরবে। নবী (ﷺ) এর (মৃত্যু) ইন্তেকালের পর কোন সাহাবী (রাঃ) নবী (ﷺ) এর মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠান করেনি। তাহলে আমরা করছি কেন? তাহলে সাহাবীরা কি ভুল করে গেছেন? এ থেকে মানুষ শিখেছে নিজের, ছেলে মেয়ের জন্মদিন পালন। আরো লোক আছে তাদের জন্মদিন কেন পালন করছেন না? (সাহাবীরা, বাকি নবী-রাসুলরা কি দোষ করেছেন তাদের নাম তো আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেছেন। নবী (ﷺ) ইদে মীলাদুন্নবীর দিন কয় রাকাত নামায পরেছেন? ঈদের দিনতো মানুষ ২ রাকাত নামায পড়ে নাকি? ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করা মানে

টাকার অপচয় এবং দ্বীনে নতুন বিষয় উদ্ভাবন করা আর দ্বীনে নতুন বিষয় উদ্ভাবন করা মানেই বিদ'আত। তাই এই বিষয় কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ভাই আপনি কেন মিলাদুন্নবী পালন করেন? উত্তরে সে বলে আমরা মিলাদুন্নবী করি কারন আমরা নবী (সাঃ) কে ভালবাসি। আপনি যে টাকা মিলাদুন্নবীর দিন খরচ করছেন এইটা কি ঠিক? আল্লাহ বলেছেন আল্লাহর পথে খরচ করতে (দান করেন?)? যারা মিলাদুন্নবী করে তাদের চিন্তা দ্বীন পূর্ণাঙ্গ না তারা দ্বীন কে পূর্ণাঙ্গ করার অযথা চেষ্টা করছে। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন - “আমি তোমাদের জন্য দ্বীন কে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।” (সূরা আল মায়েদা, আয়াত নং - ৩)। কিন্তু আমরা মুসলিমরা ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী যেইটা করা উচিত সেইটাই আমরা করি না। অথচ আমাদের ঈদে মিলাদুন্নবীর দিনে নবী (সাঃ) প্রতি অতিরিক্ত সলাত (দুরুদ) পাঠ করা উচিত যা তিনি আদেশ করে গেছেন। বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম উৎসব উদযাপন। সাহাবীগণ ও পূর্ববর্তী ‘আলিমগণ হতে এটি পালন করাতো দূরের কথা বরং অনুমোদন দানের কোন বর্ণনাও পাওয়া যায় না। ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, “এ কাজটি পূর্ববর্তী সালাফগণ করেননি অথচ এ কাজ জায়েয থাকলে সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে তা পালন করার কার্যকারণ বিদ্যমান ছিল এবং পালন করতে বিশেষ কোন বাধাও ছিল না। যদি এটা শুধু কল্যাণের কাজই হতো তাহলে আমাদের চেয়ে তারাই এ কাজটি বেশী করতেন। কেননা তারা আমাদের চেয়েও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বেশী সম্মান ও মহব্বত করতেন এবং কল্যাণের কাজে তারা ছিলেন বেশী আগ্রহী।” নিম্নে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

ঈদে মিলাদুন্নবী'র শাব্দিক বিশ্লেষণঃ ‘ঈদ’ অর্থ হচ্ছে খুশি বা আনন্দ প্রকাশ করা। আর ‘মীলাদ’ ও ‘নবী’ দুটি শব্দ একত্রে মিলিয়ে ‘মীলাদুন নবী’ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ’ বলা হয়। ‘মীলাদ’-এর তিনটি শব্দ রয়েছে- **ميلاد** মীলাদ, **مولد** মাওলিদ ও **مولود** মাওলূদ। **ميلاد** ‘মীলাদ’ অর্থ জন্মের সময়, **مولد** ‘মাওলিদ’ অর্থ জন্মের স্থান, **مولود** ‘মাওলূদ’ অর্থ সদ্যপ্রসূত সন্তান। আর **النبي** ‘নবী’ শব্দ দ্বারা নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - উনাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আভিধানিক বা শাব্দিক অর্থে **ميلاد النبي** ‘মীলাদুন নবী’ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’ বলতে নূরে নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- ওনার বিলাদত শরীফকে বুঝানো হয়ে থাকে। আল্লামা ইবনে মানযূর তাঁর সুপ্রসিদ্ধ আরবী অভিধান “লিসানুল আরব” লিখছেনঃ “ **ولد فيه ميلاد الرجل: اسم الوقت الذي** ” অর্থাৎ: “লোকটির মীলাদঃ যে সময়ে সে জন্মগ্রহণ করেছে সে সময়ের নাম” [তথ্যসূত্রঃ ইবনে মনজুর, লিসানুল আরব (বৈরুত, দারু সাদের) ৩/৪৬৮]¹³⁹। স্বভাবতঃই মুসলিমগণ “মীলাদ” বা “মীলাদুন্নবী” বলতে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মের সময়ের আলোচনা করা বা জন্ম কথা বলা বোঝান না। বরং তাঁরা “মীলাদুন্নবী” বলতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) জন্মের সময় বা জন্মদিনকে বিশেষ পদ্ধতিতে উদযাপন করাকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

সুতরাং **عيد ميلاد النبي** ‘ঈদু মীলাদিন নবী’ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’ বলতে নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ, রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

¹³⁹ ইবনে মনজুর, লিসানুল আরব (বৈরুত, দারু সাদের) ৩/৪৬৮

ওনার বিলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশী প্রকাশ করাকে বুঝানো হয়েছে আর পারিভাষিক বা ব্যবহারিক অর্থে **عيد ميلاد النبي** ‘ঈদে মীলাদুন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’ বলতে হযরত মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - ওনার বিলাদত শরীফ উপলক্ষে ওনার ছানা-ছিফত বর্ণনা করা, ওনার প্রতি ছলাত-সালাম পাঠ করা, ওনার পুতঃপবিত্র জীবনী মুবারকের সামগ্রিক বিষয়ের আলোচনা করাকে বুঝানো হয়। এক কথায় ‘ঈদে মীলাদুন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ’ অর্থ নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার পবিত্র ‘বিলাদত শরীফ’ উপলক্ষে খুশী প্রকাশ করা। অর্থাৎ খুশী প্রকাশ করে মীলাদ শরীফ মাহফিলের ব্যবস্থা করা, ওনার শান-মান, মর্যাদা-মর্তবা আলোচনা করা, সলাত-সালাম পাঠ করা। বিঃ দ্রঃ ঈদ, মীলাদ ও আননাবী তিনটি শব্দই আরবী। যেগুলো ফার্সী ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়। শব্দ তিনটি একসাথে আরবীতে বললে এভাবে বলতে হবেঃ “ঈদু মীলাদিন নাবী” আর ফার্সীতে বললে হবেঃ “ঈদে মীলাদিন নাবী”। আর এ শব্দগুলো আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে “ঈদে মীলাদুন নাবী” রূপে।

সাধারণত ১২ রবীউল আওয়াল তারিখে নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম দিন উপলক্ষে এই উৎসব উদযাপিত হয়। তবে যে কোন ব্যক্তির জন্মদিন, নতুন ব্যবসায়ের সুত্রপাত, গৃহ নির্মাণ সমাপ্তি, মৃত্যু বার্ষিকী ইত্যাদি উপলক্ষ্যে বছরের যে কোন সময় মীলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। অথচ আল্লাহ তা’আলা পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাবের ৫৬ নং আয়াতে বলেছেনঃ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

নিশ্চয় আল্লাহ (উর্ধ্ব জগতে ফেরেশতাদের মধ্যে) নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দো‘আ করেন*। হে মুমিনগণ, তোমরাও নবীর উপর দরুদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

অথচ আমাদের সমাজে বর্তমানে যেসব জঘন্য বিদ‘আত অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বিদ্যমান তন্মধ্যে অন্যতম হলো- রাবী‘উল আওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জন্মদিন পালন বা ‘ঈদে মীলাদুন্নাবী’ উদযাপন। এই বিদ‘আত কর্মটি বিভিন্নভাবে পালিত হয়ে থাকে। কেউ কেউ এ (মীলাদুন্নাবী) উপলক্ষে সমবেত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জন্মকাহিনী পড়ে থাকেন কিংবা ওয়া‘য-নাসীহাত এবং বিভিন্ন ধরনের ক্বাসীদাহ, গযল, কবিতা ইত্যাদি আবৃত্তি করে থাকেন। কেউ কেউ এ উপলক্ষে সমবেত লোকদের মাঝে সেমাই, মিষ্টি ও হালুয়া বিতরণ করে থাকেন। এসব মীলাদ মাহ্‌ফিল কেউ কেউ মাসজিদে আবার কেউ কেউ নিজ নিজ বাড়িতে আয়োজন করে থাকেন।

আবার অনেকে এমনও আছেন যারা মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠানকে শুধুমাত্র উপরোক্ত কার্যাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন না, বরং তাতে তারা নানা ধরনের অবৈধ ও হারাম কাজ যেমন- নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ, ঢোল-তবলা, নাচ-গান, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা, তাকে আহ্বান করা, তাঁর সাহায্যে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করা ইত্যাদি বিভিন্ন রকম শির্কী ও কুফরী কাজ-কর্ম করে থাকে। এই মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান তা

যেভাবেই পালন বা উদযাপন করা হোক না কেন কিংবা যে কোন উদ্দেশ্যেই করা হোক না কেন, ইসলামী শারী'য়াতে সর্বাবস্থায় এটি বিদ'আত ও নিষিদ্ধ গর্হিত কাজ। এটি উত্তম যুগের অনেক পরে ইসলামের মধ্যে নব-আবিষ্কৃত একটি কাজ।

স্বভাবতঃই আমরা যে কোন ইসলামী আলোচনা কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের আলোকে শুরু করি। কুরআনুল কারীমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের “মীলাদ” অর্থাৎ তাঁর জন্ম, জন্ম সময় বা জন্ম উদযাপন বা পালন সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। কুরআন করীমে পূর্ববর্তী কোন কোন নবীর জন্মের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, তবে কোথাও কোনভাবে কোন দিন, তারিখ, মাস উল্লেখ করা হয় নি। অনুরূপভাবে “মীলাদ” পালন করতে, অর্থাৎ কারো জন্ম উদযাপন করতে বা জন্ম উপলক্ষে আলোচনার মাজলিস করতে বা জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের কোন নির্দেশ, উৎসাহ বা প্রেরণা দেওয়া হয় নি। শুধুমাত্র আল্লাহর মহিমা বর্ণনা ও শিক্ষা গ্রহণের জন্যই এসকল ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্যাদি আলোচনার মাধ্যমে এর আত্মিক প্রেরণার ধারাবাহিকতা ব্যহত করা হয় নি। এজন্য আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন সম্পর্কে আলোচনায় মূলত: হাদীস শরীফ ও পরবর্তী যুগের মুসলিম ঐতিহাসিক ও আলেমগণের মতামতের উপর নির্ভর করবঃ

হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনঃ হাদীস বলতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কর্ম, অনুমোদন বা তাঁর সম্পর্কে কোন বর্ণনা বুঝি। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহাবীগণের কথা, কর্ম বা অনুমোদনকেও হাদীস বলা হয়ে থাকে [তথ্যসূত্রঃ আব্দুল হাই লাখনাবী, যাকরুল আমানী ফী মুখতাসারিল জুরজানী (সংযুক্ত আরব আমিরাত, দুবাই, দারুল ইলম, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫) ৩১-৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]¹⁴⁰। হাদীস (حَدِيث) আরবী শব্দ। এর বহুবচন (أَحَادِيث) হাদীস (حَدِيث) শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে নতুন, নবীন, আধুনিক, নব্য, সাম্প্রতিক। আরবী অভিধান ও কোরআনের ব্যবহার অনুযায়ী ‘হাদীস’ শব্দের অর্থ- কথা, বাণী [speech, word (s)], বার্তা, সংবাদ, বিষয়, খবর (خَبْر) ও ব্যাপার ইত্যাদি। [তথ্যসূত্রঃ আরবী - বাংলা অভিধান, ডঃ ফজলুর রহমান, পৃষ্ঠা ২৮০; আল মাওরিদ, (আরবী-ইংরেজী অভিধান) মুনির বাআলবাকী]¹⁴¹।

حَدِيث (হাদীস) শব্দটি একবচন, এর বহুবচন حَدَثَان (হুদিসানুন) বা أَحَادِيث (আহাদীসু) বা حَدَاثَاء (হুদাসাউ)। যার লুগাতী বা শাব্দিক অর্থ হচ্ছে কথা, বাণী, সংবাদ, ব্যাপার, বিষয়, পুরাতন সংবাদ ইত্যাদি। আর ‘ইসতিলাহী’ বা পারিভাষিক অর্থে সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খাতামুন নাবিয়ীন, হাবীবুল্লাহ, সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন, করেছেন বা অন্যের কোন কথা বা কাজের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন তাকে সুন্নাহ বা হাদীস বলে। অর্থাৎ রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কর্ম, সম্মতি, চারিত্রিক গুণবলীকে হাদীস বলা হয়। আল্লামা হাফেজ সাখাবী (রহঃ) বলেন-

¹⁴⁰ আব্দুল হাই লাখনাবী, যাকরুল আমানী ফী মুখতাসারিল জুরজানী (সংযুক্ত আরব আমিরাত, দুবাই, দারুল ইলম, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫) ৩১-৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

¹⁴¹ আরবী - বাংলা অভিধান, ডঃ ফজলুর রহমান, পৃষ্ঠা ২৮০; আল মাওরিদ, (আরবী-ইংরেজী অভিধান) মুনির বাআলবাকী

والحديث لغة ضد القديم واصطلاحاً ما اضيف الى النبي ﷺ قولاً له او فعلاً
له او تقرير اوصفة حتى الحركات والسكنات في اليقظة والنام

অর্থঃ আভিধানিক অর্থে হাদীস শব্দটি কাদীম তথা অবিনশ্বরের বিপরীত
আর পরিভাষায় বলা হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর
দিকে সম্বন্ধযুক্ত। চাই তার বক্তব্য হোক বা কর্ম বা অনুমোদন অথবা গুণ
এমন কি ঘুমন্ত অবস্থায় বা জাগ্রত অবস্থায় তাঁর গতি ও স্থির সবই হাদীস।

সহীহ বুখারীতে বিশিষ্ট ব্যাখ্যাগ্রন্থ **عمدة القارى** এর মধ্যে হাদীস সম্বন্ধে
রয়েছেঃ

- علم الحديث هو علم يعرف به اقوال النبي ﷺ وافعاله واخواله

অর্থঃ ইলমে হাদীস এমন বিশেষ জ্ঞান যার সাহায্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা, কাজ ও অবস্থা জানতে পারা যায়।

হাদীস' শব্দের বিশ্লেষণ করে ইমাম রাগব ইসফাহানী লিখেছেনঃ

الْحَدِيثُ: وَالْحَدِيثُ كَوْنُ الشَّيْءِ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ عَرَضًا كَانَ تَوَّ أَوْجَدَ هَرًا وَكَلَّ
-كَلَامٍ يَبْلُغُ الْإِنْسَانَ مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ أَوْ الْوَجْهِ فِي يَفْظَتِهِ أَوْ مَنَامِهِ حَدِيثٌ

‘হাদীস’ আর ‘হুদুস’ বলতে বুঝায় কোন একটি অস্তিত্বহীন জিনিসের অস্তিত্ব
লাভ করা, তা কোন মৌলিক জিনিস হোক কি অমৌলিক। আর মানুষের
নিকট শ্রবণেন্দ্রীয় বা ওহীর সূত্রে নিদ্রায় কিংবা জাগরণে যে কোন কথা
পৌঁছায়, তাকেই হাদীস বলে। অন্যত্র তিনি লিখেছেনঃ

شَيْءٌ نُلْقَى فِي رَوْعٍ أَحَدٍ مِنْ جِهَةِ الْمَلَأْ

উচ্চতর জগত হতে একজনের অন্তর্লোকে যা কিছু উদ্ভিক্ত হয় তাই হাদীস¹⁴²।

হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে প্রায় অর্ধশতাব্দিক গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস ও তাঁর সাহাবাগণের মতামত সনদ বা বর্ণনাসূত্রসহ সংকলিত হয়। তন্মধ্যে “আল-কুতুবুস সিত্তাহ” নামে প্রসিদ্ধ ৬টি অতি প্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল হাদীসগ্রন্থের সংকলিত হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবার, জন্মদিন ও জন্মতারিখ সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

একঃ জন্মবারঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবার সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ: “ذَٰكَ يَوْمٌ وَلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ

আবু কাতাদা আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সোমবার দিন রোজা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেনঃ

“এই দিনে (সোমবারে) আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনেই আমি নবুয়ত পেয়েছি” [তথ্যসূত্রঃ সহীহ মুসলিম (মিশর, কাইরো, দারু এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তারিখবিহীন) ২/৮১৯]¹⁴³।

¹⁴² হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মাওলানা আব্দুর রহীম নামক, খায়রুন প্রকাশনী, পৃষ্ঠা নং -২০।

¹⁴³ সহীহ মুসলিম (মিশর, কাইরো, দারু এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তারিখবিহীন) ২/৮১৯

ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেনঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "وُلِدَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَاسْتُئْتِبِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَتُوْفِيَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَرَفَعَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ"

ইবনে আববাস বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন, সোমবারে নবুয়ত লাভ করেন, সোমবারে ইস্তেকাল করেন, সোমবারে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনার পথে রওয়ান করেন, সোমবারে মদীনা পৌছান এবং সোমবারেই তিনি হাজারে আসওয়াদ উত্তোলন করেন” [তথ্যসূত্রঃ আহমাদ ইবনে হাম্বাল, আল-মুসনাদ (মিসর, দারুল মা’আরিফ, ১৯৫০) ৪/১৭২-১৭৩, নং ২৫০৬ (সম্পাদক আহমদ শাকির সনদ আলোচনা করে বলেছেন: হাদীসটির সনদ সহীহ)]¹⁴⁴।

এভাবে আমরা হাদীস শরীফ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবার জানতে পারি। সহীহ হাদীসের আলোকে প্রায় সকল ঐতিহাসিক একমত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার জন্মগ্রহণ করেন।

দুইঃ জন্ম বৎসরঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবৎসর বা জন্মের সাল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছেঃ

عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ. وَسَأَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَبَاثَ بَنَ"

¹⁴⁴ আহমাদ ইবনে হাম্বাল, আল-মুসনাদ (মিসর, দারুল মা’আরিফ, ১৯৫০) ৪/১৭২-১৭৩, নং ২৫০৬ (সম্পাদক আহমদ শাকির সনদ আলোচনা করে বলেছেন: হাদীসটির সনদ সহীহ)

أَشْتَمَ أَخَا بَنِي يَعْمَرَ بْنِ لَيْثٍ أَنْتَ أَكْبَرُ أَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ مِنِّي وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ وَلِدَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ. رواه الترمذي وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ

কায়স ইবনে মাখরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুজনেই “হাতীর বছরে” জন্মগ্রহণ করেছি।
উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু কুবাস ইবন আশইয়ামকে প্রশ্ন করেনঃ আপনি বড় না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড়? তিনি উত্তরে বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার থেকে বড়, আর আমি তাঁর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম “হাতীর বছরে” জন্মগ্রহণ করেন” [তথ্যসূত্রঃ তিরমিযী, আল-জামিয়, প্রাগুক্ত ৫/৫৫০, নং ৩৬১৯। ইমাম তিরমিযী বলেছেনঃ হাদীসটি হাসান গরীব]¹⁴⁵। হাতীর বছর অর্থাৎ যে বৎসর আবরাহা হাতী নিয়ে কাবা ঘর ধ্বংসের জন্য মক্কা আক্রমণ করেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে এ বছর ৫৭০ বা ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দ ছিল [তথ্যসূত্রঃ আকরাম যিয়া আর-উমারী, আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ আস-সহীহা (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৩) ১/৯৬-৯৮, মাহদী রেজকুল্লাহ আহমদ, আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ (সৌদি আরব, রিয়াদ, বাদশাহ ফয়সল কেন্দ্র, ১ম সংস্করণ, ১৯৯২) ১০৯-১১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)]¹⁴⁶।

¹⁴⁵ তিরমিযী, আল-জামিয়, প্রাগুক্ত ৫/৫৫০, নং ৩৬১৯। ইমাম তিরমিযী বলেছেনঃ হাদীসটি হাসান গরীব

¹⁴⁶ আকরাম যিয়া আর-উমারী, আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ আস-সহীহা (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৩) ১/৯৬-৯৮, মাহদী রেজকুল্লাহ আহমদ, আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ (সৌদি আরব, রিয়াদ, বাদশাহ ফয়সল কেন্দ্র, ১ম সংস্করণ, ১৯৯২) ১০৯-১১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

তিন. জন্মমাস ও জন্ম তারিখঃ এভাবে আমরা হাদীস শরীফের আলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম বৎসর ও জন্ম বার সম্পর্কে জানতে পারি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন হাদীসে তাঁর জন্মমাস ও জন্মতারিখ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। একারণে পরবর্তী যুগের আলেম ও ঐতিহাসিকগণ তাঁর জন্মতারিখ সম্পর্কে অনেক মতভেদ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনঃ আলেমগণ ও ঐতিহাসিকদের মতামতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ সম্পর্কে যেহেতু হাদীসে রাসূলের হাদীসে কোন বর্ণনা আসে নি এবং সাহাবীগণের মাঝেও এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট মত প্রচলিত ছিল না, তাই মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

ইবনে হিশাম, ইবনে সা‘দ, ইবনে কাসীর, কাসতাল্লানী ও অন্যান্য ঐতিহাসিক ও সীরাতুল্লাহী লিখকগণ এ বিষয়ে নিম্নলিখিত মতামত উল্লেখ করেছেনঃ

কারো মতে, তাঁর জন্ম তারিখ অজ্ঞাত, তা জানা যায় নি, এবং তা জানা সম্ভব নয়। তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এটুকুই শুধু জানা যায়, জন্ম মাস বা তারিখ জানা যায় না। এ বিষয়ে কোন আলোচনা তারা অবাস্তব মনে করেন।

কারো কারো মতে, তিনি মুহাররম মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

অন্য মতে, তিনি সফর মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

কারও কারও মতে, তিনি রবিউল আউআল মাসের ২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম ঐতিহাসিক ও মাগাযী প্রণেতা মুহাদ্দিস আবু মাশার নাজীহ ইবন আব্দুর রহমান আস-সিনদী (১৭০হঃ) এই মতটি গ্রহণ করেছেন।

অন্য মতে, তাঁর জন্ম তারিখ রবিউল আউআল মাসের ৮ তারিখ। আল্লামা কাসতালানী ও যারকানীর বর্ণনায় এই মতটিই অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন। এই মতটি দুইজন সাহাবী ইবনে আববাস ও জুবাইর ইবন মুতয়িম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সীরাতুননবী বিশেষজ্ঞ এই মতটি গ্রহণ করেছেন বলে তারা উল্লেখ করেছেন।

প্রখ্যাত তাবেরী ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (১২৫হঃ) তাঁর উস্তাদ প্রথম শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও নসাববিদ ঐতিহাসিক তাবেরী মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতয়িম (১০০হঃ) থেকে এই মতটি বর্ণনা করেছেন।

কাসতালানী বলেনঃ “মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর আরবদের বংশ পরিচিতি ও আরবদের ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ সম্পর্কিত এই মতটি তিনি তাঁর পিতা সাহাবী জুবাইর ইবন মুতয়িম থেকে গ্রহণ করেছেন। স্পেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ আলী ইবনে আহমদ ইবনে হাযম (৪৫৬হঃ) ও মুহাম্মাদ ইবনে ফাতুহ আল-হুমাইদী (৪৮৮হঃ) এই মতটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন।

স্পেনের মুহাদ্দিস আল্লামা ইউসূফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল বার (৪৬৩ হিঃ) উল্লেখ করেছেন যে, ঐতিহাসিকগণ এই মতটিই সঠিক বলে মনে করেন। মীলাদের উপর প্রথম গ্রন্থ রচনাকারী আল্লামা আবুল খাতাব ইবনে দেহিয়া (৬৩৩ হিঃ) ঈদে মীলাদুন্নবীর উপর লিখিত “আত-তানবীর ফী মাওলিদিল বাশির আন নাযীর” গ্রন্থে এই মতটিকেই গ্রহণ করেছেন। অন্য মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ ১০ই রবিউল আউয়াল। এই মতটি ইমাম হুসাইনের পৌত্র মুহাম্মাদ ইবন আলী আল বাকের (১১৪হিঃ) থেকে বর্ণিত। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আমির ইবন শারাহিল আশ শা‘বী (১০৪হিঃ) থেকেও এই মতটি বর্ণিত।

ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবন উমর আল-ওয়াকিদী (২০৭হিঃ) এই মত গ্রহণ করেছেন। ইবনে সা‘দ তার বিখ্যাত “আত-তাবাকাতুল কুবরা”-য় শুধু দুইটি মত উল্লেখ করেছেন, ২ তারিখ ও ১০ তারিখ [তথ্যসূত্রঃ ইবনে সা‘দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা (বৈরুত, দারু এহইয়ায়েত তুরাসিল আরাবী) ১/৪৭]¹⁴⁷।

কারও কারও মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ ১২ রবিউল আউয়াল। এই মতটি হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (১৫১হিঃ) গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতীর বছরে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন” [তথ্যসূত্রঃ ইবনে হিশাম,

¹⁴⁷ ইবনে সা‘দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা (বৈরুত, দারু এহইয়ায়েত তুরাসিল আরাবী) ১/৪৭

আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ (মিশর, কায়রো, দারুল রাইয়ান, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৮)১/১৮৩]¹⁴⁸।

এখানে লক্ষণীয় যে, ইবনে ইসহাক সীরাতুননবীর সকল তথ্য সাধারণতঃ সনদ সহ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এই তথ্যটির জন্য কোন সনদ উল্লেখ করেন নি। কোথা থেকে তিনি এই তথ্যটি গ্রহণ করেছেন তাও জানান নি বা সনদসহ প্রথম শতাব্দীর কোন সাহাবী বা তাবেয়ী থেকে মতটি বর্ণনা করেন নি। এ জন্য অনেক গবেষক এই মতটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন [তথ্যসূত্রঃ মাহদী রেজকুল্লাহ আহমদ, আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ, ১০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]¹⁴⁹।

অন্য মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ ১৭ই রবিউল আউয়াল।

অন্য মতে তাঁর জন্ম তারিখ ২২ শে রবিউল আউয়াল।

অন্য মতে তিনি রবিউস সানী মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

অন্য মতে তিনি রজব জন্মগ্রহণ করেছেন।

অন্য মতে তিনি রমযান মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। ওয় হিজরী শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যুবাইর ইবনে বাক্বার (২৫৬ হি:) থেকে এই মতটি বর্ণিত।

¹⁴⁸ ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ (মিশর, কায়রো, দারুল রাইয়ান, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৮)১/১৮৩

¹⁴⁹ মাহদী রেজকুল্লাহ আহমদ, আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ, ১০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

তাঁর মতের পক্ষে যুক্তি হলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বসম্মতভাবে রমযান মাসে নবুয়ত পেয়েছেন। তিনি ৪০ বৎসর পূর্তিতে নবুয়ত পেয়েছেন। তাহলে তাঁর জন্ম অবশ্যই রমযানে হবে [তথ্যসূত্রঃ ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ১/১০০-১০১, ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬) ২/২১৫, আল-কাসতালানী, আহমদ বিন মুহাম্মাদ, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬) ১/৭৪-৭৫, আল-যারকানী, শরহুল মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬) ১/২৪৫-২৪৮, ইবনে রাজাব, লাভায়েফুল মাযারেফ, প্রাগুক্ত ১/১৫০]¹⁵⁰।

মীলাদুন্নবী বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিবস পালন বা উদযাপনঃ

ক) পূর্বকথাঃ উপরের আলোচনা থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মবার, জন্মমাস ও জন্মতারিখ সম্পর্কে হাদীস ও ঐতিহাসিকদের মতামত জানতে পেরেছি। তাঁর জন্মদিন সম্পর্কে ইসলামের প্রথম যুগগুলির আলেম ও ঐতিহাসিকদের মতামতের বিভিন্নতা থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারছি যে, প্রথম যুগে, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

¹⁵⁰ ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ১/১০০-১০১, ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬) ২/২১৫, আল-কাসতালানী, আহমদ বিন মুহাম্মাদ, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬) ১/৭৪-৭৫, আল-যারকানী, শরহুল মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬) ১/২৪৫-২৪৮, ইবনে রাজাব, লাভায়েফুল মাযারেফ, প্রাগুক্ত ১/১৫০

জন্মদিন পালন বা উদযাপন করার প্রচলন ছিল না। কারণ তাহলে এধরণের মতবিরোধের কোন সুযোগ থাকত না। মুহাদ্দিস, ফকিহ ও ঐতিহাসিকদের গবেষণা আমাদের এই অনুমানকে সত্য প্রমাণিত করেছে।

আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন পালন বা রবিউল আউয়াল মাসে “ঈদে মীলাদুননবী” পালনের বৈধতা ও অবৈধতা নিয়ে আলেম সমাজে অনেক মতবিরোধ হয়েছে, তবে মীলাদুননবী উদযাপনের পক্ষের ও বিপক্ষের সকল আলেম ও গবেষক একমত যে, ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে “ঈদে মীলাদুননবী” বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন পালন করা বা উদযাপন করার কোন প্রচলন ছিল না। নবম হিজরী শতকের অন্যতম আলেম ও ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে হাজার আল-আসকালানী (মৃত্যুঃ ৮৫২হিঃ ১৪৪৯খ্রিঃ) লিখেছেনঃ “মাওলিদ পালন মূলতঃ বিদ‘আত। ইসলামের সম্মানিত প্রথম তিন শতাব্দীর সালফে সালেহীনদের কোন একজনও এ কাজ করেন নি” [তথ্যসূত্রঃ আস-সালেহী, মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ, আস-সীরাতুশ শামিয়াহ (বৈরুত, দারুল কুতুব আল- ইলমিয়াহ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩) ১/৩৬৬]¹⁵¹।

নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আল্লামা আবুল খাইর মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহমান আস-সাখাবী (মৃত্যুঃ ৯০২হিঃ ১৪৯৭খ্রিঃ) লিখেছেনঃ

¹⁵¹ আস-সালেহী, মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ, আস-সীরাতুশ শামিয়াহ (বৈরুত, দারুল কুতুব আল- ইলমিয়াহ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩) ১/৩৬৬

“ইসলামের সম্মানিত প্রথম তিন যুগের সালফে সালেহীনদের (সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের) কোন একজন থেকেও মাওলিদ পালনের কোন ঘটনা খুজে পাওয়া যায় না। মাওলিদ পালন বা উদযাপন পরবর্তী যুগে উদ্ভাবিত হয়েছে। এরপর থেকে সকল দেশের ও সকল বড় বড় শহরের মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মমাস পালন করে আসছেন। এ উপলক্ষ্যে তারা অত্যন্ত সুন্দর জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবময় খানাপিনার মাহফিলের আয়োজন করেন, এ মাসের রাতে তাঁরা বিভিন্ন রকমের দান-সদকা করেন, আনন্দপ্রকাশ করেন এবং জনকল্যাণমূলক কর্ম বেশী করে করেন। এ সময়ে তাঁরা তাঁর জন্মকাহিনী পাঠ করতে মনোনিবেশ করেন” [তথ্যসূত্রঃ আস-সালেহী, সীরাত ১/৩৬২]¹⁵²। লাহোরের প্রখ্যাত আলেম সাইয়েদ দিলদার আলী (১৯৩৫খ্রিঃ) মীলাদের সপক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেনঃ “মীলাদের কোন আসল বা সুত্র প্রথম তিন যুগের (সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ) কোন সালফে সালেহীন থেকে বর্ণিত হয় নি; বরং তাঁদের যুগের পরে এর উদ্ভাবন ঘটেছে” (তথ্যসূত্রঃ সাইয়েদ দিলদার আলী, রাসূলুল কালাম ফিল মাওলিদ ওয়াল কিয়াম (লাহোর), ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)¹⁵³।

আলেমদের এই ঐক্যমতের কারণ হলো, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে সংকলিত অর্ধশতাব্দিক সনদভিত্তিক হাদীসের গ্রন্থ, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্ম, আচার-আচরণ, কথা, অনুমোদন, আকৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি সংকলিত রয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের মতামত ও কর্ম সংকলিত হয়েছে সে সকল গ্রন্থের একটিও সহীহ বা দুর্বল

¹⁵² আস-সালেহী, সীরাত ১/৩৬২

¹⁵³ সাইয়েদ দিলদার আলী, রাসূলুল কালাম ফিল মাওলিদ ওয়াল কিয়াম (লাহোর), ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

হাদীসে দেখা যায় না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় বা তাঁর মৃত্যুর পরে কোন সাহাবী সামাজিকভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জন্ম উদযাপন, জন্ম আলোচনা বা জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট কোন দিনে বা অনির্দিষ্টভাবে বৎসরের কোন সময়ে কোন অনুষ্ঠান করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ছিলেন তাঁদের সকল আলোচনা, সকল চিন্তা চেতনার প্রাণ, সকল কর্মকাণ্ডের মূল। তাঁরা রাহমাতুল্লিল আলামীনের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) জীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা আলোচনা করে তাঁর ভালবাসায় চোখের পানিতে বুক ভিজিয়েছেন। তাঁর আকৃতি, প্রকৃতি, পোষাক আশাকের কথা আলোচনা করে জীবন অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু তাঁরা কখনো তাঁর জন্মদিন পালন করেন নি। এমনকি তাঁর জন্মমুহূর্তের ঘটনাবলী আলোচনার জন্যও তাঁরা কখনো বসেন নি বা কোন দান-সাদকা, তিলাওয়াত ইত্যাদির মাধ্যমেও কখনো তাঁর জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করেন নি। তাঁদের পরে তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের অবস্থাও তাই ছিল।

বস্তুতঃ কারো জন্ম বা মৃত্যুদিন পালন করার বিষয়টি আরবের মানুষের কাছে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। জন্মদিন পালন “আ‘জামী” বা অনারবীয় সংস্কৃতির অংশ। প্রথম যুগের মুসলিমগণ তা জানতেন না। পারস্যের মাজুস (অগ্নি উপাসক) ও বাইযান্টাইন খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল জন্মদিন, মৃত্যুদিন ইত্যাদি পালন করা। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে পারস্য, সিরিয়া, মিসর ও এশিয়া মাইনরের যে সকল মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আসেন তাঁরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাহাবীদের অনুসরণ অনুকরণ করতেন এবং তাঁদের জীবনাচারণে

রীতিনীতিরই প্রাধান্য ছিল। হিজরী তৃতীয় শতাব্দী থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে অনারব পারস্যান ও তুর্কী মুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির প্রচলন ঘটে, তন্মধ্যে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী অন্যতম।

ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন - প্রাথমিক প্রবর্তন ও সীমিত উদযাপনঃ আমরা জানতে পারলাম প্রথম যুগগুলোর পরে মীলাদ অনুষ্ঠান বা ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের শুরু হয়েছে। কিন্তু কবে থেকে? কে শুরু করলেন? আসুন আমরা তাদের সাথে পরিচিত হই এবং কিভাবে তাঁরা এই অনুষ্ঠান পালন করতেন তা জানার চেষ্টা করি। ইতিহাসের আলোকে যতটুকু জানতে পেরেছি, দুই ঈদের বাইরে কোন দিবসকে সামাজিক ভাবে উদযাপন শুরু হয় হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শিয়াদের উদ্যোগে। সর্বপ্রথম ৩৫২ হিজরীতে (৯৬৩খ্রিঃ) বাগদাদের আববাসী খলীফার প্রধান প্রশাসক ও রাষ্ট্রের প্রধান নিয়ন্ত্রক বনী বুয়াইহির শিয়া শাসক মুইজ্জুদ্দৌলা ১০ই মুহররাম আশুরাকে শোক দিবস ও জিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখ গাদীর খুম দিবস উৎসব দিবস হিসাবে পালন করার নির্দেশ দেন। তার নির্দেশে এই দুই দিবস সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। যদিও শুধুমাত্র শিয়ারাই এই দুই দিবস পালনে করেন, তবুও তা সামাজিক রূপ গ্রহণ করে। কারণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রথম বৎসরে এই উদযাপনে বাধা দিতে পারেন নি। পরবর্তী যুগে যতদিন শিয়াদের প্রতিপত্তি ছিল এই দুই দিবস উদযাপন করা হয়, যদিও তা মাঝে মাঝে শিয়া-সুন্নী ভয়ঙ্কর সংঘাত ও গৃহযুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায় [তথ্যসূত্রঃ আগাখানী, বুহরা, বাতেনী শিয়াদের পূর্বপুরুষ]। ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন করার ক্ষেত্রেও শিয়াগণ

ভূমিকা পালন করেন। উবাইদ বংশের রাফেযী ইসমাজ্জলী শিয়াগণ [তথ্যসূত্রঃ বিস্তারিত দেখুনঃ মাহমুদ শাকির, আত-তারিখুল ইসলামী (বাইরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১ম সংস্করণ ১৯৮৫ ইং) ৬/১১১-১১২, ১২৩-১২৪, ১৩৬-১৩৭, ১৬৫-১৬৮, ১৮০-১৮২, ১৯৩-১৯৬, ২০৮-২০৯, ২৩৩, ২৪৮, ২৬৫, ২৮৭-২৮৯, ৩০৩-৩০৭]¹⁵⁴। ফাতেমী বংশের নামে আফ্রিকার উত্তরাংশে রাজত্ব স্থাপন করেন। ৩৫৮ হিজরীতে (৯৬৯ খ্রিঃ) তারা মিশর দখল করে তাকে ফাতেমী রাষ্ট্রের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলেন এবং পরবর্তী ২ শতাব্দীরও অধিককাল মিশরে তাদের শাসন ও কর্তৃত্ব বজায় থাকে। গাজী সালাহুদ্দীন আইউবীর মিশরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের মাধ্যমে ৫৬৭ হিজরীতে (১১৭২খ্রিঃ) মিশরের ফাতেমী শিয়া রাজবংশের সমাপ্তি ঘটে [তথ্যসূত্রঃ আল-মাকরীযী, আহমদ বিন আলী, আল-মাওয়াযিজ ওয়াল ইতিবার বি যিকরিল খুতাতি ওয়াল আসার (মিশর, কাইরো, মাকতাবাতুস সাকাফা আদ দীনীয়াহ) ৪৯০-৪৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]¹⁵⁵। এই দুই শতাব্দীর শাসনকালে মিশরের ইসমাজ্জলী শিয়া শাসকগণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ২ ঈদ ছাড়াও আরো বিভিন্ন দিন পালন করতেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই ছিল জন্মদিন। তাঁরা অত্যন্ত আনন্দ, উৎসব ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৫টি জন্মদিন পালন করতেনঃ

১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন,

¹⁵⁴ বিস্তারিত দেখুনঃ মাহমুদ শাকির, আত-তারিখুল ইসলামী (বাইরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১ম সংস্করণ ১৯৮৫ ইং) ৬/১১১-১১২, ১২৩-১২৪, ১৩৬-১৩৭, ১৬৫-১৬৮, ১৮০-১৮২, ১৯৩-১৯৬, ২০৮-২০৯, ২৩৩, ২৪৮, ২৬৫, ২৮৭-২৮৯, ৩০৩-৩০৭

¹⁵⁵ আল-মাকরীযী, আহমদ বিন আলী, আল-মাওয়াযিজ ওয়াল ইতিবার বি যিকরিল খুতাতি ওয়াল আসার (মিশর, কাইরো, মাকতাবাতুস সাকাফা আদ দীনীয়াহ) ৪৯০-৪৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

- ২) আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্মদিন,
- ৩) ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার জন্মদিন,
- ৪) হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্মদিন ও
- ৫) হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্মদিন।

এ ছাড়াও তারা তাদের জীবিত খলীফার জন্মদিন পালন করতেন এবং “মীলাদ” নামে ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মদিন (বড়দিন বা ক্রীসমাস), যা মিশরের খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তা আনন্দপ্রকাশ, মিষ্টি ও উপহার বিতরণের মধ্য দিয়ে উদযাপন করতেন (তথ্যসূত্রঃ বিস্তারিত দেখুনঃ ইবনে কাসীরঃ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৭ম খন্ড, মাহমুদ শাকির, আত-তারিখ আল-ইসলামী, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খন্ড)¹⁵⁶।

ঈদে মীলাদুননবীর প্রাথমিক উদযাপন - যুগ ও প্রবর্তক পরিচিতিঃ হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে মিশরে এই উদযাপন শুরু হয়। এ যুগকে আববাসীয় খেলাফতের দুর্বলতার যুগ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন ঐতিহাসিকগণ। আববাসীয় খেলাফতের প্রথম অধ্যায় শেষ হয় ২৩২ হিঃ (৮৪৭খ্রিঃ) ৯ম আববাসী খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এরপর সুবিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবনতির সূচনা হয়। কারণ কেন্দ্রীয় প্রশাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশাল সাম্রাজ্য বিভিন্ন ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়। এসকল রাষ্ট্রের

¹⁵⁶ বিস্তারিত দেখুনঃ ইবনে কাসীরঃ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৭ম খন্ড, মাহমুদ শাকির, আত-তারিখ আল-ইসলামী, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খন্ড

মধ্যে অবিরত যুদ্ধ বিগ্রহ চলতে থাকে। এছাড়া কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দুর্বলতার কারণে বিভিন্ন এলাকায় সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্তরা লুটতরাজ চালানোর সুযোগ পায়। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যহত হয়। বিশেষ করে ৩৩৪ হিঃ (৯৪৫খ্রিঃ) থেকে বাগদাদে শীয়া মতাবলম্বী বনু বুয়াইহ শাসকগণ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যান, ফলে ইসলামী জ্ঞানচর্চা, হাদীস ও সুন্নাহের অনুসরণ ব্যহত হয়। রাফেযী শীয়া মতবাদের প্রসার ঘটতে থাকে। অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী জনগণ শিয়াদের বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে প্রতিবাদ করলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শীয়া-সুন্নী সংঘর্ষ ও গৃহযুদ্ধের রূপ ধারণ করত। এ সকল সংঘর্ষ মূলতঃ দেশের সার্বিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটাত। আভ্যন্তরীণ অশান্তি ও অনৈক্য বহির্শত্রুর আগ্রাসনের কারণ হয়। এশিয়া মাইনর, আর্মেনীয়া, ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন খ্রিষ্টান শাসক সুযোগমত ইসলামী সম্রাজ্যের আভ্যন্তরে আগ্রাসন চালাতে থাকেন। এছাড়া ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচার ও উস্কানীমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে জ্ঞানচর্চা, ধর্মীয় মূল্যবোধের বিকাশ ব্যহত হয়। অপরদিকে সমাজের মানুষের মধ্যে বিলাসিতা ও পাপাচারের প্রসার ঘটতে থাকে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইসলাম বিরোধী আচার আচরণ, কুসংস্কার, ধর্মীয় বিকৃতি ছড়িয়ে পড়ে। এই যুগের বিচ্ছিন্ন ইসলামী সম্রাজ্যের একটি বিশেষ অংশ ও ইসলামী সভ্যতার অনন্তম কেন্দ্র মিশরে ফাতেমী খলীফা আল-মুয়িজ্জ লি-দীনিল্লাহ সর্বপ্রথম ঈদে মীলাদুন্নবী, অন্যান্য জন্মদিন পালন ও সে উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসবের শুরু করেন। তিনি ৩৫৮ হিজরীতে মিসর অধিকার করেন এবং কায়রো শহরের পত্তন করেন। তিনি সিরিয়া ও হেজাজের বিভিন্ন অঞ্চল ও তাঁর অধীনে আনেন। ৩৬২ হিজরীতে (৯৭২খ্রিঃ) মুয়িজ্জ কায়রো প্রবেশ করেন এবং কায়রোকেই তাঁর

রাজধানী হিসাবে গ্রহণ করেন। ৩৬৫ হিজরীতে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর শাসনামলে মিশরে শিয়া শাসকদের যে সকল উৎসবাদি প্রচলিত হয় তার অন্যতম ছিল ঈদে মীলাদুন্নবী উৎসব [তথ্যসূত্রঃ যাহাবী, নুবালা, ১৫/১৬৪। আরো দেখুনঃ ইবনে খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান (ইরান, কূম, মানশুরাতুশ শরীফ আর-রাযী, ২য় সংস্করণ) ৫/২২৪-২২৮, আল-যিরিকলী, আল-আলাম বৈরুত, দারুল ইলম লিল মালাঈন, ৯ম সংস্করণ, ১৯৯০) ৭/২৬৫]¹⁵⁷।

আল মুয়িজ্জ এর প্রচলিত এই ঈদে মীলাদুন্নবী ও অন্যান্য জন্মদিন পালন ও উদযাপন পরবর্তী প্রায় ১০০ বৎসর কায়রোতে শিয়াদের মধ্যে এই উৎসব চালু থাকে। ৪৮৭ হি: (১০৯৪ খ্রিঃ) ফাতেমী খলীফা আল-মুসতানসিরের মৃত্যু হলে সেনাপতি আল-আফযাল ইবন বদর আল-জামালীর সহযোগিতায় মুস্তানসিরের ছোট ছেলে ২১ বৎসর বয়স্ক আল-মুস্তা'লী খলীফা হন। সেনাপতি আফযাল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়েন। তিনি ৪৮৮ হিজরীতে ফাতেমীদের প্রচলিত ঈদে মীলাদুন্নবী উৎসব ও অন্যান্য জন্মদিনের উৎসব বন্ধ করে দেন। পরবর্তী কোন কোন ফাতেমী শাসক পুনরায় এ সকল উৎসব সীমিত পরিসরে চালু করেন, তবে ক্রমান্বয়ে ফাতেমীদের প্রতিপত্তি সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং এ সকল উৎসব জৌলুস হারিয়ে ফেলে [তথ্যসূত্রঃ ইজ্জত আলী আতিয়া, আল-বিদয়াত (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮০) ৪১১ পৃ, ইসমাঈল বিন

¹⁵⁷ যাহাবী, নুবালা, ১৫/১৬৪। আরো দেখুনঃ ইবনে খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান (ইরান, কূম, মানশুরাতুশ শরীফ আর-রাযী, ২য় সংস্করণ) ৫/২২৪-২২৮, আল-যিরিকলী, আল-আলাম বৈরুত, দারুল ইলম লিল মালাঈন, ৯ম সংস্করণ, ১৯৯০) ৭/২৬৫

মুহাম্মাদ আল-আনসারী, আল-কাউলুল ফাসল (সৌদী আরব, রিয়াদ, আর-রিয়াসা আল-আমাহ লি ইদারাতিল বুহস, ১৯৮৫) ৬৪-৭২]¹⁵⁸।

ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ আবিষ্কারের কাহিনীঃ চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে ফাতিমী গোত্রের তথাকথিত দাবিদার [যারা নিজেদেরকে ফাতিমাহ (رضي الله عنه) এর বংশধর বলে মিথ্যা দাবি করে] ‘উবায়দী গোত্রের শী‘আ শাসকগণ এবং তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম আল মু‘য়য লি দ্বীনিল্লাহ নামক শাসক মিশরে এই বিদ‘আত প্রবর্তন করে। অতঃপর ৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা ৭ম হিজরী শতাব্দীর শুরুর দিকে, বিখ্যাত ঐতিহাসিক যথাক্রমে ইবনু কাসীর ও ইবনু খালকানের মতে ইরদীল শহরের শাসক মুযাফ্ফার আবু সাঈদ মুযাফ্ফরুদ্দীন কুকুবুরী পুনরায় নব উদ্যমে এই বিদ‘আতটি চালু করে। আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে, ক্রসেড বিজেতা মিসরের সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (৫৩২ - ৫৮৯ হিজরী) কর্তৃক নিয়োজিত ইরাকের ‘এরবল’ এলাকার গভর্নর মুযাফ্ফার আবু সাঈদ মুযাফ্ফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬ - ৬৩০ হিজরী) সর্বপ্রথম কারও মতে ৬০৪ হিজরী ও কারো হিসাব মতে ৬২৫ হিজরীতে মীলাদের সূচনা ঘটে। [তথ্যসূত্রঃ মহাম্মাদ জুনাগড়ী, মীলাদে মুহাম্মাদী (মউ, ইউ পি, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা নং - ৫, আবুবকর আল-জাযায়েরী, অধ্যাপক মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েত ছাপা, তাবি), পৃষ্ঠা নং - ৩১।]¹⁵⁹ তাঁর এই মীলাদ আবিষ্কারের পিছনের

¹⁵⁸ ইজ্জত আলী আতিয়া, আল-বিদয়াত (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮০) ৪১১

পৃ, ইসমাইল বিন মুহাম্মাদ আল-আনসারী, আল-কাউলুল ফাসল (সৌদী আরব, রিয়াদ, আর-রিয়াসা আল-আমাহ লি ইদারাতিল বুহস, ১৯৮৫) ৬৪-৭২

¹⁵⁹ মহাম্মাদ জুনাগড়ী, মীলাদে মুহাম্মাদী (মউ, ইউ পি, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা নং - ৫, আবুবকর আল-জাযায়েরী, অধ্যাপক মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েত ছাপা, তাবি), পৃষ্ঠা নং - ৩১।

কাহিনী আর কিছুই নয় বরং মিথ্যা নাবী প্রেমের মহড়া দেখিয়ে জনসাধারণের মন জয় করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। যেমন তিনি প্রতি বছর মিলাদুন্নবী উৎসের নামে প্রাসাদের নিকট তৈরী অনূন ২০টি খানকাহে গান-বাদ্যের আসর বসাতেন। কখনও মহররম বা সফর মাস থেকেও এইসব গান-বাজনার মহড়া শুরু হত। এমনকি কবি, গায়কদের দিয়ে জোর করিয়ে এইসব বিদ'আতী আয়োজনের অনুষ্ঠান করত এবং ঈদে মিলাদুন্নবী আয়োজনের মাধ্যমে চরম স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হত। (তথ্যসূত্রঃ তারিখু ইবনে খাল্লিকান, (বৈরুত ছাপা, তাবি), ৪/১১৩-২১ পৃষ্ঠা।)¹⁶⁰ এ প্রসঙ্গে ইবনুল জাওয়ী (রহঃ) বলেনঃ গর্ভনর নিজে নাচে অংশ নিতেন। (তথ্যসূত্রঃ আব্দুস সাত্তার দেহলোভী, মীলাদুন্নবী, পৃষ্ঠা নং - ২০,৩৫।)¹⁶¹ অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, সে প্রতি বছর রাষ্ট্রীয় বিশাল অর্থ ব্যয় করে রাবী'উল আওয়াল মাসে মীলাদুন্নবী উপলক্ষে অত্যন্ত জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে থাকে। আর এভাবেই এই জঘন্য বিদ'আতটি মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

অতএব বুঝা গেল, প্রচলিত মিলাদের প্রবর্তক বাদশা মুজাফফর ইসলামী বিধি বিধানের গুরুত্ব দিতেন না। গান বাজনায় লিপ্ত হতেন। ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থ খরচ করে মিলাদের আয়োজন করতেন। আলেমদেরকে প্রলোভন দিয়ে ইচ্ছা মত ব্যবহার করতেন।

অন্য দিকে যে আলেম প্রচলিত মিলাদ প্রবর্তনে সাহায্য করেন তার নাম মাজদুদ্দিন আবুল খাত্তাব উমার বিন হাসান বিন আলী বিন জমায়েল। তিনি

¹⁶⁰ তারিখু ইবনে খাল্লিকান, (বৈরুত ছাপা, তাবি), ৪/১১৩-২১ পৃষ্ঠা।

¹⁶¹ আব্দুস সাত্তার দেহলোভী, মীলাদুন্নবী, পৃষ্ঠা নং - ২০,৩৫।

নিজেকে সাহাবী দায়েয়াতুল কালবি এর বংশধর বলে দাবি করেন। অথচ তা ছিল মিথ্যা দাবি। কারণ দায়েয়াতুল কালবি (রা.) কোনো উত্তরসূরী ছিল না। তাছাড়া তার বংশধারায় মধ্যস্তন পূর্বপুরুষরা ধংসের মধ্যে নিপাপিত হয়েছিল। তারপরেও তার বর্ণিত বংশ ধারায় অনেক পুরুষের উল্লেখ নাই। (মিজানুল ইতিদাল (১/১৮৬) এই সরকারি দরবারী আলেম একটি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে মিলাদের রূপরেখা বর্ণনা করা হয়। ৬০৪ হিজরীতে শাসক মুজাফ্ফারকে পুস্তকটি উপহার দেন। এতে তিনি খুশি হয়ে তাকে দশ হাজার দিনার বখশিশ দেন। আর সে বছর হতেই তিনি মিলাদুন্নবী পালন করতে শুরু করেন। (টিকা সিয়ারু আলা মিনুবালা ১৫/২৭৪)¹⁶²। মিলাদ প্রথা আবিষ্কারের পরে সে সময়ের মানুষ বছরে একটি দিনে (১২ রবিউল আউয়াল) তা পালন করত এবং তা কয়েকদিন ধরে চলত। পরবর্তিতে ভক্তরা এটিকে সওয়াবের কাজ মনে করে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে পালন করতে শুরু করে। আগে বড় ধরনের মাহফিলের আয়োজন করা হত। বর্তমান মনগড়া কিছু দুরন্দ ও গজল গেয়ে শেষ করা হয়।

বাদশাহ্ চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে কয়েকজন প্রখ্যাত আলেমদের উক্তিঃ
এই বাদশাহ্ চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ মিসরী মালেকী উল্লেখ করেনঃ

كانت ملكا مسرفا يأمر علماء زمانه ان يعملوا باستنباطهم واجتهادهم وان لا يتبعوا لمذهب غيرهم حتى مالت اليه جماعة من العلماء وطائفة من الفضلاء ويحتفل لمولد النبي صلى الله عليه وسلم

¹⁶² সিয়ারু আলা মিনুবালা ১৫/২৭৪

فى الربيع الاول و هو اول من الملوك هذا العمل . القول المعتمد فى عمل
المل المولد

অর্থঃ সে ছিল একজন অপচয়ী বাদশাহ্। সে তার সময়কার উলামায়ে
কেরামকে অন্যের মাযহাব অনুসরণ বর্জন করে নিজ নিজ ইজতিহাদ ও
গবেষণা অনুসারে চলার নির্দেশ দিত। আর এতে দুনিয়া পুজারী উলামা ও
ফুযালার একটি দল তার দিকে ঝুকে পড়ে। সে রবিউল আওয়ল মাসে
মীলাদ-মাহফিলের আয়োজন করত। বাদশাহদের মাঝে এ-ই সর্বপ্রথম
ব্যক্তি যিনি এই বিদ'আতের (মীলাদ-মাহফিলের) প্রচলন করেন।

এ অপচয়ী বাদশাহ্ প্রজাদের অন্তরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট ও অনুরক্ত
রাখার জন্য এই বিদ'আত উৎসবের আয়োজন করত, আর তাতে জাতির
বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ অকাতরে অপচয় করত। এ অপচয়ের বর্ণনা
দিতে গিয়ে আল্লামা যাহাবী (রহঃ) বলেন,

كان ينفق كل سنة على مولد النبي صلى الله عليه وسلم نحو ثلاث مائة ألف

অর্থাৎ সে প্রতি সৎসর মীলাদ-মাহফিলে প্রায় তিন লাখ (দিরহাম/দীনার)
ব্যয় করত। (দুয়ালুল ইসলাম ২/১০৩)¹⁶³

দুনিয়ালোভী দরবারী মৌলভী উমার ইবনে হাছান ইবনে দেহইয়া আবুল
খাত্তাব যিনি মীলাদ-মাহফিল ও জশনে জুলুসের স্বপক্ষে দলীল প্রমাণ
সম্বলিত কিতাব রচনা করে বাদশাহর কাছ থেকে প্রচুর অর্থ কড়ি হাতিয়ে

¹⁶³ দুয়ালুল ইসলাম ২/১০৩

নিয়েছেন, তার ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বর্ণনা করেন,

كثير الواقعة في الانمة وفي السلف من العلماء خبيث اللسان احمق شديد
المكر قليل النظر

في امور الدين متهاونا

অর্থাৎ, সে আইস্মায়ে দ্বীন এবং পূর্বসূরী উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে অত্যন্ত আপত্তিকর ও গালিগালাজ মূলক কথাবার্তা বলত। সে ছিল দুষ্টভাষী, আহমক ও চরম ধোকাবাজ। আর ধর্মীয় ব্যাপারে ছিল চরম উদাসীন। (লিসানুল মীযান)¹⁶⁴

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী আরো বর্ণনা করেনঃ

قال ابن النحر رايت الناس محتمين على كذبه و ضعفه

অর্থাৎ, ইবনে নাজ্জার (রহঃ) বলেন, আমি মানুষদেরকে তার (উমার ইবনে হাছান ইবনে দেহইয়া আবুল খাত্তাব-এর) মিথ্যা ও অবিশ্বাসযোগ্যতার উপর ঐক্যবদ্ধ বা একমত পেয়েছি। (লিসানুল মীযান)¹⁶⁵

সুতরাং উপরোক্ত বিবরণ থেকে বোঝা গেল যে, মীলাদ মাহফিল প্রচলনকারীদের একজন হলেন প্রতারক, ধূর্তবাজ বাদশাহ, আরেকজন হলেন স্বার্থাশ্বেষী দুনিয়ালোভী মৌলভী। আর তাদের সাথে মিলিত হয়েছেন ঐ সকল পীর, সূফী-যারা ধর্মীয় জ্ঞানের গভীরতায় পৌঁছেননি। এ তিন

¹⁶⁴ লিসানুল মীযান

¹⁶⁵ ঐ

দলের সমন্বিত প্রয়াস ও অপপ্রচারে সাধারণ জনগণ হয়েছেন বিভ্রান্ত।
আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) যথার্থই বলেছেন,

و هل افسد الدين الا الملوك + و احبار سوء ورهبانها

অর্থাৎ, রাজা বাদশাহ অসৎ পন্ডিত ও সাধুরাই ধর্মকে নষ্ট করে থাকে।

প্রচলিত মীলাদ-মাহফিল সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের উক্তি

তাই সর্বযোগের হক পন্থীরা এবং সর্বস্তরের উলামায়ে কেরাম কঠোরভাবে
এর (মীলাদ-মাহফিলের) বিরোধিতা করেছেন এবং বাতিল পন্থীদের সমস্ত
ভ্রান্ত যুক্তি খন্ডন করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী (রহঃ)
(তার ফাতাওয়ার ১ম খন্ডের ৩১২নং পৃষ্ঠায়)¹⁶⁶, ইমাম নাসিরুদ্দিন
শাফেঈ **রাশাদ الاخيار** গ্রন্থে, মুজাদ্দের আলফেসানী (রহঃ) **মكتوبات** ৫ম
খন্ডের ২২ নং পৃষ্ঠায় এবং ইবনে আমীরুল হাজ্ব মালেকী (রহঃ) সুস্পষ্ট
রূপে বর্ণনা করেছেন,

ومن جملة ما احدثوا من البدع مع اعتقادهم ان ذلك من اكبر العبادات و اظهار
الشعائر ما يفعلون في الشهر الربيع الاول من المولد وقد احتوى ذلك على
بدع ومحرمات الى ان قال وهذه المفاصد مترتبة على فعل المولد اذا علم
بالسماع فان خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا اليه الا خوان
وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط لان ذلك زيادة في الدين
وليس من عمل السلف الماضين و اتباع السلف اولى

আল্লামা আব্দুর রহমান মাগরীবী তার ফাতাওয়ায় উল্লেখ করেন,

¹⁶⁶ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী (রহঃ) তাঁর ফাতাওয়ার ১ম খন্ডের ৩১২ নং পৃষ্ঠা থেকে
সংগ্রহীত।

ان عمل المولد بدعة لم يقل به ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم
- والخلفاء الائمة

- كذا فى الشرعة الالهية

অর্থাৎ, মীলাদকর্ম বিদ'আত। রাসূল (সাঃ), খোলাফায়ে রাশেদীন ও ইমামগণ কেউ এ ব্যাপারে বলেননি এবং তা করেননি। আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ মিসরী মালেকী (রহঃ) লিখেন-

قد اتفق علماء المذاهب الاربعة بدم هذا العمل - راه سنة از القول المعتمد فى
عمل المولد

অর্থাৎ মাযহাব চতুর্থায়ে উলামায়ে কেরাম এই কাজ (মীলাদ) নিন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ।

প্রচলিত মীলাদ পন্থীদের দলীল-প্রমাণ ও তার খন্ডন

পূর্বের বক্তব্যে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, খাইরুল কুরুনে এই মীলাদ মাহফিলের সূচনা হয়নি। বরং ৬ষ্ঠ শতাব্দির পর এর সূচনা হয়েছে। সূচনা কারীদদের অবস্থা আলোচিত হয়েছে যে, তৎকালীন এক বদকার বাদশাহ এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আর গৃহিত এই নীতির পরে সর্ব সাধারণের মাঝে এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে যা এই বিষয়ে উপরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গও এই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছেন। এত কিছু পর মীলাদের স্বপক্ষে গ্রহণযোগ্য যুক্তি প্রমাণ না দিতে পেরে প্রসিদ্ধ বিদ'আতী মৌলভী আব্দুস সামাদ সাহেব আরো অনেকে

নিজেদের আত্ম প্রশান্তি ও অনুসারীদের সান্তনা প্রদানের জন্য তিহাতুরজন মনীষীর তালিকা পেশ করেছেন, যারা মীলাদ অনুষ্ঠানকে পছন্দ করতেন।

কিন্তু এ তালিকায় সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, আইস্মায়ে মুজতাহিদীন এবং নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছীনে কেরামের নাম নেই। যাদের নাম আছে তাদের অধিকাংশই সূফীয়ায়ে কেরাম, মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ) এর কথা (হালাল হারামের ব্যাপারে সূফীদের কথা সনদ নয়) অনুযায়ী যাদের আমল গ্রহণযোগ্য নয়। আর যে কয়েকজন দার্শনিক আলেম রয়েছেন তারা ভ্রান্ত কিয়াসের শিকার হয়েছেন। মুফতী আহমদ ইয়ার খান সাহেব মীলাদেরস্বপক্ষে একটি দলীল পেশ করেছেন যে, হারামাইন শরীফাইনে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পবিত্র মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয় এবং যে রাষ্ট্রেই যাবে সেখানেই মুসলমানদের মাঝে এ কাজটি পাবে।

বুয়ুর্গানে দ্বীন এবং উলামায়ে কেরাম এর বড় বড় ফায়দা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, সবযুগেই সবস্থানেই উলামায়ে কেরাম, মাশায়েখ ও সাধারণ মুসলমান মুস্তাহাব জেনে আসছেন-“মুস্তাহাব হওয়া-এর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, মুসলমান কাজটিকে ভাল জানে।”

যুক্তি খন্ডনঃ

এই দলীলের উত্তর হল- তখন এ হারামাইন শরীফাইনও ছিল, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, আইস্মায়ে মুজতাহিদীন তাঁরাও ছিলেন। তাঁরা কি মীলাদ মাহফিলের বরকত ও ফযীলত সম্পর্তে অবগত ছিলেন না? তবে কেন তাঁরা করেন নি? সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, আইস্মায়ে মুজতাহিদীন সকলেই এমন একটি উত্তম কাজ

করেছেন তা কি মেনে নেয়া যায়? অথচ খুলাফায়ে রাশিদীন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

অর্থ- তোমাদের উপর আবশ্যকীয় হলো আমার সুন্নাহ এবং আমার পরে খুলাফায়ে রাশিদীনের ছুন্নাহ অবলম্বন করা, তোমরা একে মাড়ি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরো (শক্ত করে আঁকড়ে ধরো) এবং তোমরা নব-আবিষ্কৃত বিষয়াদী হতে সাবধান থেকো! কেননা প্রতিটি নব-আবিষ্কৃত বিষয়ই হলো বিদ'আত আর প্রতিটি বিদ'আতই হলো পথভ্রষ্টতা। (তথ্যসূত্রঃ সহীহ ইবনু মাজাহ, তাহকীক আলবানী, হা/৯৭।)।

তাছড়া শরী'আতের ভাষ্যসমূহ (نصوص) এর মাঝে হারামাইন শরীফাইনের অনেক ফযীলত ও মর্যাদার কথা এসেছে। তবে হারামাইন শরীফাইন তথা সেখানকার আমল শরী'আতের দলীল নয়। সেখানে শরী'আত পরিপন্থী কাজের প্রচলনও হয়ে পড়তে পারে।

শরী'আতের দলীল মাত্র দুটি যথা পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীস। তাই হারামাইন শরীফাইনে যদি কোন ভাল কাজ হয় তাহলে ভাল نور على نور - । অন্যথায় কক্ষনো তা দলীল হতে পারে না। হারামাইনেও মাঝে মধ্যে অন্যায় কর্ম সংঘটিত হয়েছে তার প্রমাণ রয়েছে। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) এক সময়কার হারামাইন শরীফাইনের অবস্থার বিবরণ দিয়ে বলেছেনঃ

في الحرمين الشريفين من شيوخ الظلم وكثرة الجهل وقلة العلم وظهور المنكرات وفشو البدع والسيئات واكل الحرام والشبهات

অর্থাৎ, হারামাইন শরীফাইনের মাঝে অন্যায় অত্যাচার ব্যাপক লাভ করেছে, অজ্ঞতা বেড়ে গেছে, ইলম কমে গেছে, অপ্রীতিকর কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে, বিদ'আত প্রসার লাভ করেছে, হারাম ও সন্দেহপূর্ণ জিনিস খাওয়া বেড়ে গেছে। (মেরকাত ৫ম খন্ড ৬১৪ নং পৃষ্ঠা)¹⁶⁷

অতএব হারামাইন শরীফাইন দলীল হতে পারে না। আর মুফতী আহমদ ইয়ার খান সাহেব বলেছেন, মুস্তাহাব হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, মুসলমান সেটাকে ভাল জানে। অথচ মুস্তাহাব তো অনেক - উঁচু জিনিস বরং (মোবাহ হওয়াটা) ও শরী'আতের একটি হুকুম যা নবী কারীম (সাঃ) এর কথা বা কাজ ছাড়া প্রমাণিত হয় না। এ ব্যাপারে আল্লামা শামী (রহঃ) লিখেছেন,

الاستحباب حكم شرعى لا بدله من دليل

অর্থাৎ, মুস্তাহাব হওয়া শরী'আতের একটি হুকুম। তাই তার জন্য দলীলের প্রয়োজন রয়েছে। **সারকথা** - উপরের এই সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, প্রচলিত মীলাদ-মাহফিল বিদ'আত এবং দ্বীন-বহির্ভূত বিষয়।

মীলাদে কিয়াম করা প্রসংগ

কিয়াম কাকে বলে

“কিয়াম” শব্দের আভিধানিক অর্থ দাঁড়ানো। আর মুআশারা তথা সমাজ সামাজিকতার পরিভাষায় “কিয়াম” বলতে বোঝায় কারও আগমনে

¹⁶⁷ মেরকাত ৫ম খন্ড ৬১৪ নং পৃষ্ঠা

দাঁড়ানো। আর মীলাদ প্রসঙ্গে উল্লেখিত কিয়াম দ্বারা বোঝানো হয় বিশেষ ধরনের কাসীদা পাঠ করার পর রাসূল (সাঃ) মজলিসে হাজির হয়ে গেছেন ধারণায় “ইয়া নবী ...” বলার সময় দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুরূদ পাঠ করা।

কিয়াম প্রচলনের ইতিহাসঃ প্রচলিত মিলাদের সাথে আর একটি প্রথা সংযোজিত হয়েছে। তা হল রাসূল (সাঃ) এর সম্মানাথে দাঁড়ান। এটি মৌলিক বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। সম্পূর্ণ অপ্রাসাংগিক একটি বিষয় মিলাদের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। এটি মিলাদের পরে আবিস্কৃত হয়েছে। ৭৫১ হিজরির কথা। খাজা তকিউদ্দিন ছিলেন একজন ভাব কবি ও মাজযুব (ভাবাবেগে উদ্বেলিত) ব্যক্তি।

মহানাবী (সাঃ) এর নামে তিনি বিভিন্ন কাসিদা রচনা করেন। বরাবরের ন্যায় একদিন তিনি কাসিদা পাঠ করছিলেন। বসা থেকে ভাবাবেগে হঠাত তিনি দাঁড়িয়ে কাসিদা পাঠ করতে থাকলেন। ভক্তরাও তার দেখা দেখি দাঁড়িয়ে গেল। বাস, ঘটনা এখানেই শেষ। তিনি আর কখনো এমনটি করেননি। এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, খাজা তকিউদ্দিন কবিতা পাঠ করতে করতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। এটি কোন মিলাদের অনুষ্ঠান ছিল না। তিনি অনিচ্ছাকৃত দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু মিলাদের জন্মের একশত বছর পরে বিদআতপন্থীরা এটিকে মিলাদের সাথে জুড়ে দেয়।

ফলে কিয়াম বিশিষ্ট মিলাদ বিদআত হওয়ার বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। বস্তুত আমাদের দেশে এমন অনেক বিদআত রয়েছে যা বুজুগদের বিশেষ মুহূর্তের আমল থেকে সৃষ্ট।

অতএব, সংশ্লিষ্ট বুজুর্গ কখনো তার ভক্তদের এসব করার নিদেশ দেননি, অনুসারীরা অজ্ঞতাবশত এসব কাজ চালু করেছে।

সমাজ-সামাজিকতায় কিয়ামের ছকুম

কোন বুয়ুর্গ তথা সম্মানী ব্যক্তি যখন স্বশরীরে আগমন করেন, তখন কোন কোন মুহূর্তে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি ছাড়া ক্লেয়াম করা (আগন্তুক ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়িয়ে যাওয়া) বৈধ। এ ব্যাপারে ইমাম নববী (রহঃ) **قوموا الى سيدكم** (অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের নেতার কাছে গিয়ে দাঁড়াও) হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। অন্যান্য উলামায়ে কেরাম এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এ ভাবে যে, হযরত সাআদ ইবনে মুআয (রাঃ) আঘাত প্রাপ্ত ছিলেন। নবী কারীম (সাঃ) তাঁকে গাঁধার পিঠ থেকে নামানোর জন্য মজলিস থেকে উঠেছিলেন। এটা কোন সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তে দাঁড়ানো নয়। এ ব্যাপারে মুসনাদে আহমদে বিবরণ নিম্ন রূপঃ

قوموا الى سيدكم فانزازه من الحمار - অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের নেতার কাছে গিয়ে দাঁড়াও তাঁকে গাঁধার পিঠ থেকে নামাও। এজন্যই **الى سيدكم** “তোমাদের নেতার কাছে” কথাটা বলেছে- **لسيدكم** “নেতার জন্য” কথাটা বলেননি। (মুসনাদে আহমদ)

যাহোক উপরোক্ত হাদীস অকাট্য অর্থ বোধক না হওয়ায় এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের আমল কি ছিল এবং নবী কারীম (সাঃ) কোন আমলটিকে পছন্দ করতেন, তা দেখা দরকার এবং সেটাই হবে আমাদের আমল। আর এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে যানা যায় হযরত আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা-

عن انس قال - لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك - رواه الترمذى فى اباب الاستيذان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ماجاء فى ركاهية قيام الرجل للرجل وقال هذا حديث حسن صحيح غريب ورواه احمد حديث رقم ١٢٢٨٥ واسناده صحيح كذا فى هامشه

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের কাছে নবী কারীম (সাঃ) এর জাত মোবারকের চেয়ে বড় সম্মানের ও প্রিয় এ দুনিয়তে আর কোন কিছুই ছিল না, এতদসত্ত্বেও তাঁরা নবী কারীম (সাঃ) কে দেখলে কিয়াম করতেন না। যেহেতু তারা জানতেন নাবী কারীম (সাঃ) এ কাজটিকে (তাঁর সম্মানে দাড়িয়ে যাওয়া কিয়াম করাকে) অপছন্দ করেন। (তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদ)¹⁶⁸

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, নাবী কারীম (সাঃ) নিজের জন্য কিয়াম করাকে অপছন্দ করতেন। তাই সাহাবায়ে কেরাম নাবী কারীম (সাঃ) এর প্রতি চরম ভালবাসা ও মহব্বত পোষণ করা সত্ত্বেও নবী কারীম (সাঃ) যখন স্বশরীরে উপস্থিত হতেন তখন তাঁকে দেখতে পেয়েও তাঁরা দাঁড়াতেন না। কেননা, নাবী কারীম (সাঃ) এর জীবদ্দশায় ও তাঁর জন্য কিয়াম করা

¹⁶⁸ তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদ

হত না এবং তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে কিয়াম করা তথা দাঁড়িয়ে যাওয়াকে পছন্দ করতেন না।

তদুপরি মীলাদ-মাহফিলে রাসূল (সাঃ) এর নাম আসলে সেখানে রাসূল (সাঃ) এর আগমন ঘটে এটা শরী'আতের কোন দলীল দ্বারাও প্রমাণিত নয় বরং রাসূল (সাঃ) এর উদ্দেশ্যে দুরূদ পাঠ করা হলে তিনি সেখানে হাজির হন না বরং নির্ধারিত ফেরেশতারা রাসূল (সাঃ) এর কাছে সে দুরূদ পৌঁছে দেন - এ কথা স্পষ্ট হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসে এরশাদ হয়েছে,

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى على نا عيا ابلاغته رواه البيهقى فى شعب الايمان فى باب فى تعظيم النبى صلى الله عليه وسلم واجلاله وتوقيره - حديث رقم ١٥٨٣ وللحديث شواهد ساقها البخارى فى القول البديع

অর্থাৎ, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে আমার কবরের নিকট এসে আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে আমি তা সরাসরি শুনব, আর যে দূরে থেকে আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে তা আমার নিকট পৌঁছানো হবে। (শুআবুল ঈমান)।

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عن عبيد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ملئته سياحين فى الارض يبلغونى من امتى السلام رواه الدرهمى فى كتاب الرقاق - باب فى فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم . حديث

رقم ٢٧٧٤

ورواه النسائي في كتاب الافتتاح - باب . واسناده صحيح كذا في هامشه
التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه ابن حبان صحيحه . حديث رقم
٩٠٢ . واللفظ للدارمي

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর কতক ফেরেশতারা রয়েছেন, যারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন এবং আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌঁছান। (নাসায়ী, দারিমী ও ইবনে হিব্বান)

কিয়াম সম্পর্কে বিদ 'আতীদের বক্তব্য ও তার খন্ডন

বিদ 'আতীদের বক্তব্য হল মীলাদ-মাহফিলে রাসূল (সাঃ) এর নাম আসলে তিনি মজলিসে হাজির হয়ে যান। তাই তাঁর সম্মানার্থে কিয়াম করতে হবে অর্থাৎ দাঁড়িয়ে যেতে হবে। বিদ 'আতীগণ এই কিয়াম করাকে জায়েয এবং মুস্তাহাব হিসাবে গন্য করেন। এমনকি এটাকে ওয়াজিব ও ফরয বলেও আখ্যায়িত করেন। আর কিয়াম না করনেওয়ালাদেরকে কাফের পর্যন্ত বলা হয়। (এ কথার বরাত একটু পরেই উল্লেখ করছি।)

খন্ডন

পূর্বোল্লিখিত হাদীসে স্পষ্ট রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে, তাঁর কাছে দুরূদ সালাম পৌঁছে দেয়া হয়, তিনি হাজির হন না। অথচ বিদ'আতীগণ বলেছেন তার বিপরীত। হাদীসে বর্ণিত আকীদার বিপরীত কোন বিষয় কিভাবে মুস্তাহাব এমনকি ফরয হয়ে যায় তা বোধগম্য নয়। আর যারা হাদীসে বর্ণিত আকীদা মোতাবেক মীলাদের মজলিসে রাসূল (সাঃ) এর হাজির না

হওয়ার আকীদা রাখেন, তারা কিভাবে কাফের হয়ে যান তা আরও অবোধগম্য বৈ কি? যারা কুরআন হাদীসের বর্ণনা মোতাবেক আকীদা পোষণ করেন তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করা, পক্ষান্তরে যারা কুরআন হাদীসের বর্ণনার বিপরীত আকীদা পোষণ করেন তাদেরকে খাঁটি মুসলমান মনে করাটা কি কুফরি নয়?

সুতরাং ‘মিলাদ’ এবং ‘কিয়াম’ শব্দদ্বয় ইসলামে নব আবিষ্কার। নাবী করিম (সাঃ) এর ওফাতের ৬০০ বছর পর, ইমাম চতুষ্ঠয়ের ৪০০ বৎসরেরও অধিক সময় পর ‘মিলাদ’ এবং ‘কিয়াম’ শব্দদ্বয় আবিষ্কৃত যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। তাই মিলাদ এবং কিয়াম আবিষ্কারের আলোচনার সারাংশে বলা যায় যে, এটিও প্রকাশ্য বিদ’আত যা নাবী করিম (সাঃ) বা সাহাবী বা তাবা-তাবিঈ কর্তৃক স্বীকৃত বা অনুসৃত নয়। (তথ্যসূত্রঃ বিদ’আত – মোসাদ্দেক আহম্মাদ, পৃষ্ঠা নং – ১৪০।)¹⁶⁹। কয়েকটি কারনে ঈদে মিলাদুন্নাবী এবং প্রচলিত মীলাদ কেন বিদআত তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

১. মহানবীর (সাঃ) জন্মদিন পালন করা যা বিজাতীয় সংস্কৃতি। যেমন হিন্দুরা শ্রী কৃষ্ণের, খৃষ্টনরা ঈসা (আঃ) জন্মদিন পালন করে।

২. রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ তার জন্য নির্ধারিত করা।

৩. প্রচলিত মীলাদ মাহফিলে অতিরঞ্জন করে দুরুদ পাঠের জন্য নিদিষ্ট করা।

¹⁶⁹ বিদ’আত – মোসাদ্দেক আহম্মাদ, পৃষ্ঠা নং – ১৪০

৪. মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আত্মা উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছে মনে করে দাঁড়ানো।

উপরোক্ত আলোচনার পর বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

পূর্ববর্তী এবং বর্তমান সময়ের প্রায় সকল হাক্কানী ‘উলামায়ে কিরাম ‘ঈদে মীলাদুন্নাবী কিংবা মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান পালনকে নিম্নোক্ত দালীল ও সুস্পষ্ট কারণ সমূহের ভিত্তিতে বিদ‘আত ও হারাম বলে অভিহিত করেছেন। যে সব বিশুদ্ধ দালীল ও সুস্পষ্ট কারণের ভিত্তিতে ‘উলামায়ে কিরাম এটিকে বিদ‘আত ও নিষিদ্ধ বা হারাম, বলেছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি হলো নিম্নরূপঃ

১) এটি দ্বীনে ইসলামের মধ্যে নব-আবিষ্কৃত একটি বিষয়। কেননা এর পক্ষে আল্লাহ (سبحانه وتعالى) কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। রাসূলুল্লাহ্ ও (صلی الله علیه وسلم) তাঁর কথা, কাজ কিংবা কোনরূপ অনুমোদন দ্বারা এ কাজটি প্রবর্তন করেননি। অথচ তিনি হলেন আমাদের অনুসরণীয় ও ইমাম। ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ (سبحانه وتعالى) ইরশাদ করেছেনঃ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

অর্থাৎ- রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তোমরা তা অবলম্বন করো, আর যা কিছু থেকে তিনি তোমাদেরকে বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো¹⁷⁰। রাসূল (صلی الله علیه وسلم) বলেছেনঃ-

¹⁷⁰ সূরা হাশর, আয়াত নং - ৭

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكَيْعٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ "

যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে যেন আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমাকে আমাকে অমান্য করল সে যেন আল্লাহকেই অমান্য করল। (তথ্যসূত্রঃ তাখরীজ কুতুবুত তিসআহ: বুখারী ২৯৫৭, মুসলিম ১৮৩৫, নাসায়ী ৪১৯৩, ৫৫১০, আহমাদ ৭৩৮৬, ৭৬০০, ২৭৩৫০, ৮৩০০, ৮৭৮৮, ৯১২১, ৯৭৩৯, ১০২৫৯। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ। তাখরীজ আলবানীঃ ইরওয়াউল গালীল ৩৯৪।)¹⁷¹। আল্লাহ (سبحانه وتعالى) এ প্রসঙ্গে আরো ইরশাদ করেছেনঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.

অর্থাৎ- নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম-অনুপম আদর্শ; যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে। (তথ্যসূত্রঃ সূরা আহযাব, আয়াত নং- ৩৩/২১)¹⁷²। রাসূল (صلى الله عليه وسلم) জুম'আর খুতবায়ে ঘোষণা করেছেনঃ

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعٍ ضَلَالَةٌ. مُسْلِم

¹⁷¹ তাখরীজ আলবানীঃ ইরওয়াউল গালীল ৩৯৪

¹⁷² সূরা আহযাব, আয়াত নং- ৩৩/২১

অর্থঃ উত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী। আর উত্তম পথনির্দেশনা হচ্ছে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর পথনির্দেশনা। নিকৃষ্টতম বিষয় হচ্ছে (দ্বীনের মধ্যে) নতুন নতুন বিধান ইবাদতের নামে প্রবর্তন করা, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা। (মুসলিম : ৮৬৭)¹⁷³। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেছেনঃ

مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

অর্থ- যে আমাদের এই দ্বীনের (শারী'য়াতের) মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে, তাহলে তা হবে প্রত্যাখ্যাত।

২) মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে 'ঈদ উদযাপন বা অনুষ্ঠান পালন করা - এটি হলো বিপথগামী পথভ্রষ্টদের প্রবর্তিত একটি প্রথা। যেমন আমরা আলোচনার শুরুতেই জেনেছি যে, আনুষ্ঠানিকভাবে মীলাদুন্নাবী পালনের প্রথা সর্বপ্রথম চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে ফাতিমী 'উবায়দী শী'আ শাসকগণ প্রবর্তন করেছিল।

সুতরাং বিবেকসম্পন্ন কোন মুসলমান কি কখনো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাতের বিরোধিতা করতে পারে এবং শী'আ-রাফিযীদের প্রবর্তিত পথ ও প্রথা অনুসরণ করতে পারে? অবশ্যই না।

৩) আল্লাহ (سبحانه وتعالى) দ্বীনে ইসলামকে পরিপূর্ণ ও সুসম্পন্ন করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে কারীমে তিনি ইরশাদ করেছেনঃ

¹⁷³ মুসলিম : ৮৬৭

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থাৎ- আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধীন পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নি‘মাত সুসম্পন্ন করে দিলাম এবং ইচ্ছামকে ধীন হিসেবে তোমাদের জন্য মনোনীত করে দিলাম। (সূরা মায়েদা, আয়াত নং - ৩)¹⁷⁴

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহ্‌র এই ধীনকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মানবজাতির নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। মানুষকে জালাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে এমন প্রত্যেকটি বিষয় তিনি তাঁর উম্মাতকে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে জানিয়ে গেছেন। মোটকথা, উম্মাতের জন্য কল্যাণকর এমন কোন বিষয় নেই যে সম্পর্কে তিনি [রাসূলুল্লাহ (ﷺ)] তাঁর উম্মাতকে অবহিত করেননি এবং উম্মাতের জন্য অকল্যাণকর বা অনিষ্টকর এমন কোন বিষয় নেই যে সম্পর্কে তিনি উম্মাতকে সতর্ক করেননি।

আমাদের নাবী ছিলেন আল্লাহ্ (سبحانه وتعالى) এর প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নাবী। মানবজাতির কাছে আল্লাহ্‌র বার্তা পৌঁছে দেয়ার এবং আল্লাহ্‌র বান্দাহদেরকে নাসীহাত প্রদানের ক্ষেত্রে সকল নাবী-রাসূলের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম। যদি মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান বা ‘ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করা এমন কোন ধীনী কাজ বা ‘ইবাদাত হতো- যেটাকে আল্লাহ (سبحانه وتعالى) পছন্দ করেন এবং যদ্বারা আল্লাহ্‌র (سبحانه وتعالى) সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, তাহলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয়

¹⁷⁴ সূরা মায়েদা, আয়াত নং - ৩

উম্মাতকে তা জানিয়ে দিতেন অথবা তিনি তাঁর জীবদ্দশায় নিজে এ কাজটি করতেন। কিন্তু তিনি নিজে এরূপ করেছেন কিংবা উম্মাতকে তা করতে বলেছেন মর্মে আদৌ কোন প্রমাণ নেই। অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَذُلَّ أُمَّتُهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ.

অর্থ- আমার পূর্বে যতো নাবী ছিলেন, তাদের প্রত্যেকের উপরই ওয়াজিব ছিল যতো কিছু তাদের (নিজ নিজ উম্মাতের) জন্য মঙ্গলজনক বা কল্যাণকর হিসেবে জানেন সেসব বিষয়ে তাদেরকে পথ-নির্দেশ দেয়া, আর যতো কিছু তাদের জন্য অকল্যাণকর বলে জানেন সেসব বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক ও সাবধান করা।

৪) দ্বীনে ইসলামে এ ধরনের মীলাদ বা জন্মদিবস পালনের বিদ'আতী প্রথা প্রবর্তনের দ্বারা প্রথমতঃ এ কথাই বুঝা যায় যে, আল্লাহ (سبحانه وتعالى) এই উম্মাতের জন্য দ্বীনে ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দেননি বরং তা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তাই তা সম্পূর্ণ করার জন্য নতুন কিছু করার প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ দ্বীনের মধ্যে কোন বিদ'আতী পন্থা প্রবর্তনের দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই উম্মাতের কল্যাণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন ও প্রাপ্য ছিল তা তিনি পুরোপুরি ও যথাযথভাবে তাদের নিকট পৌঁছে দেননি। তাই পরবর্তীতে এইসব বিদ'আতীগণ শারী'য়াতের মধ্যে নতুন কিছু বিষয় (বিদ'আত) প্রবর্তন ও সংযোজন করে দিয়ে উম্মাতের সেই দ্বীনী প্রয়োজনটুকু পূরণ করে দিয়েছে। (এসব জঘন্য কথা-বার্তা ও ধ্যান ধারণা থেকে আমরা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তাদের ধারণা হলো

যে, এরূপ কাজের দ্বারা তারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে পারবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এরূপ কোন কাজ করার অনুমতি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দেননি। শুধু তাই নয় বরং এর দ্বারা প্রকারান্তরে তারা একদিকে যেমন আল্লাহ্র উপর অভিযোগ আরোপ করছে, অপরদিকে একথাই বলছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করেননি। বরং তিনি আল্লাহ (سبحانه و تعالیٰ) প্রদত্ত রিছালাতের আমানাত খিয়ানাত করেছেন। সুবহানাল্লাহ! এরূপ ধারণা আল্লাহ (سبحانه و تعالیٰ) ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) উপর অপবাদ আরোপ ও জঘন্য মিথ্যাচার বৈ কিছু নয়। আল্লাহ (سبحانه و تعالیٰ) ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এরূপ অভিযোগ ও অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পুতঃপবিত্র।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (سبحانه و تعالیٰ) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং বান্দাহগণের উপর তাঁর এই নি'মাত সুসম্পন্ন করে দিয়েছেন। বিদায় হাজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنه) কে সাক্ষী রেখে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানিয়ে গেছেন যে, আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাঁর প্রতি যা কিছু নাযিল হয়েছিল, সে সবই তিনি উম্মাতের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন; কোন কিছুই তিনি অবশিষ্ট বা অসম্পূর্ণ রাখেননি।

৫) বিদ'আত বর্জন করার ও বিদ'আত থেকে সতর্ক ও সাবধান থাকার বিষয়ে এবং সর্বক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অনুসরণ করার, কথায় কাজে বা 'আমালে তাঁর বিরোধিতা না করার বিষয়ে ক্বোরআন ও ছুন্নাহতে যেসব সুস্পষ্ট দালীল রয়েছে, সেসব দালীলের ভিত্তিতে হাক্কানী 'উলামায়ে কিরাম মীলাদ তথা জন্মদিন বা জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কোনরূপ

আয়োজন বা ‘ঈদ উদযাপনকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিদ‘আত বলে অভিহিত করেছেন।

৬) মীলাদুন্নাবী পালনের দ্বারা রাসূলের (ﷺ) প্রতি আদৌ কোন ভালোবাসা প্রদর্শিত হয় না। কস্মিনকালেও নয় বরং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যথাযথ অনুসরণ, তাঁর সুন্নাহ অনুযায়ী ‘আমাল এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমেই প্রকৃত অর্থে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা প্রদর্শিত হয়ে থাকে। (সত্যিকার অর্থে যে যাকে ভালোবাসে, সে তার আনুগত্য করে থাকে)। ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন:-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

অর্থাৎ:- (হে নাবী) আপনি বলুন! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ করো- আল্লাহ তোমাদিগকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৮) ‘ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপন কিংবা জন্মদিবস পালনের মধ্যে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ‘ঈদ বা বড়দিন পালনের সাথে মিল তথা সামঞ্জস্য রয়েছে। এর দ্বারা ‘আমাল বা কর্মে তাদের (ইয়াহুদী-নাসারাদের) সাদৃশ্য ধারণ করা হয়। অথচ আমাদেরকে (মুসলমানদেরকে) তাদের (ইয়াহুদী-নাসারাদের) সাদৃশ্য ধারণ করতে এবং তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। (এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ এর “ইকতিয়াউস

সিরাতিল মুছতাকীম লি মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম” গ্রন্থের; বিশেষ করে ২/৬১৪-৬১৫ নং পৃষ্ঠা দু’টি পড়ুন। আরো দেখুন! ইবনুল ক্বায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ সংকলিত গ্রন্থ “যাদুল মা‘আদ”- ১/৯৫)

৯) তবে কারো ইচ্ছা হলে সে সোমবার দিন রোযা রাখতে পারে। কেননা একদা রাসূলুলাহ (ﷺ) - কে সোমবার দিন রোযা পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ

ذَٰكَ يَوْمٌ وَلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ - أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ.

অর্থ- এটা (সোমবার) হলো সেই দিন যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি, এবং এই দিনেই আমাকে রাছূল হিসাবে পাঠানো হয়েছে অথবা এই দিনে আমার প্রতি অহী (ক্বোরআন) নাযিল হয়েছে।

সুতরাং শারী‘য়াতের বিধান হলো- সোমবার দিন নাফল রোযা পালনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অনুসরণ করা, তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা এবং কোন অবস্থাতেই মীলাদ মাহ্ফিল বা ‘ঈদে মীলাদুন্নাবী ইত্যাদি বিদ‘আতী কর্মকান্ড না করা।

১১) মীলাদ মাহ্ফিল বা মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান পালন কিংবা ‘ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপন উপলক্ষে অনেক রকম শারী‘য়াত বিরোধী কর্মকান্ড সংঘটিত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে মাত্র দু-তিনটি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) মীলাদ মাহ্ফিলগুলোতে যেসব ক্বাসীদাহ্-গজল, না‘তে রাছূল ইত্যাদী পাঠ করা হয়, সেসবের বেশিরভাগের মধ্যে শিরকী শব্দ, বাক্য ও কথা-বার্তা

ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত এসব অনুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রশংসায় মারাত্মক বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করা হয়ে থাকে। অথচ এসব বিষয় থেকে বিরত থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

لَا تَطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ،
وَرَسُولُهُ.

অর্থ- আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করো না যেভাবে নাসারাগণ মারইয়াম পুত্রের (ঈসা ইবনু মারইয়াম- এর) প্রশংসায় অতিরঞ্জন করেছিল। আমি তো কেবল তাঁর (আল্লাহ্র) বান্দাহ্ হই, অতএব তোমরা (আমাকে) বলো - “আল্লাহ্র বান্দাহ্ ও তাঁর রাসূল”।

খ) অধিকাংশ মীলাদ মাহ্ফিলগুলোতে বিভিন্ন রকমের হারাম কর্ম-কাণ্ড সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন- তাতে নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ, গান-বাজনা, নেশাজাতীয় দ্রব্য (মদ, গাজা ইত্যাদি) পান করা হয়ে থাকে। কখনো এসব মাহ্ফিলে রাসূলুল্লাহ্ কিংবা অন্য কোন অলী-আউলিয়া এর নিকট আশ্রয় বা সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে শিরকে আকবার করা হয়।

সেখানে ক্লোরআনে কারীম তিলাওয়াতের মাজলিসে বিড়ি-সিগারেট পান করা হয়, যেটি মূলতঃ ক্লোরআন অবমাননার শামিল। অনর্থক কাজে বিপুল পরিমাণ টাকা-পয়সা অপব্যয় ও অপচয় করা হয়। মীলাদুন্নাবী উদযাপনের দিনগুলোতে বিভিন্ন মাছজিদের উচ্চস্বরে-সমস্বরে তালে তাল মিলিয়ে, কোথাও কোথাও দেখা যায় হাতে জোরে জোরে তালি বাজিয়ে নানারকম বিকৃত (বিদআতী) বানোয়াট যিকর-আযকারের আয়োজন করা হয়। অথচ

উপরোক্ত কার্যকলাপ যে আদৌ শারীয়াত সম্মত নয় বরং তা হারাম তথা নিষিদ্ধ- সে ব্যাপারে সকল হাক্কানী ‘উলামায়ে কিরাম একমত; এ বিষয়ে তাদের কারো কোন দ্বিমত নেই।

উপরোক্ত আয়াত, হাদীস এবং এর সমর্থক আরো যেসব আয়াত ও হাদীছ রয়েছে- সবগুলোই প্রমাণ করে যে, রাছুলুল্লাহ এবং অন্যান্য সকল মৃত ব্যক্তি ক্রিয়ামাতের দিন নিজ নিজ ক্বাবর থেকে বের হবেন। কোন অবস্থাতেই এর আগে নয়। এমনকি রাসূলুল্লাহও ঐদিনই ক্বাবর থেকে বের হবেন, প্রথমে তাঁর ক্বাবর-ই বিদীর্ণ হবে এবং তিনিই সর্বপ্রথম ক্বাবর থেকে উঠবেন।

আশ্ শাইখ আল ‘আল্লামা আব্দুল আযীয ইবনু বায (রহঃ) বলেছেন যে, উপরোক্ত বিষয়ে (সকল কালের সকল যুগের) সকল ‘উলামায়ে কিরামের ঐকমত্য রয়েছে। এ সম্পর্কে তাদের কারো কোন দ্বিমত নেই।

দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে এমন অজ্ঞতা আর উপেক্ষার কারণেই আমরা মুসলমানরা আজ ইসলামের নামে “মুহাম্মাদ (সাঃ) কে সৃষ্টি করা না হলে আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি হতো না,” “মুহাম্মাদ (সাঃ) নূরের সৃষ্টি,” “মিলাদ মাহফিলে তিনি উপস্থিত হন,” “তিনি হায়াতুন নবী” এমন অনেক বানোয়াট কথায় বিশ্বাস করি; ‘শবে বরাত’, ‘শবে মিরাজ’, ‘জুম‘আতুল বিদা’, ‘মিলাদ’ ও ‘ঈদে মিলাদুন নবীর’ মতো অসংখ্য অনুষ্ঠান উদযাপন করে সওয়াবের নিয়তে পরিশ্রম করে গুনাহ অর্জন করি।

‘দোয়ায়ে গঞ্জে আরশ’, ‘দরুদে নারিয়া’, ‘দরুদে হাজারী’ ইত্যাদি ধরনের বিদ‘আতী ও শিরকী দরুদ সওয়াবের উদ্দেশ্যে পাঠ করি। কথাগুলো শুনতে

আপনার কাছে যতোই আজব মনে হোক না কেন, আসলে ব্যাপারগুলো তিক্ত হলেও বাস্তব সত্য।

ইসলামের নামে আমাদের বর্তমান সমাজে এমন অসংখ্য বিশ্বাস, নিয়ম-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, এবাদত-বন্দেগী চালু রয়েছে, বাস্তবে যেগুলোর সাথে ইসলামের, আল্লাহর, তাঁর রসুলের, কুরআনের ও বিশুদ্ধ সুন্নাহর কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ এ কাজগুলোকে আমরা তথাকথিত “ধর্মীয় ভাব গান্ধীর্যের” মধ্য দিয়েই উদ্‌যাপন করে থাকি অথচ এসব আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ বিদ’আত।

কেউ কেউ বলেন যে, মিলাদ ও মিলাদুন নবী হলো ‘বিদ’আহ হাসানা’ বা উত্তম বিদ’আহ। তাদের অবগতির জন্য বলবো যে, যেখানে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে “কুল্লু বিদ’আতিন দলালাহ” অর্থাৎ সকল বিদ’আহ পথভ্রষ্টতা, সেখানে কোনো ব্যক্তি যদি বলে যে, “না না কিছু বিদ’আহ আছে ভালো”, তাহলে সে কি স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে চরম বেয়াদবী করলো না? সে কি নিজেকে আল্লাহর রসুলের চেয়েও অধিক জ্ঞানী বলে দাবী করলো না? (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ আমাদের এসব নব-আবিষ্কৃত বিদ’আতী কাজ থেকে হেফাযত করুন, আমীন।

উপরোক্ত কারণ ও দালীল-প্রমাণের ভিত্তিতে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জন্মদিন বা জন্মবার্ষিকী আনুষ্ঠানিকভাবে কিংবা বিশেষভাবে পালন করা কিংবা ‘ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন বা উদ্‌যাপন করা দ্বীনে ইছলামে নব-আবিষ্কৃত একটি বিদ’আত ও শারী’য়াত বহির্ভূত কাজ- যা অবশ্যই বর্জনীয়। (তথ্যসূত্রঃ নুরুস সুন্নাহ ওয়া যুলুমাতুল বিদ’আহ।)

(৪) বিয়ে সংক্রান্ত প্রচলিত কিছু বিদ'আতঃ প্রচলিত বিবাহ প্রথা থেকে শুরু করে অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান বা রসমগুলো যা ইসলাম শরঈ সমর্থন করে না বরং এসব অনুষ্ঠান মূলতঃ টাকার অপচয় ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ আমাদের খুশির ও আনন্দের জন্য ২টি ঈদ দিয়েছেন আর আমরা চিন্তা করি কি করে আরো খুশির ও আনন্দের দিন আমাদের মাঝে আনা যায় - নবী (সাঃ) যে গুলো আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন তার মধ্যে নুতন কিছু বা অনুষ্ঠান যুক্ত করা বিদআত । আমরা যদি ৯৫% ইসলাম মেনে চলি আর ১% থেকে ৫% অন্য কোন ধর্ম থেকে নিয়ে মেনে চলি তাহলে এটা আর ইসলাম থাকে? মূলতঃ ইসলাম শুধু নামায-রোযার নয়; ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তাই এখানে সালাত-সিয়ামের সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে-শাদীর আমলও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আজকাল মসজিদে আমরা মুসলিম পরিচয় বজায় রাখি; কিন্তু বিয়ে-শাদীতে কেন যেন ইসলাম পরিপন্থী তথা বিদ'আতই কাজই বেশি করি। বিয়ে-শাদীর আগে যেহেতু কনে দেখার পর্ব তাই আগে বিয়ের প্রস্তাব বা কনে দেখা সংক্রান্ত ইসলামী নির্দেশনাগুলো আগে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি এ গ্রন্থে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

সূরা আল ইমরান (৩) ১৪৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন - হে মানুষ, তোমরা যারা (আল্লাহর উপর) ইমান এনেছো, তোমরা যদি অমুসলিমদের অনুসরণ করতে শুরু করো তাহলে এরা তোমাদের পূর্ববর্তী (জাহেলিয়াতের) অবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ফলে তোমরা নিদারুণ

ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পরবে। সুরা বাকারা (২) ২৭০ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন – তোমরা যা কিছু খরচ করো আর যা কিছু মানত করো আল্লাহ তা নিশ্চই জানেন, যালেমদের কোন সাহায্য কারি নাই। তিরমিযী শরীফ - মিনা বুক হাউস - কিয়ামত অধ্যায় -২৩৫৮ নং হাদীস - মাসুউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী (ﷺ) বলেন, রোজ কিয়ামতে পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে তার একটি হল তুমি তোমার ধন সম্পদ কোথা থেকে আয় করেছো এবং কোন খাতে ব্যবহার করেছো? মেশকাত গ্রন্থ - সালাউদ্দিন বই ঘর - ৬ষ্ঠ খন্ড - ৩০৭৩ নং হাদীস - আনাস (রাঃ) বলেন নবী (ﷺ) যয়নবের বিয়েতে যত বড় বিবাহ ভোজ করেছেন তা অন্য কোন বিবির জন্য করেনি, তাতে তিনি একটা ভেড়া দিয়ে বিবাহ ভোজ করিয়েছেন।

অতএব, বিবাহের সময় অনুষ্ঠান বা বিবাহ ভোজ একটা (যে পক্ষই অনুষ্ঠান করুক বা উভই পক্ষ একত্রে অনুষ্ঠান করুক) এগুলো বিদআত কেন - নবী (ﷺ) এর সময় লোকজন বিয়ে করেছে ও নবী (ﷺ) অনেকের বিয়ে দিয়েছেন কিন্তু নবী (ﷺ) বৌ ভাত, গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান করেনি এজন্য এগুলো বিদআত। [নবী (ﷺ) মাগরিবের নামায পড়েছেন ৩ রাকাত এখন আপনি কি ৪ রাকাত নামায পড়বেন মাগরিবে? তিনি বিয়ের নিয়ম আমাদের বলে দিয়ে গেছেন?] মিশকাত শরীফ - সালাউদ্দিন বইঘর - ৬ষ্ঠ খন্ড - ৩০৮০ নং হাদীস আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী (ﷺ) বলেছেন সর্বাপেক্ষা মন্দ সে অলীমার ভোজ (বিবাহ ভোজ) যাতে ধনীদেব দাওয়াত করা হয় আর গরীবদের বাদ দেওয়া হয়। আমাদের উচিত যাদের বিবাহ ভোজে যাচ্ছি তাদের জন্য দোয়া করা। সেইটা অধিকাংশ লোকই আমরা করি না। গিফট বা উপহার সামগ্রী না নিয়ে গেলে মান সম্মান থাকবে না অথচ গিফট বা উপহার সামগ্রী বিবাহ ভোজের

না, দোয়া বিবাহ ভোজের অংশ। (গিফট বা উপহার সামগ্রী দেওয়া যাবে না তা না, কিন্তু আমাদের দোয়া করা উচিত। যাই হোক, বিয়ে যেহেতু আমাদের জীবনে একটি স্বাভাবিক ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তেমনি আমাদের সমাজে বা দেশে প্রচলিত যেসব প্রথা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম সেগুলো আমরা বর্জন করা উচিত। বিয়ের সময় যৌতুক, গায়ে হলুদ বা গান বাজনা করা ইত্যাদি বিদাত বা হারাম তা আমরা সবাই জানি। এগুলো ছাড়াও আরোও কিছু কুপ্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে।

বিবাহে প্রচলিত কু-প্রথার তালিকাঃ- বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিবাহ করা নবীগণের (আলাহিসসালাতু আসসালাম) সুন্নাত। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিয়ে করে না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (দারিমী-কিতাবুন নিকাহ)। ইমাম রাগিব বলেনঃ বিয়েকে দুর্গ বলা হয়েছে, কেননা (বিয়ে) স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সকল প্রকার লজ্জাজনক কাজ থেকে দুর্গবাসীদের মতোয় বাচিয়ে রাখে। (মুফরাদাত)। তবে এই পবিত্র কর্ম পালন করতে গিয়ে মাঝে মাঝে কিছু কু-প্রথা মানা হয় যা কিনা অনুচিত। আসুন নবীগণের (আলাহিসসালাতু আসসালাম) এই সুন্নাত কে সুন্নাত তরীকায় পালন করি। নিম্নে কিছু তালিকা উপস্থাপন করা হলোঃ-

১. চন্দ্র বর্ষের কোন মাসে বা কোন দিনে অথবা বর/কনের জন্ম তারিখে বা তাদের পূর্ব পুরুষের মৃত্যুর তারিখে বিবাহ শাদী হওয়া অথবা যে কোন শুভ সৎ কাজ করার জন্য ইসলামী শারী'য়াতে বা ইসলামী দিন তারিখের কোন

বিধি নিষেধ নেয়। বরং উপরিউক্ত কাজগুলো বিশেষ কোন মাসে বা যে কোন দিনে করা যাবে না মনে করাই গুনাহ।

২. বিবাহ উৎসবে অথবা অন্য যে কোন উৎসবে পটকা-আতশবাজি ফুটান, অতিরিক্ত আলোকসজ্জা করা, রংবাজী করা বা রঙ দেওয়ার ছড়াছড়ি ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ ও অপচয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“নিশ্চয় অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান হচ্ছে তার প্রভুর প্রতি বড় অকৃতজ্ঞ।” (বানী ইসরাঈল-২৭)

৩. বাঁশের কুলায় চন্দন, মেহদি, হলুদ, কিছু ধান-দুর্বা ঘাস কিছু কলা, সিঁদুর ও মাটির চাটি নেওয়া হয়। মাটির চাটিতে তেল নিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। স্ত্রী ও বরের কপালে তিনবার হলুদ লাগায় এমনকি মূর্তিপূজার ন্যায় কুলাতে রাখা আগুন জ্বালানো চাটি বর-কনের মুখের সামনে ধরা হয় ও আগুনের ধুঁয়া ও কুলা হেলিয়ে-দুলিয়ে বাতাস দেওয়া হয়। এসব হিন্দুয়ানী প্রথা ও অনৈসলামিক কাজ।

৪. বরের আত্মীয়রা কনেকে কোলে তুলে বাসর ঘর পর্যন্ত পৌছে দেওয়া অথবা বরের কোলে করে মুরুব্বীদের সামনে স্ত্রীর বাসর ঘরে গমনের নীতি একটি বেহায়াপনা, নিরলজ্জতা ও অনৈসলামিক কাজ।

৫. বরের ভাবী ও অন্য যুবতী মেয়েরা বরকে সমস্ত শরীরে হলুদ মাখিয়ে গোসল করিয়ে দেওয়া নির্লজ্জ কাজ যা ইসলাম সমর্থন করে না।

৬. বর ও কনেকে হলুদ বা গোসল করতে নিয়ে যাওয়ার সময় মাথার উপর বড় চাদর এর চার কোনা চার জনের ধরা হিন্দুয়ানী প্রথা।

৭. বিবাহ করতে যাওয়ার সময় বরকে পিড়িতে বসিয়ে বা সিল-পাটাই দাড় করিয়ে দই-ভাত খাওয়ান ইসলামিক প্রথা নয়।

৮. বিবাহ কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর বরকে দাড় করিয়ে সালাম দেওয়ানোর প্রথা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সাহাবীদের (রাযি আল্লাহু আনহুম) দ্বারা প্রমানিত নয়।

৯. বর ও কনের মুরুব্বীদের কদমবুসি করা একটি মারাত্মক কু-প্রথা। বিয়ে তো নয় এমনকি যে কোন সময় কদমবুসি করা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সাহাবীদের (রাযি আল্লাহু আনহুম) দ্বারা কোন কালে প্রমানিত নয়। কদমবুসি করার সময় সালাতের রুকু-সিজদার মত অবস্থা হয়। বেশি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে হিন্দুয়ানী প্রণামকে প্রথা হিসেবে নিয়ে আসা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য নয়।

উপরে উল্লেখিত বিদ'আত, প্রচলিত রসম বা কুপ্রথা ব্যতীত আরও বিয়ে সংক্রান্ত যেসব বিষয়ক বিদ'আত, প্রচলিত রসম ও কুপ্রথা আমাদের মুসলিম সমাজে প্রচলিত রয়েছে সেসব বিষয়ে নিয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে যেসব আলোচনা রয়েছে তা নিম্নে স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হলো:-

শরীয়তে বিবাহ বলতে কী বুঝায় : নারী-পুরুষ একে অপর থেকে উপকৃত হওয়া এবং আদর্শ পরিবার ও নিরাপদ সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যে পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হওয়া। এ সংজ্ঞা থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি, বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল ভোগ নয়; বরং এর সঙ্গে আদর্শ পরিবার ও আলোকিত সমাজ গড়ার অভিপ্রায়ও জড়িত। অথচ আজকাল প্রায়শই দেখা যায় যে, মেয়ের অবিভাবকের অনুমতি ছাড়া পালিয়ে বিয়ে করা একটা রেওয়াজে পরিণতি হয়েছে কিন্তু ইসলাম শরীয়তে এটা স্পষ্টভাবে হারাম। অর্থাৎ মেয়ের শরীয়ত সম্মত অবিভাবক ছাড়া বিয়ে শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহনযোগ্য নয়।

নবী করিম (ﷺ) বলেন- “ওলী ছাড়া বিয়ে হয়ন।” আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত – কোন মহিলা তার ওলীর বিনা অনুমতিতে নিজেই বিয়ে করে ফেললো তার সম্বন্ধে নবী করিম (ﷺ) বলেছেন, তার বিয়ে বাতিল, বাতিল, বাতিল (তিনবার বলেছেন)।” ওলী অর্থ হচ্ছে শরীয়ত সম্মত অবিভাবক। অপরপক্ষে একটি ছেলে তার অবিভাবকের সম্মতি ছাড়াও বিয়ে করতে পারে। তাই আজকের যুব সমাজে প্রচলিত কোর্ট ম্যারেজের ক্ষেত্রে অন্তত মেয়ে পক্ষের অবিভাবকের অনুমতি নিতে হবে। তাছাড়া সে বিয়ে ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহনযোগ্য হবেনা। তবে যদি কোন মেয়ে মনে করে যে তার বাবা মা কোন কিছুর লোভে বা কারও ভয়ে তাকে কুপাত্রের কাছে বিয়ে দিতে চাচ্ছে বা তাদের কে বোঝানো যাচ্ছেনা আবার বিয়েতে রাজী না হলে কোন প্রকার সমস্যা হবে অথবা ইত্যাদি আরও অনেক সমস্যার কারনে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় না থাকে তবে সেক্ষেত্রে কোন বিজ্ঞ আলেমের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে বিয়ে করা উচিত।

বিবাহের তাৎপর্য : বিবাহ একটি বৈধ ও প্রশংসনীয় কাজ। প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এর যার গুরুত্ব অপরিসীম। বিয়ে করা নবী-রাসূলদের (আলাইহুমুস সালাম) সুন্নাত। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

‘আর অবশ্যই তোমার পূর্বে আমি রাসূলদের প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে দিয়েছি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি।’¹⁷⁵

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বিবাহ করেছেন এবং এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলেছেন,

اتَزَوَّجِ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

‘আমি নারীকে বিবাহ করি। (তাই বিবাহ আমার সুন্নত) অতএব যে আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।’¹⁷⁶

এ জন্যই আলিমগণ বলেছেন, সাগ্রহে বিবাহ করা নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। কারণ, এর মধ্য দিয়ে অনেক মহৎ গুণের বিকাশ ঘটে এবং অবর্ণনীয় কল্যাণ প্রকাশ পায়। কারও কারও ক্ষেত্রে বিবাহ করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। যেমন : যদি কেউ বিবাহ না করলে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করে। তখন নিজেকে পবিত্র রাখতে এবং হারাম কাজ থেকে বাঁচতে

¹⁷⁵. রা‘দ : ৩৮।

¹⁷⁶. বুখারী : ৫০৫৬; মুসলিম : ৩৪৬৯।

তার জন্য বিয়ে করা ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

‘হে যুব সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিয়ে করে। কেননা তা চক্ষুকে অবনত করে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে। আর যে এর সামর্থ্য রাখে না, তার কর্তব্য রোযা রাখা। কেননা তা যৌন উত্তেজনার প্রশমন ঘটায়।’¹⁷⁷

বিয়ের প্রস্তাব এবং তার নিয়ম : কেউ যখন কোনো নারীকে বিবাহ করতে আগ্রহী হয় তার জন্য সমীচীন হলো ওই মেয়ের অভিভাবকের মাধ্যমে তাকে পেতে চেষ্টা করা। আর এর জন্য রয়েছে কিছু মুস্তাহাব ও ওয়াজিব কাজ, যা উভয়পক্ষের আমলে নেওয়া উচিত :

১। শরীয়তে বিয়ের প্রস্তাব কী বুঝায় : এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিয়ে করতে চাওয়া যার কাছ থেকে এমন প্রস্তাব গ্রহণ হতে পারে। এটি বিবাহ পর্ব সূচনাকারীদের প্রাথমিক চুক্তি। এটি বিবাহের ওয়াদা এবং বিবাহের প্রথম পদক্ষেপ।

২। ইস্তিখারা করা : মুসলিম নর-নারীর জীবনে বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই যখন তারা বিবাহের সিদ্ধান্ত নেবেন তাদের জন্য কর্তব্য হলো

¹⁷⁷. বুখারী : ৫০৬৬; মুসলিম : ৩৪৬৪।

ইস্তিখারা তথা আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা করা। জাবির রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَنْ جَابِرٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ كَانَ النَّبِيُّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ : (إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَ أَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَ مَعَاشِي وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي- أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ- فَأَقْدِرْهُ لِي، وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَ مَعَاشِي وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي- أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ اصْرِفْنِي عَنْهُ، وَ اقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضْنِي بِهِ. (وَ يُسَمِّي حَاجَتَهُ).

‘যখন তোমাদের কেউ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চায় সে যেন দু’রাকাত নফল নামাজ পড়ে অতপর বলেঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ ، وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ ، وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ، أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ - فَأَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ، أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ اصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي.

‘হে আল্লাহ, আমি আপনার ইলমের মাধ্যমে আপনার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। আপনার কুদরতের মাধ্যমে আপনার নিকট শক্তি কামনা করছি এবং আপনার মহা অনুগ্রহ কামনা করছি। কেননা আপনি শক্তিধর, আমি শক্তিহীন, আপনি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং আপনি অদৃশ্য বিষয়

সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী। হে আল্লাহ, এই কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি উল্লেখ করবেন) আপনার জ্ঞান মোতাবেক যদি আমার দীন, আমার জীবিকা এবং আমার পরিণতির ক্ষেত্রে অথবা ইহলোক ও পরলোকে কল্যাণকর হয়, তবে তাতে আমাকে সামর্থ্য দিন। পক্ষান্তরে এই কাজটি আপনার জ্ঞান মোতাবেক যদি আমার দীন, জীবিকা ও পরিণতির দিক দিয়ে অথবা ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিকর হয়, তবে আপনি তা আমার থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন এবং আমাকেও তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন এবং কল্যাণ যেখানেই থাকুক, আমার জন্য তা নির্ধারিত করে দিন। অতঃপর তাতেই আমাকে পরিতুষ্ট রাখুন।¹⁷⁸

৩। পরামর্শ করা : বিবাহ করতে চাইলে আরেকটি করণীয় হলো বিয়ে ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ, পাত্রী ও তার পরিবার সম্পর্কে ভালো জানাশুনা রয়েছে এমন ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে অধিক পরিমাণে পরামর্শ করতেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অন্য কাউকে আপন সাথীদের সঙ্গে বেশি পরামর্শ করতে দেখি নি।’¹⁷⁹

¹⁷⁸. বুখারী : ১১৬৬; আবু দাউদ : ১৫৪০।

¹⁷⁹. তিরমিযী : ১৭১৪; বাইহাকী : ১৯২৮০।

হাসান বসরী (রহ.) বলেন,

ثلاثة فرجل رجل ورجل نصف رجل لا رجل فأما الرجل الرجل فذو الرأي
والمشورة وأما الرجل الذي هو نصف رجل فالذي له رأي ولا يشاور وأما الرجل
الذي ليس برجل فالذي ليس له رأي ولا يشاور

‘মানুষের মধ্যে তিন ধরনের ব্যক্তিত্ব রয়েছে : কিছু ব্যক্তি পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, কিছু ব্যক্তি অর্ধেক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং কিছু ব্যক্তি একেবারে ব্যক্তিত্বহীন। পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি সেই, যিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং পরামর্শও করেন। অর্ধেক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সেই, যিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তবে পরামর্শ করেন না। আর ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তি তিনিই, যিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না আবার কারো সঙ্গে পরামর্শও করেন না।’¹⁸⁰

এদিকে পরামর্শদাতার কর্তব্য বিশ্বস্ততা রক্ষা করা। তিনি যেমন তার জানা কোনো দোষ লুকাবেন না, তেমনি অসদুদ্দেশ্যে আদতে নেই এমন কোনো দোষের কথা বানিয়েও বলবেন না। আর অবশ্যই এ পরামর্শের কথা কাউকে বলবেন না।

৪। কনে দেখাঃ কনে দেখার ক্ষেত্রে পাত্র পক্ষের মহিলারা ও পাত্র নিজে দেখতে পারেন। অন্য কোন পুরুষ লোক মেয়ে পক্ষের সাথে আলোচনা করতে পারবেন কিন্তু মেয়ে দেখতে পারবেন না। তবে পাত্রের নিজে দেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সাঃ) এর একটি হাদীস উল্লেখ করা

¹⁸⁰ . শিহাবুদ্দীন আবশীহী, আল-মুসতাতারিফ ফী কুল্লি মুসতায়রিফ : ১/১৬৬।

যায়। যেমনঃ জাবের ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَرَى مِنْهَا مَا يُعْجِبُهُ وَيَدْعُوهُ إِلَيْهَا فَلْيَفْعَلْ. قَالَ جَابِرٌ : فَلَقَدْ خَاطَبْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَكُنْتُ أَتَخَبُّ فِي أَصُولِ النَّخْلِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا أُعْجِبُنِي فَتَزَوَّجْتُهَا.

‘তোমাদের কেউ যখন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, অতপর তার পক্ষে যদি ওই নারীর এতটুকু সৌন্দর্য দেখা সম্ভব হয়, যা তাকে মুগ্ধ করে এবং মেয়েটিকে (বিবাহ করতে) উদ্বুদ্ধ করে, সে যেন তা দেখে নেয়।’¹⁸¹

শুধু তাই নয়, নবী করীম (ﷺ) সাহাবীদের নিজের চোখে পাত্রী দেখে পছন্দ করতে নির্দেশ বা উপদেশ দিয়েছেন। যেমনঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « -أَنْظَرْتُ إِلَيْهَا » -قَالَ لَا. قَالَ «فَاذْهَبْ فَأَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنْ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا».

‘আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে জানাল যে সে একজন আনসারী মেয়েকে বিয়ে করেছে।

¹⁸¹. বাইহাকী, সুনান কুবরা : ১৩৮৬৯।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি তাকে দেখেছো?’ সে বললো, না। তিনি বললেন, যাও, তুমি গিয়ে তাকে দেখে নাও। কারণ আনসারীদের চোখে (সমস্যা) কিছু একটা রয়েছে’।¹⁸²

ব্যাখ্যাঃ ইমাম নববী (রহ.) বলেন, ‘এ হাদীস থেকে জানা যায়, যাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক তাকে দেখে নেয়া মুস্তাহাব’।¹⁸³ অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, হাদীসটি হতে মোট দুটি কথা জানা যায়। একটি এই যে, নবী করীম (সাঃ) আনসার বংশের লোকদের চোখে একটা কিছু থাকার কথা বললেন এমন ব্যক্তিকে যে সেই বংশের একটি মেয়েকে বিবাহ করেছে। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, রাসূলে করীম (সাঃ) আনসার বংশের মেয়ের স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সেই মেয়েটিকে দেখেছ কিনা? সে যখন দেখে নাই বলে জানাল, তখন নবী করীম (সাঃ) মেয়েটিকে দেখার জন্য তাকে নির্দেশ দিলেন। প্রথম কথাটি সম্পর্কে হাদীস ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেনঃ এই রূপে বলা কল্যাণকামী ব্যক্তির জন্য সম্পূর্ণ জায়েয। এটি কোন গীবত নয়, নয় তারও বিষয়ে মিথ্যা দুর্নাম রটানো বা কোন রূপ বিদ্বেষ ছড়ানো বরং একটা প্রকৃত ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরিচিত করা মাত্র। কেননা আনসার বংশের মেয়েদের চোখে যদি এমন কিছু থাকে যা অন্য লোকদের পছন্দনীয় নাও হতে পারে, তা হলে সেই মেয়েকে নিয়ে দাম্পত্য জীবন

¹⁸². মুসলিম : ৩৫৫০।

¹⁸³. নববী, শারহ মুসলিম : ৯/১৭৯।

সুখের নাও হতে পারে। তাই পূর্বাঙ্কেই সে বিষয়ে জানিয়ে দেয়া কল্যাণকামী ব্যক্তির দায়িত্বও বটে। কিন্তু আনসার বংশের লোকদের চোখে কি জিনিস থাকার কথা রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছিলেন? কেউ কেউ বলেছেন, আনসার বংশের লোকদের চক্ষু আকারে ক্ষুদ্র হত। আর ক্ষুদ্র চোখ অনেকেই স্বাভাবিকভাবেই পছন্দ করে না। কেহ কেহ বলেছেন যে, তাদের চক্ষু নীল বর্ণের হত, যা অনেক লোকেরই অপছন্দ। রাসূলে করীম (সাঃ) এই দিতেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। মোট কথা, এটি কোন বিশেষ বংশ বা শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারণাও নয় বরং রাসূলে করীম (সাঃ) - এর দ্বিতীয় কথাটি হতে জানা যায়, যে মেয়েকে বিবাহ করা হবে, তাকে দেখে নেয়া বাঞ্ছনীয়। বিবাহ করার পর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করা যে, সে বিয়ে-করা-মেয়েটিকে দেখেছিল কিনা, এটিতে দুটির তাৎপর্য হতে পারে? হয় এটি হবে যে, বিবাহ করার পূর্বে তাকে দেখেছে কিনা নতুবা এই হবে যে, বিয়ে করার পর-পরই তাকে দেখেছে কিনা। আলোচ্য লোকটি বিবাহ করেছে, এই সংবাদ দেয়ার পর নবী করীম (সাঃ) তাকে চলে যেতে ও তাকে দেখতে বললেন- দেখতে হুকুম করলেন। অতএব, হাদীস আলোচনায় বলা যায় যে, প্রচলিত সামাজিক নিয়ম আমাদের দেশে রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহত পরিপন্থী। তাই এই সব নতুন নিয়ম বিদ'আত এবং বাতিল বলে বিবেচিত হবে তাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, আমাদের অনেকের ধারণা যে মামাতো বোন, খালাতো বোনদের মেয়ে বিয়ে করা জায়েজ নয়

কারণ তারা আমাদের ভাগ্নি বা ভতিজী হয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের বিয়ে করা জায়েজ।

৫। এ্যাংগেজমেন্ট করা বা আংটি পড়ানো : ইদানীং পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে বিয়েতে এ্যাংগেজমেন্ট করার রেওয়াজ ব্যাপকতা পেয়েছে। এই আংটি পরানোতে যদি এমন ধরে নেওয়া হয় যে এর মাধ্যমে বিবাহের কথা পাকাপোক্ত হয়ে গেল তবে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। কেননা, মুসলিম সমাজ বা শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই। আরও নিন্দনীয় ব্যাপার হলো, এ আংটি প্রস্তাবদানকারী পুরুষ নিজ হাতে কনেকে পরিয়ে দেয়। কারণ, এ পুরুষ এখনো তার জন্য বেগানা। এখনো সে মেয়েটির স্বামী হয়নি। কেননা, কেবল বিবাহ চুক্তি সম্পাদিত হবার পরেই তারা স্বামী-স্ত্রী বলে গণ্য হবেন।¹⁸⁴ শাইখ আলবানী (রহ.) 'আদাবুয যিফাফ' গ্রন্থে বলেন, 'এতে মূলত কাফেরদের অন্ধানুকরণই প্রকাশ পায়। কেননা তা খ্রিস্টানদের সনাতন রীতি।

৬। বিবাহের আগে প্রস্তাবদানকারীর সঙ্গে বাইরে বের হওয়া বা নির্জনে অবস্থান করা : বিয়ের আগে প্রস্তাব দেয়া নারীর সঙ্গে নির্জন অবস্থান বা তার সঙ্গে ঘুরতে যাওয়া বৈধ নয়। কেননা, এখনো সে বেগানা নারীই রয়েছে। পরিতাপের বিষয়, আজ অনেক মুসলমানই তার মেয়েকে লাগামহীন ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে তারা প্রস্তাবদানকারী পুরুষের সঙ্গে ঘরের

¹⁸⁴ . ফাতাওয়া জামেয়া লিল-মারআতিল মুসলিমা।

বাইরে যায়! উপরন্তু তার সঙ্গে সফরও করে! ভাবখানা এমন যে মেয়েটি যেন তার স্ত্রী হয়ে গেছে।

৭। বর-কনের পারস্পরিক যোগাযোগ করা : প্রস্তাব দেয়া নারীর সঙ্গে ফোন বা মোবাইলে এবং চিঠি ও মেইলের মাধ্যমে শুধু বিবাহের চুক্তি ও শর্তাদি বোঝাপড়ার জন্য যোগাযোগের অনুমতি রয়েছে। তবে এ যোগাযোগ হতে হবে ভাব ও আবেগবিবর্জিত ভাষায়, যা একজন বেগানা নারী-পুরুষের জন্য বৈধ ভাবা হয় না। আর বলাবাহুল্য, বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণকারী কনের কেউ নন, যাবৎ না তারা বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উল্লেখ্য, এ যোগাযোগ উভয়ের পিতার সম্মতিতে হওয়া শ্রেয়।

৮। একজনের প্রস্তাবের ওপর অন্যজনের প্রস্তাব না দেয়া : যে নারীর কোথাও বিয়ের কথাবার্তা চলছে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া বৈধ নয়।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ ، أَوْ يَتْرُكَ .

‘কেউ তার ভাইয়ের প্রস্তাবের ওপর যেন প্রস্তাব না দেয়, যাবৎ না সে তাকে বিবাহ করে অথবা প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়।’¹⁸⁵ হ্যাঁ, দ্বিতীয় প্রস্তাবদাতা যদি প্রথম প্রস্তাবদাতার কথা না জানেন তবে তা বৈধ। এ ক্ষেত্রে ওই নারী

¹⁸⁵. বুখারী : ৫১৪৪; নাসায়ী : ৩২৪১।

যদি প্রথমজনকে কথা না দিয়ে থাকেন তবে দু'জনের মধ্যে যে কাউকে গ্রহণ করতে পারবেন।

৯। ইদ্দতে থাকা নারীকে প্রস্তাব দেয়া : বায়ান তালাক বা স্বামীর মৃত্যুতে ইদ্দত পালনকারী নারীকে সুস্পষ্ট প্রস্তাব দেয়া হারাম। ইঙ্গিতে প্রস্তাব দেয়া বৈধ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ

‘আর এতে তোমাদের কোন পাপ নেই যে, তোমরা নারীদেরকে ইশারায় যে প্রস্তাব করবে।’¹⁸⁶ তবে ‘রজঈ’ তালাকপ্রাপ্ত নারীকে সুস্পষ্টভাবে তো দূরের কথা আকার-ইঙ্গিতে প্রস্তাব দেয়াও হারাম। তেমনি এ নারীর পক্ষে তালাকদাতা ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও প্রস্তাবে সাড়া দেয়াও হারাম। কেননা এখনো সে তার স্ত্রী হিসেবেই রয়েছে।

(সুস্পষ্ট প্রস্তাব : যেমন এ কথা বলা, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। অস্পষ্ট প্রস্তাব : যেমন এ কথা বলা, আমি তোমার মতো মেয়েই খুঁজছি ইত্যাদি বাক্য)।

১০। উপযুক্ত পাত্রের প্রস্তাব প্রত্যাখান করা : উপযুক্ত পাত্র পেলে তার প্রস্তাব নাকচ করা উচিত নয়। আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

¹⁸⁶ . সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৩৫।

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرُجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ عَرِضٌ.

‘যদি এমন কেউ তোমাদের বিয়ের প্রস্তাব দেয় যার ধার্মিকতা ও চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট তবে তোমরা তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে। যদি তা না করো তবে পৃথিবীতে ব্যাপক অরাজতা সৃষ্টি হবে।’¹⁸⁷

১১। মেয়ের কবুল বলাঃ আমাদের সমাজে আরেকটি বিদাত হচ্ছে বিয়ের দিন মেয়ের তিনবার কবুল বলা। বস্তুত মেয়ের কবুল বলার কোন প্রয়োজন বা বিধান নেই। বিয়ের দিন মেয়ের অভিভাবক মেয়ের বিয়েতে সম্মতি দিলে ছেলে কবুল বললেই বিয়ে হয়ে যায়। তাই বিয়ের দিন মেয়ের কোন কাজ নেই। অভিভাবক আগেই মেয়ের অনুমতি নিয়ে নিতে হয়। উল্লেখ্য মেয়ের অনুমতি ছাড়া বিয়ে হবেনা।

যেমন রাসূল (সাঃ) এর একটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। হাদীসটি হচ্ছেঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেনঃ পূর্বে স্বামীসঙ্গ প্রাপ্তা কনের স্পষ্ট আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে বিবাহ দেয়া যাবে না এবং পূর্বে স্বামী অ-প্রাপ্তা কনের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তাকে বিবাহ দেয়া যাবে না।

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে অনুমতি কিভাবে নেয়া যেতে পারে? রাসূল (সাঃ) বললেনঃ তার চুপ থাকাই হলো (অনুমতি)। (তথ্যসূত্রঃ মুসলিম, বুখারী, নাসায়ী)। পক্ষান্তরে আরেকটি হাদীসের উদাহরন এখানে উল্লেখ করা যায়। যেমনঃ যরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছেঃ

¹⁸⁷. তিরমিযী: ১০৮৪।

তিনি বলেনঃ ইয়া রাসূল! কুমারী মেয়ে তো বিবাহের অনুমতি দিতে লজ্জাবোধ করে। তা হলে তার অনুমতি পাওয়া যাবে কিভাবে? রাসূলে করীম (সাঃ) বলেনঃ তার চুপ থাকাটাই তার অনুমতি ও রাযী থাকা বুঝাবে। (তথ্যসূত্রঃ সহীহ মুসলিম)।

অতএব, হাদীসগুলো আলোচনা করে বলা যায় যে, প্রচলিত আমাদের দেশের বিবাহ পদ্ধতিতে তথা বিয়ের দিন মেয়ের তিনবার কবুল বলা শরীয়ত সম্মত নয় তথা বিদ'আত।

১২। ওকিল বানানোঃ বিয়ের দিনে ওকিল ও সাক্ষী দিয়ে মেয়ের অনুমতি নেয়ার প্রথা আমাদের দেশের অনেক জায়গায় প্রচলিত। মেয়ের অনুমতি নেওয়ার দায়িত্ব তার অবিভাবকের। তাই বাইরের কোন লোক, ওকিল বা সাক্ষী ইত্যাদি ইসলাম সম্মত নয়।

১৩। কবুল বলার পর সালাম করাঃ আমাদের দেশে আরেকটি বিদাত হলো কবুল বলার পর বর দাড়িয়ে সবাইকে সালাম করে। আসলে সালাম করতে হয় কারও সাথে দেখা হলে বা কোথাও গেলে বা বিদায় নেওয়ার সময়। বিয়ের অনুষ্ঠানের মাঝখানে দাড়িয়ে এভাবে সালাম দেয়ার প্রথা নবী(সঃ) এর আমলে ছিলোনা অর্থাৎ তা পরে আবিষ্কৃত।

১৪। বিয়ের মোহরানাঃ বিয়ের মোহরানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সামাজিক সম্মান বিবেচনা করে অসম্ভব বা অসাধ্য পরিমান মোহরানায় রাজী হওয়া বা বরপক্ষকে চাপ দিয়ে রাজী করানো ইত্যাদি শরীয়ত সম্মত নয়। নবী করীম (সাঃ) নগদ মোহরানা দিয়ে বিয়ে করেছেন বা সাহাবীদের সাধ্যমতো

মোহরানা দেয়ে বিয়ে পড়িয়েছেন। মোহরানা হতে পারে টাকা পয়সা, জমিজমা, অলংকার এমনকি জ্ঞান বা শিক্ষাও হতে পারে।

১৫। বিয়ের অনুষ্ঠানঃ আমাদের দেশে বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে যেসব প্রচলিত রসম বা কুপ্রথা বা বিদ'আতী কাজ পরিলক্ষিত হতে দেখা যায় তা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ-

১- বিয়েতে পুরুষদের বর্জনীয় কাজ - দাঁড়ি মুগুন করা : আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ অমান্য করে বিয়ে উপলক্ষ্যে দাঁড়ি মুগুনো তো এখন অনেকের কাছেই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়ি না কামিয়ে বিয়েতে যাওয়াকে অনেকে দোষের মনে করেন।

অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفَرُّوا اللَّحْيَ وَأَخْفُوا الشَّوَارِبَ

'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করো : দাড়ি বড় করো এবং গোঁফ ছোট করো।' (বুখারী : ৫৮৯২; মুসলিম : ৬২৫)^{১৮৮}। হাদীসে দাঁড়ি রাখতে সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, যা থেকে প্রমাণিত হয় দাড়ি রাখা ওয়াজিব। কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে দাড়ি কাটার অবকাশ নেই। দাড়ি মুগুনো হারাম। মুগুনকারী গুনাহগার। কারণ, এতে কাফের ও নারীদের সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়। সরাসরি লজ্জিত হয় আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ।

^{১৮৮}. বুখারী : ৫৮৯২; মুসলিম : ৬২৫।

২- বিয়েতে নারীদের বর্জনীয় কাজসমূহ :

১. **ঐ উপড়ানো** : ঐ উপড়ানো বা পাতলা করা এমন একটি কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হারাম করেছেন এবং এ কাজ করা ব্যক্তির ওপর অভিশাপ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّاصِبَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خُلِقَ اللَّهُ

‘আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন সেসব মহিলার ওপর যারা সৌন্দর্যের জন্য উকি অঙ্কন করে ও করায়, ঐ উৎপাটন করে ও করায় এবং দাঁত ফাঁকা করে।’ (মুসলিম : ৫৬৯৫)¹⁸⁹

২. **চুল কাটা** : **চুল কাটার তিনটি ধরন রয়েছে** : এক. পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে চুল কাটা। এটি হারাম এবং কবীরা গুনাহ। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারীদের অভিসম্পাত করেছেন। এখানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর একটি হাদীস উল্লেখ করা যায়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ প্রসঙ্গে বলেনঃ

ثَلَاثٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْعَاقُ بِوَالِدَيْهِ ،
وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ - الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ - وَالذَّيُّوثُ

¹⁸⁹. মুসলিম : ৫৬৯৫।

'তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের দিকে তাকাবেন না : পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারী এবং কোটনা তথা ব্যভিচারের দূত।'¹⁹⁰

দুই. যদি চুল ছোট করা হয় এমনভাবে যে তাতে পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ হয় না তবে ইমাম আহমদ রহ.-এর মতে তা মাকরুহ।

তিন. যদি চুল ছোট করা হয় অমুসলিম রমণীদের অনুকরণে তবে তা হারাম। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

'যে বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।' (মুসনাদ আহমদ : ৬১৮০)¹⁹¹

৩. অল্লীল কিংবা প্রসিদ্ধি ও অহংকারের পোশাক পরা : অতি টাইট, পাতলা ও গোপন সৌন্দর্যকে প্রস্ফুটিত করে এমন পোশাক পরা। বক্ষ, বাহু ও কটি দৃশ্যমান হয় এমন অপ্রচলিত ও দৃষ্টিকটু পোশাক পরে অহংকার দেখানো এবং পর পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

¹⁹⁰. মুসনাদ আহমদ : ৬১৮০।

¹⁹¹. আবু দাউদ : ৪০৩৩।

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا
النَّاسَ وَنِسَاءً كَاسِيَاتٍ عَارِيَّاتٍ مُمِيلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ
لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا.

'দুই শ্রেণীর জাহান্নামী লোক যাদের আমি এখনো দেখিনি। (তবে তারা অচিরেই সমাজে দেখা দেবে) এক. সস্ত্রাসী দল, তাদের সাথে গরুর লেজ সদৃশ চাবুক থাকবে। তারা এর দ্বারা লোকজনকে আঘাত করবে।

দুই. এমন নারী যারা (পাতলা ফিনফিনে কাপড়) পরিহিতা অথচ উলঙ্গ, অপরকে আকর্ষণকারিণী আবার নিজেরাও অপরের দিকে আকৃষ্ট। তাদের মস্তকগুলো হবে বুখতি উটের হেলানো কুজের মতো। এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ এমন এমন দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।' (মুসলিম : ৫৭০৪; বাইহাকী : ৩৩৮৬)¹⁹²।

অপর এক হাদীসে তিনি বলেন,

مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا ، أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

'যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধির পোশাক পরিধান করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন।' (আবু দাউদ : ৪০২৩; ইবন মাজাহ : ৩৬০৩)¹⁹³

¹⁹². মুসলিম : ৫৭০৪; বাইহাকী : ৩৩৮৬।

¹⁹³. আবু দাউদ : ৪০২৩; ইবন মাজাহ : ৩৬০৩।

৪. সুগন্ধি ব্যবহার করা : বিবাহ অনুষ্ঠানে ইদানীং মেয়েরা বিশেষত তরুণীরা মহা উৎসাহে সেন্ট ব্যবহার করে অংশগ্রহণ করে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ، فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

'যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে অতপর মানুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাতে তার সুগন্ধি পায়, সে ব্যভিচারিণী।' (নাসায়ী : ৯৩৬১; আহমদ : ১৯৭২৬)¹⁹⁴

৫. ছবি তোলা : নারী-পুরুষ কারো জন্য কোনোভাবে কোনো ছবি বা ফটো বিনিময় বৈধ নয়। কারণগুলো নিম্নরূপঃ আলোচনা করা হলোঃ-

প্রথমত. এ ছবি অন্যরাও দেখার সম্ভাবনা রয়েছে, যাদের জন্য তা দেখার অনুমতি নেই।

দ্বিতীয়ত. ছবি কখনো পূর্ণ সত্য তুলে ধরে না। প্রায়শই এমন দেখা যায়, কাউকে ছবিতে দেখে বাস্তবে দেখলে মনে হয় তিনি একেবারে ভিন্ন কেউ।

তৃতীয়ত. কখনো এমন হতে পারে যে প্রস্তাব ফিরিয়ে নেয়া হয় বা প্রত্যাখ্যাত হয় অথচ ছবি সেখানে রয়েই যায়। ছবিটিকে তারা যাচ্ছে তাই করতে পারে। তাছাড়া প্রয়োজন ব্যতীরেকে ইসলাম শরীয়তে ছবি তোলা নিষিদ্ধ। কারন এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

¹⁹⁴ . নাসায়ী : ৯৩৬১; আহমদ : ১৯৭২৬।

'প্রত্যেক ছবি অঙ্কনকারীই জাহান্নামে যাবে।' (মুসলিম : ৫৬৬২)¹⁹⁵।

অতএব সেই ছবি সম্পর্কে আর কী বলার প্রয়োজন আছে যা পর পুরুষের হাতে প্রিন্ট হয়, পর পুরুষরা দেখে এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

৬. দাওয়াত খাওয়ানো ও নব দম্পত্তির জন্য দু'আ করাঃ আমাদের দেশের প্রচলিত বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়ে পক্ষ ঘটা করে অনুষ্ঠান করে লোক দাওয়াত দিয়ে খাওয়ায়।

ইসলামী দৃষ্টিতে মেয়ে পক্ষের অনুষ্ঠান করা বা লোক খাওয়ানোর কোন বিধান নেই। তবে কেউ যদি বিয়ের দাওয়াত দেয় তাহলে সে দাওয়াত কবুল করা সুন্নত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

'তোমাদের কাউকে যখন বৌভাতের দাওয়াত দেয়া হয়, সে যেন তাতে অংশ নেয়।' (বুখারী : ৫১৭৩; মুসলিম : ৩৫৮২)¹⁹⁶। অপর এক হাদীসে তিনি বলেন,

وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

¹⁹⁵. মুসলিম : ৫৬৬২।

¹⁹⁶. বুখারী : ৫১৭৩; মুসলিম : ৩৫৮২।

'আর যে দাওয়াত কবুল করল না সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করল।' (মুসলিম : ৩৫৯৮)^{১৭৭} কিন্তু আমাদের দেশে সামাজিক নিয়মের চাপে পড়ে বাবা মা ধারদেনা করে বিয়ের আয়োজন করে আর বরপক্ষ বরযাত্রী নিয়ে ধুমধাম করে এসে দাওয়াত খায়। উপরন্তু খাবার দাবারে সমস্যা হলে মেয়ে পক্ষকে দু'একটি কথা না শুনিয়ে ছাড়ে না। তাছাড়া দাওয়াত কবুল করার পাশাপাশি নব-দম্পতির জন্য দু'আ করা উচিত কিন্তু আমাদের দেশে এর সঠিক প্রথা একদম পরিলক্ষিত হতে দেখা যায় না বললেই চলে। অথচ নব দম্পতির জন্য দু'আ করা সুন্নত। দোআটি হলো - আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যখন কোনো ব্যক্তি বিবাহ করত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.

'আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দিন, তোমার ওপর বরকত দিন এবং তোমাদের উভয়েক কল্যাণে মিলিত করুন।' (আবু দাউদ, সুনান : ২১৩০)^{১৭৮}।

৭. গান বাজনাঃ বিয়ের অনুষ্ঠানে আজকাল গান বাজনা করতেও দেখা যায় যা ইসলাম শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নিম্নোক্ত প্রমাণসমূহের ভিত্তিতে গান-বাজনা হারাম তা স্পষ্টভাবে বলা যায়।

^{১৭৭} . মুসলিম : ৩৫৯৮।

^{১৭৮} . আবু দাউদ, সুনান : ২১৩০।

ক. পবিত্র কুরআন থেকে : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (6) وَإِذَا تُلِّيَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ
فِي أُذُنِهِ وَقْرًا فَبَسَّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (7)

'আর মানুষের মধ্য থেকে কেউ কেউ না জেনে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বেহুদা কথা খরিদ করে, আর তারা ঐগুলোকে হাসি-ঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ করে; তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব। আর তার কাছে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন সে দস্তভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে শুনতে পায়নি, তার দু'কানে যেন বধিরতা; সুতরাং তাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।' (সূরা লুকমান : ৬-৭)¹⁹⁹।

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহর কসম, বেহুদা কথা দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য গান।'

এ কথা তিনি তিনবার আওড়ান। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু জাবের রাদিআল্লাহু আনহু ও ইকরামা রাদিআল্লাহু আনহু থেকেও এমনটি বর্ণিত হয়েছে।

খ. হাদীস থেকে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ
إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ ، يَغْنِي الْفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا

¹⁹⁹. সূরা লুকমান : ৬-৭।

ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ وَيَمْسَخُ آخِرِينَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ.

'আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক এমন হবে যারা ব্যভিচার, রেশমি বস্ত্র পরিধান, মদ পান এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার ইত্যাদি হালাল মনে করবে। আর কিছু লোক এমন হবে যারা একটি পর্বতের কাছে অবস্থান করবে এবং সন্ধ্যাবেলায় তাদের মেষপালক তাদের কাছে মেঘগুলো নিয়ে আসবে এবং তাদের কাছে কিছু চাইবে। তখন তারা বলবে, আগামীকাল ফেরত এসো।

রাতের বেলায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন এবং তাদের ওপর পর্বত ধ্বসিয়ে দেবেন। বাকি লোকদেরকে তিনি বানর ও শূকরে পরিণত করে দেবেন এবং শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তারা এই অবস্থায় থাকবে।' (বুখারী : ৫৫৯০)²⁰⁰। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ ، أَوْ حُرِّمَ الْخَمْرُ ، وَالْمَيْسِرُ ، وَالْكُوبَةُ قَالَ : وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

'আল্লাহ আমার ওপর হারাম করেছেন অথবা (তিনি বলেছেন) মদ, জুয়া ও তবলা হারাম করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আর প্রতিটি নেশাজাতীয় দ্রব্যই হারাম।' (আবু দাউদ : ৩৬৯৬)²⁰¹

গ. সাহাবীদের উক্তি থেকে : আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,

²⁰⁰. বুখারী : ৫৫৯০।

²⁰¹. আবু দাউদ : ৩৬৯৬।

الدُّفُّ حَرَامٌ وَالْمَعَازِفُ حَرَامٌ وَالْكَوْبَةُ حَرَامٌ وَالْمَرْمَارُ حَرَامٌ.

'দফ হারাম, বাদ্যযন্ত্র হারাম, তবলা হারাম এবং বাঁশি হারাম।' (বাইহাকী : ২১৫২৯)²⁰²

ঘ. সালাফের উক্তি থেকে : প্রখ্যাত বুযুর্গ হাসান বসরী (রহ.) বলেন, মুসলিমের জন্য দফ বাজানো কিছুতেই শোভনীয় নয়, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু -এর শিষ্যগণ দফ ভেঙ্গে ফেলতেন।' (আলবানী, তাহরীমু আলাতিত-তারব : ১/১০৪)²⁰³ উল্লেখ্য, গান ও বাদ্যযন্ত্র হারাম হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। তবে বিয়ের ঘোষণার স্বার্থে শুধু দফ বাজানো এবং নির্দোষ সঙ্গীত গাওয়ার অনুমতি রয়েছে। তবে সে সঙ্গীতে রূপের বর্ণনা কিংবা অবৈধ কিছু আত্মশ্রম না থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

فَصْنُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ، وَضَرْبُ الدُّفِّ.

'হালাল ও হারাম বিয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল ঘোষণা ও দফ বাজানো।' (তিরমিযী : ১১১১; মুসনাদ আহমদ : ১৮৩০৫)²⁰⁴

৪- বিয়েতে হারাম কাজ হলেও তাতে অংশ নেয়া : বিয়ের অনুষ্ঠানে যদি নিষিদ্ধ কিছু আয়োজন থাকে তবে তাতে অংশ নেয়ার অনুমতি নেই। আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

²⁰² . বাইহাকী : ২১৫২৯।

²⁰³ . আলবানী, তাহরীমু আলাতিত-তারব : ১/১০৪।

²⁰⁴ . তিরমিযী : ১১১১; মুসনাদ আহমদ : ১৮৩০৫।

صَنَعْتُ طَعَامًا وَدَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ ، فَرَأَى فِي الْبَيْتِ
تَصَاوِيرَ فَرَجَعَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ رَجَعْتَ ؟ قَالَ : إِنَّ فِي الْبَيْتِ شَيْئًا فِيهِ
تَصَاوِيرُ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ.

'আমি একটি খাবার তৈরি করলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত দিলাম। ফলে তিনি এলেন। তারপর ঘরে ছবি দেখতে পেয়ে ফেরত এলেন। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি ফিরে এলেন কেন? তিনি বললেন, 'ঘরে কিছু রয়েছে যাতে ছবি আঁকা। আর যে ঘরে ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।' (প্রাগুক্ত)²⁰⁵।

এ হাদীসের আলোকে আলিমগণ বলেন, যে দাওয়াতে নিষিদ্ধ বিষয় রয়েছে, তা বর্জন করা উচিত। ইমাম আওয়ামী (রহ.) বলেন, 'সে ঘরে বিয়ের দাওয়াতে যাওয়া যাবে না, যেখানে তবলা এবং বাদ্যযন্ত্র রয়েছে।' (মুসনাদ বাযযার : ৫২৩; ইবন মাজা : ৩৩৫৯)²⁰⁶।

বস্তুত এসবই ইসলামের নিয়মের বাইরে আমাদের সামাজিক প্রথা যা একেতো অন্যায় এবং তা ইসলামী সংস্কৃতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে কেউ যদি বিয়ের দাওয়াত দেয় তাহলে সে দাওয়াত কবুল করা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

²⁰⁵ . প্রাগুক্ত।

²⁰⁶ . মুসনাদ বাযযার : ৫২৩; ইবন মাজা : ৩৩৫৯।

'তোমাদের কাউকে যখন বৌভাতের দাওয়াত দেয়া হয়, সে যেন তাতে অংশ নেয়।' (বুখারী : ৫১৭৩; মুসলিম : ৩৫৮২)^{২০৭}

অপর এক হাদীসে তিনি বলেন,

وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

'আর যে দাওয়াত কবুল করল না সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করল।' (মুসলিম : ৩৫৯৮)^{২০৮}

৮। মালামাল দেয়াঃ বিয়েতে কনে পক্ষ বিয়ের দিন বরের বাড়ীতে যে মালামাল পাঠায় তাও ইসলামী সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। এগুলো বেদাত এবং তাতে মেয়ে পক্ষের উপর খরচের চাপ পড়ে। এবং এ খরচ মিটাতে গিয়ে মেয়ের বাবা মা ধার দেনা গ্রস্থ হয়ে পড়েন।

৯। উপহার নেয়াঃ আমাদের দেশী বিয়েতে উপহার নেওয়ার প্রথা রয়েছে। শুধু তাই নয়, বিয়েতে উপহার নিয়ে তা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। গেইট দিয়ে ঢুকেই উপহার গ্রহনকারী লোক জনের মুখামুখি হতে হয়। এতে যারা উপহার নিয়ে আসেন নি বা উপহার আনার সামর্থ্য যাদের নেই তারা ভীষন বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে পড়েন। উপহার লিপিবদ্ধ করার কারনে দামী উপহার না দিলে সামাজিক অবস্থান হারানোর একটা আশংকা থাকায় অনেকে বাধ্য হয়ে দামী উপহার দিতে বাধ্য হন। ওনেকে উপহার সামগ্রী দেওয়ার অসামর্থ্যের কারনে বিয়েতে আসেন না। উপহার সামগ্রী দেওয়া

^{২০৭} . বুখারী : ৫১৭৩; মুসলিম : ৩৫৮২।

^{২০৮} . মুসলিম : ৩৫৯৮।

একটা সওয়াবের কাজ কিন্তু এভাবে পরোক্ষ চাপ দিয়ে উপহার সামগ্রী আদায় করা সম্পূর্ণ অনৈসলামিক।

১০। ওয়ালিমা না করাঃ আমাদের দেশ প্রচলিত বিয়েতে মেয়ে পক্ষ ঘটা করে অনুষ্ঠান করলেও ছেলে পক্ষ অনেক ক্ষেত্রে ওয়ালিমা করেনা। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে পুরো উল্টা সিষ্টেম। ইসলামে মেয়ে পক্ষের অনুষ্ঠান করা বা লোক খাওয়ানোর বিধান নেই কিন্তু ছেলে পক্ষের ওয়ালিমা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। কিছু কিছু আলেম ওয়াজিব ও বলেছেন। নাবী করীম (সঃ) সাহাবী আব্দুর রহমান বিন আওয়াফ (রাঃ) এর বিয়ের পর তাকে বল্লেন যে, কমপক্ষে একটা ছাগল দিয়ে হলেও ওয়ালিমা করো। ওয়ালিমার দাওয়াতের ক্ষেত্রে গরীবদের অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) কতৃক বর্ণিত, "নাবী করীম (সাঃ) বলেছেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার হচ্ছে সে ওয়ালিমার খাবার যেখানে ধনীদেবকে তো ডাকা হয় কিন্তু ফকির গরীবদের কে ডাকা হয়না।" তিনি আরও বলেন- "যে ব্যক্তি ওয়ালিমার দাওয়াত ছেড়ে দিলো সে আল্লাহ ও রাসুল (সাঃ) এর সাথে নাফরমানী করলো।"

তাই কোন জরুরী কোন কাজ বা সমস্যা না হলে অবশ্যই ওয়ালিমার আসতে হবে। কেননা বিয়ের আরেকটি সুন্নত হলো অলীমা করা তথা মানুষকে দাওয়াত করে খাওয়ানো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এমনকি তিনি আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিআল্লাহু আনহু -এর উদ্দেশে বলেন,

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ.

'অলীমা কর, হোক না তা একটি ছাগল দিয়ে হয়।' (বুখারী : ২০৪৯;
মুসলিম : ৩৫৫৬)^{২০৯}

১১। মেয়ে পক্ষের খরচ করাঃ ইসলাম সম্মত বিয়েতে বিয়ের সময় বা বিয়ের অনুষ্ঠানে মেয়ে পক্ষের খরচ করার মতো তেমন কিছু নেই। বিয়েতে মোহরানা দিবে ছেলে। ওয়ালিমা করবে ছেলে। কনে ঘরে আনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ঘরের আসবাব পত্রের ব্যবস্থা করবে ছেলে। অথচ আমাদের দেশে হয় ঠিক তার উল্টো। যৌতুক দেয় মেয়ে পক্ষ, অনুষ্ঠান করে লোক খাওয়ায় মেয়ে পক্ষ, মেয়ের সাথে প্রয়োজনীয় ফার্নিচার বা আসবাব দেয় মেয়ে পক্ষ। এসবই হচ্ছে বিদাতী প্রথা।

১২। আরও কিছু বিদাতী প্রথাঃ আরও কিছু কুপ্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে যেমন, বিয়ের পরে মেয়ে কর্তৃক শশুরের পায়ে তেল মালিশ করে দেয়া। এটা বিদাতী প্রথা। যেমনঃ বিয়ের পরে মেয়ে পক্ষের পক্ষ হতে রমজানে ইফতার দেয়া, মৌসুমী ফল পাঠানো, ঈদের সময় কাপড় চোপড় পাঠানো ইত্যাদিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে চাপ প্রয়োগ করা বা সামাজিক চাপের কারনে মেয়ে পক্ষ তা দিতে সম্মত হলেও তাদের কষ্ট হবে জেনেও ছেলে তা পাঠাতে বারণ না করা ইসলামের দৃষ্টিতে গর্হিত কাজ। এটি জুলুম ও বটে।

আমাদের সমাজে কিছু বিভ্রান্তি আছেন যারা মনে করেন যে, তাদের সামর্থ্য আছে তাই তারা মেয়ের বিয়েতে দাওয়াত দিয়ে ঘট্টা করে লোক খাওয়াবেন বা মেয়ের সাথে আসবাব পত্র দিবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। উপহার সামগ্রী

^{২০৯}. বুখারী : ২০৪৯; মুসলিম : ৩৫৫৬।

দেওয়া ভালো কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের খেয়াল রাখা উচিত তাদের এই কাজের ফলে একটি বিদ'আতী প্রথা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কি না যাতে পরে অন্য একজন অসামর্থ্যবান পিতা তার মেয়ের বিয়েতে তা করতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বাধ্য হন। যদি তাই হয় তাহলে তাই এই প্রথা প্রতিষ্ঠিত করার কারনে ঐ বিভবান ব্যক্তি গোনহগার হবেন। সবচেয়ে ভালো হয় উপহার সামগ্রী সবার অগোচরে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট প্রদান করা। (তথ্যসূত্রঃ উক্ত লিখাটি ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার আয়োজিত শায়খ মতিউর রহমান এর ওয়াজ “বিবাহ নবীগনের সুন্নাত” এর অবলম্বনে লিখেছি।)²¹⁰

উপরোক্ত আলোচনায় বলা যায় যে, মানব জীবনে বিয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বিয়ে মানুষকে দায়িত্ববান বানায়। জীবনে আনে স্বস্তি ও প্রশান্তি। বিয়ের মাধ্যমে নারী-পুরুষ সক্ষম হয় যাবতীয় পাপাচার ও চারিত্রিক স্থলন থেকে দূরে থাকতে। অব্যাহত থাকে বিয়ের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে মানব সভ্যতার ধারা। বৈধ ও অনুমোদিত পন্থায় মানুষ তার জৈবিক চাহিদা মেটায় কেবল এ বিয়ের মাধ্যমে। এককথায় বিয়েতে রয়েছে প্রভুত কল্যাণ ও অননুমেষ উপকারিতা। বিয়ের বিবিধ কল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা তাই ইরশাদ করেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²¹⁰ ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার আয়োজিত শায়খ মতিউর রহমান এর ওয়াজ “বিবাহ নবীগনের সুন্নাত” এর অবলম্বনে লেখা।

'আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই জ্বীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।' (রুম : ২১)²¹¹

বিয়ের সঙ্গে পৃথিবীতে মানুষের বংশ ধারার সম্পর্ক নির্দেশ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ ، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'তোমরা অধিক সন্তানদানকারী স্বামীভক্ত নারীদের বিয়ে করো। কেননা কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের (সংখ্যা) নিয়ে নবীদের সামনে গর্ব করবো।' (মুসনাদ আহমাদ : ১২৬৩৪)²¹²

সুতরাং বলাবাহুল্য যে, বিয়ে করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। অতএব, কেউ যখন বিয়ে করবেন তার উচিত বিয়ের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আজ আমাদের ভেবে দেখা দরকার, ইসলামের আদর্শ কোথায় আর আমরা কোথায়। ইসলাম কী বলে আর আমরা কী করি। আমরা কি অস্বীকার করতে পারি যে, এসব আদর্শ আজ আমাদের আমলের

²¹¹. রুম : ২১।

²¹². মুসনাদ আহমাদ : ১২৬৩৪।

বাইরে চলে গেছে। আমাদের যাপিত জীবনে ইসলামের বিমল রঙ ফিকে হয়ে এসেছে। সত্যি কথা বলতে গেলে, আমরা বরং বর্জনীয় কাজগুলো করি আর করণীয়গুলো ভুলে থাকি। আল্লাহ মাফ করুন। এ কারণেই আমাদের বিয়ে-শাদীতে বরকত নেই। বিবাহিত জীবনে সুখ নেই। দাম্পত্য জীবনের সুখ আজ সোনার হরিণে পরিণত হয়েছে।

প্রকৃত সুখের পরশ পেতে হলে, সুখ পাখির আগুন ডানা ছুঁতে হলে আজ আমাদের তাই ইসলামের কাছেই ফিরে আসতে হবে।

ইসলামের আদর্শকেই আকড়ে ধরতে হবে। শুধু কনে দেখা আর বিয়ে-শাদীতেই নয়; জীবনের প্রতিটি কর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। মুখে নয়; কাজে পরিণত করতে হবে তাঁর উম্মত দাবী।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এসব কাজ থেকে একটু বিরত হোন। নিজেকে রক্ষা করুন এবং আল্লাহ হিসাব নেয়ার আগে নিজে নিজের হিসাব নিন। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فَيَمَّا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فَيَمَّا فَعَلَ
وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جَسْمِهِ فَيَمَّا أَبْلَاهُ.

'কিয়ামতের দিন কোনো বান্দার পা নড়বে না যাবৎ না তাকে প্রশ্ন করা হবে তার হায়াত সম্পর্কে : কোন কাজে তা ব্যয় করেছে, জিজ্ঞেস করা হবে তার ইলম সম্পর্কে : তার কতটুকু আমল করেছে, প্রশ্ন করা হবে তার

সম্পদ বিষয়ে : কোথেকে তা উপার্জন করেছে এবং কোথায় তা খরচ করেছে এবং জিজ্ঞেস করা হবে তারা দেহ সম্পর্কে : কোথায় তা কাজে লাগিয়েছে।' (তিরমিযী : ২৬০)²¹³

পরিশেষে বলা যায় যারা নিজের জীবনের প্রতিটি পর্বকে কুরআন-সুন্নাহর আদলে গড়ে তোলেন এবং সর্ব প্রকার নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকেন, আশা করা যায় তারাই হবেন সফল ও কামিয়াব। তাদের মৃত্যু হবে পরম সৌভাগ্যকে সঙ্গে নিয়ে। আর তারাই হলেন সে দলের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ যাদের কথা বলেছেন এভাবেঃ

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
(74) أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (75) خَالِدِينَ
فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (76)

'আর যারা বলে, 'হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন'। তারাই, যাদেরকে [জান্নাতে] সুউচ্চ কক্ষ প্রতিদান হিসাবে দেয়া হবে যেহেতু তারা সবার করেছিল সেজন্য। আর তাদের সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম দ্বারা। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। অবস্থানস্থল ও আবাসস্থল হিসেবে তা কতইনা উৎকৃষ্ট!' (সূরা ফুরকান : ৭৪-৭৬)²¹⁴

²¹³ . তিরমিযী : ২৬০২।

²¹⁴ . সূরা ফুরকান : ৭৪-৭৬।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলার তাওফীক দিন। আমাদের জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজে তাঁর প্রিয় হাবীবের সুন্নতের অনুবর্তী হবার তাওফীক দিন। আমীন।

(৫) নামাযের শুরুতে মুখে নিয়ত পাঠ করাঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযসহ অন্যান্য সকল নামাযের শুরুতে নাওয়াইতু বলে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা একটি বিদআত। কারণ এটা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সুন্নাতে নেই। আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

অর্থঃ তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে শিক্ষা দিতে চাও? অথচ আল্লাহ তায়া'লা আকাশ-যমীনের মধ্যকার সকল বস্তুসম্পর্কে অবগত আছেন। আর আল্লাহ প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। (সূরা হুজরাতঃ ১৬)। নিয়ত বিষয়ে সহীহ হাদীসও আছে।

সহীহুল বুখারীতে হাদীসটি এসেছে। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ "

(সহীহ বুখারী :: খন্ড ১ :: অধ্যায় ১ :: হাদীস ১)²¹⁵। হুমায়দী (রহঃ)
 ‘আলকামা ইবন ওয়াক্কাস আল-লায়সী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) - কে মিসরের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছিঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছিঃ প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের অথবা নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে - সেই উদ্দেশ্যেই হবে তার হিজরতের প্রাপ্য।” অতএব, উপরোক্ত কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, নিয়তের স্থান অন্তর। এটা অন্তরের কাজ, মুখের কাজ নয়। মুখে নিয়ত উচ্চারণের পক্ষে কোন সহীহ তো দূরের কথা, কোন যঈফ হাদীছও পাওয়া যায় না।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সাহাবায়ে কেরাম, কোন তাবঈ বা চার ইমামের কোন ইমাম এভাবে নিয়ত উচ্চারণ করেন নি। এটা কোন এক বুয়ুর্গ ব্যক্তির তৈরী করা প্রথা। ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং তা বর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য ফরজ। পূর্বেই বলা হয়েছে, নিয়ত শব্দের অর্থঃ ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করা। আর তা অন্তরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। মুখের মাধ্যমে নয়। সুতরাং কোন কিছু করার জন্য অন্তরে ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করলেই সে কাজের নিয়ত হয়ে গেল। তা মুখে বলতে হবে না।

(৬) ফরজ নামাযের আগে-পরে দলবদ্ধভাবে জিকির করাঃ আমার বিন ইয়াহয়া হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার পিতাকে আমার দাদা হতে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমরা একবার ফজরের নামাযের পূর্বে

²¹⁵ সহীহ বুখারী :: খন্ড ১ :: অধ্যায় ১ :: হাদীস ১

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর ঘরের দরজার সামনে বসা ছিলাম। উদ্দেশ্য হল তিনি যখন বের হবেন, আমরা তার সাথে পায়ে হেঁটে মসজিদের দিকে যাত্রা করব। এমন সময় আমাদের কাছে আবু মুসা আশআরী (রাঃ) আগমণ করে বললেন, আবু আব্দুর রাহমান (ইবনে মাসউদের উপনাম) কি বের হয়েছেন? আমরা বললাম, এখনও বের হন নি। তিনিও আমাদের সাথে বসে গেলেন। তিনি যখন বের হলেন, আমরা সকলেই তাঁর কাছে গেলাম। আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বললেন, হে আবু আব্দুর রাহমান! আমি মসজিদে এখনই একটি নতুন বিষয় দেখে আসলাম। আল-হাম্দু লিল্লাহ, এতে খারাপ কিছু দেখিনি। তিনি বললেন সেটি কি? আবু মুসা (রাঃ) বললেন, আপনার হায়াত দীর্ঘ হলে আপনিও তা দেখতে পাবেন। তিনি বললেন, আমি দেখলাম মসজিদে একদল লোক গোলাকার হয়ে বসে নামাযের অপেক্ষা করছে। সেই দলের মাঝখানে একজন লোক রয়েছে। আর সবার হাতে রয়েছে ছোট ছোট পাথর। মাঝখানের লোকটি বলছে, একশতবার আল্লাহ্ আকবার পাঠ কর। এতে সকলেই একশতবার আল্লাহ্ আকবার পাঠ করে। তারপর বলে একশতবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ কর। এ কথা শুনে সবাই একশতবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করে থাকে। তারপর লোকটি বলে এবার একশতবার সুবহানাল্লাহ পাঠ কর। সবাই একশতবার সুবহানাল্লাহ পাঠ করে থাকে।

একথা শুনে ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, তুমি তাদেরকে তাদের পাপের কাজগুলো গণনা করে রাখতে বললে না কেন? আর এটা বললে না কেন যে তাদের নেকীর কাজগুলো থেকে একটি নেকীও নষ্ট হবেনা। কাজেই এগুলো হিসাব করে রাখার কোন দরকার নাই। অতঃপর ইবনে মাসউদ (রাঃ) চলতে থাকলেন। আমরাও তার সাথে চললাম এবং একটি

(বৈঠকের) কাছে এসে উপসিত হলাম। তিনি তাদের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, একি করছ তোমরা? তারা সবাই বলল পাথরের মাধ্যমে গণনা করে আমরা তাকবীর, তাসবীহ্ ইত্যাদি পাঠ করছি। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, তাহলে তোমরা তোমাদের পাপের কাজগুলোর হিসাব কর। কারণ পাপের কাজগুলো হিসাব করে তা থেকে তাওবা করা দরকার। আমি এ ব্যাপারে জিম্মাদার হলাম যে, তোমাদের ভাল কাজগুলোর একটি ভাল কাজও নষ্ট হবেনা। এ কথা বলার কারণ এই যে আল্লাহর কাছে কারও আমল বিনষ্ট হয়না। বরং একটি আমলের বিনিময়ে দশটি ছাওয়াব দেয়া হয় এবং দশ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদের উম্মাত! অমঙ্গল হোক তোমাদের! কিসে তোমাদেরকে এত তাড়াতাড়ি ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে? এখনও নবী মুহাম্মাদের অসংখ্য সাহাবী জীবিত আছেন।

এই তো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাপড় এখনও পুরাতন হয়নি। তাঁর ব্যবহারকৃত থালা-বাসন গুলো এখনও ভেঙ্গে যায়নি। ঐ সত্কার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমরা যে দ্বীন তৈরী করেছ তা কি মুহাম্মাদের দ্বীন হতে উত্তম? না তোমরা গোমরাহীর দ্বার উন্মুক্ত করেছ? তারা বলল, হে আবু আব্দুর রাহমান! আমরা এর মাধ্যমে কল্যাণ ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছা করিনি। তিনি বললেন, অনেক কল্যাণকামী আছে, যে তার উদ্দেশ্য পর্যন্ত স্তুপৌঁছতে পারে না।

আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, একটি দল কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর ভিতরে প্রবেশ করবেনা।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, মনে হয় তাদের অধিকাংশই তোমাদের থেকে বের হবে। অতঃপর ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাদেরকে ছেড়ে চলে আসলেন। আমরা ইবনু সালামা (রাঃ) বলেন, আমরা তাদের অধিকাংশকেই দেখলাম নাহ্‌রাওয়ানের যুদ্ধে খারেজীদের সাথে আমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি কারণে ইবনু মাসউদ (রাঃ) এ ভালকাজগুলো অপছন্দ করেছেনঃ

প্রথমতঃ তাসবীহ পাঠ করার জন্য গোলাকার হয়ে বসা।

দ্বিতীয়তঃ তাসবীহ সমূহের সংখ্যা ১০০ নির্ধারণ করা। তৃতীয়তঃ পাথরের মাধ্যমে হিসাব করে এগুলো পাঠ করা। কেননা তাসবীহ পাঠের উল্লেখিত পদ্ধতির কোনটিই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নয়। সতুরাং, জিকিরের ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, প্রত্যেক ব্যক্তি হাদীসে বর্ণিত জিকিরগুলো একা একা পাঠ করবে। অতএব, সালাত শেষে বা সালাতের আগে দলবদ্ধভাবে যিকির করা বিদ'আত যা ইসলাম সমর্থন করে না। তাই এইসব কাজ আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

(৭) রুকুতে রাফ'উল ইয়াদাইন "(দু'হাত উঠান)" ছেড়ে দেয়া সুন্নাহ বিরোধী কাজ তথা বিদ'আতঃ

হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ আলিমগণের মতামত - "রাফ'উল ইয়াদাইন"।

হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ নামাজে রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় রাফ'উল ইয়াদাইন করে না। আলিম সমাজ আমাদের

মত অধম বান্দাদের বলে থাকেন, এটি নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রথম দিকে করেছেন এবং শেষের দিকে বাদ দিয়েছেন অর্থাৎ মানসুখ হয়ে গেছে। আমরা সেই বিশ্বাসেই আজ রাফ'উল ইয়াদাইন করি না। যাহা অন্যান্য মাযহাব এবং আমাদের দেশে আহলে হাদীস বা সালাফীগণকরে থাকেন। মসজিদের হুজুরকে জিজ্ঞেসা করলে বলে, দু'ইটাই সুন্নাত। আসুন একটু বিস্তারিত আলোচনা করিঃ

প্রথমেই আমাদের হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ আলিমগণের মতামত দিয়ে শুরু করা যাকঃ

১। মোল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেনঃ সালাতে রুকু'তে যাওয়ার সময় ও রুকু' থেকে দাড়ানোর/উঠার সময় দু' হাত না তোলা সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সবই বাতিল হাদীস। তন্মধ্যে একটিও সহীহ নয়। (মাওযু'আতে কাবীরঃ পৃ-১১০)।

২। হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (রহঃ) রুকু'তে যাওয়ার পূর্বে রাফ'উল ইয়াদাইন করার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) সম্পর্কে লিখেছেনঃ ইমাম আবু হানিফা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তা ত্যাগ করলে গুনাহ হবে। (উমদাতুল ক্বারীঃ ৫/২৭২)।

৩। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী হানাফী (রহঃ) বলেনঃ যে মুসল্লী রাফ'উল ইয়াদাইন করে ঐ মুসল্লী আমার কাছে অধিক প্রিয় সেই মুসল্লীর চাইতে যে রাফ'উল ইয়াদাইন করে না। কারন, রাফ'উল ইয়াদাইন করার হাদীসগুলো সংখ্যায় বেশি এবং অধিকতর মজবুত। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহঃ ২/১০)। তিনি আরো বলেন, রাফ'উল ইয়াদাইন হচ্ছে

সম্মান
300

সূচক কর্ম। যা মুসল্লীকে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার ব্যাপারে এবং সালাতে তন্ময় হওয়ার ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দেয়। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহঃ ২/১০)।

৪। আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী হানাফী (রহঃ) বলেনঃ যারা এ কথা বলে যে, তাকবীরে তাহরীমাহ ছাড়া রুকু'তে যাওয়ার সময় এবং রুকু' থেকে দাড়ানোর/উঠার সময় দু' হাত তোলার হাদীস মানসূখ ও রহিত, তাদের ঐ দাবী দলীলবিহীন এবং ভিত্তিহীন। (শারহ সুনানে ইবনে মাজাহঃ মিসরি ছাপাঃ ১ম খন্ড; ১৪৬ পৃষ্ঠার টিকা)।

৫। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী হানাফী (রহঃ) বলেনঃ এ কথা জানা উচিত যে, সালাতে রাফ'উল ইয়াদাইন করার হাদীস সূত্র ও 'আমালের দিক দিয়ে মুতাওয়াতির, এতে কোনই সন্দেহ নেই। আর এটা মানসূখও নয় এবং এর একটি হরফও নাকচ নয়। (নাইলুল ফারকাদাইনঃ পৃ- ২২, রসূলে আকরাম কী নামায, পৃ-৬৯)²¹⁶।

টিকাঃ মুতাওয়াতিরঃ মুতাওয়াতির বলা হয় সেই হাদীসকে যেটিকে এতো অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, তাদের পক্ষে সাধারণত মিথ্যার উপর একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়।

৬। আল্লামা আবদুল হাই লাখনৌভী হানাফী (রহঃ) বলেনঃ নবী (সাঃ)-এর সূত্রে রাফ'উল ইয়াদাইন করার প্রমাণ বেশী এবং প্রাধান্যযোগ্য। আর এটা মানসূখ বা নাকচ হবার দাবী যা ত্বাহাভী, ইবনুল হুমাম ও আইনী প্রমুখ আমাদের দলের মনীষীদের পক্ষ থেকে প্রচারিত হয়েছে, তা এমনই

²¹⁶ নাইলুল ফারকাদাইনঃ পৃ- ২২, রসূলে আকরাম কী নামায, পৃ-৬৯

প্রমাণহীন যে তদদ্বারা রোগী নিরোগ হয় না এবং পিপাসার্তও তৃপ্ত হয় না।
(আত-তালীকুল মুমাজ্জাদ, পৃ-৯১)।

৭। ইমাম মুহাম্মাদের সাথী ও ইমাম আবু ইউসূফের শিষ্য ইসাম ইবনু ইউসূফ আল বালাখী (রহঃ)-এর রাফ'উল ইয়াদাইন করা সম্পর্কে আল্লামা 'আবদুল হাই লাখনৌভী হানাফী (রহঃ) বলেনঃ ইসাম ইবনু ইউসূফ ছিলেন ইমাম আবু ইউসূফের শাগরিদ এবং হানাফী। তিনি রুকু'তে যাওয়ার সময় এবং রুকু' থেকে উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদাইন করতেন। (আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়াহ ফী তারাজিমিল হানাফিয়াহঃ পৃ - ১১৬)²¹⁷।

আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক, সুফিয়ান সাওরী এবং শু'বাহ (রহঃ) বলেন, ইসাম ইবনু ইউসূফ মুহাদিস ছিলেন। সেজন্য তিনি রফ'উল ইয়াদাইন করতেন। (আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়াহঃ পৃ-১১৬)।

৮। শায়খ আবৃত ত্বালিব মাক্কী হানাফী (রহঃ) তার 'কুতুল কুলূব' গ্রন্থে সালাতের সুন্নাত সমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রুকু'তে যাওয়ার সময় রাফ'উল ইয়াদাইন করা ও তাকবীর বলা সুন্নাত। তারপর 'সামিআল্লাহলিমান হামিদাহ' বলে রাফ'উল ইয়াদাইন করা সুন্নাত। (কুতুল কুলূবঃ ৩/১৩৯)।

৯। কাজী সানাউল্লাহ পানিপতি হানাফী (রহঃ) বলেনঃ বর্তমান সময়ের অধিকাংশ 'আলিমের দৃষ্টিতে রাফ'উল ইয়াদাইন করা সুন্নাত। অধিকাংশ ফার্সী ও মুহাদিসীনে কিরাম একে প্রমাণ করেছেন। (মালাবুদ্বাহ মিনহঃ পৃ-৪২, ৪৪)।

²¹⁷ আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়াহ ফী তারাজিমিল হানাফিয়াহঃ পৃ - ১১৬

১০। শায়খ ‘আবদুল ক্বাদির জিলানী (রহঃ) সালাতের সুন্নাত সমূহের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ সালাত শুরু করার সময়, রুকু’তে যাওয়ার সময় এবং রুকু’ হতে উঠার সময় রাফ’উল ইয়াদাইন করা সুন্নাত। (গুনিয়াতুত ত্বালিবীনঃ পৃ-১০)।

১১। দ্বিতীয় আবু হানিফা নামে খ্যাত আল্লামা ইবন নুজাইম (রহঃ) বলেনঃ রুকু’তে যাওয়ার সময় ও রুকু’ থেকে মাথা উঠানোর সময় রাফ’উল ইয়াদাইন করলে সালাত বরবাদ হবার কথা যা মাকহুল নাসাফী ইমাম আবু হানিফা থেকে বর্ণনা করেছেন তা বিরল বর্ণনা, যা রিওয়ায়াত ও দিরায়াত উভয়েরই পরিপন্থী অর্থাৎ সূত্রতঃ ও জ্ঞানতঃ” ঠিক নয়। (রাহরু রায়িকঃ ১/৩১৫, যাহরাতু রিয়অযুল আবরারঃ পৃ-৮৯)²¹⁸।

১২। দেওবন্দের শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান বলেনঃ রাফ’উল ইয়াদাইন মানসূখ নয়। আর এর স্থায়িত্ব প্রমাণিত নয়। (ইযাহুল আদিব্বাহ)। ইতিপূর্বে ইমাম যায়লায়ী হানাফীর বরাত দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, এর স্থায়িত্ব প্রমাণিত। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মৃত্যু পর্যন্ত আজীবন রাফ’উল ইয়াদাইন করেছিলেন। (নাসবুর রায়াহ তাখরীজ আহাদীসিল হিদায়াঃ ১/৪১০)।

১৩। মুফতী আমিমুল ইহসান লিখেছেনঃ যারা রফ’উল ইয়াদাইন করার হাদীস মানসূখ-আমি বলি, তাদের একটি মাত্র দলীল (অর্থাৎ ইবনু মাস’উদের হাদীস), দ্বিতীয় কোন দলীল নাই। (ফিকহুস সুনার ওয়াল আছারঃ পৃ-৫৫)।

²¹⁸ রাহরু রায়িকঃ ১/৩১৫, যাহরাতু রিয়অযুল আবরারঃ পৃ-৮৯

১৪। হানাফী মাযহাবের ফিক্বাহ গ্রন্থাবলীতেও রাফ'উল ইয়াদাইনের পক্ষে বক্তব্য রয়েছে। তন্মধ্যকার কয়েকটি উল্লেখ করা হলঃ

(ক) রুকু'র পূর্বে ও পরে রফ'উল ইয়াদাইন করার হাদীস প্রমাণিত আছে। (আয়নুল হিদায়াঃ ১/৩৮৪, নুরুল হিদায়া)।

(খ) রাফ'উল ইয়াদাইন করার হাদীস, রাফ'উল ইয়াদাইন না করার হাদীসের চাইতে শক্তিশালী ও মজবুত। (আয়নুল হিদায়াঃ ১/৩৮৯)।

(গ) বায়হাকীর হাদীসে আছে, ইবনু উমার বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মৃত্যু পর্যন্ত সালাতের মধ্যে রাফ'উল ইয়াদাইন করেছেন। (ইয়নুল হিদায়াঃ ১/১৮৬)।

(ঘ) রাফ'উল ইয়াদাইন না করার হাদীস দুর্বল। (নুরুল হিদায়াঃ ১০২)।

(ঙ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে রাফ'উল ইয়াদাইন প্রমাণিত আছে এবং এটাই হাক্ক। (আয়নুল হিদায়াঃ ১/৩৮৬)।

এবার সহীহ হাদীসের আলোকে রাফ'উল ইয়াদাইনের কয়েকটি প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনা করা হলোঃ

(১) মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল (রহঃ).... 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) সুত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَ حَذْوُ

مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ
سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ". وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ "الرُّكُوعِ وَيَقُولُ

আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে দেখেছি, তিনি যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন কাঁধ পর্যন্ত দু' হাত উঠাতেন, এবং তিনি যখন রুকু'র জন্য তাকবীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন, আবার যখন রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন তখনও এ রকম করতেন এবং আমি আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ বলতেন। তবে তিনি সাজদাহর সময় এমন করতেন না। (সহীহুল বুখারীঃ ৭৩৪, ৭৩৫, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, মুয়াত্তা মালিক, মায়াত্তা মুহাম্মাদ, ত্বাহাভী, বায়হাকী, তিরিমিযী)²¹⁹।

(২) আবুল ইয়ামান (রহঃ) আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَدَوْ
مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَعَلَ مِثْلَهُ
وَقَالَ " رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ". وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ
السُّجُودِ.

আমি নবী (সাঃ) কে তাকবীর দিয়ে সালাত শুরু করতে দেখেছি, তিনি যখন তাকবীর বলতেন তখন তাঁর উভয় হাত উঠাতেন এবং কাঁধ বরাবর করতেন। আর যখন রুকু'র তাকবীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন।

²¹⁹ সহীহুল বুখারীঃ ৭৩৪, ৭৩৫, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, মুয়াত্তা মালিক, মায়াত্তা মুহাম্মাদ, ত্বাহাভী, বায়হাকী, তিরিমিযী

আবার যখন ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদা’ বলতেন, তখনও এরূপ করতেন এবং ‘রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ’ বলতেন। কিন্তু সিজদায় যেতে এরূপ করতেন না। সিজদার থেকে মাথা উঠার সময়ও এরূপ করতেন না। (তথ্যসূত্রঃ স্বলাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ :: সহীহ বুখারী :: খন্ড ১ :: অধ্যায় ১২ :: হাদীস ৭০৫, সহীহ মুসলিমঃ হা/৩৯১, সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ, সহীহ আবু দাউদ, ইরওয়াঃ ২/৬৭, হাদীসটি সহীহ)²²⁰।

(৩) আমর ইবন উছমান আবু বাকর ইবন আব্দুর রহমান এবং আবু সালামা (রহঃ) হতে বর্ণিত। তারা বলেন,

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي وَبَقِيَّةُ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْمَكْنُوبَةِ وَغَيْرِهَا يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي اثْنَتَيْنِ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَيْهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتِهِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْكَلَامُ الْأَخِيرُ يَجْعَلُهُ مَالِكٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَوَأَفَقَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) ফরয ও অন্যান্য নামায আদায়ের সময় দাঁড়ানো ও রুকু করাকালে তাকবীর বলতেন। অতঃপর তিনি দাড়িয়ে “সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ” বলার পর “রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ” বলতেন সিজদায়

²²⁰ স্বলাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ :: সহীহ বুখারী :: খন্ড ১ :: অধ্যায় ১২ :: হাদীস ৭০৫, সহীহ মুসলিমঃ হা/৩৯১, সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ, সহীহ আবু দাউদ, ইরওয়াঃ ২/৬৭, হাদীসটি সহীহ

যাওয়ার পূর্বে। অতঃপর সিজদায় যেতে “আল্লাহু আক্বার” বলতেন। সিজদা হতে মাথা উত্তোলন এবং পুনরায় সিজদায় গমনকালে তিনি তাকবীর বলতেন, অতঃপর সিজদা হতে মাথা উঠাবার সময় তাকবীর বলতেন।

দ্বিতীয় রাকাতের বৈঠক হতে দন্ডায়মান হবার সময়ও তিনি “আল্লাহু আক্বার” বলতেন। প্রত্যেক রাকাতেই “আল্লাহু আক্বার” বলতেন। নামাযান্তে তিনি বলতেনঃ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার জীবন! তোমাদের তুলনায় আমার নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাযের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি (সাঃ) দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এরূপে নামায আদায় করেন- (বুখারী, নাসাঈ, মুসলিম)।

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, ইমাম মালেক... আলী ইবন হুসাইনের সূত্রে এটাকে সর্বশেষ বাক্য বলেছেন। আব্দুল আলা... যুহরীর সূত্রে এ ব্যাপারে একমত প্রকাশ করে। (তথ্যসূত্রঃ সুনান আবু দাউদ :: কিতাবুস স্বলাত অধ্যায় ২, হাদীস ৮৩৬)²²¹।

(৪) সালেম থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَاللَّفْظُ -وَعَمَرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ،
لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِيَ
مَنْكِبَيْهِ وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

²²¹ সুনান আবু দাউদ :: কিতাবুস স্বলাত অধ্যায় ২, হাদীস ৮৩৬

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি- যখন তিনি নামায শুরু করতেন তখন উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। তিনি রুকুতে যাওয়ার পূর্বে এবং রুকু থেকে উঠার সময়ও এরূপ করতেন। কিন্তু তিনি দুই সিঁজদার মাঝখানে হাত উঠাতেন না। (তথ্যসূত্রঃ কিতাবুস স্বলাত অধ্যায় :: সহিহ মুসলিম :: খন্ড ৪ :: হাদীস ৭৫৮)²²²।

(৫) আবু কিলাবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালিক ইবনে হুয়াইরিসকে (রাঃ) দেখেছেন যে,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْخُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ هَكَذَا

তিনি যখন নামায শুরু করতেন, তাকবীর বলতেন, অতপর উভয় হাত উত্তোলন করতেন। যখন তিনি রুকুতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখনও উভয় হাত উত্তোলন করতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা তুলতেন তখনো হাত উত্তোলন করতেন। তিনি আরও বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপই করতেন। (তথ্যসূত্রঃ কিতাবুস স্বলাত অধ্যায় :: সহিহ মুসলিম :: খন্ড ৪ :: হাদীস ৭৬১)²²³।

(৬) আবু সালামা থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ - حِينَ يَسْتَخْلِفُهُ مَرْوَانُ

²²² কিতাবুস স্বলাত অধ্যায় :: সহিহ মুসলিম :: খন্ড ৪ :: হাদীস ৭৫৮

²²³ কিতাবুস স্বলাত অধ্যায় :: সহিহ মুসলিম :: খন্ড ৪ :: হাদীস ৭৬১

عَلَى الْمَدِينَةِ - إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَفِي حَدِيثِهِ فَإِذَا قَضَاهَا وَسَلَّمْ أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لِأَشَبَّهُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযের মধ্যে যখনই ঝুঁকতেন অথবা উঠতেন তখনই তাকবীর বলতেন। আমরা বললাম, হে আবু হুরায়রা! এটা কীসের তাকবীর? তিনি বলতেন, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাযের তাকবীর। (তথ্যসূত্রঃ কিতাবুস স্বলাত অধ্যায় :: সহিহ মুসলিম :: খন্ড ৪ :: হাদীস ৭৬৭)²²⁴।

(৭) আলী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে তাকবীরে তাহরীমাহর সময়, রুকু'র সময়, রুকু' হতে মাথা উঠানোর সময় এবং দু'রাক'আত শেষে তৃতীয় রাক'আতে দাঁড়ানোর সময়ে রফ'উল ইয়াদাইন করতে দেখেছেন। (বায়হাকীঃ ২/৮০, বুখারীর জুযউল ক্বিরআত, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)²²⁵।

(৮) ওয়ায়িল ইবনু হজর (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে সালাত আদায় করেছি। তিনি তাকবীর দিয়ে সালাত আরম্ভ করে দু'হাত উঁচু করলেন। অতঃপর রুকু' করার সময় এবং রুকু'র পরেও দু'হাত উঁচু করলেন। (আহমাদ, বুখারীর জুযউল ক্বিরআত, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ)²²⁶।

²²⁴ কিতাবুস স্বলাত অধ্যায় :: সহিহ মুসলিম :: খন্ড ৪ :: হাদীস ৭৬৭

²²⁵ বায়হাকীঃ ২/৮০, বুখারীর জুযউল ক্বিরআত, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

²²⁶ আহমাদ, বুখারীর জুযউল ক্বিরআত, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ

(৯) মুহাম্মাদ ইবনু ‘আমর বলেন, আমি নাবী (সাঃ) এর দশজন সাহাবীর মধ্যে আবু হুমাইদের নিকট উপস্থিত ছিলাম, তাঁদের (আবু হুমাইদ, আবু উসাইদ, সাহল ইবনু সা’দ, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ- (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণের) মধ্যে একজন আবু ক্বাতাদাহ ইবনু রবয়ী (রাঃ) ও ছিলেন। তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সালাত সম্পর্কে আপনাদের চাইতে বেশি অবগত। তাঁরা বললেন, তা কিভাবে? আল্লাহর শপথ! আপনি তো আমাদের চেয়ে তাঁর অধিক নিকটবর্তী ও অধিক অনুসরণকারী ছিলেন না। তিনি বললেন, বরং আমি তো তাঁকে পর্যবেক্ষণ করেছিলাম। তাঁরা বললেন, এবার তাহলে উল্লেখ করুন। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন সালাতে দাঁড়াতে তখন দু’হাত উঁচু করতেন এবং যখন রুকু’ করতেন, রুকু’ থেকে মাথা উঠাতেন, এবং দু’ রাক’আত শেষে তৃতীয় রাক’আতে দাঁড়াতে তখনও দু’ হাত উঁচু করতেন। এ বর্ণনা শুনে তাঁরা সবাই বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন। (বুখারীর জুযউল ক্বিরাতাত, সহীহ ইবনু মাজাহ, সহীহ আবু দাউদ)।

(১০) মুতাররিফ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَخَلْفَ بْنِ هِشَامٍ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، - عَنْ غِيْلَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاةِ - قَالَ - أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ لَقَدْ صَلَّيْنَا بِنَا هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَوْ قَالَ قَدْ ذَكَرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

আমি এবং ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) আলীর (রাঃ) পিছনে নামায পড়েছি। তিনি যখন সিজদায় যেতেন আল্লাহ্ আকবার বলতেন, যখন

সিজদা থেকে মাথা তুলতেন তখনও আল্লাহ্ আকবার বলতেন এবং দুই রাকআত পূর্ণ করে (তাশাহুদ পড়বার পর) উঠার সময়ও আল্লাহ্ আকবার বলতেন। আমরা যখন নামায শেষ করলাম, ইমরান (রা) আমার হাত ধরে বললেন, তিনি (আলী) আমাদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুরূপ নামায পড়িয়েছেন। অথবা তিনি বললেন, তিনি (আলী) আমাদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। (তথ্যসূত্রঃ কিতাবুস স্বলাত অধ্যায় :: সহিহ মুসলিম :: খন্ড ৪ :: হাদীস ৭৭০)²²⁷।

রাফ'উল ইয়াদাইন সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস ও আছারের সংখ্যা এবং সেসবের মান-

(ক) রাফ'উল ইয়াদাইন সম্পর্কে বর্ণিত সর্বমোট সহীহ হাদীস ও আছারের সংখ্যা অন্যান্য ৪০০ শত। (সিফরুস সাআদাতঃ পৃ-১৫)²²⁸।

(খ) ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, রাফ'উল ইয়াদাইনের হাদীস সমূহের সানদের চেয়ে বিশুদ্ধতম সানদ আর নেই। (ফাতহুল বারীঃ ২/২৫৭)।

(গ) হাদীসের অন্যতম ইমাম হাফিয তাকীউদ্দিন সুবকী (রহঃ) বলেন, সালাতের মধ্যে রাফ'উল ইয়াদাইন করার হাদীস এতো বেশী যে, রাফ'উল ইয়াদাইনের হাদীসকে মুতাওয়াতির বলা ছাড়া উপায় নেই। (সুবকীর জুযউ রাফ'উল ইয়াদাইন)।

²²⁷ কিতাবুস স্বলাত অধ্যায় :: সহিহ মুসলিম :: খন্ড ৪ :: হাদীস ৭৭০

²²⁸ সিফরুস সাআদাতঃ পৃ-১৫

রাফ'উল ইয়াদাইনের হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের সংখ্যা-

রুকু'তে যাওয়া ও রুকু' হতে উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদাইন করা সম্পর্কে চার খলীফাসহ প্রায় ২৫ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীস সমূহ রয়েছে। (সালাতুর রসূল (সাঃ), পৃষ্ঠা ৬৫, হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত)।

মুহাদ্দিস ইরাকী (রহঃ) তাঁর ফাতহুল মুগীস গ্রন্থে বলেন, আমি সালাতে রাফ'উল ইয়াদাইনের হাদীস প্রায় ৫০ জন সাহাবা হতে একত্রিত করেছি। তিনি তাকরীবুল আসানীদ ও তাকরীবুল মাসানীদ গ্রন্থে বলেন, জেনে রাখ! সালাতে রাফ'উল ইয়াদাইনের হাদীস ৫০ জন সাহাবায়ি কিরাম হতে বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল মুগীসঃ ৪/৮, কিতাবু তাকরীবুল আসানীদ ও তাকরীবুল মাসানীদ পৃঃ-১৮)।

রাফ'উল ইয়াদাইনের গুরুত্ব ও ফযীলাত -

(১) মালিক বলেন, ইবনু 'উমার (রাঃ) কোন ব্যক্তিকে সালাতে রুকু'র সময় ও রুকু' থেকে উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদাইন না করতে দেখলে তাকে ছোট পাথর ছুঁড়ে মারতেন, যতক্ষণ না সে রাফ'উল ইয়াদাইন করে। (বুখারীর জুয'উ রাফ'উল ইয়াদাইন, আহমাদ, দারকুতনী-নাফি, হতে সহীহ সনদ)।

(২) 'উক্বাহ ইবনু 'আমির (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রুকু'র সময় এবং রুকু' থেকে মাথা উঠানোর সময় রাফ'উল ইয়াদাইন করে তার জন্য রয়েছে প্রত্যেক ইশারার বিনিময়ে দশটি নেকী। (বায়হাকীর মা'রিফাতঃ ১/২২৫, মাসায়িলে আহমাদ, কানযুল 'উম্মাল)।

(৩) ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেন, রাফ'উল ইয়াদাইন হচ্ছে সালাতের সৌন্দর্যের একটি শোভা। প্রত্যেক রাফ'উল ইয়াদাইনের বদলে দশটি করে নেকী রয়েছে, অর্থাৎ প্রত্যেক আঙ্গুলের বিনিময়ে রয়েছে একটি করে নেকী। (আল্লামা আইনী হানাফীর 'উমদাতুল ক্বারীঃ ৫/২৭২)। এতে প্রমাণিত হয়, রাফ'উল ইয়াদাইন করার কারণে দু' রাক'আত সালাতে ৫০ আর চার রাক'আত সালাতে ১০০টি নেকী বেশি পাওয়া যায়। এ হিসেবে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তের ১৭ রাক'আত ফরয সালাতে ৪৩০ নেকী, একমাসে ১২,৯০০ নেকী আর এক বছরে ১,৫৪,৮০০ নেকী শুধু রাফ'উল ইয়াদাইন করার জন্য বাড়তি যোগ হচ্ছে। সুতরাং কোন ব্যক্তি সালাতে রাফ'উল ইয়াদাইন করার কারণে ৩০ বছরে ৪৬,৪৪,০০০ নেকী আর ৬৫ বছরে ১,০০,৬২,০০০ নেকী বেশি পাচ্ছেন। এটা শুধু পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের হিসাব এছাড়া সুন্নত, নফল, বিতর, তাহাজ্জুদ, তারাবীহ প্রভৃতি সালাতে রাফ'উল ইয়াদাইন করার নেকী তো রয়েছেই। যা এ হিসাব অনুপাতেই পাওয়া যাবে। সুতরাং যারা ফরয, সুন্নাত, নফল প্রভৃতি সালাতে রাফ'উল ইয়াদাইন করেন না তারা কতগুলো নেকী থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তা কি ভেবে দেখেছেন? অথচ ক্রিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে মানুষ একটি নেকী কম হওয়ার কারণে জান্নাতে যেতে পারবে না!

হানাফী মাযহাবের রাফ'ইয়াদাইন না করার পক্ষে সব থেকে শক্তিশালী হাদীস এবং তার তাত্ত্বিক পর্যালোচনাঃ

আলক্বামাহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সালাত কিরূপ ছিল তা শিক্ষা দেব না? বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি সালাত আদায়

করলেন এবং তাতে কেবল একবার হাত উত্তোলন করলেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন এবং ইবনু হাযাম বলেছেন সহীহ। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামগণ এটিকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। যেমন ইমাম বুখারী, ইমাম আহমাদ উবনু হাম্বল, ইমাম নাববী, ইমাম শাওকানী (রহঃ) প্রমুখ ইমামগণ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। (আল-মাজমু'আহ ফী আহাদীসিল মাওযু'আহঃ ২০ পৃঃ)।

ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন, রাফ'উল ইয়াদাইন না করার পক্ষে কূফাবাসীদের এটিই সবচেয়ে বড় দলীল হলেও এটিই সবচেয়ে দুর্বলতম দলীল। কেননা এর মধ্যে এমন সব বিষয় রয়েছে যা একে বাতিল বলে গণ্য করে। (নায়লুল আওত্বারঃ ৩/১৪, ফিকহুস সুন্নাহঃ ১/১০৪, আওনুল মা'বুদ)।

হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) 'আত-তালখীস' গ্রন্থে বলেন, ইবনুল মুবারক বলেছেন, হাদীসটি আমার নিকট প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত নয়। ইবনু আবু হাতিম বলেন, এ হাদীসটি ভুল ও ত্রুটিযুক্ত। ইমাম আহমাদ ও তাঁর শায়খ ইয়াহইয়া ইবনু আদাম বলেন, হাদীসটি দুর্বল। ইমাম আবু দাউদ বলেন, হাদীসটি সহীহ নয়। ইমাম দারকুতনী বলেন, হাদীসটি প্রমাণিত নয়। ইমাম বায়হাকী এবং ইমাম দারিমী (রহঃ) ও হাদীসটিকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। অন্যদিকে ইমাম তিরমিযী হাসান বললেও তিনি নিজেই আবার 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) -এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি

প্রমাণিত নয় এবং প্রতিষ্ঠিতও নয়। (আওনুল মা'বুদ, নায়লুল আওত্বার, জামি আত-তিরমিযী ও অন্যান্য)।

আল্লামা শামসুল হাক্ক 'আযীমাবাদী (রহঃ) বলেন, তাকবীরে তাহরীমাহ ব্যতীত অন্যত্র রফ'উল ইয়াদাইন না করার পক্ষে এ হাদীসটি দলীল হিসাবে পেশ করা হয়। কিন্তু হাদীসটি দলীলযোগ্য নয়। কেননা হাদীসটি দুর্বল ও অপ্রমাণিত।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, নবী (সাঃ) হতে ইবনু মাসউদের সূত্র ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে রফ'উল ইয়াদাইন ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে সহীহ সুন্নাহ সাব্যস্ত হয়নি। আর ইবনু মাসউদের এ হাদীসটিকে সহীহ মেনে নিলেও তা রফ'উল ইয়াদাইন এর পক্ষে বর্ণিত সহীহ হাদীসসমূহের বিপরীতে পেশ করা যাবে না এবং ইবনু মাসউদের এ হাদীসের উপর আমল করা উচিত হবে না। কেননা এটি না-বোধক আর ঐগুলি হাঁ-বোধক। 'ইলমে হাদীসের মূলনীতি অনুযায়ী হাঁ-বোধক হাদীস না-বোধক হাদীসের উপর অগ্রাধিকার যোগ্য।

মাযহাবী থিওরীতে বলা হয়েছে, হানাফী ও অন্যদের নিকট যখন হাঁ-সূচক ও না-সূচকের সাথে দ্বন্দ্ব দেখা দিবে তখন না-সূচকের উপর হাঁ-সূচক অগ্রাধিকার পাবে। এরূপ নীতি বলবৎ হয় যদি হা-সূচকের পক্ষে একজনও হয় তবুও।

সুতরাং সেখানে বিরাট এক জামা'আত হাঁ-সূচকের পক্ষে সেখানে অন্য কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। যেমনটি এ মাসআলার ক্ষেত্রে। সুতরাং

দলীল সাব্যস্ত হওয়ার পর গোড়ামী না করাটাই উচিত। (হাশিয়া মিশকাত;
আলবানীঃ ১/১৫৪, ও যঈফাহ ৫৬৮)।

ইমাম বায়হাকী, শায়খ আবুল হাসান সিন্দী হানাফী ও ফাকীহ আবু বাকর ইবনু ইসহাক (রহঃ) প্রমুখগণ বলেনঃ বরং ইবনু মাসউদ এমন কিছু বিষয় ভুলে গেছেন যে ব্যাপারে মুসলিমগণ মতভেদ করেনি। যেমনঃ (১) তিনি সমস্ত সাতাবায়ি কিরাম ও মুসলিম উম্মাহর বিপরীতে সূরাহ নাস ও সূরাহ ফালাককে কুরআনের অংশ মনে করতেন না। (২) তিনি তাতবীক অর্থাৎ রুকু'র সময় দু' হাঁটুর মাঝখানে দু' হাত জড়ো করে হাঁটু দ্বারা চেপে রাখতে বলতেন। অথচ এরূপ আমল রহিত হয়ে যাওয়া এবং তা বর্জন করার উপর সকল আলিমগণ যে একমত হয়েছেন তাও তিনি ভুলে গেছেন। (৩) ইমামের সাথে দু' জন মুক্তাদী হলে মুক্তাদীদ্বয় কোথায় কিভাবে দাঁড়াবেন তাও তিনি ভুলে গেছেন। তিনি বলতেন, ইমামের বরাবর দাঁড়াতে হবে। অথচ এটা হাদীসের সম্পূর্ণ খেলাফ। (৪) তিনি ভুলে গিয়েছিলেন বিধায় এরূপ বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদুল আযহার দিন ফাজরের সালাত সঠিক সময়ে পড়তেন না বরং ঈদের সালাতের পূর্বে পড়তেন। অথচ এটা সমস্ত মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধ মত। এ ব্যাপারে সমস্ত আলিমগণের ঐক্যমতের কথাও তিনি ভুলে গেছেন। (৫) তিনি ভুলে গেছেন নবী (সাঃ) 'আরাফার ময়দানে কী নিয়মে দু' ওয়াক্ত সালাত একত্রে আদায় করেছেন। (৬) তিনি সাজদাহর সময় মাটিতে হাত বিছিয়ে রাখতে বলতেন। অথচ এটি হাদীসের পরিপন্থি হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণ মতভেদ করেননি বরং একমত পোষন করেছেন, তাও ইবনু মাসউদ ভুলে গেছেন।

অতএব, এ সমস্ত ভুল যাঁর হয়েছে, তাঁর সালাতে রাফ'উল ইয়াদাইন না করা এবং সে বিষয়ে হাদীস না জানা বা না বলাও ভুলের অন্তর্ভুক্ত। এতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট এ কথা প্রসিদ্ধ যে, ইবনু মাসউদের শেষ বয়সে বার্ধক্যজনিত কারনে স্মৃতি ভ্রম ঘটে। সুতরাং রাফ'উল ইয়াদাইন না করার হাদীসটিও সে সবার অন্তর্ভুক্ত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। (মাওয়াহিবু লাতিফাঃ ১/২৬০, ইমাম বুখারীর জুযউ রাফ'উল ইয়াদাইন, ইমাম যায়লায়ী, হানাফীর নাসবুর রায়হঃ ৩৯৭-৪০১, ফিক্‌হুস সুন্নাহঃ ১/১৩৪, শারহু মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা ১৪১ পৃঃ, বালাগুল মুবীনঃ ১/২২৯)।

রাফ'উল ইয়াদাইন না করার এই হাদীস সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ইবনুল হাম্বাল (রহঃ), আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ), ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) ও ইমাম শাওকানী (রহঃ) বানোয়াট (মাওযু) বলেছেন। (তাসহীলুল ক্বারী, আল-ফাওয়ায়িদুল মাওযু'আহ, আল-লাআ-লিল মাসনু'আহ ফিল আহাদীসিল মাওযু'আহ ২/১৯)।

রাফ'উল ইয়াদাইনের পক্ষে জমহুর মুহাদ্দিস, জমহুর ফাক্বীহ ও মুজতাহিদ ইমামগণের অভিমত-

(০১) ইমাম বুখারী ও ইমাম বায়হাক্কী (রহঃ) বলেনঃ মাক্কাহ, মাদীনাহ, হিজাজ, ইয়ামান, সিরিয়া, ইরাক, বাসরাহ, খুরাসান প্রভৃতি দেশের লোকেরা সকলেই রুকু'তে যাওয়ার সময় এবং রুকু' থেকে মাথা উঠানোর সময় রাফ'উল ইয়াদাইন করতেন। (বুখারীর জুযউল ক্বিরআত)।

অসংখ্য সহীহ হাদীস ও আসার বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যারা রাফ'উল ইয়াদাইন করেন না তাদের বিরুদ্ধে ইমাম বুখারী (রহঃ) 'জুয'উ রাফ'উল ইয়াদাইন' নামে একটি স্বতন্ত্র কিতাবই রচনা করেছেন এবং সেখানে এর পক্ষে ১৯৮টি দলীল বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে হাদীসের অন্যতম হাফিয তাকীউদ্দিন সুবকী (রহঃ) ও রাফ'উল ইয়াদাইনের পক্ষে জুয'উ রাফ'উল ইয়াদাইন' নামে একখানা স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। সুতরাং মুহাদ্দিসগণের নিকট রাফ'উল ইয়াদাইন যে কত বড় গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ তা সহজেই অনুমেয়।

(০২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ), ইমাম ইবনু হিব্বান (রহঃ), ইমাম মুহাম্মাদ নাসর (রহঃ), ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম ইবনুল মাদীনী (রহঃ), ইবনু আবদুল বার (রহঃ), শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ), হাফিয ইবনুল কাইয়িম আল জাওয়ী (রহঃ), আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী (রহঃ), শায়খ সালিহ আল-উসাইমিন (রহঃ), স'উদী আরবের প্রাক্তন গ্রান্ড মুফতী শায়খ 'আবদুল 'আযীয বিন বায (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ সকলেই রাফ'উল ইয়াদাইনের পক্ষে তাদের দলীল সহ মতবাদ ব্যক্ত করেছেন।

এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী ১টি কিতাব লিখেছেন, যার নাম- "জুযু রাফ'উল ইয়াদিন"। এ কিতাবে তিনি তাদের বিরোধিতা করেছেন যারা রুকু তে যাওয়ার আগে ও রুকু থেকে উঠার পর রাফ'উল ইয়াদিন(দু হাত উঠান) করে না। আসুন আমরা হিংসা-বিদ্বেষ ছেড়ে সঠিক আকিদার মানদণ্ডে নিজেদের আমলকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করি। আমিন। ছুমমা আমিন।

(৮) উচ্ছে কঠে বা চিৎকার করে যিকির করা বা হালকায়ে যিকিরের অনুষ্ঠান করাঃ সূফীদের যত জিকির রয়েছে তার সবই বানোয়াট ও বিদআতী যিকির। কেননা এগুলো সবই হাদীসে বর্ণিত শরীয়ত সম্মত জিকিরের পরিপন্থী। তাছাড়া দলবদ্ধ হয়ে উচ্ছে কঠে বা চিৎকার করে যিকির করা বা হালকায়ে যিকির করা যেমনঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর জিকির, আল্লাহু আল্লাহ বলে জিকির করা, জিকিরে যলী, জিকিরে খফী, জিকিরে রুহী, জিকিরে কলবী ইত্যাদি সবই ইবাদতের নামে নতুন সৃষ্টি তথা বিদআত বা ইসলাম বহির্ভূত কাজ।²²⁹

(৯) মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিদআতঃ মৃত ব্যক্তির উপকারের জন্য কুলখানি, চল্লিশা, হাফেজ-আলেমদের দাওয়াত দিয়ে কুরআন খতম, সবীনা খতম পড়িয়ে মৃতের রুহের উপর বখশানো, খতমে ইউনুস, খতমে জালালী, ফাতেহা খানি, ইসালে সাওয়াব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান পালন করা সম্পূর্ণ বিদআত। এগুলোর পক্ষে কোন দলীল নেই। এ সমস্ত- অনুষ্ঠানে শরীক হয়ে হাদীয়া ও টাকা-পয়সা গ্রহণ বা প্রদান করা সম্পূর্ণ হারাম। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্বন্ধে বলেছেনঃ আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ. (الحشر)

‘যারা তাঁদের পরে এসেছে তারা বলে ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ও আমাদের যে সকল ভাই পূর্বে ঈমান গ্রহণ করেছে তাদের

²²⁹ (তথ্যসূত্রঃ ড: শাইখ সালেহ বিন ফাউযান (হাফিযাল্লাহ)। অনুবাদক: শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী।

দাঈ ও শিক্ষক হিসেবে কর্মরত: জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সৌদী আরব।)

ক্ষমা কর।' [সূরা হাশরঃ ১০]²³⁰ এ আয়াতে আল্লাহ রাসূলু আলামীন যে সকল মুসলিম দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, তাদের মাগফিরাতের জন্য প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন। তাই বুঝে আসে মৃত ব্যক্তিদের জন্য মাগফিরাতের দুআ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। যদি এটা তাঁদের জন্য কল্যাণকর না হত, তবে আল্লাহ তা করতে আমাদের উৎসাহিত করতেন না। এমনিভাবে, আল্লাহ রাসূলু আলামীন মৃত ব্যক্তিদের জন্য দুআ-প্রার্থনা করার কথা কুরআনের একাধিক আয়াতে উল্লেখ করেছেন। হাদীসে এসেছে-

عن أبي أسيد الساعدي قال سأل رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما، فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفذ عهدهما بعد موتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه

সাহাবী আবু উসাইদ আস-সায়েদী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত যে, বনু সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল: হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর এমন কোন কল্যাণমূলক কাজ আছে যা করলে পিতা-মাতার উপকার হবে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন: হ্যাঁ, আছে। তাহল, তাদের উভয়ের জন্য আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করা। উভয়ের মাগফিরাতের জন্য দুআ করা। তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করা। তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সু-সম্পর্ক রাখা ও তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা। [তথ্যসূত্রঃ আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ]²³¹

²³⁰ সূরা হাশর, আয়াত ১০

²³¹ আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

উপরোক্ত কুরআন ও সঠিক হাদীসের জ্ঞান না থাকার কারনে বর্তমানে বাংলাদেশে জনসাধারণ কল্যাণকর মনে করে এমন কিছু করে যা মৃত ব্যক্তির জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না। এমন কাজ করে যা কুরআন বা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং তার কাজগুলো বিদআত ও সুন্নাহ পরিপন্থী হওয়ার কারণে গুনাহ হয়। ভাবতে গিয়ে অবাক না হয়ে পারা যায় না যখন দেখা যায় যে, হাদীসে রাসূল (সাঃ) এর এ সম্পর্কে স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা আছে তা পাশ কাটিয়ে প্রচলিত কুসংস্কার তথা বিদআতের আশ্রয় নেয়া হয়। এমন কাজ করা হয় যা কোনভাবেই মৃত ব্যক্তির কল্যাণে আসে না এবং এগুলো যে মৃত ব্যক্তির জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনে, তার সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর থেকে দাফন করা ও দাফনোত্তর যতসব কাজ বিভিন্ন এলাকা ওঅঞ্চল ভিত্তিক কালক্রমে নতুন নতুন উদ্ভাবিত হয়েছে তা সবই বিদআত ও নাজায়েয।

যেমনঃ

1. মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত কামনার নামে তাহলীল পড়ানো,
2. কুরআন খতম পড়ানো মৃত ব্যক্তির চার পাশে বসে কুরআন পাঠ করা
3. গোসলের জন্য গরম পানি দেওয়ার জন্য পাক ঘরের চুলা বাদ দিয়ে বাইরে চুলা করেগরম পানি দেয়া
4. মৃত ব্যক্তিকে যেখানে গোসল দেওয়া হয় সে স্থান ৪দিন কিংবা ৪০ দিন পর্যন্ত বেড়া দিয়ে সংরক্ষণ করা এবং রাতের বেলায় সেখানে মোম, হ্যারিকেন বা বৈদ্যুতিক বাতি দিয়ে আলোকিত করে রাখা,

5. জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় আল্লাহ্ রাব্বী, মুহাম্মাদুন নবী কিংবা কালিমা শাহাদাত পাঠ করা,
6. জানাযা কবর স্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় খাটিয়ার উপর আগর বাতি জ্বালানো এবং জানাযার যাত্রীদের উপর গোলাপ জল ছিটানো,
7. কবর স্থানে জানাযা নেয়ার সময় খাটিয়াকে ছাতা বা কোনো আচ্ছাদন দিয়ে ছায়াদান করে নিয়ে যাওয়া,
8. জানাযার ছালাত শেষে “এ মানুষটি কেমন ছিল “উপস্থিত সবাই “বেশ ভালো ছিল ” একথা বলা,
9. জানাযার ছালাতের পূর্বে মৃত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য দেয়া,
10. জানাযা পড়ানোর সময় ইমামের একখন্ড সাদা কাপড় জায়নামায হিসেবে ব্যবহার করা -যা মূলত কাফনের কাপড়ের অংশ বিশেষ,
11. জানাযার ছালাত পড়ার পর পুনরায় খাটিয়ার সামনে দু’আ করা ঐ সময় ক্রিয়াম করা ছালাত ও সালাম পেশ করা,
12. জানাযার ছালাতের পর মত ব্যক্তিকে শেষ বারের মত দেখার জন্য মুখের কাফন খোলা,
13. কাফনের উপর যে কোনো রকমের দু’আ লিখে দেয়া কিংবা দু’আ লিখিত কাপড় খন্ডকাফনের সাথেলাগিয়ে দেয়া,
14. কোনো কাপড় খন্ডের উপর কালিমা লিখে ঐ কাপড় খন্ড কবরের ভেতর মৃতের ডান পাশে মুখ বরাবর কবরের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে দেয়া,
15. কবরের উপর পুষ্পস্তবক অর্পণ করা,
16. দাফন করার সময় প্রথম তিন অঞ্জলি মাটি দেওয়ার ক্ষেত্রে মিনহা খালাকনাকুমওয়া মিনহা ” কুরআন মাজীদের এ আয়াত পাঠ করা,

17. দাফনের পর দুআ করার পূর্বে একবার সূরা ফাতিহা তিনবার সূরা ইখলাছ, একবারসূরা ফালাক একবার সূরা নাস এভাবে কুরআন মাজীদ থেকে কোনো সূরা বা আয়াত পাঠ করা,
18. দাফন ও দুআ শেষে সবাই চলে আসার পর একজন বসে কবর তালক্বীন করা, *কবর পাকা করা ও তাতে মৃত ব্যক্তির নাম ফলক করা,
19. কবরের উপর ঘর তৈরি করা বা মাযার নির্মাণ করা,
20. মৃত্যুর পর চার দিন পর্যন্ত কিংবা চল্লিশ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন ফাতিহা পড়ানো,
21. মৃত ব্যক্তির বাড়িতে তিন দিন পর্যন্ত আত্মীয় -স্বজন কত্রিক পালা ক্রমেখানা পাঠানো,
22. মৃত্যুর পর চার দিন বা চল্লিশ দিন পর্যন্ত মোল্লা - মৌলভী দিয়ে প্যাভেল টাঙ্গিয়ে কবর পাহারা দেয়া,
23. মৃত ব্যক্তির বাড়িতে তিন পর্যন্ত চুলা না জ্বালানো ও খানা পাক না করা,
24. মৃত ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিত্ব কিংবা জাতীয় নেতা-নেত্রী হলে অথবা সামরিক ব্যক্তি হলে দাফনের সময় তোপধ্বনি করা ও যুদ্ধের বাজনা বাজানো,
25. জানাযার ছালাতের সময় জুতা -স্যাম্বেল পাক থাকলেও খুলে রাখা (সুন্নাত হল জুতা-স্যাম্বেল খুলে না রাখা),
26. জানাযার ছালাতে প্রথম তাকবীরের পর 'ছানা পড়া, (সুন্নাত হল 'ছানা না পড়ে সূরা ফাতিহা পড়া),
27. মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় আযান দেয়া,

28. নেককার বা বুযুর্গ ব্যক্তি হিসেবে কোনো কবরে বিছানা-বালিশ দেয়া,
29. মৃত্যুর পূর্বেই কবর খনন করে রাখা,
30. মৃত ব্যক্তির কাযা নামায থাকলে কিংবা মৃত ব্যক্তি বেনামাযী হলে তার নামাযের আর্থিক কাফফারা হিসাব করে কাফফারা আদায় করা এং এ মৃত ব্যক্তি গরীব লোক হলে কাফফারার পরিবর্তে একটি কুরআন মাজীদ কাউকে হাদীয়া প্রদান করে কাফফারা এসকাত্ত (দূরীভূত করা) ইত্যাদি ইত্যাদি।

উল্লেখিত কাজসমূহ বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক সম্পূর্ণ নব উদ্ভাবিত। এসব কাজের কোন শারঈ ভিত্তি নেই। অর্থ্যাৎ আল্লাহর যেমন এসব কাজ করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই, তেমনি সাহাবায়ে কেলাম এসব কাজ করেছেন বলে কোন ভিত্তি নেই। উল্লেখ্য, যে কাজ আল্লাহর রাসূল কিংবা তার সাহাবাগণ হতে পাওয়া যাবে না। তা কোন শরঈ কাজ বলে গণ্য হবে না। অথচ আমাদের দেশের নানান জায়গায় ইসালে সাওয়াব-মাহফিলের আয়োজন করতে দেখা যায় যা বা উক্ত কাজগুলো ইসলাম শরীয়ত সম্মত নয় এবং স্পষ্ট বিদ'আত। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফিরাতের জন্য অথবা কোন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খতমে কুরআন অথবা খতমে জালালীর অনুষ্ঠান করা। যেমন: কেউ যদি কুরআন তিলাওয়াত করে মৃত ব্যক্তিকে ঈসালে সাওয়াব করে, আলেমদের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এ সাওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছায় না, কারণ এটা মৃত ব্যক্তির আমল নয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

(وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)

(আর এই যে, মানুষ যা চেষ্টা করে, তাই সে পায়।) [সূরা নাজম: ৩৯]। এ তিলাওয়াত জীবিত ব্যক্তির চেষ্টা বা আমল, এর সাওয়াব সে নিজেই পাবে, অন্য কাউকে সে ঈসালে সাওয়াব করার অধিকার রাখে না। বিশুদ্ধ হাদিস থেকে প্রমাণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারত করতেন এবং কিছু বাক্য দ্বারা তিনি কবরবাসীদের জন্য দু‘আ করতেন, যা তিনি সাহাবাদের শিখিয়েছেন, তারাও তার থেকে শিখে নিয়েছে। যেমনঃ

السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بكم
لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافية

হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলমানগণ, তোমাদের উপর সালাম, ইনশাআল্লাহ অতিসত্ত্বর আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো, আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য ও তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।” [ইবনে মাজাহ : ১৫৩৬]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারত করার সময় কুরআন বা তার কোন আয়াত তিলাওয়াত করেছেন এমন প্রমাণিত নয়, অথচ তিনি খুব কবর যিয়ারত করতেন। যদি তা বৈধ হত বা মৃতরা তার দ্বারা উপকৃত হত, তাহলে অবশ্যই তিনি তা করতেন এবং সাহাবাদের নির্দেশ দিতেন। বরং নবুওয়তের দায়িত্ব আদায়, উম্মতের প্রতি দয়া ও সাওয়াবের বিবেচনায় এটা তার কর্তব্য ছিল। কারণ, তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ

(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
رَؤُوفٌ رَحِيمٌ)

নিশ্চয় তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু। [সূরা তওবা: ১২৮]। অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে দয়া, উম্মতের কল্যাণ কামনা ও অনুগ্রহ থাকা সত্ত্বেও যেহেতু তিনি তা করেন নি, তাই প্রমাণ করে যে এটা না-জায়েয। সাহাবায়ে কেরাম তাই বুঝেছেন এবং এর উপরই তারা আমল করেছেন। সুতরাং, আধুনিককালে সমাজে কবর যেয়ারত নিয়ে যেসব কাজসমূহ দেখা যায় তা বিদ'আত।

সুতরাং, মৃত ব্যক্তির জন্য যেসব কাজ নাজায়েজ ও বিদআত বলে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই সহীহ হাদীস অনুযায়ী সত্যিই নাজায়েয এবং বিদ'আত। আর বিদ'আত হলো - গোমরাহী যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

(১০) জানাযা নামাজ শেষে সম্মিলিতভাবে দুআ-মুনাজাতঃ আমাদের দেশের অনেক স্থানে দেখা যায় যে, জানাযা নামাজ পড়া হলে মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন ও তার জন্য মাগফিরাত কামনার জন্য দুআ-প্রার্থনা করে। অথচ ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী এরূপ করা সম্পূর্ণ বিদ'আত। জানাযা নামাজে তার জন্য দুআ-মুনাজাত শেষ করে আবার সাথে সাথে দুআ-মুনাজাত করার মধ্যে কি হিকমত থাকতে পারে? উদ্দেশ্য হতে পারে, আল্লাহকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, হে আল্লাহ! মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ-মুনাজাত করার যে পদ্ধতি আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিখিয়ে গেছেন, তাতে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। তাই আমরা আবার আমাদের পছন্দ মত নিয়মানুসারে আমাদের মত করে দুআ-

মুনাজাত করে নিলাম। জানাযা নামাজ শেষে দুআ-মুনাজাত করার অনুমোদন নেই। তবে দাফন শেষে কবরের কাছে দুআ করার অনুমোদন আছে। যেমন হাদীসে এসেছে-

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال :
استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মৃত ব্যক্তির দাফন শেষ করতেন তখন তার কবরের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াতেন এবং বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা কর এবং তার অবিচল থাকার জন্য দুআ কর। কারণ এখন তাকে প্রশ্ন করা হবে। (তথ্যসূত্রঃ আবু দাউদ)।

(১১) কুলখানি বা চল্লিশা পালনঃ মানুষ মারা যাওয়ার কুলখানি বা চল্লিশা পালন করা বিদ্‌আত। পরে মৃতের কুলখানি বা চল্লিশা উপলক্ষ্যে খানার আয়োজন করা অথবা চল্লিশদিন পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শোক পালন করা, মৃত্যুর পর প্রথম ঈদকে বিশেষভাবে শোকদিবস হিসেবে পালন করা, সে দিন কুরআনের হাফেয বা কারী সাহেবদের ডেকে কুরআন পড়ানো এবং শোক পালনের জন্য লোকজন একত্রিত করা ইত্যাদি সবই বিদ্‌আত এবং হারাম। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) সহীহ সনদে আব্দুল্লাহ আল বাজালী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন “আমরা মৃত্যুবরণকারী সাহাবীগনের কাফন-দাফন সম্পন্ন করে মৃতের বাড়ীতে একত্রিত হওয়া এবং তাদের পক্ষ থেকে খাবারের আয়জন করাকে ‘নাওহা’ এর মতই মনে করতাম।”

ইমাম আহমদ বলেন, “এটি একটি জাহেলী কাজ।” নাওহা অর্থঃ কারো মৃত্যুতে চিৎকার করে কান্নাকাটি করা, শরীরে আঘাত করা, চুল ছেড়া, জামা-কাপড় ছেড়া ... ইত্যাদি। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, শোক পালনের জন্য মজলিস করা অপছন্দীয় কাজ। এমনকি ইমাম আওয়ামীও অনুরূপ বলেছেন। [তথ্যসূত্রঃ মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন পাঠের সওয়াব পোঁছে কি? – সম্পাদনায়ঃ খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহঃ), পৃষ্ঠা নং – ৩৮]²³²

অতএব, চল্লিশা পালন কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমানিত নয়। তাই এসব কাজ করা ইসলামে হারাম।

(১২) মৃত্যুবার্ষিকী পালন করাঃ আমাদের সমাজে যেমন জন্ম-দিবস পালনের রেওয়াজ আছে তেমনি আছে মৃত্যু দিবস পালনের প্রথাও। এ প্রথাটি সম্পূর্ণ বিধর্মীদের। ইসলাম বা মুসলমানদের আচার নয়। দুর্ভাগ্যজনক সত্য হল, মুসলিমগণ কাফেরদের অনুসরণ করে তাদের এ প্রথা মত আমল করে যাচ্ছে। যদি এটাকে ধর্মীয় আচার মনে করে করা হয় তবে তা বিদআত হিসেবে একটা গুনাহের কাজ বলে পরিগণিত হবে। আর যদি সমাজে প্রচলিত প্রথা হিসেবে করা হয় তবে তা অমুসলিমদের অনুসরণ-অনুকরণের দোষে দুষিত হবে, যা নিঃসন্দেহে একটি মারাত্মক অপরাধ ও নিষিদ্ধকর্ম। অথচ আজকে আমাদের সমাজে পিতা-মাতা, দাদা-দাদী সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির মৃত বার্ষিকী অত্যন্ত জমজমাট ভাবে পালন করা হয়ে থাকে। সেখানে অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে বিশাল খাবার-দাবারের আয়োজন

²³² মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন পাঠের সওয়াব পোঁছে কি? – সম্পাদনায়ঃ খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহঃ), পৃষ্ঠা নং – ৩৮

করা হয়। যদিও গরীব শ্রেণীর চেয়ে অর্থশালীদের মধ্যে এটা পালন করার ব্যাপারটি বেশি চোখে পড়ে কিন্তু আমরা কজনে জানি বা জানার চেষ্টা করি যে, মৃত্যুবার্ষিকী কিংবা কারো মৃত্যু উপলক্ষ্যে শোক দিবস পালন পালন করা জঘন্যতম বিদ্‌আত? অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে এ উপলক্ষ্যে শামিয়ানা টাঙ্গানো, ঘর-বাড়ী সাজানো, আলোকসজ্জা করা এবং কুরআন তেলাওয়াত বা বিভিন্ন তাসবীহ-ওয়ীফা ইত্যাদি পাঠ করে সেগুলোর সাওয়াব মৃতব্যক্তির রুহের উদ্দেশ্যে বখশানো বিদ্‌আত। আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রাঃ) বলেন, “মৃত ব্যক্তিকে ছায়া দিতে পারে কেবল তার আমল; তাঁরু টানিয়ে ছায়া দেয়া সম্ভব নয়।”

(১৩) রুহের মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে ফাতিহা পাঠের বিদ্‌আতঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং খেলাফয়ে রাশেদীনের রুহের প্রতি ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে ফরয নামাযের পর এই বিশ্বাস সহকারে সূরা ফাতিহা পড়া বিদ্‌আত যে, এ সকল পবিত্র রুহসমূহের উদ্দেশ্যে সূরা ফাতিহা পড়লে তাঁরা মৃত্যুর পর গোসল দেয়ার সময় এবং কবরে সওয়াল-জওয়াবের সময় উপস্থিত থাকবেন। আফসোস! এটা কত বড় মূর্খতা এবং গোমরাহী! এসব কথার না আছে ভিত্তি; না আছে দলীল। এদের বিবেক দেখে বড় করুণা হয়। অনুরূপভাবে, কোথাও কোথাও নামাযের শেষে দু'আ শেষ করে করে মৃতের ফাতিহা পাঠের রেওয়াজ দেখা যায়। কোন জায়গায় জুমআর নামায শেষ করে ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর উদ্দেশ্যে ফাতিহা পাঠের নিয়ম চালু রয়েছে। এসবই বিদ্‌আত। অনুরূপভাবে কোন কবর বা মাযারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং হাত উঠিয়ে কবর বা মাযারে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ফাতিহা পাঠ করা, আবার সে মৃত ব্যক্তির নিকটে ফরিয়াদ করা বা তার নিকট সাহায্য

করা, মৃত মানুষের দাফন শেষে গোরস্থান থেকে ফিরে আসার সময় চল্লিশ কদম দূরে দাঁড়িয়ে ফাতিহা পাঠ করা এবং সাধারণ মৃত মুসলমানদের রুহের উদ্দেশ্যে সাওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে ফাতিহা পড়া শুধু মূর্খতাই নয় বরং বিদ'আত। অতএব, বিশুদ্ধ হাদিস থেকে প্রমাণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারত করতেন এবং কিছু বাক্য দ্বারা তিনি কবরবাসীদের জন্য দু'আ করতেন যা তিনি সাহাবাদের শিখিয়েছেন, তারাও তার থেকে শিখে নিয়েছে। যেমনঃ

السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بكم
لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافية

হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলমানগণ, তোমাদের উপর সালাম, ইনশাআল্লাহ অতিসত্বর আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো, আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য ও তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।” [তথ্যসূত্রঃ ইবনে মাজাহঃ ১৫৩৬]²³³। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারত করার সময় কুরআন বা তার কোন আয়াত তিলাওয়াত করেছেন এমন প্রমাণিত নয়, অথচ তিনি খুব কবর যিয়ারত করতেন। যদি তা বৈধ হত বা মৃতরা তার দ্বারা উপকৃত হত, তাহলে অবশ্যই তিনি তা করতেন এবং সাহাবাদের নির্দেশ দিতেন বরং নবুওয়তের দায়িত্ব আদায়, উম্মতের প্রতি দয়া ও সাওয়াবের বিবেচিনায় এটা তার কর্তব্য ছিল। কারণ, তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ

(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
رَؤُوفٌ رَحِيمٌ)

²³³ তথ্যসূত্রঃ ইবনে মাজাহ : ১৫৩৬

“নিশ্চই তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা তওবা: ১২৮]²³⁴

অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে দয়া, উম্মতের কল্যাণ কামনা ও অনুগ্রহ থাকা সত্ত্বেও যেহেতু তিনি তা করেন নি, তাই প্রমাণ করে যে এটা না-জায়েয। সাহাবায়ে কেরাম তাই বুঝেছেন এবং এর উপরই তারা আমল করছেন, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন তারা কবর যিয়ারতের সময় মৃতদের জন্য দু‘আ করতেন ও নিজের নসহিত হাসিল করতেন। তারা মৃতদের জন্য কুরআন তিলাওয়াত করেন নি। তাই প্রমাণিত হল যে, কবর যিয়ারতের সময় কুরআন তিলাওয়াত করা পরবর্তীতে আবিষ্কৃত বিদ্‘আত।

(১৪) কবরে মান্নত পেশ, পশু যবেহ এবং খতমে কুরআনের বিদ্‘আতঃ
মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবরে খতমে কুরআন আয়োজন করা, পশু যবেহ করে কুরআনখানী বা মৃতবার্ষিকীতে অংশ গ্রহণকারীদেরকে খানা খাওয়ানো এবং কবরে টাকা-পয়সা মান্নত হিসেবে পেশ করা জঘন্যতম বিদ্‘আত। এসব কাজের সাথে যদি বিশ্বাস করা হয় যে, কবরবাসীরা এগুলোতে খুশি হয়ে আমাদের উপকার করবে, আমাদেরকে ক্ষয়-ক্ষতি এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবে এবং যদি বিশ্বাস করা হয় যে, তারা এ হাদিয়া-তোহফা দিলে কবুল করেন তবে তা শুধু বিদ্‘আতই নয় বরং বরং শির্ক। নাবী

²³⁴ সূরা তওবা: ১২৮

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ধরনের ক্রিয়াকলাপকে লানত করেছেনঃ

((لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ))

“যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করে তার প্রতি আল্লাহর অভিশম্পাত।” (মুসলিম, অধ্যায়ঃ গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু জবেহ করা হারাম)। মান্নত একটি ইবাদত। আর গাইরুল্লাহর জন্য ইবাদত করা শির্ক। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ “এক ব্যক্তি একটি ছোট মাছির জন্য জান্নাতে গেছে এবং অন্য একজন জাহান্নামে গেছে। সাহাবীগণ কারণ, জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, “পূর্ববর্তী উম্মতের দু জন লোক সফরকালে এমন এক জায়গা দিয়ে যাচ্ছিল যেখানে ছিল একটি মূর্তি। মূর্তির সেবকগণ এ দু জন লোককে কোন কিছু মূর্তির উদ্দেশ্যে কোন কিছু উৎসর্গ করতে আদেশ করল। এমনকি হুমকি দিয়ে বলল, “অবশ্যই কিছু না কিছু উৎসর্গ করতে হবে। কমপক্ষে একটি মাছি হলেও মূর্তির উদ্দেশ্যে দিতে হবে। অন্যথায় তোমাদেরকে হত্যা করা হবে।” কোন উপায় না পেয়ে হয়ে দু জনের মধ্যে একজন একটি মাছি ধরে মূর্তির মন্ডপে নিক্ষেপ করল। যার ফলে সে জাহান্নামে সন্তান করে নিল। আরেকজন কোন কিছু দিতে অস্বীকার করল। ফলে তাকে হত্যা করা হল এবং সে জান্নাতবাসী হয়ে গেল। (সহীহ মুসলিম)

(১৫) কবরের কাছে বা মাযাবে, পথের ধারে কুরআন পাঠঃ কবরের কাছে বা মাযার, পথের ধারে বা লোক সমাগম হয় এমন কোন স্থানে কুরআন তেলাওয়াত করে ভিক্ষা করা বিদ'আত এবং হারাম। আবার দেখা যায় যে,

কবরের কাছে বা মাযারে, পথের ধারে কেউ সূরা ইয়াসীন পড়েন, কেউ পড়েন সূরা তাকাসুর। কেউ সূরা ফাতেহা পড়েন। আবার কেউ তিন বার সূরা ইখলাস পড়ে তার সওয়াব মৃত ব্যক্তির জন্য পাঠিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে বহু বার কবর ঘিয়ারত করেছেন। তিনি কখনো কোন কবরের কাছে গিয়ে সূরা ফাতেহা, কুরআন থেকে কোন সূরা বা কোন আয়াত পাঠ করেননি। কুরআনের ফযীলত তার সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সকলের চেয়ে বেশি অবগত ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে ইমামদের তিনটি মত পাওয়া যায়।

এক. না-জায়েয ও বিদআত। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ইমাম মালেক (রহঃ) ও ইমাম আহমদ (রহঃ) এ মত পোষণ করতেন।

দুই. জায়েযঃ ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান এ মত পোষণ করতেন।

তিন. শুধু দাফনকালে কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত জায়েয। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) এ মত পোষণ করেন এবং ইমাম আহমদ থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু ব্যক্তির কবরে খেজুর ডাল গেড়ে দিয়েছিলেন এ জন্য যে খেজুর ডাল যতক্ষণ তাজা থাকবে ততক্ষণ জিকির করবে ফলে কবরে আযাব হবে না। যদি খেজুর ডালের জিকিরের কারণে কবর আযাব বন্ধ হয় তাহলে কুরআন তিলাওয়াত করলে কবরের আযাব বন্ধ হবে না কেন? তাই কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করা যেতে পারে। কিন্তু তার এ মত অনুমান নির্ভর

ইসলাম সাধারণভাবে ভিক্ষাবৃত্তিকেই তো নিন্দা করেছে আবার কুরআনকে মাধ্যম ধরে ভিক্ষা করা?! এটা শুধু হারামই নয় বরং কঠিন গুনাহের কাজ। এভাবে অসংখ্য বিদআত আমাদের সমাজে জেঁকে বসে আছে যেগুলোর প্রতিবাদ করতে গেলেও হয়ত প্রতিবাদকারীকে উল্টো বিদআতী উপাধী নিয়ে ফিরে আসতে হবে। তবে বর্তমানে জ্ঞান চর্চার অবাধ সুযোগে আমাদের নতুন প্রজন্ম, যুব সমাজ, তরুন আলেম সমাজ সবাই যদি উন্মুক্ত হৃদয়ে দ্বীনে ইসলামের বুক থেকে বিদআতের পাথরকে সরানোর জন্য তৎপর হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে ইসলাম তার আগের মহিমায় ভাস্বর হবে। ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য্যে ভরে উঠবে আমাদের সপ্নিল বসুন্ধরা। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

(১৬) তথাকথিত পীর ব্যবসা বা পীরের মুরিদ হওয়া সর্ব উৎকৃষ্ট বিদ'আতঃ

নিকৃষ্ট বিদ'আতের সর্ব উৎকৃষ্ট উদাহরণটি হল - তথাকথিত পীর ব্যবসা। কারন এদের কিছু কিছু কাজ বিদ'আত তো বটেই সরাসরি শিরক এর পর্যায়ে পরে। যেমন এরা নিজেরাই কিছু সামা সংগীত, গজল, যিকর ইত্যাদি তৈরি করে যার কথাগুলো পুরাপুরি শিরক। আবার এরা মাজারে গিয়ে দোয়া প্রার্থনা করে এসবও শিরক। তাসাউফ অর্জন এর নাম করেও এরা দ্বীনের ভেতর নতুন জিনিসের উদ্ভাবন করেছে। যেমনঃ আশ্বিয়া, আউলিয়া, পীর-দরবেশসহ সকল মৃত মুসলমানের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা, তাদের জন্য দুআ করা। এ মাহফিলে জীবিত-মৃত আউলিয়া-বুজুর্গ, পীর-দরবেশ ও তাদের খাদেম ভক্তদের কেরামত বয়ান করা হয়। ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে মানুষকে আয়োজক দরবারের দিকে আকৃষ্ট করা হয়। আল্লাহর কাছে এ দরবার ছাড়া আর কোন প্রিয় দরবার যে নেই এটা জোর-জবরদস্তি করে বুঝানো হয় সাধারণ মানুষকে। মীলাদ পড়া হয়।

দরবারে অবস্থিত মাদরাসা, মসজিদ ও খানকাহর জন্য চাঁদা তোলা হয়। সর্বশেষে, আখেরি মুনাজাত ও তাবারুকের ব্যবস্থা থাকে। শুধু তাই নয় এরা যে গান বাজনার আসর বসায়, গানের মাহফিলে নর্তন-কুন্দন, নাচতে নাচতে অজ্ঞান হয়ে যায়, কাপড় ছিঁড়ে ফেলে দুনিয়ার কেউ প্রমান করতে পারবে না রসুলুল্লাহ (সাঃ) বা সাহাবীদের জামানায় এমন কিছু ছিল। অতএব নিসন্দেহে এসব বিদ'আত এবং সম্পূর্ণ বিদ'আতী কাজ। অতএব, ইসলাম শরীয়ত এ কাজ সমর্থন করে না। আল্লাহ আমাদের এসব বিদ'আতী কাজ থেকে হেফাযতে রাখুন, আমীন।

(১৭) ওরসঃ “ওরস” শব্দের আভিধানিক অর্থ “ওলীমা বা বিবাহের খানা, জিয়ারত, বিবাহের দাওয়াত, বাসর যাপন” ইত্যাদি। পারিভাষিক ও রূপক অর্থ “কোন আউলিয়া-ই-কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের ইন্তকালের দিন ফাতিহা পাঠ উপলক্ষ্যে খাওয়া, ওয়াজ-মাহফিল, মীলাদ-কিয়াম ইত্যাদির ব্যবস্থা করা”। পূর্ববর্তী যামানায় ওরস শব্দ ব্যবহার করাকে ওলামায়ে হক্কানী-রব্বানীগণ দোষণীয় মনে করেননি। কিন্তু পরবর্তী যামানায় ওরসের নাম দিয়ে বেপর্দা, বেহায়াপনা, গান-বাজনা, মেলা ইত্যাদি বেশরীয়তী কাজ করার কারণে পরবর্তী যামানার হক্কানী-রব্বানী আলিমগণ ফতওয়া দিয়েছেন যে, কোন নেক বা দ্বীনী কাজে ওরস শব্দ ব্যবহার করা না করে “ঈসালে সাওয়াব” বা “সাওয়াব রেসানী” শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

(১) পবিত্র কুরআনের আলোকে ওরসের ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

আল্লাহ কুর'আনে বলেন, "বলুন, আমার প্রতিপালক আমাকে একটি সরল পথে পরিচালিত করেছেন, যা বক্রতা হতে মুক্ত দ্বীন, ইবরাহীমের দ্বীন, যিনি

একনিষ্ঠভাবে নিজেকে আল্লাহ-অভিমুখী করে রেখেছিলেন। আর তিনি ছিলেন না শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা আনআম: ১৬১]

(২) হাদীসের আলোকে ওরসের ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আর সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। আর ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে ধর্মে নতুন সৃষ্টি। (এটা বিদআত) আর সব বিদআতই পথভ্রষ্টতা।" [মুসলিম]

"আমি তোমাদেরকে এমন কোন কিছু নির্দেশ দিতে ছাড়িনি যা তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে আর জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।" [বুখারী ও মুসলিম]

"যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করবে যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।" [বুখারী ও মুসলিম]

অতীব দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই উপমহাদেশের একশ্রেণীর মানুষ অজ্ঞতা ও শয়তানের ধোঁকায় পরে সরাসরি আল্লাহ'র সাহায্য না চেয়ে বিভিন্ন বুয়ুর্গের কবরকে সাহায্য গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। কবর পাকাকরণ নিষিদ্ধ হলেও উনার কবরকে ইট-বালি-সিমেন্টে বার্বিয়ে মাযারে রূপান্তর করেছে যাকে ঘিরে ইসলামের নামে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন বিদ'আহ-শিরক ও কুফরী কার্যকলাপ যার সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্কও নেই।

গান-বাজনা-মদ-গাঁজার উৎসবে ছেয়ে গেছে মাযারগুলো যা কিনা সুস্পষ্ট হারাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা নিজেদের

ঘরকে কবর বানিয়ে না। (অর্থাৎ কবরের মতো ইবাদত-বন্দেগী শূন্য করো না) এবং আমার কবরকে উৎসবের স্থান বানিয়ে না।" [সুনানে আবু দাউদ]। এছাড়াও রাসূল-সাহাবী-তাবেঈ-তাবেঈন দ্বারা সিদ্ধ নয় এমন প্রচুর কাজই সেখানে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত হয়ে এসেছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'ওরস'।

উল্লেখ্য, এভাবে কারোও ইন্তেকালের দিন উদযাপন করা, সেদিন অনেকে একসাথে সূরা ফাতিহা পাঠ করা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা, মীলাদ-ক্রিয়াম করা সুস্পষ্ট বিদ'আহ। কোন সাহাবী-তাবেঈ বা তাবেঈনদের দ্বারা এমন কাজের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং "ওরস" উৎসব হচ্ছে ইসলামের মধ্যে নতুন সৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ 'বিদ'আহ' এবং ইহা পালন করা 'হারাম' এবং কুর'আন ও হাদীস বিরোধী বক্তব্য যা অবশ্যই পরিতাজ্য। আল্লাহ আমাদের সকল বিদআত হতে হেফযত করুন আমিন।

(১৭) ফরয সালাতের পরে সম্মিলিত মুনাযাতঃ একটি প্রচলিত বিদআতঃ

আমাদের সমাজে যতগুলি বিদ'আত প্রচলিত আছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ফরয সালাতের পর সম্মিলিত মুনাযাত। এই সম্মিলিত মুনাযাতের দলীল নবী (সাঃ) থেকে পাওয়া যায় না। কোন কোন বিদ'আত বছরে একবার করা হয়, কোন কোনটি হয়ত মাসে একবার, কোন কোনটি হয়তো সপ্তাহে একবার। কিন্তু সম্মিলিত মুনাযাত এমন এক বিদ'আত যা প্রতিদিন পাঁচবাব করা হয়। সুতরাং এর থেকে দূরে থাকতে হবে।

হাদীসে বর্ণিত ফরয সালাতের পর পঠিতব্য দুআ ও যিকিরগুলো এককী পড়তে হবে, দলবদ্ধভাবে নয়। কারণ, হাদীসে এ ক্ষেত্রে পঠিতব্য দুআগুলো

প্রায়ই সবই এক বচনের শব্দে এসেছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ভারত বর্ষের প্রায় সকল মুসলিম জনগণ (আলিম ও সাধারণ) নবী (সাঃ) কর্তৃক সালাতের পর পঠিতব্য দুআর তালিকাটি আংশিক বা পুরোপুরি বাদ দিয়ে নিজেরাই বিভিন্ন দুআ নির্বাচন ও সংযুক্ত করেছে। এর সাথে আরো যোগ করেছে দলবদ্ধ ও সম্মিলিত রূপ। ফলে সালাতের পরে দুআর নামে সম্মিলিত মুনাজাতের মাধ্যমে অনেকগুলো সুন্নাত উৎখাত হয়েছে। প্রথমতঃ যে সুন্নাতটি উঠেছে সেটা হল, ফরয সালাতের পর যে নির্দিষ্ট কিছু দুআ ও যিকির রয়েছে এটার জ্ঞানই অধিকাংশ লোকের নেই। যার জন্য ওগুলো কঠিন করার সুযোগ তাদের হয়নি। ঐ সকল দুআ ও যিকির সম্বলিত হাদীসগুলো পড়ার কিম্বা ইমাম সাহেবের মাধ্যমে শোনার অবকাশ হয়নি বা নেই। অতএব সালাতের পর দলবদ্ধভাবে দুআর প্রমাণ পেশ করা শরীয়ত বিকৃত করার শামিল। প্রকাশ থাকে যে , কোন কোন ‘আলেম ফরয সালাতান্তে হাত উঠিয়ে দুআ করার প্রমাণে কিছু পুস্তক লিখলেও প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি বিতর্কিত নয়। সিদ্ধান্তহীনতার ফলে অথবা স্বার্থান্বেষী হয়ে আমরাই বিষয়টিকে বিতর্কিত করেছি। কারণ একথা সর্বজন বিদিত যে, রাসূল (সাঃ), সাহাবীগণ ও তাবেঈগণ ইমাম-মুজাদী মিলে হাত উঠিয়ে কখনো দুআ করেননি এবং পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ‘আলিমগণ করেননি এবং বর্তমানেও করেন না। কাজেই এটি স্পষ্ট বিদ’আত। আব্বাহ তায়ালা আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী ‘আমল করার তাওফীক দান করুন – আমীন!!

(১৮) শাহাদাত আঙ্গুলে চুম্বন করা ও চোখে মাসাহ করাঃ “আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ” -শুনে শাহাদাত আঙ্গুলে চুম্বন করা ও চোখে মাসাহ করা! একটি বিদ’আতী আমল। কারন উক্ত আমল শরী‘আত সম্মত নয়।

এর পক্ষে কোন সহীহ হাদীস নেই। এর পক্ষে যা কিছু বর্ণনা এসেছে তা জাল বা মিথ্যা। যেমন-

■ ১ম বর্ণনাঃ খিযির (আঃ) বলেন, মুয়াযযিন যখন ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ বলবে, তখন যে ব্যক্তি বলবে, আমার প্রিয় ব্যক্তিকে স্বাগত, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহর কারণে আমার চক্ষু শীতল হয়েছে, অতঃপর তার দুই হাতের বৃদ্ধা আংগুলে চুম্বন করবে ও দুই চোখ মাসাহ করবে, সে কখনো অন্ধ হবে না এবং তার চোখও উঠবে না। (তথ্যসূত্রঃ ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আল- জাররাহী, কাশফুল খাফা ২/২০৬ পৃঃ; তায়কিরাতুল মাওযু‘আত, পৃঃ ৩৪)

►তাহকীকঃ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বর্ণনা। এর কোন সনদই নেই। (তথ্যসূত্রঃ আল- মাক্বাহিদুল হাসানাহ, পৃঃ ৬০৫; আল-ফাওয়াইদুল মাজমু‘আহ ফিল আহাদীছিল মাওযু‘আহ, পৃঃ ২০)²³⁵

■ ২য় বর্ণনাঃ আবুবকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি যখন মুয়াযযিনের ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ বলা শুনতেন, তখন তিনি অনুরূপ বলতেন। অতঃপর দুই শাহাদাত আঙ্গুলের পেটে চুম্বন করতেন এবং দুই চোখ মাসাহ করতেন। তখন রাসূল (সঃ) বলেন, আমার বন্ধু যা করল তা যদি কেউ করে, তবে আমার শাফা‘আত তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে। (তথ্যসূত্রঃ তায়কিরাতুল মাওযু‘আত, পৃঃ ৩৪)²³⁶

²³⁵ আল- মাক্বাহিদুল হাসানাহ, পৃঃ ৬০৫; আল-ফাওয়াইদুল মাজমু‘আহ ফিল আহাদীছিল মাওযু‘আহ, পৃঃ ২০

²³⁶ তায়কিরাতুল মাওযু‘আত, পৃঃ ৩৪

► তাহকীকঃ এটিও ডাহা মিথ্যা বর্ণনা। এর কোন সনদ নেই। (তথ্যসূত্রঃ আব্দুর রহমান আস-সাখাবী, আল- মাক্বাছিদুল হাসানাহ ফী বায়ানি কাছীরিন মিনাল আহাদীছিল মুস্তাহারা আলাল আলসিনাহ, পৃঃ ৬০৫; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ‘আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ‘আহ, পৃষ্ঠা নং - ২০)²³⁷

(১৯) প্রচলিত তাবলীগ এবং চিল্লা প্রথাঃ বর্তমানে মুসলিম সমাজ বিদ‘আতের সর্দিতে ভুগছে। সস্তা ফযীলতের ধোঁকায় পড়ে মুসলিম জাতি আজ দিশেহারা। তারা খুঁজে ফিরছে সত্যের সন্ধানে। কোথায় পাওয়া যাবে সঠিক পথের দিশা, কোথায় পাওয়া যাবে সত্যিকারের আদর্শ? কেননা পৃথিবীর সকল মানুষ কোন না কোন আদর্শের সাথে সংযুক্ত। যেমনঃ তাবলীগ জামায়াতের আদর্শ হচ্ছেন মাওলানা ইলিয়াস! পক্ষান্তরে মাযার, খানকা ও তরীকা পূজারী মুরীদদের আদর্শ স্ব স্ব পীর-ফকীর। যার যার নেতা-আমীরদের আদর্শ নিয়ে তারা উৎফুল্ল! তাহলে কোথায় আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আদর্শ? ইসলাম কারো মনগড়া ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থা নয়। এটা বিশ্ব প্রতিপালক মহান আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আর এ দ্বীন প্রচারিত হয়েছিল নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) - এর মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সাঃ) এর একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَسْعَرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ لِعُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَنَّ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ

²³⁷ আব্দুর রহমান আস-সাখাবী, আল- মাক্বাছিদুল হাসানাহ ফী বায়ানি কাছীরিন মিনাল আহাদীছিল মুস্তাহারা আলাল আলসিনাহ, পৃঃ ৬০৫; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ‘আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ‘আহ, পৃষ্ঠা নং - ২০

الإِسْلَامَ دِينًا} لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. فَقَالَ عُمَرُ إِنَّي لَأَعْلَمُ أَيَّ يَوْمٍ نَزَلَتْ هَذِهِ
الآيَةُ، نَزَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ. سَمِعَ سَفِيَانُ مِنْ مِسْعَرٍ وَمِسْعَرٌ قَيْسًا
وَقَيْسٌ طَارِقًا.

হুমায়দী (রহঃ) তারিক ইব্ন শিহাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,
এক ইল্হদী উমর (রা.)-কে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের উপর
যদি এই আয়াতঃ “আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম
ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে
তোমাদের দীন মনোনীত করলাম” (৫:৩) অবতীর্ণ হত, তাহলে সে
দিনটিকে আমরা ঈদ (উৎসবের) দিন হিসাবে গণ্য করতাম। উমর (রাঃ)
বললেন, আমি অবশ্যই জানি এ আয়াতটি কোন্ দিন অবতীর্ণ হয়েছিল।
আরাফার দিন জুমু'আ দিবসে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। হাদীসটি
সুফিয়ান (রহঃ) মিসআর (রহঃ) থেকে, মিসআর কায়স থেকে, কায়স
(রহঃ) তারিক থেকে শুনেছেন। (তথ্যসূত্রঃ সহিহ বুখারী :: অধ্যায় ::
কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা অধ্যায়, খন্ড ৯ :: অধ্যায় ৯২ ::
হাদিস ৩৭৩)।²³⁸ অতএব, রাসূল (সাঃ) এর উপরোক্ত হাদীস থেকে
প্রমানিত হয় যে, এই দ্বীন তথা ইসলাম পরিপূর্ণ এবং এই দ্বীন তথা
ইসলামের মূল দর্শন হল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দান। মানব সমাজে
আল্লাহর দ্বীনের বার্তা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য কুরআন ও হাদীসে মুসলিম
উম্মাহকে বহুবার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এমনকি যদি একটি আয়াতও

²³⁸ সহিহ বুখারী :: অধ্যায় :: কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা অধ্যায়, খন্ড ৯ :: অধ্যায় ৯২ ::
হাদিস ৩৭৩

কেউ জানে, তা প্রচার করার জন্য রাসূল (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন।
(তথ্যসূত্রঃ বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮।)²³⁹।

সুতরাং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ থেকে কারো পিছিয়ে থাকার কোন সুযোগ নেই। বর্তমানে ফেৎনার যে ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে এবং সঠিক দ্বীন প্রচারকের সংখ্যাও যেহেতু খুবই কম, সে কারণে দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করা এখন ‘ফরযে আইন’ হয়ে পড়েছে। সুতরাং কেউ যদি শারঈ ওয়র ব্যতীত দৈনন্দিন ব্যস্ততার অজুহাতে বা অলসতাবশতঃ তাবলীগ বা দ্বীনের প্রচার না করে, তাহলে সে নিঃসন্দেহে গোনাহগার হবে। তাবলীগ মুসলিম মিলাতের অতি পরিচিত একটি শব্দ। যার অর্থ প্রচার ও প্রসার। ক্রিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল বিশ্ব মানবতার দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাবার যে গুরু দায়িত্ব মুহাম্মাদ (সাঃ) কর্তৃক সকল উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর অর্পিত হয়েছে, সেটিকেই তাবলীগ বলে। মূলতঃ রাসূল (সাঃ) বিশ্ব মানুষের কাছে দ্বীনের এ দাওয়াত পৌঁছাবার ও প্রচার-প্রসারের মহান দায়িত্ব নিয়েই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। যেমন আগমন করেছিলেন রাসূল (সাঃ) - এর পূর্বে অগণিত নবী ও রাসূল। রাসূল (সাঃ) - কে তাবলীগ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলেন না (মায়েদা ৬৭)। রাসূল (সাঃ) হলেন সর্বশেষ নবী। তারপর পৃথিবীতে আর কোন নবী আসবে না। তাই বিদায় হজ্জের সময় রাসূল (সাঃ) বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা, **فليبلغ الشاهد الغائب** ‘উপস্থিত লোকেরা যেন

²³⁹ বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮।

দ্বীনের এ দাওয়াত অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছে দেয়'। এর মাধ্যমে সমস্ত উম্মাতে মুহাম্মাদীই তাবলীগ তথা দ্বীন প্রচারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেন, **بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً** 'আমার পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও (মানুষের নিকট) পৌঁছে দাও'। মূলতঃ এ কারনেই তাবলীগের অন্যতম জনপ্রিয় একটা গ্রুপ হল তাবলীগ জামায়াত। এই জামায়াত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছে। এমনকি শুনা যায় যে, বিশ্বের যেখানে সত্যিকারের মুসলিমের প্রবেশ নিষেধ সেখানেও এই জামায়াতের অবোধ বিচরণ। এই জামা'আতের দাওয়াতের মূল উৎস হল ফাযায়েলে 'আমাল বা তাবলীগী নিসাব। এই বইটি আমাদের দেশে খুব পরিচিত। অথচ রাসূল (সাঃ) এর তাবলীগের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে এবং দ্বীনের ভিতরে নব উদ্ভাবিত বিদ'আত। কেন বিদ'আত তা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

প্রচলিত তাবলীগ জামা'আতের প্রচলন বা আবিষ্কারের কাহিনীঃ তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতার পরিচিতিঃ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের একটি রাজ্যের বর্তমান নাম হরিয়ানা এবং সাবেক নাম পাঞ্জাব। ভারতের রাজধানী দিল্লীর দক্ষিণে হরিয়ানার একটি এলাকার নাম মেওয়াত। যার পরিধি দিল্লীর সীমান্ত থেকে রাজস্থান রাজ্যের জয়পুরহাট যেলা পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই মেওয়াতে ১৩০৩ হিজরীতে এক হানাফী ব্যক্তির জন্ম হয়। তাঁর নাম ছিল আখতার ইলিয়াস। কিন্তু পরে তিনি শুধু ইলিয়াস নামে পরিচিত হন। ইনি ১৩২৬ হিজরীতে দেওবন্দ মাদরাসার শাইখুল হাদীছ মাওলানা মাহমুদুল হাসানের কাছে বুখারী ও তিরমিযীর দারস গ্রহণ করেন। এর

দু'বছর পরে ১৩২৮ হিজরীতে তিনি সাহারানপুরের মায়া-হিরুল 'উলূমের শিক্ষক হন।

১৩৪৪ হিজরীতে তিনি দ্বিতীয়বারে হজে গমন করেন। এই সময় মদীনায থাকাকালীন অবস্থায় তিনি (গায়েবী) নির্দেশ পান যে, আমি তোমার দ্বারা কাজ নেব। ফলে ১৩৪৫ হিজরীতে তিনি দেশে ফিরে এসে মেওয়াতের একটি গ্রাম নওহে তাবলীগী কাজ শুরু করেন।

পরিশেষে ১৩৬৩ হিজরীর ২১ রজব মোতাবেক ১৩ জুলাই ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। (তথ্যসূত্রঃ মাওলানা আবুল হাসান 'আলী রচিত মাওলানা ইলয়াস রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি আওর উনকি দ্বীনী দা'ওয়াত- ৪৮, ৫৭, ৬১, ১৯৩ পৃষ্ঠা এবং রববানী বুক ডিপো প্রকাশিত তাবলীগী নিসাব - এর ভূমিকা পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)।²⁴⁰

ইলায়াসী তাবলীগ বনাম রাসূলের তাবলীগঃ পার্থক্যগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:-

(ক) তারা নিজেরা কুরআন বুঝে না অন্যদেরকেও বুঝতে দেয় না। কিন্তু রাসূল (সাঃ) নিজে কুরআন শিখিয়েছেন এবং তার প্রচারকও ছিলেন।

²⁴⁰ মাওলানা আবুল হাসান 'আলী রচিত মাওলানা ইলয়াস রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি আওর

উনকি দ্বীনী দা'ওয়াত- ৪৮, ৫৭, ৬১, ১৯৩ পৃষ্ঠা এবং রববানী বুক ডিপো প্রকাশিত তাবলীগী নিসাব - এর ভূমিকা পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

(খ) তাদের দাওয়াতী নিয়ম স্বপ্নে প্রাপ্ত। রাসূলের দাওয়াতী নিয়ম স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত (মায়েদা ৬৭)।

(গ) তাদের দাওয়াতের মধ্যে সপ্তাহে ১ দিন, মাসে ৩ দিন, বছরে ১ চিল্লা, কমপক্ষে জীবনে ৩ চিল্লা লাগিয়ে দ্বীনি কাজ শিখতে হবে। পক্ষান্তরে রাসূলের দাওয়াতী কাজ এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই।

(ঘ) তাদের দাওয়াতের মধ্যে ইসলামের একটি অপরিহার্য বিধান ও আল্লাহর প্রিয় জিহাদ নেই। কিন্তু রাসূলের দাওয়াতে জিহাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

(ঙ) তাদের দাওয়াতে কাফের মুশরিকদের কোন বাধা নেই। রাসূল (সাঃ) যখন দাওয়াত দিতেন তখন কাফের মুশরিক বাধা দিত।

(চ) তাদের দাওয়াতী কাজ শেখার মূল উৎস হল ‘ফাযায়েলে আমাল’। কুরআনের চেয়েও তারা ফাযায়িলে আমাল-এর গুরুত্ব বেশী দেয়। অথচ রাসূলের দাওয়াত শেখার মূল উৎস হচ্ছে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। আর কুরআনের মর্যাদা হচ্ছে সবকিছুর উর্ধে।

(ছ) তারা রাষ্ট্রপ্রধান বা ক্ষমতাসালীদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে না যদিও তারা শিরক করে ও ইসলামের বিরুদ্ধে বলে। রাসূল তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান ও ক্ষমতাসালীদের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন, শিরক ও ইসলাম বিরোধী কাজে বাধা দিয়েছেন।

(জ) তারা কোন দাওয়াতী কাজ করার সময় কুরআন হাদীছের দলীল পেশ করে না, নিজেদের মনগড়া কথা বলে। রাসূল নিজে কোন কিছু বলার বা দাওয়াত দেবার আগে দলীল পেশ করতেন।

(ঝ) তারা কোন মতেই কারো সাথে যুদ্ধ করতে চায় না। রাসূল যুদ্ধ করতে গিয়ে নিজের দাঁতকে শহীদ করেছেন।

(ঞ) তারা শুধু দাওয়াত কিভাবে দিবে তা শেখায় যদিও তা ইসলামী পদ্ধতিতে নয়; অন্য কোন কিছু তারা শিখায় না। রাসূল জীবনের প্রতি মুহূর্তে কি করতে হবে, কার সাথে কিভাবে চলতে হবে সবকিছু শিখিয়েছেন।

(ট) ইলিয়াসী তাবলীগ বুয়ুর্গদের সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। রাসূলের তাবলীগ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য (সূরা আন'আম ১৬; সূরা বাইয়েনা ৫)।

(ঠ) ইলিয়াসী তাবলীগের অলিরা গায়েব জানেন। অথচ রাসূল (সাঃ) গায়েব জানতেন না (সূরা আন'আম ৫০; সূরা আরাফ ১৮৮)।

(ড) ইলিয়াস সাহেবের আক্বীদায় রাসূল (সাঃ) জীবিত। কিন্তু নবী (সাঃ) ইন্তেকাল করেছেন (সূরা যুমার ৩০)।

(ঢ) বুয়ুর্গরা জান্নাত-জাহান্নাম দুনিয়াতে দেখেন। জান্নাত এমন যে, না কোন চোখ দেখেছে, না কোন কান শুনেছে এবং না কোন হৃদয় কল্পনা করেছে।

(গ) ইলিয়াসী তাবলীগে বুযুর্গদের মৃত্যুকে অস্বীকার করা হয়েছে। রাসূল (সাঃ) - এর তাবলীগের প্রত্যেকের মৃত্যু সত্য (সূরা আল-ইমরান ১৮৫)।

(ত) পর্যবেক্ষক ফেরেশতারা আল্লাহ ও বান্দার গোপন যিকির সম্পর্কে জানতে পারে না। ফেরেশতাগণ পর্যবেক্ষণ হিসাবে রয়েছেন এবং আমরা যা করি তারা সে সব জানেন (সূরা ইনফিতার ১০ ও ১২)।

(থ) ইলিয়াসী তাবলীগের কেন্দ্রস্থল ভারতের নিয়ামুদ্দীন মসজিদের ভিতরে মাওলানা ইলিয়াস সাহেব ও তার পুত্রের কবর রয়েছে। নাবী (সাঃ) কবরের দিকে সালাত পড়তে ও কবরকে পাকা নিষেধ করেছেন।

(দ) মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস সাহেবের ইন্তিকালের পর আল্লাহর সাথে মিশে গেছেন। নাবী করীম (সাঃ) বলেন, আল্লাহর সমতুল্য কেউ নেই, তার সাথে কেউ মিশতে পারে না (সূরা ইখলাস ৪; সূরা শূরা ১১)।

বিশ্ব বরেণ্য আলেমদের দৃষ্টিতে তাবলীগ জামাত ও গ্রন্থসমূহঃ সউদী আরবের সর্বচ্চ ওলামা পরষিদের সদস্য আব্দুর রাযযাক আফিফী বলেন, বাস্তবে তাবলীগপন্থিরা বিদ'আতী, ইসলাম বিকৃতকারী এবং কাদেরীয়া সহ অন্যান্য বাতিল তরীকার অনুসারী। তারা আল্লাহর পথে বের হয়নি বরং তাদের প্রতিষ্ঠাতা আমীর ইলিয়াসের মনগড়া পথে বের হয়েছে; তারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ডাকে না বরং তারা অতি সূক্ষ্মভাবে ইলিয়াসের দিকে ডাকে। আমি অনেক দিন আগে থেকেই এদের চিনি। এরা মিসর, ইসরাঈলে বা আমেরিকায় যে স্থানেই থাকুক না কেন, এরা

বিদ'আতী। (তথ্যসূত্রঃ বিশ্ববরেণ্য আলেমদের দৃষ্টিতে – তাবলীগ জামাত, মুহাম্মাদ বিন নাসের আল-উরাইনী, পৃষ্ঠা নং – ৫৮ -৫৯)।²⁴¹

সউদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের সদস্য শাইখ সালেহ বিন ফাওয়ান (রহঃ) বলেন, দাওয়াতের নাম ব্যবহার করে তাবলীগ জামায়াতের লোকেরা যা করে তা বিদ'আত; সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈ অর্থাৎ সালফে সালেহীনরা এভাবে দাওয়াত দেননি। এদের মাঝে অনেক বিদ'আত এবং ভ্রান্ত কুসংস্কার রয়েছে। এদের কর্মনীতি রাসূল (সাঃ) - এর কর্মসূচী ও কর্মনীতির পরিপন্থী ও বিরোধী। এটি একটি বিদ'আতী ছুফী জামায়াত, এদের সম্পর্কে সাবধান থাকা অপরিহার্য। তারা বিদ'আতী চিল্লা দেয়। তাদের দ্বারা ইসলামের কোন ফায়দা হবে না এবং কোন মুসলিমের জায়েয হবে না এ জামায়াতের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং এদের সাথে চলা। (তথ্যসূত্রঃ তারিখঃ ১৩/৫/১৪১৭ হিজরী, ফাতাওয়া ও চিঠিপত্র, শাইখ সালেহ বিন ফাওয়ান (রহঃ), সউদী আরব এবং দাওয়াত ও ইলমের ব্যাপারে তিনটি বক্তব্য-শায়েখ ফাওয়ান)²⁴²।

তাবলীগ জামাত এর গ্রন্থ (ফাযায়েল আমল): তাবলীগ জামাত এর গ্রন্থটি বিদ'আতী উদাহরনে ভুরপুর। যেমনঃ 'ফাযাযয়েল আমল' নামক বইটিতে অধিকংশ আলোচনাই শিরক-বিদআত, মিথ্যা কিচছা-কাহিনী, কুসংস্কার, সূত্রহীন, বানোয়াট জাল ও যঈফ হাদীছে পরিপূর্ণ। যেমন, (এক) তাবলীগ

²⁴¹ বিশ্ববরেণ্য আলেমদের দৃষ্টিতে – তাবলীগ জামাত, মুহাম্মাদ বিন নাসের আল-উরাইনী, পৃষ্ঠা নং – ৫৮ -৫৯

²⁴² তারিখঃ ১৩/৫/১৪১৭ হিজরী, ফাতাওয়া ও চিঠিপত্র, শাইখ সালেহ বিন ফাওয়ান (রহঃ), সউদী আরব এবং দাওয়াত ও ইলমের ব্যাপারে তিনটি বক্তব্য-শায়েখ ফাওয়ান

জামা'য়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর নির্দেশে মাওলানা যাকারিয়াহ্ ফাযায়েলে তাবলীগ বইটি লেখেন। ঐ বইয়ের ভূমিকায় তিনি বলেন, ইসলামী মুজাদ্দিদের এক উজ্জ্বল রত্ন এবং উলামা ও মাশায়েখদের এক চাকচিক্যময় মুক্তার নির্দেশ যে, তাবলীগে দ্বীনের প্রয়োজন সংক্ষিপ্তভাবে কতিপয় আয়াত ও হাদীস লিখে পেশ করি। আমার মত গুনাহগারের জন্য এরূপ ব্যক্তিদের সম্ভূষ্টিই নাজাতের ওয়াসিলা বইটি পেশ করলাম। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন, আপনি বলুন! আমার ছালাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। অর্থাৎ আল্লাহর সম্ভূষ্টির জন্য (আন'আম ১৬২)। এবার বুঝুন আল্লাহর সম্ভূষ্টি বাদ দিয়ে মাওলানা যাকারিয়াহ্ ইলিয়াস সাহেবের সম্ভূষ্টির অর্জন করতে চাইছে।

চিল্লা প্রথাঃ চল্লিশ দিনের জন্য নিজস্ব খরচে তাবলীগে বের হওয়াকে 'চিল্লা' বলে। চিল্লা হলো তাবলীগীদের ভিত্তিমূলক রুকন। যে ব্যক্তি চিল্লায় বের হয়, তাকে তারা মহব্বত করে, সম্মান করে ও তার অপরাধসমূহ ক্ষমা করে। আর যারা বিরোধিতা করে তারা তাকে গ্রহণ করে না যদিও সে ইসলামের ফরয-ওয়াজিব সমূহ পালন করে। প্রচলিত তাবলীগের চিল্লা প্রথাকে শরীয়ত সিদ্ধ প্রমাণ করার জন্য তারা সূরা আলু ইমরানের ১১০ নং আয়াতে বর্ণিত (أُخْرِجْتَ لِلنَّاسِ) এর অপব্যাখ্যা করে এটাকে চিল্লার পক্ষে কুরআনী নির্দেশ বলতে চেয়েছেন যা ইসলাম শরীয়ত সম্মত নয়।²⁴³

অতএব, এসব বিদ'আতী চিল্লা প্রথা থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে এবং কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা

²⁴³ হাদীসের প্রামাণিকতা - মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, পৃষ্ঠা নং - ৬৭-৬৮।

আমাদের আমলকে সমৃদ্ধ করতে পারি। আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুন, আমীন।

বিশ্ব ইজতেমা প্রসঙ্গঃ ‘ইজতেমা’ শব্দের অর্থ সমাবেশ করা, সভা-সমাবেশ বা সম্মেলন। ধর্মীয় কোন কাজের জন্য বহুসংখ্যক মানুষকে একত্র করা, কাজের গুরুত্ব বোঝানো, কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া এবং ব্যাপকভাবে এর প্রচার-প্রসারের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা ইত্যাদি বিষয়কে ইসলামের পরিভাষায় ইজতেমা বলা হয়। তাবলীগ জামা‘আতের বড় সম্মেলন হচ্ছে ‘বিশ্ব ইজতেমা’। ১৯৪৪ সালে প্রথম বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার কাকরাইল মসজিদে। ১৯৪৮ সালে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামের হাজি ক্যাম্প এবং ১৯৫০ সালে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে। ১৯৬৫ সালে টঙ্গীর পাগার নামক স্থানে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছিল খুব ছোট পরিসরে। এরই মধ্যে তাবলীগের কার্যক্রম বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে, শহর-বন্দরে, ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ইজতেমায় দেশি-বিদেশী বহু মানুষের উপস্থিতি বেড়ে যায়। ১৯৬৭ সালে টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে বিশ্ব ইজতেমার স্থান নির্ধারণ করা হয়। তখন থেকেই বিশ্ব ইজতেমা সর্ববৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশের পরিণত হয়! ১৯৭২ সালে সরকার টঙ্গীর ইজতেমাস্থলের জন্য সরকারী জমি প্রদান করেন এবং তখন থেকে বিশ্ব ইজতেমার পরিধি আরো বড় হয়ে উঠে। ১৯৯৬ সালে তৎকালীন সরকার এ জায়গায় ১৬০ একর জমি স্থায়ীভাবে ইজতেমার জন্য বরাদ্দ দেয় এবং অবকাঠামোগত কিছু উন্নয়ন ঘটায়। উক্ত ইজতেমার বিশেষ আকর্ষণ হল এই আখেরী মুনাজাত! মানুষ এখন ফরয ছালাত আদায়ের চাইতে আখেরী মুনাজাতে যোগদান করাকেই অধিক গুরুত্ব দেয়।

আখেরী মুনাজাতে শরীক হবার জন্য নামাজী, বে-নামাজী, ঘুষখোর, সন্তাসী, বিদ'আতী, দুস্কৃতিকারী দলে দলে ময়দানের দিকে ধাবিত হয়। কেউ ট্রেনের ছাদে, কেউ বাসের হ্যান্ডেল ধরে, নৌকা, পিকআপ প্রভৃতির মাধ্যমে ইজতেমায় যোগদান করে। তারা মনে করে সকল প্রাপ্তির সেই ময়দান বুঝি টঙ্গির তুরাগ নদীর পাড়ে। মানুষ পায়খানা-পেসাব পরিষ্কার করেও সেখানে ছওয়াবের আশায় থাকেন। এ যেন সওয়াবের ছড়া ছড়ি, যে যতো কুড়ায়ে থলে ভরতে পারবে তার ততোই লাভ। ট্রেনের ছাদের উপর মানুষের ঢল দেখে টিভিতে সাংবাদিক ভাইবোনগণ মাথায় কাপড় দিয়ে বার বার বলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ আজ তাদের পাপের প্রাপ্তি করতে ছুটে চলছেন তুরাগের পাড়ে! পরের দিন বড় হেডিং দেখে যারা এবার যেতে পারেননি তারা মনে মনে ওয়াদা করে বসবেন যে আগামীতে যেতেই হবে। তা না হলে পাপীদের তালিকায় নাম থেকেই যাবে! এভাবে পঙ্গোপালের মতো এদের বাহিনী বড়তে থাকবে। এদের আর রুখা যাবে না। কেননা স্বয়ং রাষ্ট্রপতি বঙ্গভবনে, প্রধানমন্ত্রী গণভবনে, বিরোধীদলীয় নেত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীগণও সেখানে গিয়ে আঁচল পেতে প্রার্থনা করেন। টিভিতে সরাসরি মুনাজাত সম্প্রচার করা হয়। রেডিও শুনে রাস্তার ট্রাফিকগণও হাত তুলে আমিন! আমিন! বলতে থাকে। কি সর্বনাশা বিদ'আত আমাদের কুড়ে কুড়ে গ্রাস করছে তা আমরাও জানি না! আরাফার মাঠে হজ্জ এর সময় লক্ষ লক্ষ লোক সমাগম হয়। সেখানে কেন সম্মিলিত মুনাজাত হয় না? যেখানে আল্লাহ নিজে হাযির হতে বলেছেন, যেখানে তিনি অগণিত মানুষকে ক্ষমা করে দেন। এই প্রশ্নের জবাব যারা বুঝতে চেষ্টা করেছে তারাই বুঝতে পারবে কেন বিশ্ব ইজতেমা বিদ'আত? সম্মিলিত মুনাজাত এর কারণেই বিশ্ব ইজতেমা বিদ'আত। যদি আখেরী মুনাজাত না হত তবে অন্তত বলা

যেত ইসলামিক আলোচনার জন্য বিশ্ব ইজতেমা। তাছাড়া এই ইজতেমা বিদ‘আতী কিতাব থেকে বয়ান করা হয়। অনেকে আবার এই ইজতেমাকে ২য় হজ্জ বলে উল্লেখ করেন! (নাউযুবিল্লাহ)। (তথ্যসূত্রঃ তাবলীগ জামায়াত ও বিশ্ব ইজতেমা - একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ - আকরাম হোসাইন)²⁴⁴।

এমনকি ‘চ্যানেল আই’ সহ অন্যান্য গণমাধ্যমগুলোতেও এটিকে হজ্জের সাথে তুলনা করেছে! আল্লাহ তা‘আলা কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোথাও ২য় হজ্জ করতে বলেন নি। এমন কাজ সওয়াবের আশায় করলে আল্লাহর দেয়া নির্ধারিত বিধানের সীমালঙ্ঘন করা হবে। আর আল্লাহর দেয়া সীমালঙ্ঘন করলে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়ে আল্লাহর সীমালঙ্ঘন করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে ঢুকাবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি (সূরা নিসা, আয়াত নং - ১৪)।²⁴⁵

ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান ও প্রচার করার লক্ষ্যে যেকোন মাহফিল বা ইজতেমার আয়োজন করা ও সেখানে যোগদান করা যায়। কিন্তু যদি ইসলামের নামে জাল, যঈফ ও বানোয়াট হাদীসের এবং ভিত্তিহীন ফাযায়েল ও কেচ্ছা-কাহিনী শোনার দাওয়াত দেয়া হয়, বিদ‘আতী আক্বীদা ও আমল প্রচার করা হয়, তাহলে সেখানে যোগদান করা যাবে না। চাই সেটা বিশ্ব ইজতেমা হোক বা অন্য কোন ইজতেমা হোক। কারণ বিদ‘আতীদের সঙ্গ দিতে নিষেধ করা হয়েছে। বিদ‘আতী লোকেরা ক্রিয়ামতের দিন হাউয

²⁴⁴ তাবলীগ জামায়াত ও বিশ্ব ইজতেমা - একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ - আকরাম হোসাইন

²⁴⁵ সূরা নিসা, আয়াত নং - ১৪

কাওছারের পানি পান করতে পারবে না। (তথ্যসূত্রঃ মুসলিম, হা/৪২৪৩)।²⁴⁶

অতএব, মুসলিম সমাজে ক্রমশঃ আল্লাহ প্রদত্ত পবিত্র কুরআন ও সুন্নাতে নববীর নির্ধারিত দ্বীনের পরিবর্তে কিছু মনগড়া নবাবিস্কৃত আদর্শ ও নীতি অনুপ্রবেশ করেছে। ফলশ্রুতিতে আমরা প্রকৃত ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আমাদের মধ্যে তাওহীদ ও সুন্নাহর পরিবর্তে শিরক বিদ'আতের প্রাদুর্ভাব ঘটছে। তাবলীগপন্থীদের টুপি, পাগরী, লম্বা পোশাকের বাহ্যিক রূপ দেখে অনেকে মনে করেন এরাই সঠিক পথে আছে। বহু মসজিদে তাদেরকে দেখতে পাবেন, 'বাকি নামাজ বাদ ঈমান ও আমলের কথা হবে আমরা সবাই বসি বহুত ফায়দা হবে'।

আসলে প্রকৃতপক্ষেই এসব শিরক-বিদ'আতীদের মজলিসে আপনি বসলে ঈমান ও আমলে ফায়দা তো দূরের কথা বরং ঈমান ও আমল দু'টিই হারাবেন। তাই আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের ফরিয়াদ হচ্ছেঃ হে আল্লাহ আমাদেরকে প্রচলিত তাবলীগী বিদ'আতী প্রথা থেকে হেফাযত করুন এবং সঠিক কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতে পারি এবং দ্বীনের খেদমত করতে পারি সেই তৌফিক দান করুন, আমীন।

(২০) মৃত ব্যক্তির কাফা বা ছুটে যাওয়া নামাজ সমূহের কাফফারা আদায় করাঃ সহীহ হাদীসে অনাদায়ী নামাজের জন্য কোন কাফ ফারার বিধান নেই। অথচ আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তির কিছু ওয়াক্ত বা

²⁴⁶ মুসলিম, হা/৪২৪৩।

কিছুদিনের জন্য নামাজ কাযা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ঐ ব্যক্তির পাপ মুক্তির জন্য ইমাম সাহেব মৃত ব্যক্তির ওয়ারিগণের উপর একটা টাকার পরিমাণ ধরে যা শরীয়ত অনুযায়ী ঠিক নয় এবং প্রচলিত নিয়ম বিদ'আত ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এসব বিদ'আত পরিত্যাজ্য।

তাছাড়া শুধু মৃত মানুষের ক্ষেত্রেই নয় জীবিত মানুষের মধ্যেও নামাজের বিষয়ে প্রচুর বিদ'আত পরিলক্ষিত হয়। তাই এ ক্ষেত্রে বলা যায় যে, ছুটে যাওয়া কাযা নামায সমূহ প্রথমে আদায় করবে। তারপর বর্তমান সময়ের নামায আদায় করবে। দেরী করা ঠিক হবে না।

মানুষের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত বিদ'আতী প্রথা আছে যে, কারো যদি একাধিক ফরয নামায ছুটে গিয়ে থাকে, তবে ঐ নামাযের সময় উপস্থিত হলে তার কাযা আদায় করবে। আজ কারো ফজর নামায ছুটে গেছে। সে উক্ত নামায পরবর্তী দিন ফজরের সময়ে কাযা আদায় করবে। এটা মারাত্মক ভুল এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী ও কর্মের বিরোধী। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণীঃ

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

“যে ব্যক্তি ছালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা ভুলে যায়, সে যেন ইহা আদায় করে যখনই স্মরণ হবে।” এখানে এরূপ বলা হয়নি, দ্বিতীয় দিন উহা আদায় করে নিবে।

খন্দক যুদ্ধের সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কয়েকটি নামায ছুটে যায়। তখন তিনি বর্তমান সময়ের নামাযের আগেই উক্ত নামাযগুলোর কাযা আদায় করেন।

অতএব ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা প্রথমে আদায় করবে তারপর বর্তমান সময়ের নামায আদায় করবে। কিন্তু যদি ভুলক্রমে বা অজ্ঞতা বশতঃ কাযা নামাযের আগে বর্তমান সময়ের নামায আদায় করে ফেলে তবে তা বিশুদ্ধ হবে। কেননা এটা তার ওযর।

উল্লেখ্য যে, কাযা নামায সমূহ তিন ভাগে বিভক্তঃ

প্রথম প্রকারঃ দেরী করার ওযর দূর হয়ে গেলেই কাযা আদায় করে নিবে। তা হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ক্ষেত্রে। অনুরূপভাবে বিতর ও সুন্নাত নামায সমূহ।

দ্বিতীয় প্রকারঃ যার পরিবর্তে অন্য নামায কাযা হিসেবে আদায় করবে। তা হচ্ছে, জুমআর নামায। এ নামায ছুটে গেলে তার পরিবর্তে যোহর নামায আদায় করবে। কেউ যদি জুমআর দিন ইমামের দ্বিতীয় রাকাআতের রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর নামাযে शामिल হয়, তবে সে যোহর নামায আদায় করবে। ঐ অবস্থায় যোহরের নিয়ত করে ইমামের সাথে নামাযে शामिल হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি ইমামের সালামের পর আসে তবে সেও যোহর পড়বে। তবে কেউ যদি দ্বিতীয় রাকাআতে ইমামের সাথে রুকু পায়, তবে সে জুমআর নামাযই আদায় করবে। অর্থাৎ ইমাম সালাম ফিরালে এক

রাকাত আদায় করবে। অনেক লোক ইমামের দ্বিতীয় রাকাতের রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর জুমআর নামাযে शामिल হয়। অতঃপর সালাম শেষে জুমআর নামায হিসেবে দু'রাকাত নামায আদায় করে। এটা ভুল। বরং তার জন্য উচিত হচ্ছে ইমামের সালাম ফেরানোর পর যোহর হিসেবে চার রাকাত নামায আদায় করা। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ

“যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকাত পেয়ে গেল, সে পূর্ণ সালাত পেয়ে গেল।” এদ্বারা বুঝা যায় কেউ যদি এর কম পায় সে নামায পেল না। তখন জুমআর কাযা আদায় করবে যোহর নামায আদায় করার মাধ্যমে। এই কারণে নারীরা বাড়িতে, মসজিদে আসতে অপারগ অসুস্থ ব্যক্তির যোহর নামায আদায় করবে। তারা জুমআ আদায় করবে না। তারা যদি জুমআ আদায়ও করে, তাদের নামায প্রত্যাখ্যাত হবে- বাতিল বলে গণ্য হবে।

তৃতীয় প্রকারঃ এমন নামায যা ছুটে যাওয়া সময়েই কাযা আদায় করতে হবে। আর তা হচ্ছে ঈদের নামায। ঈদের দিন সম্পর্কে জানা গেল না। কিন্তু সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়া পর জানা গেল যে আজকে ঈদের দিন ছিল।

এক্ষেত্রে বিদ্বানগণ বলেন, পরবর্তী দিন সকাল বেলা উক্ত ঈদের নামাযের কাযা আদায় করতে হবে। কেননা ঈদের নামায আদায় করার সময় হচ্ছে

সকাল বেলা। [তথ্যসূত্রঃ গ্রন্থের নামঃ ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, বিভাগের নামঃ ঈমান, লেখকের নামঃ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ), অনুবাদ করেছেনঃ আবদুল্লাহ শাহেদ আল মাদানি - আবদুল্লাহ আল কাফী]²⁴⁷

(২১) জামাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়া সুন্নাহ বিরোধী কাজ তথা প্রচলিত বিদ'আতঃ

(এক) জেহরী ও সেরী কোন সালাতেই ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া যাবে না। দলীল হিসাবে নিম্নের আয়াত ও কিছু হাদীস পেশ করা হয়।

(ক) আল্লাহ বলেন, **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ**, ‘আর যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক। তোমাদের উপর রহম করা হবে’ (আ‘রাফ ২০৪)। আরো বলা হয় যে, সালাতে কুরআন পাঠ করার বিরুদ্ধেই উক্ত আয়াত নাযিল হয়।

পর্যালোচনাঃ মূলতঃ উক্ত আয়াতে তাদের কোন দলীল নেই। বরং তারা অপব্যখ্যা করে এর হুকুম লংঘন করে থাকে। কারণ কুরআন পাঠ করার সময় চুপ থেকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলা হয়েছে। কিন্তু যোহর ও

²⁴⁷ গ্রন্থের নামঃ ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, বিভাগের নামঃ ঈমান, লেখকের নামঃ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ), অনুবাদ করেছেনঃ আবদুল্লাহ শাহেদ আল মাদানি - আবদুল্লাহ আল কাফী।

আছরের ছালাতে এবং মাগরিবের শেষ রাক‘আতে ও এশার শেষ দুই রাক‘আতে ইমাম কুরআন পাঠ করেন না। অথচ তখনও তারা সূরা ফাতিহা পাঠ করে না।

দ্বিতীয়তঃ সূরা ফাতিহা উক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই উক্ত আয়াতের আমল বিদ্যমান। কারণ সূরা ফাতিহার পর ইমাম যা-ই তেলাওয়াত করুন মুক্তাদী তার সাথে পাঠ করে না, যদি ইমাম ছোট কোন সূরাও পাঠ করেন। বরং মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে থাকে। তাছাড়া উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর। আর তিনিই সূরা ফাতিহাকে এর হুকুম থেকে পৃথক করেছেন এবং চুপে চুপে পাঠ করতে বলেছেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৪১, তাহক্বীক আলবানী, সনদ ছহীহ লিগায়রিহী; মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/২৮০৫। মুহাক্কিক হুসাইন সালীম আসাদ বলেন, এর সনদ জাইয়িদ) আর এটা আল্লাহর নির্দেশেই হয়েছে। (নাজম ৩-৪; আবুদাউদ হা/১৪৫)। উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতের হুকুম ব্যাপক। সর্বাবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। (মির‘আতুল মাফাতীহ ৩/১২৫ পৃঃ)। তাছাড়া আল্লাহ তা‘আলাও সূরা ফাতিহাকে কুরআন থেকে পৃথক করে উল্লেখ করেছেন। রাসূল (সাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, **وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنْ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ** ‘আমি আপনাকে মাছানী থেকে সাতটি আয়াত এবং মহান গ্রন্থ আল-কুরআন দান করেছি’ (সূরা হিজর ৮৭)।

সুতরাং সূরা ফাতিহা ও কুরআন পৃথক বিষয়। যেমন ভূমিকা মূল গ্রন্থ থেকে পৃথক। এটি কুরআনের ভূমিকা। ভূমিকা যেমন একটি গ্রন্থের অধ্যায় হতে

পারে কিন্তু মূল অংশের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তেমনি সূরা ফাতিহা কুরআনের ভূমিকা। আর ‘ফাতিহা’ অর্থও ভূমিকা।

অতএব ক্বিরাআত বলতে সূরা ফাতিহা নয়। যেমন ইমাম বুখারী (রহঃ) পরিস্কারভাবে দাবী করেছেন। (তথ্যসূত্রঃ সহীহুল বুখারী, আল-ক্বিরাআতু খালফাল ইমাম, পৃঃ ২০) অনুরূপ ইবনুল মুনযিরও বলেছেন। ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত ৪/২২৪ পৃঃ হা/১২৭১-এর আলোচনা দ্রঃ-)

(খ) যোহর ও আছরের ছালাতে সূরা ফাতিহা না পড়ার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলা হয়, ইমামের আগেই যদি মুক্তাদীর ক্বিরাআত পড়া হয়ে যায়, তাহলে ইমামের অনুসরণ করা হবে না। তাছাড়া মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে’ বইয়ে কোন প্রমাণ ছাড়াই জোরপূর্বক লেখা হয়েছে, **فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا** ‘শব্দ দুটি সুস্পষ্টভাবে একথার প্রমাণ করে যে, যদি ইমাম উচ্চ আওয়াজে ক্বিরাত পড়ে তাহলে মুক্তাদীর কর্তব্য হচ্ছে, সে মনোযোগের সাথে উক্ত ক্বিরাত শ্রবণ করবে। আর [দ্বিতীয় শব্দটি অর্থাৎ **وَأَنْصِتُوا** (নীরব থাকবে) বলার দ্বারা প্রমাণিত হয়], যদি ইমাম নিম্ন আওয়াজেও ক্বিরাত পড়ে তাহলেও মুক্তাগীন (মুক্তাদীগণ) নীরবই থাকবে, কিছুই পড়বে না’। (ঐ, পৃঃ ২৬০-২৬১)।

পর্যালোচনাঃ সুধী পাঠক! পবিত্র কুরআনের আয়াতটির কিভাবে উদ্ভট ব্যাখ্যা দেয়া হল তা কি লক্ষ্য করেছেন? মনে হল, আয়াতটা লেখকের উপরই নাযিল হয়েছে। তা না হলে এভাবে কেউ ব্যাখ্য দিতে পারেন? যেখানে শর্ত করা হয়েছে, কুরআন যখন তেলাওয়াত করা হবে তখন মনোযোগ দিয়ে

শুনতে হবে এবং চুপ থাকতে হবে। এর মধ্যে কিভাবে যোহর ও আছর ছালাত অন্তর্ভুক্ত হল?

মূল কারণ হল, এই অপব্যখ্যা ছাড়া তাদের জন্য অন্য কোন উপায় নেই। অথচ যোহর ও আছর ছালাতে মুক্তাদীরা সূরা ফাতিহা তো পড়বেই তার সাথে অন্য সূরাও পড়তে পারে। উক্ত মর্মে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা যোহর ও আছর ছালাতে প্রথম দুই রাক'আতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করতাম। আর পরের দুই রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতাম। (ইবনু মাজাহ হা/৮৪৩, পৃঃ ৬১; সনদ সহীহ, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৫০৬)²⁴⁸।

ইমামের অনুসরণের যে দাবী করা হয়েছে, তাও অযৌক্তিক। কারণ রুকু, সিজদা, তাশাহুদ, দরুদ, দু'আ মাছুরাহ সবই ইমাম-মুক্তাদী উভয়ে প্রত্যেক সালাতে পড়ে থাকে। সে ব্যাপারে কখনো প্রশ্ন আসে না যে, ইমাম আগে পড়লেন, না মুক্তাদী আগে পড়লেন। সমস্যা শুধু সূরা ফাতিহার ক্ষেত্রে। আরো দুঃখজনক হল, ফজর, মাগরিব কিংবা এশার সালাতের ক্বিরাআত চলাকালীন একজন মুক্তাদী সালাতে শরীক হয়ে প্রথমে নিয়ত বলে, তারপর

²⁴⁸ ইবনু মাজাহ হা/৮৪৩, পৃঃ ৬১; সনদ সহীহ, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৫০৬

জায়নামাযের দু‘আ পড়ে অতঃপর তাকবীর দিয়ে ছানা পড়ে থাকে। অথচ সূরা ফাতিহা পাঠ করে না। তাহলে সূরা ফাতিহা কী অপরাধ করল? ক্বিরাআত অবস্থায় যদি সূরা ফাতিহা না পড়া যায় তাহলে উদ্ভট নিয়ত, জায়নামাযের ভিত্তিহীন দু‘আ ও ছানা পড়ার দলীল কোথায় পাওয়া গেল?

অতএব যারা কোন ছালাতেই, কোন রাক‘আতেই সূরা ফাতিহা পড়া জায়েয মনে করে না, তাদের জন্য উক্ত আয়াতে কোন দলীল নেই। তাদের দাবী কল্পনাপ্রসূত, উদ্ভট, মনগড়া ও অযৌক্তিক।

(২২) জোরে আমীন না বলা সুন্নাহ বিরোধী কাজ তথা বিদ‘আতঃ প্রচলিত মাযহাব যেহেতু বিদ‘আত। তাই প্রচলিত মাযহাবে আমিন জোরে বলা যাবে না। শুধু তাই নয়, সহীহ হাদীস সংকলন গ্রন্থগুলোতে স্পষ্ট প্রমান আছে যে, সালাতে ইমাম সাহেব সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর জোরে ‘আমীন’ বলবেন এবং মুক্তাদীগনও সশব্দে ‘আমীন’ বলবেন। কেননা রাসূল (সাঃ) এর জামানায় জামাতে সালাত আদায় করার সময় ‘আমীন’ বলার সাথে সাথে মসজিদ কেঁপে উঠত এবং এর সহীহ হাদীস গ্রন্থগুলোতে স্পষ্ট অসংখ্য দলীল আছে। তারপরেও আমাদের দেশের মসজিদগুলোতে বিদ‘আতী তরীকায় আমীন জোরে বলার কোন প্রবনতা পরিলক্ষিত হয় না। তাই স্পষ্টতই প্রমানিত হয় যে, জোরে ‘আমীন’ না বলা সুন্নাহ বিরোধী কাজ তথা বিদ‘আত। কেন সালাত জোরে ‘আমীন’ বলতে হবে তার সহীহ হাদীসগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ-

০১। আতা (রহঃ) বলেন, আমীন হল দু‘আ। তিনি আরো বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) ও তার পিছনের মুসল্লীগণ এমনভাবে আমীন বলতেন

যে মসজিদে গুমগুম আওয়াজ হতো। আবু হুরায়রা (রাঃ) ইমামকে ডেকে বলতেন, আমাকে আমীন বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন না।

নাফি (রাঃ) বলেন, ইবনু উমার (রাঃ) কখনই আমীন বলা ছাড়তেন না এবং তিনি তাদের (আমীন বলার জন্য) উৎসাহিত করতেন। আমি তাঁর কাছ থেকে এ সম্পর্কে হাদীস শুনেছি। (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, অনুচ্ছেদ - ৫০২, পৃষ্ঠা নং ১২০৩১২১, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)²⁴⁹।

০২। আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ (রঃ)--- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " آمِينَ "

ইমাম যখন আমীন বলেন, তখন তোমরাও আমীন বলো। কেননা, যার আমীন (বলা) ফিরিশতাদের আমীন (বলা) এক হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও আমীন বলতেন। (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, হাদীস নং ৭৪৪, পৃষ্ঠা নং ১২১ প্রকাশনী - ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)²⁵⁰।

²⁴⁹ সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, অনুচ্ছেদ - ৫০২, পৃষ্ঠা নং ১২০৩১২১, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ

²⁵⁰ সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, হাদীস নং ৭৪৪, পৃষ্ঠা নং ১২১ প্রকাশনী - ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ

০৩। আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ (রহঃ) — আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ. وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ. فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ (সালাতে) আমীন বলে, আর আসমানের ফিরিস্তাগণ আমীন বলেন এবং উভয়ের আমীন একই সময়ে হলে তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, হাদীস নং ৭৪৫, পৃষ্ঠা নং ১২১ প্রকাশনী - ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ। এ সংক্রান্ত আরো দেখুন ৭৪৬ নং হাদীস)²⁵¹।

০৪। ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) — আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন ইমাম আমীন বলবেন, তখন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা যে, ব্যক্তি ফিরিশতাদের আমীন বলার সাথে একই সময় আমীন বলবে। তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যাবে। ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও আমীন বলতেন। (সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭৯৮, পৃষ্ঠা নং ১৬০ ও ১৬১, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)²⁵²।

²⁵¹ সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭৯৮, পৃষ্ঠা নং ১৬০ ও ১৬১, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ

²⁵² সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭৯৮, পৃষ্ঠা নং ১৬০ ও ১৬১, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ

০৫। কুতায়বা ইবনু সাঈদ (রহঃ) — আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলছেন, ইমাম যখন গাইরিল মাগ— ওয়ালাদোয়াল্লীন বলবেন, তার পিছনের ব্যক্তি মুক্তাদি আমীন বলবে এবং তার বাক্য আকাশবাসীর (ফিরিশতা) বাক্যের অনুরূপ একই সময়ে উচ্চারিত হবে, তখন তার পূর্ববর্তী সমুদয় পাপ মোচন হয়ে যাবে। (তথ্যসূত্রঃ সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৮০৩, পৃষ্ঠা নং ১৬২, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ। এ সংক্রান্ত আরো দেখুন ৭৯৯ - ৮০২ নং হাদীস)²⁵³।

০৬। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ইমাম যখন আমীন বলে, তোমরাও তখন আমীন বলো। কেননা, যার আমীন বলা ফিরিশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। ইবনু শিহাব (রঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও আমীন বলতেন। (তথ্যসূত্রঃ সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৮১০, পৃষ্ঠা নং ১৭৮, প্রকাশনী- ইসলামিক সেন্টার বাংলাদেশ। এ সংক্রান্ত আরো দেখুন ৮১১-৮১৫ নং হাদীস)²⁵⁴।

০৭। মুহাম্মদ ইবনু কাছীর (রহঃ) — ওয়াইল ইবনু হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ حُجْرِ أَبِي الْعَبَّاسِ
الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
آمَنَ " . وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ " قَرَأَ { وَلَا الضَّالِّينَ } قَالَ

²⁵³ সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৮০৩, পৃষ্ঠা নং ১৬২, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ। এ

সংক্রান্ত আরো দেখুন ৭৯৯ - ৮০২ নং হাদীস

²⁵⁴ সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৮১০, পৃষ্ঠা নং ১৭৮, প্রকাশনী- ইসলামিক সেন্টার বাংলাদেশ। এ

সংক্রান্ত আরো দেখুন ৮১১-৮১৫ নং হাদীস)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওয়ালাদোয়াল্লীন পাঠ করার পর জোরে ‘আমীন বলতেন’। (আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৩২, পৃষ্ঠা নং ৩৬, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)²⁵⁵।

০৮। মাখলাদ ইবনু খালিদ (রাঃ) ওয়াইল ইবনু হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنَبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَهَرَ بِأَمِينٍ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى
رَأَيْتُ بَيَاضَ خَدِّهِ .

একদা তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিছনে সালাত আদায় করা কালে তিনি উচ্চস্বরে আমীন বলেন এবং (সালাত শেষে) ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরান এভাবে যে, – আমি তাঁর গন্ডদেশের সাদা অংশ পরিস্কারভাবে দেখি। (তথ্যসূত্রঃ আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৩৩, পৃষ্ঠা নং ৩৬, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)²⁵⁶।

০৯। নাসর ইবনু আলী (রাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) এর চাচাত ভাই আবু আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلَا { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } قَالَ " آمِينَ " .
حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ .

²⁵⁵ আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৩২, পৃষ্ঠা নং ৩৬, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ

²⁵⁶ আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৩৩, পৃষ্ঠা নং ৩৬, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম “গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদোয়াল্লীন” পাঠের পরে এমন জোরে আমীন বলতেন যে প্রথম কাতারে তাঁর নিকটবর্তী লোকেরা তা শুনতে পেত। (তথ্যসূত্রঃ আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৩৪, পৃষ্ঠা নং ৩৭, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)²⁵⁷।

১০। আল কানাবী (রঃ) — আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا قَالَ الْإِمَامُ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } فَقُولُوا " آمِينَ " . فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "

যখন ইমাম আমীন বলবে, তখন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা যে ব্যক্তির আমীন শব্দ ফিরিশতাদের আমীন শব্দের সাথে মিলবে, তার পূর্ব জীবনের সমস্ত গুনাহ মার্জিত হবে। ইবনু শিহাব (রঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও আমীন বলতেন। (তথ্যসূত্রঃ আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৩৬, পৃষ্ঠা নং ৩৮, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)²⁵⁸।

১১। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলছেন, যখন ইমাম আমীন বলেন, তখন তোমরাও আমীন বল। কেননা যার আমীন ফিরিশতাদের আমীন এর সাথে একত্রে উচ্চারিত হয় তার পূর্বের গুনাহ

²⁵⁷ আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৩৪, পৃষ্ঠা নং ৩৭, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ

²⁵⁸ আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৩৬, পৃষ্ঠা নং ৩৮, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ

মাফ করা হয়। (তথ্যসূত্রঃ মুয়াত্তা মালিক ১ম খণ্ড, পরিচ্ছেদ নং ১১, পৃষ্ঠা নং ১৪০, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)²⁵⁹।

১২। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলছেন, যখন ইমাম ‘গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদোয়াল্লীন’ বলবে তখন তোমরা আমীন বল। যাহার বাক্য ফিরিশতাদের (আমীন) বাক্যের সাথে মিলে যাবে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করা হবে। (তথ্যসূত্রঃ মুয়াত্তা মালিক ১ম খণ্ড, পরিচ্ছেদ নং ১১, রেওয়াত নং - ৪৫, পৃষ্ঠা নং ১৪০, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)²⁶⁰।

১৩। আমর ইবনু উসমান (রঃ)—আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যখন তিলাওয়াতকারী আমীন বলে, তখন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা, ফিরিশতাগনও আমীন বলে থাকেন। অতএব, যার আমীন বলা ফিরিশতার আমীন বলার মত হবে, আল্লাহপাক তার পূর্বের পাপ মার্জনা করবেন। (তথ্যসূত্রঃ সুনানু ইবনু নাসাই, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯২৮, পৃষ্ঠা নং ৫৬, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)²⁶¹।

১৪। মুহাম্মদ ইবনু মানসুর (রঃ) — আবু হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নাবী (সাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তিলাওয়াতকারী (ইমাম) আমীন বলে, তখন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা, ফিরিশতাগনও আমীন বলে থাকেন। অতএব, যার আমীন বলা ফিরিশতার আমীন বলার মত

²⁵⁹ মুয়াত্তা মালিক ১ম খণ্ড, পরিচ্ছেদ নং ১১, পৃষ্ঠা নং ১৪০, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ

²⁶⁰ মুয়াত্তা মালিক ১ম খণ্ড, পরিচ্ছেদ নং ১১, রেওয়াত নং - ৪৫, পৃষ্ঠা নং ১৪০, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ

²⁶¹ সুনানু ইবনু নাসাই, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯২৮, পৃষ্ঠা নং ৫৬, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ

হবে,আল্লাহপাক তার পূর্বের পাপ মার্জনা করবেন। (তথ্যসূত্রঃ সুনানু ইবনু নাসাই, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯২৯, পৃষ্ঠা নং ৫৬, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)²⁶²।

১৫। ইসমাইল ইবনু মাসুদ (রাঃ) — আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলছেন, যখন ইমাম ‘গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদোয়াল্লীন’ বলবে তখন তোমরা আমীন বল। কেননা, ফিরিশতাগণ আমীন বলে থাকেন। ইমামও আমীন বলে থাকেন, যার আমীন বলা ফিরিশতার আমীন বলার মত হবে, আল্লাহপাক তার পূর্বের পাপ ক্ষমা করে দেবেন। (সুনানু ইবনু নাসাই, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৩০, পৃষ্ঠা নং ৫৬, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)²⁶³।

১৬। আবু বকর ইবনু আবু শায়বা ও হিসাম ইবনু আম্মার (রহঃ) — আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলছেন, যখন ক্বারী (ইমাম) আমীন বলে, তখন তোমরা আমীন বলবে। কেননা, ফিরিশতাগণ আমীন বলে থাকেন। আর যার আমীন বলা, ফিরিশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যায় তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (সুনানু ইবনু মাজাহ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৮৫১, পৃষ্ঠা নং ৩২৬, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)²⁶⁴।

১৭। বকর ইবনু খালফ ও জামীল ইবনু হাসান ও আহমদ ইবনু আমর ইবনু সারাহ মিসরী ও হাশিম ইবনু কাশিম হাররানী —আবু হুরায়রা (রাঃ)

²⁶² সুনানু ইবনু নাসাই, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯২৯, পৃষ্ঠা নং ৫৬, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ

²⁶³ সুনানু ইবনু নাসাই, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৩০, পৃষ্ঠা নং ৫৬, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ

²⁶⁴ সুনানু ইবনু মাজাহ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৮৫১, পৃষ্ঠা নং ৩২৬, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ

হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলছেনঃ যখন ইমাম আমীন বলে, তখন তোমরা আমীন বলবে। কেননা, যার আমীন ফিরিশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যায়, তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (তথ্যসূত্রঃ সুনানু ইবনু মাজাহ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৮৫২, পৃষ্ঠা নং ৩২৬, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)²⁶⁵।

১৮। মুহাম্মদ ইবনু বাশ্শার (রহঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِينَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَالَ " {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَيَرْتَجُّ بِهَا} . " الضَّالِّينَ " . قَالَ " آمِينَ الْمَسْجِدُ .

লোকেরা আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন গাইরিল—ওয়ালাদোয়াল্লীন বলতেন; তখন তিনি বলতেন আমীন। এমনকি প্রথম সারির লোকেরা তা শুনতে পেত এবং এতে মসজিদ গুঞ্জনিত হত। (সুনানু ইবনু মাজাহ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৮৫৩, পৃষ্ঠা নং ৩২৬, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)²⁶⁶।

১৯। ইসহাক ইবনু মানসুর (রহঃ) — আয়েশা (রাঃ) এর সূত্রে নাবী (সাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন -

²⁶⁵ সুনানু ইবনু মাজাহ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৮৫২, পৃষ্ঠা নং ৩২৬, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ

²⁶⁶ সুনানু ইবনু মাজাহ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৮৫৩, পৃষ্ঠা নং ৩২৬, প্রকাশনী- ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ

ইয়াহুদীরা তোমাদের কোন ব্যাপারে এত ঈর্ষান্বিত হয় না, যতটা না তারা তোমাদের সালাত ও আমীনের উপর ঈর্ষান্বিত হয়। (সুনানু ইবনু মাজাহ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৮৫৬, পৃষ্ঠা নং ৩২৭, প্রকাশনী - ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ)²⁶⁷।

২০। ইবনু ‘আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو مُسْهِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَبِيحِ الْمُرِّي، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، مَا "عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " حَسَدَتْكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى آمِينَ فَأَكْثَرُوا مِنْ قَوْلِ آمِينَ "

ইহুদীরা তোমাদের আমীন বলায় যত বেশি ঈর্ষান্বিত হয়, আর কোন জিনিসে তত ঈর্ষান্বিত হয় না। তাই তোমরা অধিক পরিমাণে আমীন বলো।

২১। আবু হুরাইরাহ (রাহঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ

²⁶⁷ সুনানু ইবনু মাজাহ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৮৫৬, পৃষ্ঠা নং ৩২৭, প্রকাশনী - ইসঃ ফাউঃ বাংলাদেশ

إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُوَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ "عليه وسلم - قَالَ
" تَأْمِينِ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "

যখন কুরআন পাঠকারী (ইমাম) ‘আমীন’ বলেন, তখন তোমরাও ‘আমীন’ বলো। কেননা ফেরেশতাগণও তখন আমীন বলেন অতএব যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে হয় তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করা হয়।

তাখরীজ কুতুবুত তিসআহ: বুখারী ৭৮০-৮২, ৪৪৭৫, ৬৪০২; মুসলিম ৪১০/১-৪, তিরমিযী ২৫০, নাসায়ী ৯২৫-৩০, আবু দাউদ ৯৩৫-৩৬, আহমাদ ৭১৪৭, ৭২০৩, ৭৬০৪, ২৭৩৩৮, ২৭২১৫, ৯৫১২, ৯৬০৫; মুওয়াত্তা মালিক ১৯৫-৯৭, দারিমী ১২৪৫-৪৬, মাজাহ ৮৫২, ৮৫৩।

তাহকীক আলবানীঃ সহীহ। তাখরীজ আলবানী: ইরওয়াহ ৩৪৪, সহীহ আবী দাউদ ৮৬৬। (তথ্যসূত্রঃ সুনানু ইবনে মাজাহ :: হাদীস ৮৫১। আবওয়াবু আকামাতিস -স্বলাত ওয়াস - সুন্নাত ফীহা অধ্যায়)²⁶⁸।

২৩। বুন্দার (রঃ) ওয়াইল ইবন হুজর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ،
قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنَبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ
حُجْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضَّالِّينَ) فَقَالَ " آمِينَ " . وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي
هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ
وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ

²⁶⁸ সুনানু ইবনে মাজাহ :: হাদীস ৮৫১। আবওয়াবু আকামাতিস -স্বলাত ওয়াস - সুন্নাত ফীহা অধ্যায় 372

بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّأْمِينِ وَلَا يُخْفِيهَا . وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ
وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ أَبِي
الْعَنْبَسِ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ : (
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) فَقَالَ " آمِينَ " . وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ .
قَالَ أَبُو عِيسَى وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ حَدِيثَ سُفْيَانَ أَصَحَّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ فِي
هَذَا وَأَخْطَأَ شُعْبَةُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ وَإِنَّمَا
هُوَ حُجْرُ بْنُ عَنبَسٍ وَيُكْنَى أَبَا السَّكَنِ . وَزَادَ فِيهِ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ وَلَيْسَ
فِيهِ عَنْ عُلْقَمَةَ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ حُجْرٍ بْنِ عَنبَسٍ عَنْ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ وَقَالَ وَخَفَضَ
بِهَا صَوْتَهُ وَإِنَّمَا هُوَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ
هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ حَدِيثَ سُفْيَانَ فِي هَذَا أَصَحَّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ . قَالَ وَرَوَى
الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ الْأَسَدِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ نَحْوَ رِوَايَةِ سُفْيَانَ

- কে (صلی اللہ علیہ وسلم) আমি রাসূল

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

..... পাঠের পর আমীন বলতে শুনেছি। এর তিনি দীর্ঘস্বরে তা পাঠ
করেছেন।

قَالَ فِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ
حَدِيثَ حَسَنٍ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّأْمِينِ وَلَا
يُخْفِيهَا وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلَمَةَ
بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ

{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}

فَقَالَ آمِينَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ حَدِيثَ
سُفْيَانَ أَصَحَّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ فِي هَذَا وَأَخْطَأَ شُعْبَةُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ

فَقَالَ عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ وَإِنَّمَا هُوَ حُجْرُ بْنُ عَنَبَسٍ وَيُكْنَى أَبَا السَّكَنِ وَزَادَ فِيهِ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ وائِلٍ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ عُلْقَمَةَ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنَبَسٍ عَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَقَالَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ وَإِنَّمَا هُوَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ حَدِيثُ سُفْيَانَ فِي هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ قَالَ وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ الْأَسَدِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ نَحْوَ رِوَايَةِ سُفْيَانَ

এই বিষয়ে আলী ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা তিরমিযী রহ. বলেনঃ ওয়াইল ইবন জুহর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ। একাধিক সাহাবী, তাবিঈ ও পরবর্তী যুগের আলিম এই মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন নীরবে না বলে আমীন উচ্চস্বরে পাঠ করতে হবে। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (রঃ) এর অভিমত এ-ই। (তথ্যসূত্রঃ সহিহ আত্ তিরমিজি :: সালাত অধ্যায়, অধ্যায় ২ :: হাদীস ২৪৮)²⁶⁹।

(২৩) টিলা কুলুখ নিয়ে হাঁটাহাঁটি সংক্রান্ত বিদ'আতঃ টিলা কুলুখ নিয়ে চল্লিশ কদম হাঁটা, কাশি দেওয়া, নাচানাচি করা, দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা, টয়লেটে কুলুখের আবর্জনার স্তুপ তৈরি করা সবই নব্য মূর্খতা। ইসলামে এরূপ বেহায়াপনার কোন স্থান নেই। মিথ্যা ফযীলতের ধোঁকা মানুষকে এত নীচে নামিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের পেশাবে অপবিত্রতার মাত্রা বেশী। (তথ্যসূত্রঃ আবুদাউদ হা/৩৭৬, ১/৫৪ পৃঃ; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫০২, পৃঃ ৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৮, ২/১২৫ পৃঃ, 'পবিত্র' অধ্যায়, 'অপবিত্রতা হতে পবিত্রকরণ' অনুচ্ছেদ - **يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرْسُ مِنْ**

²⁶⁹ সহিহ আত্ তিরমিজি :: সালাত অধ্যায়, অধ্যায় ২ :: হাদীস ২৪৮

بَوْلِ الْغُلَامِ ; বুখারী হা/২২২ ও ২২৩)²⁷⁰। অথচ তাদের ব্যাপারে এ ধরনের চরম ফতোয়া দেয়া হয় না।

অনুরূপভাবে একই ব্যক্তি যখন টয়লেট থেকে বের হয় তখন কিন্তু হাঁটাহাঁটি করে না, কুলুখও ধরে না। এগুলো তামাশা মাত্র। এই অভ্যাস ইসলামের বিশ্বজনীন মর্যাদাকে চরমভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে। ইসলাম সৌন্দর্য মন্ডিত জীবন বিধান। যাবতীয় নোংরামী এখানে নিষিদ্ধ। শরী‘আতে পেশাব থেকে সাবধানতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। তাই বলে এর নামে নতুন আরেকটি বিদ‘আত তৈরি করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। পেশাবের ছিটা কাপড়ে লেগে যাওয়ার আশংকায় ইসলাম তার জন্য সুন্দর বিধান দিয়েছে। আর তা হল, ওযু করার পর হাতে পানি নিয়ে লজ্জাস্থান বরাবর ছিটিয়ে দেওয়া। যেমন - মুহাম্মাদ হারুন কাছীর----সুফিয়ান ইব্নুল হাকাম আছ্ছাকাফী অথবা হাকাম ইব্ন সুফিয়ান আছ্ছাকাফী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - هُوَ الثَّوْرِيُّ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ، أَوْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَافَقَ سُفْيَانَ جَمَاعَةٌ عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْحَكَمُ أَوْ ابْنُ الْحَكَمِ

রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখনই পেশাব করতেন, তখন উযু করতেন এবং উযুর পানি ছিটাতেন। (তথ্যসূত্রঃ ছহীহ আবুদাউদ হা/১৬৬

²⁷⁰ আবুদাউদ হা/৩৭৬, ১/৫৪ পৃঃ; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫০২, পৃঃ ৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত

হা/৪৬৮, ২/১২৫ পৃঃ, ‘পবিত্র’ অধ্যায়, ‘অপবিত্রতা হতে পবিত্রকরণ’ অনুচ্ছেদ - يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ - وَيُرْسَى مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ ; বুখারী হা/২২২ ও ২২৩

ও ৬৭, ১/২২ পৃঃ; মুসনাদে আহমাদ হা/১৭৫১৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৪১; মিশকাত হা/৩৬৬ পৃঃ ৪৩; বঙ্গনুবাদ মিশকাত হা/৩৩৮, ২/৬৮ পৃঃ; ছহীহ নাসাঈ হা/১৬৮; মিশকাত হা/৩৬১, পৃঃ ৪৩; বঙ্গনুবাদ মিশকাত হা/৩৩৪, ২/৬৭ পৃঃ)। অতএব প্রচলিত বেহায়াপনার আশ্রয় নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। নারী-পুরুষ সকলকে এ ব্যাপারে সাবধান ও সতর্ক থাকতে হবে।

(২৪) প্রচলিত পদ্ধতিতে কেক কেটে, মোমবাতি নিভিয়ে বার্থ-ডে বা জন্মদিন পালন করা কি সুন্নাত না বিদ'আতঃ বার্থ-ডে বা জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী পালন করা সুন্নাত। তবে সেই সুন্নাত [অর্থাৎ ইহুদী নাসারাদের সুন্নাত মুসলিমদের নয়], যার জন্য মহানবী (সাঃ) বলেছেন, “অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির সুন্নাত [ইহুদি নাসারাদের] (তারিকা) অনুসরণ করবে বিঘত বিঘত এবং হাত হাত পরিমাণ (সম্পূর্ণরূপে)। এমনকি তাঁরা যদি সাগুর (গোসাপ জাতীয় এক প্রকার হালাল জন্তুর) গর্তে প্রবেশ করে, তবে তোমরাও তাকে অনুসরণ করবে (এবং তাঁদের কেও যদি রাস্তার উপর প্রকাশ্যে স্ত্রী-সঙ্গম করে তবে তোমরাও তা করবে!)” সাহাবাগণ বললেন, “আল্লাহর রাসূল ইয়াহুদ ও খ্রিস্টানরা?” তিনি বললেন, “তবে আবার কারা?” ৯৪ (বুখারী, মুসলিম ও হাকেম)

বলা বাহুল্য, বিজাতীর অনুকরণে এমন উৎসব বা অনুষ্ঠান পালন করা বৈধ নয়। যেহেতু মহানবী (সাঃ) বলেন,

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ،
حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنَيْبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অনুরূপ অবলম্বন করে, সে তাঁদেরই দলভুক্ত।”
(আবু দাউদ, পোষাক-পরিচ্ছদ অধ্যায়, হাদীস নং - ৪০৩১)।

(২৫) দু‘আকে অবহেলা করা ও আনুষ্ঠানিকতাকে উত্তম মনে করাঃ

আমরা দেখলাম যে, মৃত বুজুর্গ বা আপনজনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে সর্বদা দু‘আ করাই ছিল তাঁদের একমাত্র নিয়মিত সুন্নাত। অপরদিকে আমরা অনেক সময় “দু‘আ” করাকে তত গুরুত্ব প্রদান করি না। চিন্তা করি দু‘আতে আর কি হবে, নিজে কিছু নেক কাজ করে সেই কাজের সাওয়াব তাঁদেরকে প্রদান করতে হবে। চিন্তাটি সঠিক নয়।

মৃত মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের দু‘আই সবচেয়ে বড় দান। দু‘আর বিনিময়ে আল্লাহ তাঁদেরকে অফুরন্ত সাওয়াব ও রহমত প্রদান করেন। মৃতদের জন্য কুরআনে অনেক দু‘আ উল্লেখিত হয়েছে।

এক্ষেত্রে দু‘আর জন্য তাঁরা কখনো কোনো প্রকার অনুষ্ঠান করেন নি। আমরা অনুষ্ঠানহীন ব্যক্তিগত দু‘আর কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে করি না। অন্তত ব্যক্তিগত দু‘আর চেয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু আলেম ও বুজুর্গকে ডেকে মৃতের জন্য দু‘আ করাকে উত্তম মনে করি। অথচ সাহাবীগণকে দেখুন। সাইয়েদুল মুরসালীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের মধ্যে রয়েছেন।

অথচ ২৩ বৎসরের নবুয়তী জিন্দেগিতে একদিন একজন সাহাবীও এসে বললেন না, হুজুর আমার পিতামাতা বা কোনো বুজুর্গের জন্য দু‘আর মাজলিস করেছি, আপনি যেয়ে একটু দু‘আ করে দেবেন। অথবা মসজিদে

নববীতেই আজ নামাযের পরে সবাইকে নিয়ে আপনি একটু দু‘আ করে দেবেন। এরূপ একটি ঘটনাও দেখতে পাবেন না। অনুরূপভাবে পরবর্তী প্রায় ২ শত বৎসরে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগেও এই ধরনের কোনো ঘটনা দেখা যায় না।

(২৬) দানের ক্ষেত্রে সুন্নাত পদ্ধতির চেয়ে প্রচলিত আনুষ্ঠানিকতাকে গুরুত্ব প্রদানঃ

দানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাহাবীগণের সুন্নাত হলো অনানুষ্ঠানিক দান। জমি ওয়াকফ, কূপ খনন ইত্যাদি। কিন্তু আমরা কখনোই এই প্রকার দানে তৃপ্ত হতে পারি না। আপনি যতই বুঝান-না কেন, যত সুন্নাতের কথাই বলুন-না কেন, মনের চিন্তা একটিই – কিছু একটু না-করলে কিভাবে হয়! শ্রদ্ধা জাতীয় একটা অনুষ্ঠান করাই দরকার। সমাজের মানুষেরও একই কথা : বাপটা মরে গেল, কিছুই করল না! কিছু অর্থ “শ্রদ্ধা”।

অনেক মানুষকে বুঝিয়েছি, আপনারা খানাপিনা করানোর টাকা দিয়ে পিতামাতার বা বুজুর্গের জন্য একটি মসজিদ, মাদ্রাসা, দাতব্য হাসপাতাল, চিকিৎসা কেন্দ্র বা এতিমখানা তৈরি করুন বা শরীক হোন। খাবার পানি বা সেচের জন্য গভীর বা অগভীর নলকূপ স্থাপন করে জনগণ বা চাষীদের জন্য ওয়াকফ করুন। না হলে টাকাগুলি কোনো দরিদ্র, বিধবা, এতিম, কন্যাদায়গ্রস্থ, অসুস্থ বা অনুরূপ কাউকে দান করুন।

এভাবে আপনি সুন্নাতের মধ্যে থাকবেন, আপনি ও আপনার মৃত আপনজন বা ওলী-বুজুর্গ অফুরন্ত সাওয়াব ও রহমত লাভ করবেন। কেউ বুঝতে চান

না। কেউ এসকল খাতে কিছু ব্যয় করলেও “কিছু একটা” না করে পারেন না। অথচ এই “কিছু” বা খানাপিনা শুধু সুন্নাত বিরোধীই নয়, এতে নির্যাত, পরিবেশনা, সামাজিকতা ইত্যাদি কারণে সাওয়াবের চেয়ে গোনাহই বেশি হয়।

সামাজিক আচার কিভাবে আমাদের মনমগজকে কজা করেছে এবং এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের সুন্নাতকে মেরে ফেলেছে তা চিন্তা করুন।

(২৭) এ সকল কাজের জন্য কোনো দিন বা মৃত্যু দিনকে নির্ধারণ করাঃ

মৃত স্বজন বা বুজুর্গের জন্য দু‘আ ও সাওয়াব প্রেরণ অর্থাৎ ঈসালে সাওয়াব বা সাওয়াব রেসানীর জন্য হিন্দু, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায়ের অনুকরণে আরেকটি বিষয় আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তা হলো এসকল কাজের জন্য দিন নির্ধারণ। মৃত্যুর পরে প্রথমত ৩য়, ৭ম, ৪০তম বা এই জাতীয় দিনে অনুষ্ঠান করা। পরে মৃত্যু দিনে অনুষ্ঠান করা।

আগেই বলেছি, নেককার বা বদকার, স্বজন বা বুজুর্গ কারো জানাযা ও দাফনের পরে দু‘আ বা খানাপিনার জন্য কোনো প্রকার অনুষ্ঠান করাই সুন্নাত বিরোধী কাজ। আর এ সকল অনুষ্ঠানের জন্য এভাবে দিন নির্ধারণ অতিরিক্ত একধাপ সুন্নাত বিরোধিতা। কুলখানী, দু‘আর মাহফিল, খতম, ঈসালে সাওয়াব, সাওয়াব রেসানী, ওরস ইত্যাদি যে নামেই তা করা হোক সবই সুন্নাত বিরোধী কর্ম। এগুলি করার অর্থ হলো এ সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের সুন্নাতকে অপছন্দ করা।

(২৮) “সাদাকাল্লাহুল আযীম” (صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ) পড়া কি শরীয়তসম্মত?:

“সাদাকাল্লাহুল আযীম” পড়া শরীয়তসম্মত না উপর্যুক্ত কারণে তা বিদআত। (লাজনাহ দায়েমাহ) শরীয়তে এ কাজের কোন ভিত্তি নেই। একদা মহানবী (সাঃ) ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর নিকট ক্বিরাআত শুনলেন। পরিশেষে তিনি তাকে ‘হাসবুক’ বলে থামতে বললেন। (সহীহুল বুখারী, হাদীস নং - ৫০৫০) তখন তিনিও “সাদাকাল্লাহুল আযীম” বলেননি এবং ইবনে মাসউদও বলেননি।

‘সাদাকাল্লাহুল আযীম’ বলার বিধানঃ কতিপয় তিলাওয়াতকারী কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত শেষে বলেনঃ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ‘সাদাকাল্লাহুল আজিম’, যার অর্থ ‘মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন’। তাদের এরূপ বলার কোনো ভিত্তি নেই। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা‘আলা সত্যবাদী, তার কালাম চিরসত্য [‘সাদাকাল্লাহুল আযীম’ (صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ) বলার বিধান - সানাউল্লাহ নজির আহমেদ, পৃষ্ঠা নং - ৩ - ১২ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]²⁷¹। ইমাম নাসাঈ রাহিমাল্লাহ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেনঃ

((إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ))

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলার কিতাব সবচেয়ে সত্যবাণী এবং সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মদের আদর্শ”। (তথ্যসূত্রঃ নাসাঈ আস-সুগরা: (১৫৭৮)। আল্লাহ তা‘আলা সত্যবাদী এবং তার বাণী সত্য এ কথা বিশ্বাস করা প্রত্যেক

²⁷¹ ‘সাদাকাল্লাহুল আযীম’ (صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ) বলার বিধান - সানাউল্লাহ নজির আহমেদ, পৃষ্ঠা নং - ৩ - ১২ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

হাদীসটি বর্ণনা করেননি, ইমাম যাহাবী (রহঃ) তার সমর্থন করেছেন।
আলবানী (রহঃ) হাদীসটি সহী বলেছেন]।

অনুরূপ কোনো ষড়যন্ত্রকারীকে নিজ ষড়যন্ত্রে ফাঁসতে দেখে যদি কেউ বলে,
আল্লাহ সত্যি বলেছেনঃ

[(وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ) (فاطر: ٤٣)]

“কিন্তু কুটচক্রান্ত কেবল তার ধারককেই পরিবেষ্টন করবে”। [সূরা ফাতিরঃ
(৪৩)] এরূপ বলা বৈধ।

শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ “কেউ যদি আল্লাহর কিতাব
তिलाওয়াত করার সময় আশ্চর্য কোনো বিষয় দেখে অবাক হয়, তার
বরকত অনুধাবন করে, অতঃপর কুরআনের মহত্ত্বকে স্মরণ করে বলে,
صدق الله العظيم সুবহানাল্লাহ কি চমৎকার! তাহলে সমস্যা নেই; তবে
প্রত্যেকবার তিলাওয়াত শেষে ‘সাদাকাল্লাহুল আজিম’ বলার কোনো প্রমাণ
অনেক অনুসন্ধান ও আহলে ইলমের সাথে আলোচনা করেও আমরা
পাইনি”। [দেখুনঃ শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায রহ., ফতোয়া ইসলামিয়াহ]।

সন্দেহ নেই, ‘সাদাকাল্লাহ’ বলা একটি ফিকর, তবে এ ফিকরকে নির্দিষ্ট
সময়, অথবা নির্দিষ্ট স্থান, অথবা নির্দিষ্ট অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য
অবশ্যই দলিল প্রয়োজন, বিনা দলিলে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত শেষে
বলা যাবে না। কারণ, ফিকহের নীতি হচ্ছেঃ “ইবাদতের প্রকৃতি নিষিদ্ধ ও
হারাম থাকা আর আল্লাহর সৃষ্ট-বস্তুর প্রকৃতি বৈধ ও হালাল থাকা”। অর্থাৎ

কোনো ইবাদত অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করার জন্য দলীলের প্রয়োজন নেই, তবে প্রমাণ করার জন্য অবশ্যই দলীলের প্রয়োজন।

ইবাদত প্রমাণ হওয়ার পর অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই; অতএব কোনো আমল সম্পর্কে যদি কেউ বলে, এটা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নি ঠিক, কিন্তু এ আমলকে তিনি নিষেধও করেননি, তাই এতে সমস্যা নেই। এটা তার কুরআন-হাদিস সম্পর্কে চরম মূর্খতা ও দীন সম্পর্কে নিরেট অজ্ঞতার প্রমাণ। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নি এটাই তার নিষেধাজ্ঞার বড় প্রমাণ, যেহেতু এটা ইবাদত। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে, তার সাহাবীদের যুগে ও তাদের অনুসারী তাবয়ীদের যুগে সাদাকাল্লাহু বলার কোনো প্রচলন ছিল না। যদি তিলাওয়াত শেষে সাদাকাল্লাহু বলা বৈধ হত অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে বলে দিতেন।

একদা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলেনঃ

أقرأ علي القرآن، فقال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمع من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً - قال: حسبك الآن، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان)). متفق عليه

“আমাকে কুরআন পড়ে শোনাও, তিনি বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনাকে কুরআন পড়ে শোনাব, অথচ আপনার উপর কুরআন নাযিল হয়েছে! তিনি বললেন: আমি অপর থেকে কুরআন শোনা পছন্দ করি।

অতঃপর আমি তাকে সূরা নিসা পাঠ করে শোনাই, যখন এ আয়াতের নিকট পৌঁছিঃ

(فَكَتِفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝ ٤١)
[[النساء : ٤١]]

‘অতএব কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে উপস্থিত করব তাদের উপর স্বাক্ষীরূপে?’
[সূরা নিসা, আয়াত নং – ৪১]

তিনি বললেন, ‘হাসবুকা’ তুমি এখন যথেষ্ট কর। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখি, তার দু’চোখ অশ্রু ঝরাচ্ছে”। [বুখারীঃ (৫০৪৯), মুসলিমঃ (৮০২)]।

শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে বায রাহিমাল্লাহ বলেন: “আমাদের জানা-মতে কোনো আহলে ইলম ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেননি যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের **حسبك** বলার পর **صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ** বলে কুরআন খতম করেছেন। অর্থাৎ ‘সাদাকাল্লাহুল আজিম’ বলে কুরআন খতম করার কোনো ভিত্তি পবিত্র শরীয়তে নেই, তবে কোনো উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে বলা যায়, হোক সেটা তিলাওয়াতের মুহূর্ত কিংবা তার বাইরের মুহূর্ত, স্বাভাবিক হালতে তিলাওয়াত শেষে নয়”।
[মাজমু ফতোয়া ও মাকালাত: (খ.৭)]।

শায়খ উসাইমীন রাহিমাল্লাহ বলেন: ‘সাদাকাল্লাহুল বলে কুরআন তিলাওয়াত শেষ করা বিদআত, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার

সাহাবীদের থেকে প্রমাণিত নেই যে, তারা ‘সাদাকাল্লাহুল আজিম’ বলে তিলাওয়াত শেষ করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها ((
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل
(بدعة ضلالة).

“আমার পর তোমাদের উপর অবধারিত আমার সুন্নত ও খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নত, তোমরা তা আঁকড়ে ধর ও মাড়ির দাঁত দ্বারা কামড়ে ধর। খবরদার! তোমরা নব-আবিষ্কৃত বস্তু (বিদআত) থেকে সাবধান থাক। কারণ প্রত্যেক নব-আবিষ্কার বিদআত, প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী। সুতরাং তিলাওয়াতকারী সর্বশেষ আয়াত পাঠ করেই তিলাওয়াত শেষ করবে, তার সাথে কোনো বাক্য যোগ করবে না”। [ফতোয়া নুরুন আলাদ-দারব: (খ.৫, পৃ.২)]

সাদাকাল্লাহুল বলার প্রচলনঃ এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে ‘কাতারে’র ওয়াকফ মন্ত্রনালয় কর্তৃক পরিচালিত ‘ইসলাম ওয়েব’ islamweb.net সাইটের 139452 নং ফতোয়ায় বলা হয়েছেঃ “কিভাবে ও কবে থেকে সাদাকাল্লাহুল আজিম বলার প্রচলন ঘটেছে জানা যায়নি।

পূর্ববর্তী কতক নেককার লোক ‘সাদাকাল্লাহুল আজিম’ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার পশ্চাতে কোনো দলিল পেশ করেননি; যেমন হাফেয ইবনুল জাযারি ‘আন-নাশর’ কিতাবে বলেনঃ আমার কতক শায়েখকে দেখেছি, তারা কুরআন খতম করে বলতেনঃ

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، وهذا تنزيل من رب العالمين، ربنا آما
بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

ইমাম কুরতুবি রাহিমাল্লাহ তার তাফসীরে বলেন: হাকিম তিরমিযি আবু আব্দুল্লাহ ‘নাওয়াদিরুল উসুল’ কিতাবে বলেন: কুরআনুল কারিমকে সম্মান প্রদর্শনের একটি দিক হচ্ছে, তিলাওয়াত শেষে আল্লাহকে সত্যারোপ করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমাদের নিকট দীন পৌঁছিয়েছেন তার সাক্ষ্য প্রদান করা; কুরআন হক এ কথারও সাক্ষ্য প্রদান করা, যেমন বলাঃ

صدقت رب وبلغت رسلك، ونحن على ذلك من الشاهدين، اللهم اجعلنا من
شهداء الحق، القائمين بالقسط، ثم يدعو بدعوات

এ থেকে আমাদের ধারণা চতুর্থ হিজরিতে এ বাক্যটির প্রচলন ঘটেছে, কারণ তিরমিযি আলহাকিম চতুর্থ শতাব্দির আলেম ছিলেন, তবে তার পূর্বেও এর প্রচলন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহ ভালো জানেন”।

সৌদী আরবের উলামা পরিষদের ফতোয়াঃ কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত শেষে সাদাকাল্লাহুল আজিম বলা বিদ‘আত, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদা ও অন্যান্য কোনো সাহাবী থেকে এরূপ প্রমাণিত নেই, তাদের পরবর্তী কোনো ইমাম থেকেও নয়।

অথচ তারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন, কুরআনের প্রতি আমাদের অপেক্ষা তাদের গুরুত্ব বেশী ছিল এবং তারা কুরআন সম্পর্কে বেশী জানতেন। তাই তিলাওয়াত শেষে ‘সাদাকাল্লাহুল আজিম’ বলা বিদ‘আত।

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ. ((رواه البخاريو مسلم و قال))
رواه مسلم. ((صلى الله عليه وسلم)) (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“যে আমাদের দীনে নতুন কিছু সৃষ্টি করল, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা পরিত্যক্ত”। [সহীহুল বুখারীঃ (২৬৯৭)]

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন: “যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যার উপর আমাদের দীন নেই, তা পরিত্যক্ত”। [মুসলিমঃ (১৭২১)]। দেখুনঃ লাজনায়ে দায়েমাঃ (খ. ৪, পৃ.১১৮)

(২৯) তসবীহ গুনতে তাসবীহ-মালা ব্যবহার করা কি বিদআতঃ অনেকে বিদআত বলেছেন। তা না হলেও তা ব্যবহার না করাই উত্তম। কারণঃ

১। মহানবী (সঃ) আঙ্গুল দ্বারা তাসবীহ গণনা করেছেন এবং বলেছেন,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هَانِي بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ
يَاسِرٍ، عَنْ يُسَيْرَةَ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُنَّ أَنْ يَرَاعِينَ
بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّهْلِيلِ وَأَنْ يَغْفِظْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ

“আঙ্গুলগুলোকে (তাঁর দ্বারা কৃত কর্মের ব্যপারে) জিজ্ঞাসা করা হবে, কথা বলানো হবে। (আহমাদ ৬/৩৭১, আবু দাউদ ১৫০১, তিরমিযী হাদীস নং - ৩৫৮৩)।

সুতরাং কিয়ামতে আঙ্গুলগুলো তাসবীহ পড়ার সাক্ষ্য দেবে, মালা সাক্ষ্য দেবে না।

২। মালা ব্যবহার করে তাসবীহ পড়লে সাধারণতঃ মনোযোগ ও একাগ্রতা বিচ্ছিন্ন হতে পারে। আঙ্গুল গুনলে তা হয় না।

৩। তাসবীহ - মালা ব্যবহার লোক-দেখানি বা 'রিয়া' হওয়ার আশঙ্কা থাকে। রং-বেরঙের মালা ও তাঁর খটখট শব্দ মানুষের দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ করে। আর আমলে 'রিয়া' ঢুকলে সওয়াবের জায়গায় শিরক ঘটে বসবে।

বলা বাহুল্য, তাসবীহ-দানার চাইতে আঙ্গুল গোনাই শরীয়তসম্মত। (ইবনে উমাইমীন)

(৩০) হজ্জের বিদ'আতসমূহঃ হজ্জ [আরবী (حج) হাজ্জ] ইসলাম ধর্মাবলম্বী অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য একটি আবশ্যকীয় ইবাদত। এটি ইসলাম ধর্মের পঞ্চম স্তম্ভ। শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য জীবনে একবার হজ্জ সম্পাদন করা ফরজ বা আবশ্যিক। [তথ্যসূত্রঃ Dalia Salah-El-Deen, Significance of Pilgrimage (Hajj)] আরবী জিলহজ মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখ হজ্জের জন্য নির্ধারিত সময়। হজ্জ পালনের জন্য বর্তমান সৌদী আরবের মক্কা নগরী এবং সন্নিহিত মিনা, আরাফাত, মুযদালফা প্রভৃতি স্থানে গমন এবং অবস্থান আবশ্যিক। (তথ্যসূত্রঃ Atlas of Holy Places, p. 29)। যিনি হজ্জ সম্পাদনের জন্য গমন করেন তাঁকে বলা হয় হাজী। রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((بَنِي الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ،
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

এই হাদীসে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের আলোচনা করা হয়েছে। (তথ্যসূত্রঃ
সহীহ মুসলিম :: খন্ড ১ :: হাদীস ১)।

হজ্জ ফরয হওয়ার প্রমাণঃ হজ্জ হলো ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভেও সর্বশেষ
তথা পঞ্চম স্তম্ভ। এটি দৈহিক ও আর্থিক ত্যাগের সমন্বয়ে বিরাট ফযীলত
পূর্ণ ইবাদত এবং হজ্জ নবম হিজরীতে ফজর হয়। মক্কা যাতায়াত ও হজ্জ
পালন কালে অবস্থানের খরচের অর্থ এবং ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারের
প্রয়োজনীয় খরচাদি সমপরিমাণ অর্থের যে কোন মালিকের উপর জীবনে
একবার হজ্জ পালন করা ফরজ।

১। কুরআন থেকে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

অর্থঃ আল্লাহর উদ্দেশ্যে মানুষের উপর বায়তুল্লাহর হজ্জ পালন করা ফরয,
যারা সেখানে পৌঁছার ক্ষমতা রাখে। আর যে ব্যক্তি উহা আদায়ের ক্ষমতা
থাকা সত্ত্বেও পালন করতে অস্বীকার করবে, তবে (জেনে রেখ) আল্লাহ
সমগ্র জগৎ থেকে মুখাপেক্ষীহীন। (সূরা আলে ইমরানঃ আয়াত নং -৯৭)।

অতএব, ইসলামী ইবাদতসমূহের মধ্যে হজ্জের গুরুত্ব অপরিসীম। এক
হাদীস অনুযায়ী হজ্জকে বরং সর্বোত্তম ইবাদত বলা হয়েছে। তাই হজ্জের
গুরুত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

من حج لله فلم يرفث ولم يفسق ، رجع كيوم ولدته أمه : رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

যে হজ্জ করল ও শরীয়ত অনুমতি দেয় না এমন কাজ থেকে বিরত রইল, যৌন-স্পর্শ রয়েছে এমন কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকল, সে তার মাতৃ-গর্ভ হতে ভূমিষ্ট 'হওয়ার দিনের মতো পবিত্র হয়ে ফিরে এল। অর্থাৎ বৎসরের নির্ধারিত সময়ে হেরেম শরীফ যিয়ারত ও আনুষঙ্গিক আনুষ্ঠানিকতা পালনই হচ্ছে হজ্জ। অথচ এই হজ্জব্রত পালনের মধ্যেও আমাদের মাঝে প্রচলন করে দেয়া হয়েছে অসংখ্য বিদ'আত এবং যা হজ্জের ইবাদতের সাথে এর তথা শরীয়তের কোন ভিত্তি নেই বললেই চলে। নিম্নে তাঁর কতিপয় বিদ'আত সমূহের বিবরণ আলোচনা হলোঃ-

(১) হজ্জের নিয়তঃ হুমায়দী (রহ) 'আলকামা ইবন ওয়াক্কাস আল-লায়সী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, আমি উমর ইবনুল খাতাব (রাঃ) - কে মিস্রের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছিঃ আমি রাসূলুল্লাহ্(সাঃ)কে বলতে শুনেছিঃ

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ "

প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের অথবা নারীকে বিয়ে

করার উদ্দেশ্যে- সেই উদ্দেশ্যেই হবে তার হিজরতের প্রাপ্য। (তথ্যসূত্রঃ সহিহ বুখারী :: খন্ড ১ :: অধ্যায় ১ :: হাদীস ১)।

সুতরাং, উপরোক্ত হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, নিয়ত অর্থ - মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত সহ প্রত্যেকটি ইবাদত সম্পাদনের জন্য অন্তরে সংকল্পের মাধ্যমেই নিয়ত করতে হবে। মুখে প্রকাশ করলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। অতএব, হজ্জ সম্পাদনের জন্য অন্তরে সংকল্পের মাধ্যমে হজ্জ অথবা ওমরার নিয়ত করে 'লাববাইক আল্লাহুমা হাজ্জান' অথবা 'লাববাইক আল্লাহুমা ওমরাতান' বলে হজ্জ অথবা ওমরায় প্রবেশ করবে। সালাত আদায়ের জন্য যেমন 'নাওয়াইতু আন উছল্লি...' পড়া বিদ'আত, হজ্জ সম্পাদনের জন্য তেমনি 'নাওয়াইতু আন আহ্জ্জা ...' পড়াও বিদ'আত। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ), শায়খ বিন বায (রহঃ), মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

(২) **দলবদ্ধভাবে তালবিয়া পাঠ করাঃ** বর্তমানে দলবদ্ধভাবে হজ্জের তালবিয়া পাঠের প্রচলন অধিক হারে লক্ষ্য করা যায়। রাসূল (সাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের যামানায় কেউ কখনো দলবদ্ধভাবে তালবিয়া পাঠ করেননি। সকলেই নিজ নিজ গতিতে তালবিয়া পাঠ করতেন। (তথ্যসূত্রঃ মুস্তাদরাক হাকেম হা/৯১৪; সহীহুল জামে' হা/৬৮৩০।)

(৩) তাওয়াফের মধ্যে দলকভাবে দো‘আ করাঃ রাসূল (সাঃ) বলেছেন, الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ‘দো‘আ হ’ল ইবাদত’। পূর্ণ হাদীসটি নিম্নরূপ উল্লেখ করা হলোঃ-

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ يُسَيْعٍ
الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "
الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ { قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } "

Narrated An-Nu'man ibn Bashir: The Prophet (sallallahu 'alaihi wa sallam) said: Supplication (du'a') is itself the worship. (He then recited :) "And your Lord said: Call on Me, I will answer you" (তথ্যসূত্রঃ আবুদাউদ হা/১৪৭৯; তিরমিযী হা/২৯৬৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৮২৮; মিশকাত হা/২২৩০; সনদ সহীহ, ছহীহুল জামে‘ হা/৩৪০৭।) [সুনান আবু দাউদ :: বিতর সম্পর্কীয় অধ্যায় ৮, হাদীস ১৪৭৯)।

(৪) মহিলাদের ছাফা-মারওয়ার মাঝখানে সবুজ লাইট চিহ্নিত স্থানে দ্রুত চলাঃ মহিলাদের অনেককেই দেখা যায় ছাফা-মারওয়ার মাঝখানে সবুজ লাইট দ্বারা চিহ্নিত স্থানে দ্রুত চলেন বা দৌড়ান। অথচ এটা শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য খাছ, নারীদের জন্য নয়। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন,

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمْلٌ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

‘নারীদের জন্য তাওয়াফ ও ছাফা-মারওয়ার মাঝখানে রমল তথা দ্রুত চলতে হবে না’। (তথ্যসূত্রঃ দারাকুত্বনী হা/২৭৯৯; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/১৩১১০।)

সুতরাং, উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বলা যায় যে, ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত হ'ল, রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী হওয়া। তিনি যে পদ্ধতিতে দো'আ করেছেন ঠিক সে পদ্ধতিতেই আমাদের দো'আ করতে হবে। রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের কেউ কখনো তাওয়াফ ও সাঈতে দলবদ্ধভাবে উচ্চৈঃস্বরে দো'আ করেছেন মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। অতএব এরূপ বিদ'আতী পদ্ধতি পরিত্যাগ করে সুন্নাহী পদ্ধতিতে দো'আ করা অপরিহার্য। আর তা হ'ল, নিম্নস্বরে বিনম্রচিত্তে একাকী দো'আ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

‘তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক। তিনি যালিমদেরকে পসন্দ করেন না’ (সূরা আ'রাফ, ৭/৫৫)। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ-

‘তোমার প্রতিপালককে মনে মনে বিনম্রচিত্তে ও গোপনে অনুচ্চৈঃস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে এবং তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে না’ (সূরা আ'রাফ ৭/২০৫)।

(৫) অন্যান্য হজ্জ সম্পৃক্ত বিদ'আতসমূহঃ অন্যান্য হজ্জ সম্পৃক্ত বিদ'আত সমূহ উল্লেখ করা হলোঃ-

- ১। ঢাকার হাজী কাম্পে ইহরাম বেঁধে দুই রাকআত সলাত আদায় করে তলবিয়া পাঠ করা
- ২। কাবা ঘর তাওয়াফ এর সময় হানাফি মাজহাবে প্রচলিত বিভিন্ন বানোয়াট দুআ পাঠ করা
- ৩। হাযরে আসওয়াদ এর দিকে ইশারা করে হাতে চুমু খেয়ে আবার হাযরে আসওয়াদ এর দিকে ইশারা করা
- ৪। সাফা মারওয়া সাঈ এর সময় হানাফি মাজহাবে প্রচলিত বিভিন্ন বানোয়াট দুআ পাঠ করা
- ৫। মক্কা থাকাকালীন সময়ে আয়েশা মসজিদে গিয়ে ২ বার উমরা করা
- ৬। মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার সময় সলাত জমা করে না পড়া
- ৭। মদিনায় গিয়ে হানাফি মাজহাবে প্রচলিত ৪০ ওয়াক্ত সলাত জামাতে পড়া
- ৮। সওয়াব লাভের আশায় রিয়াজুল জান্নাতে গিয়ে অধিক সময় ধরে সলাত পড়া
- ৯। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের সামনে গিয়ে বানোয়াট দুয়া পড়া
- ১০। বাকি কবরস্থানে গিয়ে বানোয়াট দুয়া পাঠ করা

১১। মক্কা ফেরার পথে মসজিদে নববী থেকে ইহরাম বাঁধা

১২। হজের জন্য ইহরাম বেঁধে ফজরের আগে রাতের বেলা মিনাতে যাওয়া

১৩। আরাফাত ময়দানে ফজরের আগে রাতের বেলা পৌছানো

১৪। মিনা ও আরাফাতে সলাত কসর ও জমা করে না পড়া

১৫। মুজদালিফা থেকে পাথর কুড়ান

১৬। কাবা ঘর তাওয়াফ এর সময় হানাফি মাজহাবে প্রচলিত বিভিন্ন বানোয়াট দুআ পাঠ করা

১৭। হাযরে আসওয়াদ এর দিকে ইশারা করে হাতে চুমু খেয়ে আবার হাযরে আসওয়াদ এর দিকে ইশারা করা

১৮। সাফা মারওয়া সাঈ এর সময় হানাফি মাজহাবে প্রচলিত বিভিন্ন বানোয়াট দুআ পাঠ করা

১৯। মক্কাতে আসার পর টাক হওয়া

২০। বিদআতী পদ্ধতিতে সলাত আদায় করা। এছাড়াও আরও অসংখ্য বিদ'আত পরিলক্ষিত হয়।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনার সারাংশে বলা যায় যে, আরও অসংখ্য বিদ'আত রয়েছে যা উপরে কম বেশি উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব, মৌলভী নামের আলেম সমাজের নিজস্ব পদ্ধতিতে বানানো এসব দোআ - দরুদ, কেছা - কাহিনী হজ্জকে শুধু নষ্টই করবে না বরং বিদ'আত অনুসরণের জন্য কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

সুতরাং, হজ্জ করতে যাওয়ার আগে প্রতিটি মুসল্লীর উচিত হবে নাবী করিম (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীরা কিভাবে হজ্জ পালন করেছেন তা সঠিক ভাবে একজন হক্কপন্থী আলেম থেকে জেনে নেয়া উচিত। তা না হলে আমাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই বললেই চলে। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

(৩১) ফযরের আযানে বিদ'আতঃ আবু মাহযুরার সনদে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, ফজরের দ্বিতীয় আযানে **الصلاة خير من النوم** বলা সুন্নত। অন্যথায় তা বিদ'আত হবে।

অনুরূপআয়েশা -রাদিআল্লাহু আনহা - থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, ফজর উদিত হওয়ার পর দ্বিতীয় আযানে মুয়াজ্জিন এ বাক্য বলত। তিনি বলেনঃ অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠতেন, দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন এবং প্রথম আযানের পর সালাতের জন্য বের হতেন। মূলত এটাই দ্বিতীয় আযান, ইকামতের বিবেচনায় এটাকে প্রথম আযান বলা হয়েছে, যেহেতু ইকামতকেও আযান বলা হয়।

অতএব, সুন্নত হচ্ছে ফজর উদিত হওয়ার পর দ্বিতীয় আযানে **(الصلاة خير)** **(من النوم)** বলা। ইকামতের বিবেচনায় এ আযানকে দ্বিতীয় আযান বলা হয়।

আর ইসলামী পরিভাষায় প্রথম আযানকে সতর্কতার আযান বলা হয়। এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যেন তোমাদের জাগ্রতারা ঘরে ফিরে যায়, আর ঘুমন্তরা জাগ্রত হয়। আযানের সতর্ক করা। ঘুমন্ত ব্যক্তির যেন জেগে যায়, আর যারা জাগ্রত রয়েছে তারা যেন সালাত সংক্ষেপ করে। কারণ ফজরের সময় ঘনি়ে এসেছে। আয়েশা -রাদিআল্লাহু আনহা - এর হাদীসে দ্বিতীয় আযানকে ইকামতের বিবেচনায় প্রথম আযান বলা হয়েছে। কারণ, ইকামতও আযান। হ্যাঁ, ফজরের আযান সতর্কতার আযানের তুলনায় দ্বিতীয়।

কেউ কেউ বলেছেন, ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে সতর্কতার আযানে **الصلاة خير من النوم** বলবে, - আল্লাহ ভাল জানেন- - এরও সুযোগ রয়েছে। কিন্তু কোনভাবেই উভয় আযানে বলবে না। তবে উত্তম হচ্ছে দ্বিতীয় আযানে **الصلاة خير من النوم** বলা, ইকামতের তুলনায় যে আযান প্রথম। অর্থাৎ ফজর উদিত হওয়ার পরের আযান।

الصلاة خير من النوم (সালাত ঘুম থেকে উত্তম) এর দ্বারা উদ্দেশ্য ফরজ সালাত। আল্লাহ যে সালাত মানুষের উপর অবধারিত করে দিয়েছেন, সে সালাতই ঘুম থেকে উত্তম। মানুষের জন্য তা আদায় করা ওয়াজিব, অবশ্য কর্তব্য। তবে শেষ রাতে কিংবা মধ্যরাতে নফল পড়া ওয়াজিব নয়। বরং যখন ঘুমের চাপ সৃষ্টি হয়, তখন ঘুমই উত্তম। প্রয়োজন মোতাবেক ঘুম সেরে নেয়ার জন্য ঘুমিয়ে পড়াই শ্রেয়; যেন ফরজ সালাত যথাযথভাবে আদায় করা সম্ভব হয়। এতে সন্দেহ নেই, ফরজ সালাত সব সময়ই ঘুম,

থেকে উত্তম। তাই ফরজ সালাত সঠিক ও সুন্দরভাবে আদায় করার জন্য যাতে শরীরের ক্লান্তি দূর হয় সে পরিমাণ ঘুমানো জুররী।

الصلاة خير من النوم শোনে শ্রোতাগণও মুয়াজ্জিনের ন্যায় (إِذَا) النوم বলবে। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (سَمِعْتُ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ) অর্থ : যখন তোমরা মুয়াজ্জিনকে আযান দিতে শোন, তখন সে যা বলে তোমরা তাই বল। অতএব, শ্রোতাগণও বলবে الصلاة خير من النوم যেমন তারা বলে "الله أكبر" ও "أشهد أن لا" "حي على الصلاة" যখন বাক্যগুলোর সময়। তবে মুয়াজ্জিন যখন "لا حول ولا قوة إلا بالله" বলে, তখন তারা বলবে : "حي على الفلاح" এটাই বিধান ও শরীআত কর্তৃক অনুমোদিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুয়াজ্জিনকে বলতে শোনতেন : "حي على الصلاة" তখন তিনি বলতেন : "لا حول ولا قوة إلا بالله" আবার যখন তিনি শোনতেন : "حي على الفلاح" তখন তিনি বলতেন : "لا حول ولا قوة إلا بالله" কারণ, সে জানে না, সালাত আদায় করার ক্ষমতা তার হবে কি না। অনুরূপ সে জানে না, সালাত আদায় করা তার জন্য সহজ হবে কি না। অতএব, সে বলবে : "لا حول ولا قوة إلا بالله" এর অর্থ : আমার কোন সামর্থ্য নেই, মুয়াজ্জিনের ডাকে সাড়া দেয়া, মসজিদে হাজির হওয়া ও সালাত আদায় করা, একমাত্র আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া এবং আল্লাহ বিনে আমার কোন ক্ষমতাও নেই। বস্তুতমুয়াজ্জিন তাকে কল্যাণের দিকে আহবান করেছে, তার উচিত তার ডাকে সাড়া দেয়া,

এবং বলা **لا حول ولا قوة إلا بالله** এটা শরিয়ত অনুমোদিত ও বৈধ। অর্থাৎ মুয়াজ্জিনের ডাকে সাড়া দেয়া, জমাতের সাথে সময় মত সালাত আদায় করা ও অন্যান্য কর্ম সম্পাদন করার মত কোন সামর্থ্য ও ক্ষমতা আমার নেই, একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।

(৩২) বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত খতমে (ختم) বিদ'আতঃ

খতম (ختم) শব্দের অর্থ ও প্রয়োগঃ ‘খতম’ (ختم) শব্দটি মূলত আরবী ‘(ختم)’ শব্দের বাংলা ব্যবহার। যার মূল অর্থ হচ্ছে : কোনো বস্তুতে মোহর লাগানো বা তাকে সিলযুক্ত করা। কর্ম যুগে শব্দটির অর্থ হয়, কাজটি শেষ করা। এভাবে বিভিন্ন শব্দযোগে তার বিভিন্ন অর্থ হয় যেমন, মাটি দ্বারা মুখ বন্ধ করা, এড়িয়ে যাওয়া, হৃদয়ে মোহর এঁটে দেওয়া তথা অবুঝ করে দেওয়া, কোনো বস্তুর শেষে পৌঁছা ইত্যাদি। কিতাব বা কুরআন শব্দযোগে তার অর্থ হয়: সম্পূর্ণটুকু পড়ে শেষ করা।²⁷²

কুরআনে শব্দটি ক্রিয়ামূলে শুধুমাত্র হৃদয়ে মোহর এঁটে দেওয়ার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমনঃ

(خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ٧) [البقرة: ৭]

“আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ও কানে মোহর এঁটে দিয়েছেন, আর তাদের চোখের উপর রয়েছে আবরণ রয়েছে”।²⁷³

²⁷² ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব, মাদ্দাহ: ‘ ختم ’ ১২/১৬৩।

²⁷³ সূরা বাক্বারা, ৭।

তবে বিভিন্ন হাদীসে (ختم) শেষ করা অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পড়া, সূরাটি শেষ পর্যন্ত পড়া ইত্যাদি শব্দ হাদীসে ব্যবহার হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পড়া বলতে যেমন পুরোটা পড়া বুঝায়, তেমনি যে কোনো জায়গা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত পৌঁছলেও এ শব্দ ব্যবহার হয়। এ ক্ষেত্রে পুরো সূরা পড়া উদ্দেশ্য নয়। যেমন, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক ও ওযু করার পর সূরা আলে ইমরানের ১৯০ নং আয়াত থেকে পড়তে শুনে, অতঃপর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেনঃ

" فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة...". (صحيح مسلم، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم: 1835)

“অতঃপর তিনি রাসূল (সাঃ) এই আয়াতগুলো পড়েন, এমনকি সূরা শেষ করেন”।²⁷⁴

এখানে সূরা খতম বলতে পুরো সূরা পড়া নয়, বরং ১৯০ নং আয়াত থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত পড়া।

কুরআন সম্পূর্ণতা পড়ার ক্ষেত্রে খতম শব্দের ব্যবহার সাহাবীদের মধ্যে ছিল। তবে ‘হাদীস খতম’ বা ‘হাদীসটি খতম’ এমন কোনো ব্যবহার বা প্রয়োগ তাদের মাঝে ছিল বলে জানতে পারি নি। ‘খতমে বুখারী’র আলোচনায় এমন ব্যবহার না থাকার কারণ আমরা বুঝতে পারব ইন-শাআল্লাহ। তবে হাদীসটি খতম বলতে তা পুরোটা পড়া বুঝাবে। তাই কেউ

²⁷⁴ সহীহ মুসলিম, সালাত অধ্যায়, রাতের সালাতে দু‘আ ও রাতে জাগা অনুচ্ছেদ, নং: ১৮৩৫।

একটি হাদীস পড়ে হাদীসটি খতম করেছি বলতে কোনো বাধা নেই। এভাবে খতমে দো‘আ ইউনুস বললে পুরো দো‘আটা পড়া বুঝাবে, যদিও এমন বলার প্রচলন ছিল না। কিন্তু খতমে ইউনুস বললে: এতবার পড়া, অমুক খতম বললে: এতবার পড়া, তমুক খতম বললে এতবার পড়া, এসব ব্যবহার সম্পূর্ণ নতুন মনগড়া বানানো।

খতম শব্দটি শেষ পর্যন্ত পৌঁছা বা পুরোটা পড়ার অর্থে ব্যবহার হলেও ‘খতম করানো’ বা ‘খতম পড়ানো’, এমন কোনো ব্যবহার বা প্রয়োগ না সাহাবিদের যুগে ছিল, না খাইরুল কুরানে ছিল। কেননা কুরআন, হাদীস, দো‘আ, দুরূদ, যিকর ইত্যাদির আমলের এই সিস্টেম বা পদ্ধতিটি একেবারেই নতুন। তাই ‘খতম’ শব্দের শাস্ত্রিক অর্থ অভিধানে পেলেও আমাদের সিস্টেমের তার পারিভাষিক কোনো অর্থ আহলে ইলমদের কোনো কিতাবে পাবেন না। আমরা ‘খতম’ বলতে যা বুঝি এ সবকিছু সোনালীযুগ দূরের কথা, মুহাক্কীক কোনো আলেম থেকে এ গুলোর আবিষ্কার হয়নি বলে পরিস্কার বুঝা যায়। আমাদের জানামতে প্রচলিত যে খতমগুলো রয়েছে সেগুলোর আলোচনায় আমরা এগুলোর তাৎপর্য, যথার্থতা, গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব।

মহাগ্রন্থ আলকুরআন আল্লাহর কালাম এবং প্রতিটি মানুষের জীবন বিধান। এর গুরুত্ব কারো কাছে অজানা নয়। তাই সর্বপ্রথম আমাদের সমাজে অধিকহারে প্রচলিত এই মহাগ্রন্থ আল কুরআনের খতম দিয়েই শুরু করছি। নিজে কুরআন না পড়ে, কুরআনের শিক্ষা নিজে গ্রহণ না করে, যে কোনো কারণে অন্যকে ভাড়া করে কুরআন পড়িয়ে নেওয়ার যথার্থতা কতটুকু তা আলোচনা করলে বুঝতে পারব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর তওফিক কাম্য।

খতমে কুরআনঃ কুরআন প্রতিটি মুসলিমের জীবন বিধান। এই কুরআন তাকে নিয়মিত তেলাওয়াত করতে হবে এবং এর মর্ম বুঝে তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে। কুরআন শিক্ষা ও তেলাওয়াতের ফযিলত বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

«خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (صحيح البخاري، كتاب فضائل

القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه)

“তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়”।²⁷⁵

এভাবে কুরআন তেলাওয়াতের বেলায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

" مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب .
والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ریح لها ومثل
الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر .
ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ریح
لها". (صحيح البخاري، باب فضل القرآن على سائر الكلام)

“কুরআন পাঠকারী (মুমিনের) উদাহরণ সুস্বাদু সুগন্ধযুক্ত লেবুর ন্যায়।
আর যে (মুমিন) কুরআন পাঠ করে না তার উদাহরণ এমন খেজুরের

²⁷⁵ সহীহুল বুখারী, কুরআনের ফযিলত সমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়, নং:৪৭৩৯।

মত যা সুগন্ধহীন তবে খেতে সুস্বাদু। আর যে ফাসিক কুরআন পাঠ করে তার উদাহরণ রায়হান জাতীয় গুল্মের মত যার সুগন্ধ আছে কিন্তু খেতে বিষাদযুক্ত। আর যে ফাসেক কুরআন তেলাওয়াত করে না তার উদাহরণ ঐ মাকাল ফলের মত যা খেতেও বিষাদ (তিক্ত) আবার কোনো সুস্থানও নেই।²⁷⁶ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেন,

" من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول آلم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ". (سنن الترمذي، باب فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر)

“যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর তিলাওয়াত করবে আল্লাহ তার আমলনামায় একটি নেকী প্রদান করেন, আর এই নেকীটি দশটি নেকীর সমান। আমি বলি না, “ الم ” একটি অক্ষর, বরং “ ا ” একটি অক্ষর, “ ل ” একটি অক্ষর, “ م ” একটি অক্ষর”।²⁷⁷

কুরআন তেলাওয়াতের এত মর্যাদা, গুরুত্ব, ছওয়াব কুরআন হাদীস থেকে প্রমাণিত থাকা সত্ত্বেও প্রচলিত খতমের রূপরেখায় নবী আদর্শ ও সাহাবা আদর্শের বৈপরিত্য থাকার কারণে এই কুরআন খতমের হুকুম যদি না

²⁷⁶ সহীহুল বুখারী, কুরআনের ফযিলতসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: সব কালামের উপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, নং:৪৭৩৯, সহীহ মুসলিম, কুরআনের ফযিলতসমূহ অধ্যায়, হাফিজের কুরআনের মর্যাদা অনুচ্ছেদ, নং:১৮৯৬।

²⁷⁷ সুনানুত তিরমিযি, হাদীস সহীহ, কুরআনের ফযিলত সমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: যে কুরআনের একটি অক্ষর পড়ল তার কতটুকু ছওয়াব রয়েছে, নং: ২৯১০।

বাচক হয় তবে যার কোনো অস্তিত্ব নবী জীবনে, নবীর শিক্ষা প্রাপ্ত সাহাবিদের জীবনে নেই তার হুকুম কী হবে তা সহজেই অনুমেয়। রূপরেখায় বৈপরিত্য বলতে যেমন, সাহাবায়ে কেরাম কুরআন নিজে শিখতেন, নিজে পড়তেন। যিনি জানেন না তিনি শিখতেন। এই শিক্ষাই তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। অনেক সময় কেউ কুরআন অপরের কাছে শুনতে চাইতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও কোনো কোনো সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শুনার আগ্রহ প্রকাশ করতেন, শুনতেন। তবে অন্যকে এনে বাড়ীতে খতম করানোর কোনো রেওয়াজ তাদের মাঝে ছিল না। কেউ মারা গেলে তাদের যা করণীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন তারা শুধু তাই করতেন। কেউ অসুস্থ হলে, বিপদে পড়লে কী করণীয় তাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন।

কেউ মারা গেলে বা অন্য কোনো সমস্যায় পড়লে কুরআন খতম করা বা খতম করানোর কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে একটিবার কাউকে বলেন নি নিজেও করেন নি। তাই সাহাবিরা এমন কর্ম কখনো করেন নি। এখন আমরা জানতে চেষ্টা করব প্রচলিত খতমের হুকুম সম্পর্কে আদর্শবান আলেমদের কী মত। এ ব্যাপারে আমাদের আলেম সমাজে অত্যন্ত সুপরিচিত কিতাব “আহসানুল ফাতওয়া” এর লিখক প্রসিদ্ধ ফক্বিহ রশিদ আহমদ রহ. তার কিতাবে প্রচলিত কুরআন খতম সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে যে দলীলভিত্তিক আলোচনা করেছেন, অসংখ্য আলেমের

বক্তব্যের উদ্ধৃতি পেশ করেছেন তার এই লেখাটির অনুবাদ তুলে দেওয়াই যথেষ্ট মনে করছি। তার এ বক্তব্যের পর এ ব্যাপারে আর কিছু লেখার কোনো প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। এতে আমরা প্রচলিত খতমের তাৎপর্য যেমন বুঝতে পারব তেমনি অগণিত আলেমের মতামত পেয়ে যাব। তার আলোচনা পড়ার পর সত্য সন্ধানী মানুষের মনে আর কোনো দ্বিধা থাকবে না বলে আশা করি। নিম্নে তার কিতাবের প্রশ্ন ও উত্তর হুবহু তুলে ধরছি।

প্রশ্ন: বর্তমানে কুরআন খতমের প্রচলন ব্যাপক হয়ে গেছে। যেমন, নতুন ঘর ক্রয় করা হলে কুরআন খতম করা হয়। দোকান উদ্বোধন করা হলে খতম করা হয়।

কারো চল্লিশা হলে কুরআন খতম করা হয়, কারো মৃত্যুর তৃতীয় দিনে কুরআন খতম করা হয়; যাতে মৃত ব্যক্তির কাছে ছড়ায় পৌঁছে। কোনো সময় এর ঘোষণা পত্রিকায় দেওয়া হয় এবং মানুষ দূর-দুরান্ত থেকে শুধুমাত্র কুরআন খতমের জন্য আসে। এমন কুরআন খতমের আমলের হুকুম কী?

কুরআন হাদীসের আলোকে এর কোনো প্রমাণ আছে কি? এতে আমাদের বন্ধু-বান্ধব বা পরিবারের লোক শরীক হতে পারবে কি? আমরা নিজে কি এমন কর্মে শরীক হয়ে গোনাহগার হচ্ছি না?

সুমতি দানকারীর নামে উত্তর

1- قال الإمام محمد إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: "

حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة ."

(صحيح البخاري ص:238ج:1)

(মুহাম্মদ ইসমাইল বুখারী রাহ. বলেন:মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং উরওয়া ইবনু যুবাইর (র) মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা- আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর হুজরার পাশে বসে আছেন। ইতোমধ্যে কিছু লোক মসজিদে সালাতুদ্দোহা আদায় করতে লাগল। আমরা তাকে এদের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটা বিদ'আত।²⁷⁸

2- وقال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة.

(صحيح مسلم ص:409 ج:1)

(এবং ইমাম আবুল-হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ ইবন মুসলিম আল-কুশাইরী বলেন: মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

²⁷⁸ সহীহুল বুখারী, উমরা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার উমরা করেছেন।

আমি এবং উরওয়া ইবনু যুবাইর (র) মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা - আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর হুজরার পাশে বসে আছেন। আর কিছু লোক মসজিদে সালাতুদ্বোহা আদায় করছে। আমরা তাকে এদের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটা বিদ'আত।²⁷⁹

3- وقال الشيخ محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: انهم سألوا ابن عمر عن صلاة الذين كانوا يصلون الضحى في المسجد فقال بدعة (هذا قد حمله القاضي وغيره على أن مراده أن اظهارها في المسجد والاجتماع لها هو البدعة لا أن أصل صلاة الضحى بدعة وقد سبقت المسألة في كتاب الصلاة. (شرح النووي على صحيح مسلم صفحه مندرجه بالا)

(এবং শাইখ মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন শরফ নববী রাহ. বলেন, তারা ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যারা মসজিদে সালাতুদ্বোহা আদায় করছিল তাদের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিল, তিনি বললেন বিদ'আত। এটা ক্বাযী²⁸⁰ এবং অন্যান্যরা এর অর্থ নিয়েছেন, তার উদ্দেশ্য হলো সালাতকে মসজিদে প্রকাশ করা এবং এর জন্য সমবেত হওয়াটাই হচ্ছে বিদ'আত। মূল সালাতুদ্বোহা বিদ'আত নয়। সালাত অধ্যায়ে মাসআলাটির আলোচনা হয়েছে।)²⁸¹

²⁷⁹ সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: উমরা, অনুচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উমরার সংখ্যার বর্ণনা।

²⁸⁰ ক্বাযী আয়ায, মালেকি মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম মুহাদ্দীস, ফকীহ, আদীব, ঐতিহাসিক, একাধিক কিতাবের রচয়িতা। ৪৭৩-৫৪৪ হিজরী।

²⁸¹ ইমাম নববীর মুসলিমের ব্যখ্যগ্রন্থ, প্রাপ্ত অধ্যায়। কিতাবুস-সালাত, (باب استحباب صلاة الضحى وأن) (أقلها ركعتان) এর অধীনে আলোচনা সালাতুদ্বোহার আলোচনা করেছেন।

4- وقال الامام محمد بن شهاب المعروف بابن البزار الكردي
الحنفي رحمه الله تعالى: وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه
أنه سمع قوما اجتمعوا في مسجد يهللون ويصلون عليه الصلاة
والسلام جهرا، فراح إليهم فقال ما عهدنا ذلك على عهده عليه
السلام وما أراكم إلا مبتدعين، فما زال يذكر ذلك حتى أخرجهم من
المسجد.

(بزازية بهامش الهنديه، ج:6 ص:378)

(এবং ইমাম মুহাম্মদ ইবন শিহাব আল-কুরদুরী আল-হানাফী রাহ.²⁸²
যিনি ইবনে বায্যার নামে পরিচিত, তিনি বলেন, ইবনে মাসউদ
রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, তিনি শুনতে পান
একদল লোক মসজিদে সমবেত হয়ে উচ্চস্বরে তাহলীল এবং নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পড়ছে।

অতএব তিনি তাদের কাছে গেলেন এবং বললেন, আমরাতো রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এমনটি পাইনি। আমি তো
তোমাদেরকে বিদ'আতি ছাড়া কিছু দেখছি না। তিনি একথা বলতে
বলতে তাদেরকে মসজিদ হতে বের করে দেন।)²⁸³

5- وقال في موضع آخر: ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث
وبعد الأسبوع والأعياد ونقل الطعام إلى القبر في المواسم واتخاذ
الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة
الأنعام أو الإخلاص. فالحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن
لأجل الأكل يكره. (بزازية بهامش الهنديه، ج:4 ص:81)

²⁸² ফাতওয়া বায্যায়িয়ার মুসান্নিফ, ইমাম মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন শিহাব, ইবনে বায্যার আলকুরদুরী
আল-হানাফী। মৃত্যু: ৮২৭ হিজরী।

²⁸³ বায্যায়িয়া, হিন্দিয়ার টিকা, ৬/৩৭৮ (লেখকের দেওয়া তথ্য সূত্র মোতাবেক)।

(এবং তিনি আরেক জায়গায় বলেন, আর মৃত্যুর প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন, সাপ্তাহ পর এবং অনুষ্ঠানে খাবারের আয়োজন করা, বিভিন্ন মৌসুমে কবরে খাবার নিয়ে যাওয়া, কুরআন পড়ার জন্য দাওয়াতের আয়োজন করা এবং সৎ লোক ও ক্বারীদেরকে খতমের জন্য বা সূরা আন'আম অথবা সূরা ইখলাস পড়ার জন্য সমবেত করা মাকরুহ।

মোটকথা, কুরআন পড়ার সময় খাওয়ার জন্য দাওয়াতের আয়োজন করা মাকরুহ।)²⁸⁴

6- وقال الفقيه المخدوم محمد جعفر بن العلامة عبد الكريم البوبكاني السندي رحمه الله تعالى في الصيرفية: قراءة القرآن لأجل المهمات والبأس مكروه. (وبعد صفحة) يكره للقوم أن يقرأ القرآن جملة لتضمنها ترك الاستماع والإنصات للأمور بهما. وقيل لا بأس به. في التتارخانية من المحيط: من المشايخ من قال: إن ختم القرآن بالجماعة جهرا ويسمى "سيباره خوانده" مكروه، (الى قوله) في عين العلم: ولا يختم في أقل من ثلاثة أيام (وبعد صفحة) في مفيد المستفيد من النصاب: قراءة القرآن في المجالس يكره، لأنه يقرأ طمعا في الدنيا، وكذلك في الأسواق، وكذلك على رأس القبر. قيل، ولو قرأ ولا يسأل والناس أعطوه من غير سؤال قال يكره أيضا، لأنه إذا لم يقصد السؤال لم لا يجلس في بيته يقرأ. (المتانة في المرملة عن الخزانة، 632، 633، 634)

²⁸⁴ বায্যায়িয়া, হিন্দিয়ার টিকা, 8/৮১ (লেখকের দেওয়া সূত্রে)

(এবং ফক্বীহ মুহাম্মদ জাফর²⁸⁵....সিন্দি বলেন, সাইরাফিয়াহ কিতাবে²⁸⁶ “কঠিন বিষয় এবং অসুবিধার কারণে কুরআন পড়া মাকরুহ”। (এবং এক পৃষ্ঠা পর) মুফিদুল মুস্তাফিদ কিতাবে এসেছে, “দলবদ্ধ হয়ে বৈঠকে কুরআন পড়া মাকরুহ, কেননা এতে শ্রবণ করা এবং চুপ থেকে শোনা পরিত্যাগ করা হয় অথচ এ দুটি বিষয় নির্দেশিত।” কেউ কেউ বলেন, “এতে অসুবিধা নেই”।

‘মুহিত’²⁸⁷ কিতাবের উদ্ধৃতিতে ‘তাতারখানিয়া’²⁸⁸ কিতাবে রয়েছে, “মাশায়েখের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, নিশ্চয় দলবদ্ধ হয়ে উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করা যাকে বলা হয় ‘সীপারা পড়া’ তা মাকরুহ। (আরো বলেন) আইনুল ইলমে রয়েছে, তিন দিনের কমে খতম করবে না ”। (আরো এক পৃষ্ঠা পর), “মুফিদুল মুস্তাফিদে নেসাব’²⁸⁹ থেকে বলা হয়েছে, সমাবেশস্থলে কুরআন পড়া মাকরুহ, কেননা পাঠক তা দুনিয়ার লোভে পড়ছে। এভাবে বাজারে পড়া মাকরুহ। কবরের কাছে পড়াকেও এভাবে মাকরুহ বলা হয়েছে। যদি পড়ে কিন্তু (কারো কাছে কিছু) না চায়, আর মানুষ তাকে চাওয়া ব্যতীতই দান করে তবে তাও

²⁸⁵ মুহাম্মদ জা‘ফর ইবন আব্দুল করীম আল-বুবাকানী আস-সিন্দি আল-হানাফী। তার লিখিত কিতাব, ‘আল-মাতানাহ ফিল-মারাস্মাতে আনিল খিয়ানাহ’।

²⁸⁶ আল-ফাতাওয়া আস-সাইরাফিয়াহ। লিখক, হানাফী ফক্বীহ আসআদ ইবন ইউসুফ ইবন আলী মাজ্জদুদ্দীন আস-সাইরাফী আল-বুখারী। মৃত:১০৮৮ হিজরী। (আল-আ‘লাম, ১/৩০২)

²⁸⁷ দেখুন, বুরহানুদ্দীন ইবনু মাযাহ (৬১৬ হি.) রচিত কিতাব ‘আল-মুহিতুল বুরহানী, পৃষ্ঠা:১৪৪, খ:-:৫।

²⁸⁸ ফিকহে হানাফী নিয়ে রচিত কিতাব ‘আল-ফাতাওয়া আত্তাতার খানিয়া’, লিখক, ইবনুল আলা আল-আনসারী আদ-দেহলবী আল-হিন্দি।

²⁸⁹ ‘আইনুল ইলম’ ‘মুফিদুল মুস্তাফিদ’ ‘কিতাবুন-নেসাব’ ফিকহে হানাফীতে রচিত বিভিন্ন কিতাবের 411।

মাকরুহ বলেছেন, কেননা চাওয়ার ইচ্ছা না থাকলে সে কেন ঘরে বসে পড়ছে না”।²⁹⁰

7 - وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (تتمة) أشار بقوله فرادى إلى ما ذكره بعد في متنه من قوله ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد وتمايمه في شرحه وصرح بكراهة ذلك في الحاوي القدسي قال وما روي من الصلوات في هذه الأوقات يصلي فرادى غير التراويح". قال في البحر: قال في البحر ومن هنا يعلم كراهة الاجتماع على صلاة الرغائب التي تفعل في رجب أو في أولى جمعة منه وأنها بدعة وما يحتاله أهل الروم من نذرها لتخرج عن النفل والكراهة فباطل اهـ قلت: وصرح بذلك في البرازية كما سيذكره الشارح آخر الباب وقد بسط الكلام عليها شارحا المنية وصرحا بأن ما روي فيها باطل موضوع. وللعلامة نور الدين المقدسي فيها تصنيف حسن سماه (ردع الراغب عن صلاة الرغائب) أحاط فيه بغالب كلام المتقدمين والمتأخرين من علماء المذاهب الأربعة. (رد المحتار، ج: 2، ص: 26)

(এবং আল্লামা ইবনে আবেদীন²⁹¹ রাহ. বলেন, (পরিশিষ্ট) মুসান্নিফ²⁹² তার কথা “একা একা” বলে তিনি সেদিকে ইঙ্গিত করেন যা একটু পরে তিনি তার মতনে (বইয়ের মূল অংশে) এই বলে উল্লেখ করেন,

²⁹⁰ আল-মাতানাহ ফিল-মারাস্মাতে আনিল খিয়ানাহ, ৬৩৩, ৬৩৪, ৬৩৫ (লেখকের দেওয়া সূত্রে)।

²⁹¹ বিশিষ্ট হানাফী ফক্বীহ মুহাম্মদ আমীন ইবন উমর ইবন আব্দুল আযীয ইবন আবেদীন। ১১৯৮-১১২৫ হিজরী। দামেশেক জন্ম এবং মৃত্যু। যাকে ইমামুল হানাফিয়াহ ফিশ্-শাম বলে ভূষিত করা হয়। আল্লামা ইবনে আবেদীন বা আল্লামা শামী নামে তিনি প্রসিদ্ধ। তার কিতাব ‘রাদ্দুল মুহতার’ যা ফাতওয়া শামী হিসেবে পরিচিত তা ফিকহে হানাফীর মাসাঈলে আলাউদ্দীন হাসকাফী রচিত ‘আদুররুল-মুখতারের’ ব্যাখ্যাগ্রন্থ। (আল-আ’লাম: ৬/৪২)

²⁹² মুসান্নিফ আর্থাত ‘আদুররুল-মুখতারের’ রচয়িতা মুহাম্মদ ইবন আলী আলাউদ্দীন আল-হাসকাফী। দামেশেকের একজন হানাফী মুফতী। ১০২৫-১০৮৮ হিজরী। (আল-আ’লাম: ৬/৪২)

“আর এই রাতগুলো জাগ্রত থেকে কাটানোর জন্য মসজিদে সমবেত হওয়া মাকরুহ” পুরো আলোচনা তার ব্যাখ্যাগ্ৰস্তে রয়েছে। আল-হাবীল কুদসীতে²⁹³ তা মাকরুহ বলে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন, “এই রাতগুলোতে যে সালাতের কথার বর্ণনা রয়েছে তা একা একা পড়তে হবে, একমাত্র তারাবীহ ব্যতীত”। আল-বাহরে²⁹⁴ বলেন, “এথেকে জানা যায় যে, সালাতুর রাগাইব যা রজবের প্রথম জুমুআয় পড়া হয়, এর জন্য সমবেত হওয়া মাকরুহ এবং এটি বিদ‘আত। এটাকে নফল ও মাকরুহ থেকে বের করার জন্য রোমবাসীরা এই সালাতের মান্নতের যে হীলা অবলম্বন করে তা বাতিল”।

আমি বলি (ইবনে আবেদীন) বায্যায়িয়ায় তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, যেমন ব্যাখ্যাকার অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ করবেন। আল-মুনইয়াহ এর দুই ব্যাখ্যাকার²⁹⁵ এর উপর দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং তারা উভয়ে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, “এ ব্যাপারে যা বর্ণনা করা হয় সব বাতিল মনগড়া।

আল্লামা নুরুদ্দীন মাক্কাবিসীর²⁹⁶ এ বিষয়ে একটি সুন্দর রচনা রয়েছে তিনি এর নাম দিয়েছেন ‘রাদ্উর রাগিব আন সালাতির রাগাইব’ তিনি

²⁹³ ‘আল-হাবীল কুদসী ফিল ফুরু’ লিখক, কাযী জামাল উদ্দীন আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-গায়নবী আল-হানাফী। (কাশফুয যুনুন:১/৬২৭)

²⁹⁴ যাইনুদ্দীন ইবনে নুজাইম মিসরী আল-হানাফী ৯২৬-৯৭০ হিজরী রচিত কিতাব ‘আল-বাহরুর রাযিক’। সালাত অধ্যায়। বিতর ও নফল অনুচ্ছেদ, ২/৫৬।

²⁹⁵ ‘আল-মুনইয়াহ’ অর্থাৎ ‘মুনইয়াতুল মুসাল্লী’, এই কিতাবের দুই ব্যাখ্যাকার দ্বারা উদ্দেশ্য সম্ভবত, ‘গুনইয়াতুল মুতামাল্লী’ এবং ‘আল-কুনইয়া’ কিতাবদ্বয়ের রচয়িতা। দুটি কিতাবই ‘মুনইয়াতুল মুসাল্লী’র শরাহ। কিতাব দুটি দুর্লভ ও সম্মুখে না থাকায় এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারিনি। (সংকলক)

²⁹⁶ ইমাম নুরুদ্দীন আলী ইবনু গানিম আল-মাক্কাবিসী আল-হানাফী। মৃত্যু:১০০৪ হিজরী (কাশফুয

এখানে চার মাযহাবের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমেদের কথার
অধিকাংশ সংকলন করেছেন।²⁹⁷

وقال في موضع آخر: ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل
الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة

وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله
قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة اه
وفي البزازية ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد
الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة
القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو
الإخلاص والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل
يكره وفيها من كتاب الاستحسان وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا
اه وأطال في ذلك المعراج وقال وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء
فيحترز عنها لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى اه (رد

المحتار: ج: 2: ص: 240)

(এবং তিনি আরেক জায়গায় বলেন, আর মৃত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ
থেকে যিয়াফত খাবারের আয়োজন করা মাকরুহ। কেননা তা আনন্দের
বেলায় শরীয়ত সম্মত, অনিষ্টতার বেলায় নয়। আর এটা মন্দ
বিদ'আত। ইমাম আহমদ এবং ইবনে মাজাহ বিশুদ্ধ সনদে জারীর
ইবন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন,²⁹⁸ জারীর বলেন, “মৃত ব্যক্তির

ردع, ১/৮৪০)। সালাতুর রাগাইব নামে সালাতের বিদ'আত সম্পর্কে তার লিখিত কিতাবের নাম,
الراغب عن الجمع في صلاة الرغائب

²⁹⁷ রাদ্দুল মুহত্তার, কিতাবুস সালাত, বিতর ও নফল অধ্যায়, ২/২৬

²⁹⁸ ইবনে মাজাহ, সনদ সহীহ, মৃত ব্যক্তির পরিবারে সমবেত হওয়া এবং খাবারের আয়োজন করা নিষেধ

অনুচ্ছেদ, হাদীস নং ১৬১২, ইবনে মাজাহ এর হাদীসটির শব্দ হলো:

كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة

মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং: ৬৯০৫, মুসনাদে আহমদের শব্দ:

পরিবারের নিকট সমবেত হওয়া এবং তারা খাবারের আয়োজন করাকে আমরা নিয়াহাহ (বিলাপ) গণ্য করতাম”। বায্যাযিয়ায় রয়েছে, “আর মৃত্যুর প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন, সপ্তাহ পর এবং অনুষ্ঠানে খাবারের আয়োজন করা, বিভিন্ন মৌসুমে কবরে খাবার নিয়ে যাওয়া, কুরআন পড়ার জন্য দাওয়াতের আয়োজন করা এবং সৎ লোক ও ক্বারীদেরকে খতমের জন্য বা সূরা আন‘আম অথবা সূরা ইখলাস পড়ার জন্য সমবেত করা মাকরুহ। মোটকথা, কুরআন পড়ার সময় খাওয়ার জন্য দাওয়াতের আয়োজন করা মাকরুহ” এবং উক্ত কিতাবের ইসতেহসান অধ্যায়ে রয়েছে, “যদি দরিদ্র মানুষের জন্য খাবারের আয়োজন করে তবে ভাল”। আর মি‘রাজে²⁹⁹ এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন, “এই সবগুলো হচ্ছে লোক দেখানো ও লোক শুনানো। তাই এ সব থেকে বিরত থাকবে, কেননা তারা এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে না”।³⁰⁰

وقال في موضع آخر: وقد أظن في رده صاحب تبیین المحارم
مستندا إلى النقول الصريحة فمن جملة كلامه قال تاج الشريعة في
شرح الهداية إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا
للقارئ وقال العيني في شرح الهداية ويمنع القارئ للدنيا والآخذ
والمعطي آثمان فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء
بالأجرة لا يجوز لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للأمر
والقراءة لأجل المال فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة
فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في
هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا

كُنَّا نَعُدُّ الْاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النَّبَاحَةِ

²⁹⁹ সম্ভবত আবুল ক্বাসিম আল-কুশাইরী নাইসাবুরী রচিত ‘কিতাবুল মি‘রাজ’ উদ্দেশ্য।

³⁰⁰ রাব্বুল মুহতার, সালাত অধ্যায়, সালাতুল-জানাযা অনুচ্ছেদ, ২/২৪০।

إنا لله وإنا إليه راجعون (وبعد أسطر) كما صرح به في التاتارخانية
حيث قال لا معنى لهذه الوصية ولصلة القارئ بقراءته لأن هذا
بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة وهي بدعة ولم يفعلها أحد من
الخلفاء (رد المحتار: ج: 6: ص: 56)

(এবং তিনি আরেক জায়গায় বলেন, তাবয়িনুল-মাহারিমের লিখক³⁰¹
স্পষ্ট উদ্ধৃতির মাধ্যমে এসব প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে অনেক দীর্ঘ
আলোচনা করেন। তার বক্তব্যের মধ্য থেকে রয়েছে, “তাজুশ-শরীয়াহ
বলেন,³⁰² পারিশ্রামিকের মাধ্যমে কুরআন পড়া ছাড়ার উপযুক্ত হয়
না, না মৃতব্যক্তির জন্য, না পাঠকের জন্য”। হেদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থে
আইনি³⁰³ লিখেন, “দুনিয়ার জন্য কুরআন পাঠককে বাধা দেওয়া হবে,
দাতা, গ্রহীতা উভয়ে গোনাহগার হবে”।

মোটকথা, আমাদের যুগে পারিশ্রামিকের মাধ্যমে কুরআনের অংশ পড়ার
যে প্রচলন বিস্তার লাভ করেছে তা জায়েয নেই, কেননা এখানে পড়ার
নির্দেশ এবং ছাড়ার নির্দেশদাতাকে দেওয়া রয়েছে, আর পড়া হচ্ছে
অর্থের কারণে। অতএব বিশুদ্ধ নিয়্যাত না থাকার কারণে পাঠকই যখন
ছাড়ার পাচ্ছে না তাহলে কী-ভাবে পাঠক নিয়োগকারীর কাছে ছাড়ার
পৌছবে। যদি পারিশ্রমিক না থাকত তবে আজকাল কেউ কারো জন্য

³⁰¹ সিনানুদ্দীন ইউসুফ আল-আমাসী আল-হানাফী, আল-মক্কী, মৃত্যু: ১০০০ হিজরীর পাশাপাশি।

³⁰² আল-ইমাম তাজুশ-শরীয়াহ, আহমদ ইবন উবাইদুল্লাহ আল-মাহবুবী আল-হানাফী উমর ইবন সাদরুশ-
শরীয়াহ আল-আওয়াল, মৃত্যু: ৬৭২ হিজরী। তার লিখিত হেদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘নিহায়াতুল কিফায়াহ ফি
দিরায়াতিল হিদায়াহ। (কাশফুয-যুনুন ২/২০২২)

³⁰³ প্রখ্যাত হানাফী মুহাদ্দীস আবু মুহাম্মদ আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনি। ৭৬২৮৫৫ - হিজরী ১৩৬১ - -
১৪৫১ ঈসাব্দী। তার লিখিত হেদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘আল-বিনায়াহ’। দেখুন, বর্ণিত কিতাবের কারাহিয়াহ
অধ্যায়, মাসাঈলু মুতাফারির্কাহ, ১১/২৬৭।

পড়ত না। বরং কুরআনকে তারা উপার্জনের বস্তু ও দুনিয়া সংগ্রহের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন। (কয়েক লাইন পর) যেমন তাতারখানিয়ায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে বলেন, “এই (খতমের) অসিয়্যাতের এবং পড়ার কারণে পাঠককে দানের অসিয়্যাতের কোনো অর্থ নেই। কেননা এটা ভাড়া করার ন্যায়, আর এসবের বেলায় ভাড়া করা বাতিল এবং তা বিদ‘আত। খুলাফাদের মধ্যে কেউই এমন কর্ম করেননি)।³⁰⁴

10- وقال ايضا: ونقل العلامة الحلواني في حاشية المنتهى الحنبلي عن شيخ الإسلام تقي الدين ما نصه ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهداؤها إلى الميت لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإن في ذلك وقد قال العلماء إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأى شيء يهديه إلى الميت وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة (وبعد اسطر) وحينئذ فقد ظهر لك بطلان ما أكب عليه أهل العصر من الوصية بالختمات والتهاليل مع قطع النظر عما يحصل فيها من المنكرات التي لا ينكرها إلا من طمست بصيرته وقد جمعت فيها رسالة سميتها (شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل) (رد المحتار: ج: 6: ص: 57)

(তিনি আরো বলেন, আল্লামা হুসায়নী ‘আল-মুনতাহাল হাস্বলী’³⁰⁵ এর টিকায় শায়খুল ইসলাম তাকী উদ্দীন থেকে বর্ণনা করেন যার

³⁰⁴ রাব্বুল-মুহতার, কিতাবুল ইজারাহ, মাতলাবুন ফিল-ইসতিজার আলাত-ত্বা‘আত, : ৬/৫৬।

³⁰⁵ ফিকহে হাস্বলীতে রচিত কিতাব, মূল নাম ‘মুনতাহাল-ইরাদাত ফিল জাম‘ঈ বাইনাল মুকাম্মা‘ঈ ওয়াত-তানকীহি ওয়ায-যিয়াদাত’, লেখক, তাকীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আব্দুল আযিয ইবনুন-নায্জার আল-ফুতুহী আল-মিসরী, মৃত্যু: ৯৭২ হিজরী।

ভাষ্য হলো, “পড়ার জন্য পারিশ্রমিকের উপর নিয়োগ দেওয়া এবং এর ছওয়াব মৃতব্যক্তিকে পাঠানো শুদ্ধ নয়, কেননা কোনো ইমাম থেকে এর অনুমোদন পাওয়া যায় না। বরং আলেমগণ বলেন, নিশ্চয় ক্বারী যখন সম্পদের কারণে পড়বে তখন তার কোনো ছওয়াব নেই, অতএব সে মৃতব্যক্তির কাছে কি জিনিস পাঠাবে, মৃত ব্যক্তির কাছে কেবল সৎকর্মই পৌঁছে। আর শুধুমাত্র তেলাওয়াতের উপর পারিশ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার কথা কোনো ইমাম বলেননি”। (কয়েক লাইন পর) অতএব, এখন তোমার কাছে খতম এবং তাহালিলের অসিয়্যাত, যে দিকে মানুষ বুঁকেছে তার অন্যান্য খারাবীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া ছাড়াই তা বাতিল হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল। দৃষ্টিশক্তি লোপ করা হয়েছে এমন ব্যক্তি ছাড়া যার খারাবী কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আমি এতে একটি পুস্তিকা সংকলন করেছি যার নাম দিয়েছি ‘শিফাউল-আলীল ও বাল্লু-গালীল ফি হুকমিল-সিয়্যাতে বিল-খাতামাতে ওয়াত্তাহালীল’।³⁰⁶ এ সমস্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, প্রচলিত কুরআন খতম বিদ‘আত এবং না-জায়েয। কুরআন, হাদীস এবং কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত যুগে এর কোনো প্রমাণ নেই। এতে অংশ নেওয়া জায়েয নয়। এছাড়া প্রচলিত খতমে কুরআনে আরো অসংখ্য খারাবী রয়েছে যার কিছু নিম্নে তুলে ধরছিঃ

১. ঘোষণা এবং বলপূর্বক এতে লোকজনদের সমবেত করা হয়, যাকে শরীয়তের পরিভাষায় “তাদাঈ” (ডাকাডাকি) বলা হয় যা নফল ইবাদতে নিষিদ্ধ।

³⁰⁶ রাদ্দুল মুহতার, প্রাপ্ত অধ্যায়:৬/৫৭।

যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সামনে কিছু মানুষ সালাতুদ্দোহা জামাতের আকারে পড়ছিল, যখন তার কাছে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তিনি তাদের আমলকে বিদ'আত আখ্যা দিলেন। অথচ সালাতুদ্দোহা একাকি পড়া প্রমাণিত।

এভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এক গোত্রের ব্যাপারে শুনলেন, তারা উচ্চস্বরে তাহলিল এবং দুরুদ পড়ছে, তখন তিনি তাদেরকে বিদ'আতি বলে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন। অথচ একাকি তাসবীহ, তাহলীল এবং দুরুদ পড়া পুণ্য ও ছওয়াবের কাজ।

২. ডাকার পর যদি কিছু মানুষ কুরআন খতমে না আসে তাহলে তাকে বিভিন্নভাবে তিরস্কার করা হয়। অথচ মুস্তাহাব কাজ ছাড়ার উপর তিরস্কার জায়েয নেই।

৩. অনুপস্থিতদের ব্যাপারে মনে বিদ্বেষ, ঘৃণা, ক্রোধ বদ্ধমূল করা হয়।

৪. কুরআন খতমের আয়োজকরা বেশি লোকের উপস্থিতিতে গর্ব করে।

৫. প্রচলিত কুরআন খতম এত জরুরী মনে করা হয় যে, যদি কোনো মানুষ কুরআন খতম না করায় অথবা তার খতমের আয়োজনে মানুষ কম হয় তবে সে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

৬. পুরো কুরআন খতম জরুরী মনে করা হয়, অথচ শরীয়তে বরকত এবং ছওয়াবের জন্য কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া যিকর আযকার, তাসবীহাত, নফল এবং সাদাকাত ইত্যাদি অন্যান্য পদ্ধতিতেও এই উদ্দেশ্য অর্জন হয়।

৭. যদি পড়ার জন্য মানুষ কম জমা হয় তখন তার পুরো কুরআন খতমকে নিজের উপর চাপ এবং বিষের ঢোক মনে করে যে কোনভাবে তা গলা থেকে সরানোর চেষ্টা করা হয়। অথচ হাদীসে বর্ণিত হচ্ছে,

(اقْرؤوا القرآن ما انتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه) (صحيح

بخاري: ج: 2: ص: 757)

অর্থাৎ (এ সময় পর্যন্ত কুরআন পড় যতক্ষণ মনে বিরক্তিবোধ না হয় এবং যখন ক্লান্ত হয়ে পড় তখন ছেড়ে দাও)³⁰⁷

৮. এই অবস্থায় তাজবীদের নিয়ম কানুন, হুর্কফের সিফাতের বিশুদ্ধ আদায়, গুনাহ, ইখফা, ইজহার এবং মদসমূহের প্রতি খেয়াল করা ব্যতীত শব্দ ও অক্ষর কেটে প্রাণ পরিত্রাণের চেষ্টা করা হয়।

৯. প্রচলিত কুরআন খতমে এমন লোক আসে যে কুরআন পড়া জানে না। তখন সে কুরআন হাতে নিয়ে প্রত্যেক লাইনে বিসমিল্লাহ পড়ে অথবা শুধু আঙ্গুল ফিরিয়ে পারা রাখা দেয়। একে আঙ্গুল এবং

³⁰⁷ সহীহুল বুখারী, অধ্যায়: কুরআনের ফযিলত সমূহ, অনুচ্ছেদ: যতক্ষণ মন চায় ততক্ষণ কুরআন তেলাওয়াত করা। নং: ৪৭৭৩।

বিসমিল্লাহ খতম বলা হয়, শরীয়তে যার কোনো প্রমাণ নেই। বরং এতে কুরআনের অবমাননা।

১০. খতমের শেষ পর্যন্ত বসাকে জরুরী মনে করা হয়। তাই কোনো ব্যক্তি নিজের পারা শেষ করে কঠিন প্রয়োজন সত্ত্বেও উঠার সাহস করে না। কেননা এটাকে অত্যন্ত দোষনীয় মনে করা হয়।

১১. কোনো কোনো মানুষের তেলাওয়াতে সেজদার জ্ঞান থাকে না, ফলে সে সেজদার আয়াত পড়ে এবং শোনে তেলাওয়াতে সেজদা না করার কারণে নেকীর পরিবর্তে ওয়াজিব ছাড়ার গোনাহ নিজের মাথায় বহন করে।

১২. কোনো কোনো জায়গায় কুরআন খতমের আয়োজক সবার পক্ষ থেকে চৌদ্দ সাজদা আদায় করে নেয়। এতে পাঠকদের দায়িত্ব আদায় হয় না এবং শরীয়ত বিরোধী কাজের কারণে সাজদাকারী গোনাহগার হয়।

১৩. প্রচলিত কুরআন খতমে মিঠাইর ব্যবস্থা করা হয়। “প্রচলিত নিয়ম শর্তের ন্যায়” মূলনীতির আলোকে এটা পাঠকদের পারিশ্রমিক, আর কুরআন পড়ার পারিশ্রমিকের দাতা, গ্রহিতা উভয় গোনাহগার। তাহলে এখানে নেকীর কী প্রত্যাশা করা যায়? আর যেখানে পাঠকের নিজের ছওয়াব হচ্ছে না, সেখানে মৃত ব্যক্তির জন্য তার ঈসাল কিভাবে হতে পারে?

১৪. দাওয়াত বা মিঠাইকে এমন জরুরী করে রাখা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এর ব্যবস্থা করে না তার উপর অভিশাপ ও তিরস্কারের বুড়ি পড়ে।

১৫. প্রচলিত কুরআন খতমের জন্য তিনদিনা, চল্লিশা ইত্যাদি বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করা হয়। আর অনির্দিষ্ট ইবাদতের জন্য নিজের পক্ষ থেকে দিন নির্দিষ্ট করা মাকরুহ, না-জায়েয বরং বিদ'আত।

১৬. জারীর ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة

“মৃতব্যক্তির পরিবারে সমবেত হওয়া এবং তারা খাবারের আয়োজন করাকে আমরা ‘নাওহা’³⁰⁸ (বিলাপ) গণ্য করতাম” আর বিলাপ করা হারাম।

১৭. প্রচলিত কুরআন খতমে অংশগ্রহণকারী এবং যিনি অংশগ্রহণ করান সবার উদ্দেশ্য থাকে লোক দেখানো। লোকদেখানোর কারণে মানুষের বড় বড় আমল নষ্ট হয়ে যায়।

³⁰⁸ ‘নাওহা’ বা ‘নিয়াহাহ’, অর্থাৎ বিলাপ করে মৃত ব্যক্তির উপর ক্রন্দন করা। ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে কেউ মারা গেলে বিলাপ করে ক্রন্দনের প্রচলন ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কর্মকে জাহেলী কর্ম আখ্যা দেন এবং তা হারাম ঘোষণা করেন। দেখুন, বুখারী, ‘মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ মাকরুহ অধ্যায়’। সহীহ মুসলিম, নিয়াহার উপর কঠোরতা অধ্যায়। বুখারীর একাধিক অধ্যায়ে এ বিষয় সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসে রয়েছে লোক দেখানো আমলকারীর আমল এমন ধ্বংস হয় যেমন আগুন লাকড়ি খেয়ে ফেলে³⁰⁹ এবং আল্লাহর কাছে এমন আমল প্রত্যাখ্যাত। অতএব যে আমলটি আল্লাহর জন্য করার ছিল, বরকত এবং ছওয়াব পৌছা উদ্দেশ্য ছিল, লোকদেখানোর কারণে সমস্ত আমলে আগুন লেগে গেছে। ছওয়াব কি মিলবে? উল্টো লোকদেখানোর আযাব মাথার উপর আসলো। এই সমস্ত খারাবী শরীয়ত এবং সুন্নাত থেকে চেহারা ফিরিয়ে নেওয়ার ফলাফল। এর বিপরীত যদি শরীয়তের পদ্ধতি অবলম্বন করা হত তাহলে আরাম হত। এত কষ্ট উঠাতে হত না। ইখলাসের সহিত ও আল্লাহর জন্য হত। যার বদলে পাঠক ছওয়াব পেত। মৃত ব্যক্তির কাছেও ছওয়াব পৌছত। লোক দেখানো মারাত্মক গোনাহও মাথায় নিতে হত না।

ঈসালে সওয়াবে সঠিক পদ্ধতিঃ ঈসালে ছওয়াবের সঠিক পদ্ধতি এই যে, মৌখিক এবং শারীরিক ইবাদতের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ ঘরে একাকীভাবে যে ইবাদত করে, নফল নামায পড়ে, নফল রোজা রাখে, তাসবীহ আদায় করে, তেলাওয়াত করে, নফল হজ্ব বা উমরা করে, তাওয়াফ করে এগুলোতে শুধু এই নিয়্যাত করে নিবে যে, এর ছওয়াবটুকু আমাদের অমুক দোস্তের কাছে পৌঁছুক। তা পৌঁছে যাবে। এটাই হচ্ছে ঈসালে সওয়াব। যে ছওয়াবটুকু তোমার নিজের পাবার

³⁰⁹ লোকদেখানো আমলকে শরয়ী পরিভাষায় ‘রিয়্য’ বলা হয়। কুরআন হাদীস উভয়ের মাধ্যমে ‘রিয়্য’ হারাম প্রমাণিত। হাদীসে ‘রিয়্য’কে শিরকে আসগর বা ছোট শিরক গণ্য করা হয়েছে। ‘রিয়্য’ হারাম বা কবীরা গোনাহের অন্যতম এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে লেখক এখানে হাদীসে রয়েছে বলে যে কথা উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ “লোক দেখানো আমলকারীর আমল এমন ধ্বংস হয় যেমন আগুন লাকড়ি খেয়ে ফেলে” এই মর্মের কোনো হাদীস রয়েছে বলে অবগত হতে পারিনি। (সংকলক)

কথা তা তোমার জন্য অর্জিত হয়ে যাবে এবং যে সমস্ত লোকদের নিয়াত করা হয়েছে তারাও এর পুরো ছওয়াব পেয়ে যাবে।³¹⁰ আর্থিক সাদাকা খায়রাতের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হলো, নিজের সামর্থানুযায়ী নগদ অর্থ কোনো কল্যাণমূলক কাজে লাগিয়ে দিবে অথবা কোনো মিসকিনকে দিয়ে দিবে। এই পদ্ধতি এ জন্য উত্তম যে, এতে মিসকিন নিজের প্রয়োজন পূরা করতে পারে। যদি আজ তার কোনো প্রয়োজন না হয় তবে কালকের জন্য রাখতে পারে। তা ছাড়া এই ব্যবস্থাটি লোকদেখানো হতে মুক্ত। হাদীসে গোপনে সাদাকাকারীর এই ফযিলত বর্ণিত হয়েছে যে, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামত দিবসে নিজের

³¹⁰ আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ ঈসালে ছওয়াবের বেলায় দুই ভাগে বিভক্ত। একদল কুরআনের আয়াত, "وَأَنْ لِّئِنْ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى" অর্থাৎ: আর মানুষের জন্য তার চেষ্টা ব্যতীত কোনো কিছু নেই, (সূরা নাজম:৩৯) এই মর্মের আয়াত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস,

"إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْفُطِعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ"

“মানুষ যখন মারা যায় তখন তাঁর তিনটি আমল ব্যতীত সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। সাদাকায় জারিয়াহ, যে ইলম দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দু‘আ করে।” (তিরমিযী, হাদীস সহীহ, ওয়াক্কফ অনুচ্ছেদ, নং:১৩৭৬) এই হাদীসের আলোকে তারা বলেন: হাদীসে উল্লেখিত তিন বস্তু ব্যতীত অন্য কিছুই ঈসাল হয় না। কেননা; হাদীসে তিন বস্তু ছাড়া সব আ‘মাল বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা এসেছে। আর এ তিনটি মূলত তার নিজের চেষ্টার ফসল। সুতরাং এই হাদীস আর আয়াতে কোনো বিরোধ নেই। তবে সাদাকা যেহেতু শারীরিক ইবাদত নয়, জীবিত ব্যক্তিকে তা দেওয়া যায়, তার পক্ষ থেকে অন্যকে দেওয়া যায়, মৃত্যুর পরও তার পক্ষ থেকে দেওয়া যাবে। কিন্তু শারীরিক ইবাদত কাউকে দেওয়া যায় না তাই তার ঈসাল ও নেই। তবে শারীরিক কিছু ইবাদত যার ঈসাল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সেগুলো মানসুস হওয়ার কারণে তা এই কায়দা থেকে মুসতাসনা বা ব্যতিক্রম থাকবে। এই দল আলেমদের মতে কুরআন তেলাওয়াত যেহেতু একটি শারীরিক ইবাদত তাই তার ঈসালই হবে না, কেননা এব্যাপারে কোনো নস নেই। আর ইবাদতে বিষয় গাইরে মা‘কুল, তাই আমরা তাকে অন্য ইবাদতের উপর ক্রিয়াস করতে পারি না। আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অপদল মনে করেন, যে কোনো ইবাদতের ঈসাল হতে পারে। আমাদের লেখক এমতের প্রবক্তা হিসেবে কুরআন তেলাওয়াতের ঈসালের সঠিক পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন।

রহমতের ছায়ায় জায়গা দিবেন, যখন আর কোনো ছায়া থাকবে না এবং গরমের কারণে মানুষ ঘামে ডুবে যাবে। ফযিলতের দিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর সাদাকা হচ্ছে, মিসকিনের প্রয়োজন অনুসারে তাকে সাদাকা করবে। অর্থাৎ প্রয়োজন দেখে তা পুরা করবে। ঘর ও দোকানের বরকতের জন্যও মালিক নিজেউপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো অবলম্বন করবে।

والله سبحانه وتعالى أعلم

১৪ রবিউল আওয়াল ১৪১৭ হিজরী।

পাঠক, এই হলো উনার বক্তব্য। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, উনার লেখায় অসংখ্য কিতাব ও ফকীহের বক্তব্য ও তথ্য রয়েছে। এই লেখা পড়ার পর আশা করি সত্যসন্ধানী আলেমের জন্য বিষয়টি বুঝতে কোনো সমস্যা পেতে হবে না। একমাত্র পেটপূজারী আলেম ছাড়া কেউই হিলার বাহানা তালাশ করে উনার লিখার বিরুদ্ধে কলম ধরবেন না। শরীয়তে বৈধ বা হালাল থাকা এক কথা, আর বৈধ বানানো আরেক কথা। কুরআন হাদীসে কোনো জিনিসের বৈধতা থাকা এক কথা, কুরআন হাদীস দিয়ে বৈধ বানানো আরেক কথা। তবে প্রথমটি আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলেমদের গুণ। আর দ্বিতীয়টি গুমরাহ পেটপূজারী আলেমদের গুণ। বিষয়টি সহজে বোঝার জন্য একটি উপমা পেশ করছি। যেমন ধরুন, রাসূল আলিমুল গাইব নন বিষয়টি কুরআন ও হাদীসে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যিনি বলছেন রাসূল আলিমুল গাইব নন, তার দলীল কুরআন ও হাদীসের একাধিক জায়গায় রয়েছে। পক্ষান্তরে যে আলেম দাবী করছেন রাসূল আলিমুল গাইব, তিনি কুরআন হাদীস থেকেই তার মতের স্বপক্ষে দলীল

দিচ্ছেন। তবে তার দাবীর পক্ষে কোনো দলীল কুরআন বা হাদীসে নেই। তিনি কিছু দ্ব্যর্থবোধক আয়াত ও হাদীসকে তার মতের পক্ষে দলীল বানাচ্ছেন। এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের আলেম ছাড়া কেউই প্রচলিত খতমে কুরআনের স্বপক্ষে ওকালতি করতে পারেন না, কেননা এসবের অস্তিত্ব কুরআন, হাদীস, সাহাবা জীবনে নেই, এমনকি খাইরুল কুরুন তথা সোনালী প্রজন্ম (রাসূল, সাহাবা ও তাবেরঈ) এর কোনো যুগেও এর অস্তিত্ব খোঁজে পাবেন না।

প্রচলিত খতমের অস্তিত্ব খাইরুল কুরনে না থাকায় বিষয়টি বিদ'আত হওয়ার সাথে সাথে লেখক আরো অনেক খারাবী তুলে ধরেছেন, যা উনার অভিজ্ঞতার আলোকে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে উল্লেখিত কারণ ছাড়াও আরো যে সমস্ত খারাবী রয়েছে তার কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরিছি। এই অভিজ্ঞতা সবার নাও থাকতে পারে। আমি অধমের কাছে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছে তার কয়েকটি উল্লেখ করব।

1. পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি। মনের হিংসার জ্বালা প্রকাশ্যে রূপ নিতে অনেকের বেলায় দেখা গেছে। যেমন, একজন কোথাও দশজন নিয়ে যাওয়ার কথা। বাস্তবতা হলো, দশজন হলে এক প্রতিষ্ঠানের সবাইকে খতমের তালিকায় রাখা সম্ভব নয়। এ থেকেই হিংসা ও সমালোচনার সুত্রপাত। যা খতমের দু একদিন পর্যন্ত বা আরো বেশি চলতে থাকে।

2. অন্যের মনে জ্বালা সৃষ্টির জন্য অযথা ঠাট্টাস্বরূপ খতমের কথা বলা। অথচ হাদীসের দৃষ্টিতে মিথ্যা বলা কাজে হোক বা ঠাট্টায় হোক সর্বাবস্থায় হারাম। সাধারণ নিমণ শ্রেণির উস্তাদ নয় বরং অনেক শ্রদ্ধাভাজন আলেম

যারা দাওরায়ে হাদীসে পড়ান তাদের অনেকের কাছ থেকেও এ সব আচরণ পাওয়া যায়, যা অত্যন্ত লজ্জাজনক।

3. মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া। যেমন অনেক সময় খতম না করেই খতমের আয়োজককে মিথ্যা বলা।

4. কুরআনের সাথে ব্যবসায়িক পণ্যের মত লেনদেনের আচরণ করা এবং কুরআন নিয়ে বেয়াদবীমূলক কথা বলা। যেমন, অহরহ একথা বলতে শুনা গেছে, সিলেটি ভাষায় ‘যেলা পয়সা ওলা খতম’ অর্থাৎ টাকা হিসেবে খতমের মান নির্ণয় করা হয়। অনেককে আগেই ‘কয়টেকি খতম’ অর্থাৎ কত টাকার খতম, একথা বলতে শুনা যায়। এভাবে টাকার উপর কুরআন পড়ার মান নির্ণয় করা কুরআনের সাথে কতটুকু বেয়াদবী? তা পাঠক নিজেই বলুন। অসতর্কতায় আমার মুখ থেকেও দু-একদিন এমন কথা বের হয়েছে। আল্লাহর কাছে তওবা করেছি। আবারো করছি, তিনি যেন আমাকে মাফ করেন।

5. কুরআন সামনে নিয়ে হাসি, তামাশা, গল্পগুজবের মধ্য দিয়ে তেলাওয়াত করা। আয়োজক সামনে থাকলে তার ভয়ে একটু মনোযোগ দিয়ে পড়া। এ থেকে স্পষ্ট যে, টাকাই প্রচলিত খতমের মূল টার্গেট।

6. টাকাই যে মূল টার্গেট তা সবার মনে জানা রয়েছে। সবার আচরণে একথা স্পষ্ট। মূল টার্গেট টাকা থাকাবস্থায় আল্লাহর কাছে এসব খতমের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই, আলেম বলতেই একথা জানেন। একথা জানা

থাকা সত্ত্বেও নিজের পেট পালার তাগিদে দীন সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তাকে ধোঁকা দেয়া। তাকে রাসূলের শিক্ষার আদেশ না দিয়ে খতমের কথা বলা, অথবা নিজ থেকে না বললেও তাকে তার অজ্ঞতার উপর রাখা। সঠিক সুন্নাহের দিশা না দেওয়া। অথচ সঠিক ইলম প্রকাশের সুযোগ থাকা সত্ত্বে তা গোপন রাখা অবৈধ। হাদীসে এর উপর ধমকি এসেছে। এছাড়া সমাজিকভাবে আরো অনেক বিষয় রয়েছে যা আলেমদের জন্য লজ্জাজনক ও তাদের মান সম্মানে আঘাত, এই খতমকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে।

আহসানুল ফাতওয়ার লিখাটি অনুবাদ করার পর এ বিষয়ে নিজ থেকে কিছু লিখার প্রয়োজন ছিল না। যা নিজেই পূর্বে উল্লেখ করেছি, তথাপি দু-একটি কথা না লিখে পারলাম না। আল্লাহ প্রথমে আমাকে এবং আমাদের সবাইকে হেদায়াতের উপর পরিচালিত করুন। সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনার তওফীক দান করুন। আমীন।

খতমে ইউনুসঃ ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহর প্রেরিত একজন নবী। আল্লাহর নির্দেশের পূর্বে তিনি তাঁর গোত্র থেকে হিজরত করে চলে যান। আল্লাহর কাছে তাঁর এ কাজ অপছন্দনীয় হলে ইউনুস আলাইহিস সালামকে মাছের পেটে যেতে হয়। যার বিবরণ কুরআন পাকে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। কমবেশ আমাদের সবারই ঘটনাটি জানা আছে। বিপদে পড়ে যে কেউ নিজের গোনাহের স্বীকারোক্তি বা তওবা করে আন্তরিকভাবে আল্লাহকে ডাকলে আল্লাহ তাঁর ডাক শুনেন। ইউনুস আলাইহিস সালামের মাছের পেটে পড়ার বিপদ থেকে উদ্ধারের এই কাহিনিটি থেকে আল্লাহ আমাদেরকে এই খবরটি দেন। উদ্ধারের কাহিনিটি আল্লাহ যেভাবে উল্লেখ

করেন তাতে বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা কয়েকজন নবীর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বলেন,

(وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ) (سورة الأنبياء: 87-

(88

“আর আপনি মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন, তিনি ত্রুদ্ব হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাকে আটকাবো না। অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করে বললেন, তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তুমি দোষমুক্ত, নিশ্চয় আমি গোনাহগার। অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম। এবং তাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবে মুমিনদের মুক্তি দিয়ে থাকি”।³¹¹

এই ঘটনা থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? একটু চিন্তা করলেই যে কেউ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবে। অর্থাৎ যে কোনো বিপদে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনই একজন মুমিনের করণীয়। সকাতরে আল্লাহকে ডাকলে তিনি তাঁর ডাকে অবশ্যই সাড়া দিবেন।

এবার আমরা দেখি হাদীসে এ দো‘আর ব্যাপারে আমাদের জন্য কী দিকনির্দেশনা রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

³¹¹ সূরা আশ্বিয়া, আয়াত: ৮৭-৮৮।

" دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت
 سبحانه إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في
 شيء قط إلا استجاب الله له ". (سنن الترمذي، كتاب الدعوات عن
 رسول الله صلى الله عليه و سلم، باب 82 ، رقم: 3505، مسند
 احمد، مسند سعد بن أبي وقاص، رقم: 1462)

“মাছওয়ালা যখন মাছের পেটে থাকাবস্থায় দো‘আ করেছিলেন তখন
 তার দো‘আ ছিল,

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

(তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তুমি দোষমুক্ত, নিশ্চয় আমি
 গোনাহগার) অতএব যখনই কোনো মুসলিম ব্যক্তি কোনো বিষয়ে এর
 মাধ্যমে দো‘আ করেছে আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিয়েছেন।”³¹²

কুরআন হাদীসের শিক্ষা থেকে যে বিষয়টি উপলব্ধি হয় তা অত্যন্ত স্পষ্ট।
 সাধারণ ব্যক্তিও চিন্তা করলে বিষয়টি বুঝতে পারবেন। কুরআন হাদীসের
 শিক্ষা থেকে আমরা বুঝলাম, যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো বিপদে পড়লে
 এই দো‘আটি করতে পারে। এই দো‘আ করলে আল্লাহ তাকে বিপদ মুক্ত
 করবেন বলে আমরা পূর্ণ আশাবাদী হতে পারি। কিন্তু কে বা কারা প্রথমে
 কুরআন হাদীসের এই শিক্ষার পরিবর্তন ঘটিয়ে খতমে ইউনুস নামে খতম
 আবিষ্কার করেছে তার ইতিহাস আমাদের কাছে না থাকলেও অভিজ্ঞতার
 নামে আমরা কুরআন হাদীসের শিক্ষার বিপরীত চলছি। সাধারণ মানুষের

³¹² তিরমিযী, সুনান, হাদীস সহীহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু‘আ অধ্যায়, ৮২ নং

অনুচ্ছেদ, হাদীস নং: ৩৫০৫, আলবানী, তিরমিযির সহীহ ও দয়ীফ, ৮/৫, মুসনাদে আহমদ, সা‘দ ইবন
 আবী ওয়াক্কাসের হাদীস, নং: ১৪৬২।

অঙ্ততাকে পূঁজি করে আমাদের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার প্রচার না করা কতটুকু আমানতদারী তা প্রশ্নযোগ্য। বিবেকের কাছে কি আমরা কখনো প্রশ্নের সম্মুখীন হই না? না কি পেটের তাগিদে আমাদের বিবেকই নষ্ট হয়ে গেছে?

এই খতমের বিবরণ যেভাবে দেওয়া হয়েছে:

“কঠিন বিপদ মামলা-মোকাদ্দমা ও সঙ্কটের সময় এই দো‘আ সোয়া লক্ষ বার পড়িবে। প্রত্যেক একশতবার পড়া হইলে শরীর বা মুখে পানি দিবে। পাক অবস্থায় পাক বিছানায় বসিয়া কেবলামুখী হইয়া পড়িবে। ৩,৭ কিংবা ৪০ দিনে শেষ করিবে। মাছের পেটের ভিতর অন্ধকারের এই দোয়া জন্মলাভ করিয়াছে বলিয়া অন্ধকারে বসিয়া পড়িলে আরও সত্ত্বর ফল লাভ হয়। খতম শেষ হইলে একবার এই আয়াত পড়িবেঃ

{ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ (الانبیاء):

{ (88

উচ্চারণঃ ফাসতাজাবনা লাহু ওয়া নাজ্জাইনাহু মিনাল গাম্মি ওয়া কাযালিকা নুনজিল মুমিনীন। (১৭ পারা, সূরা আশ্বিয়া, আয়াত:৮৮)

অর্থঃ “তৎপর আমি তাঁহার (হযরত ইউনুস নবীর) দোয়া কবুল করিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে কঠিন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং এইরূপে আমি বিশ্বাসীগণকে উদ্ধার করিয়া থাকি।” এই

তাদবীরকে খতমে ইউনুস বলা হয়। ইহা প্রত্যেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী ও অব্যর্থ ফলপদ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।”³¹³

এখানে আমরা কুরআন হাদীসের শিক্ষার সাথে দুই ধরনের বৈপরীত্য দেখতে পাই।

এক: নির্দিষ্ট সংখ্যার ব্যাপারটি। যা কুরআন হাদীসের শিক্ষার বিপরীত।

দুই: বিপদে যিনি পড়েন তিনি আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করে দো‘আটি না পড়ে অন্যকে দিয়ে পড়ানো। যার কোনো শিক্ষা কুরআন বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে আমরা পাই না। সবচেয়ে হাসির ব্যাপার হলো, বিপদে পড়লাম আমি, আর আরেকজনকে এনে তাকে দিয়ে দো‘আ পড়াচ্ছি, সে তার দো‘আয় বলছে ‘নিশ্চয় আমি গোনাহগার’ আমি বিপদে পড়ে অন্যকে গোনাহগার বলানোর মাধ্যমে আমার নিজের কী লাভ?

একটু ভেবে দেখলাম না। একদিন একজন সাধারণ মানুষ আমাকে কথাটি বলে হাসিয়ে দিয়েছেন। আলেম না হয়েও তার এই উপলব্ধি দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম এবং নিজেকে ধিক্কার দিলাম এই বলে যে, বুঝেও কেন এতে জড়িত রয়েছি। আল্লাহ আমাকে মাফ করুন।

এভাবে এসব খতমের মাধ্যমে সমাজে ‘পুরোহিততন্ত্র’ চালু হয়েছে। ইসলামের নির্দেশনা মোতাবেক বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে সুন্নাত সম্মত দো‘আ পড়ে মনের আবেগ নিয়ে আল্লাহর কাছে কাঁদবে এবং বিপদমুক্তি প্রার্থনা করবে। নেককার মানুষের কাছে দো‘আ চাওয়া যাবে। তিনি তার মত করে তার জন্য দো‘আ করবেন।

³¹³ নেয়ামুল কুরআন, মৌলবী শামছুল হুদা, রহমানিয়া লাইব্রেরী, একাদশ সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ১২০।

অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে বৈধ করাঃ এসব খতম বৈধ করার স্বার্থে অভিজ্ঞতার কথা বলে ফতোয়া চালিয়ে দিতে দেখা যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার বিপরীত কার অভিজ্ঞতা বা কার কথার এত মূল্যায়ন যা রাসূলের শিক্ষাকেও হার মানায়? আর যিনি এ নির্দিষ্ট সংখ্যার অভিজ্ঞতার কথা বললেন, তিনি নিজে পড়ার কথা বললেন, না কি অন্যকে দিয়ে পড়ানোর? যাই হোক এর কোনটিই যেহেতু রাসূলের শিক্ষা নয় তাই আমরা এ সবের পিছনে পড়ার প্রয়োজন বোধ করি না। এ সব কথাবার্তা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। এতে করে শরীয়ত পরিবর্তন হয় বলে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। একটি সহজ উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে বলে আশা করছি। যেমন ধরুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের আলোকে আমরা জানি, সাদাকা বা দানের মাধ্যমে বালা মুসিবত দূর হয়। এবার মনে করুন কোনো ব্যক্তি কোনো এক তারিখের নির্দিষ্ট সময়ে, যেমন সে শাওয়াল মাসের ৬ তারিখ শনিবার বিকাল ৫টার সময় ১০ টাকা দান করল। আল্লাহর অনুগ্রহে তার একটি মুসিবত দূর হলো। আমরা বলতে পারি এই সাদাকার ওসীলায় হয়ত আল্লাহ তাঁর মুসিবত দূর করেছেন। কেননা সাদাকায় মুসিবত দূর হয় বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে আমরা পেয়েছি। এমন কয়েকবার হলে সে বলতে পারে, অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে সাদাকায় মুসিবত দূর হয়। কিন্তু এ দানকারী লোকটি যদি বলে, অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে ১০ টাকা দান করলে মুসিবত দূর হয় তাই সবাই দশ টাকা দান করাকে আমল বানান। আরেকটু এগিয়ে যদি বলে, শাওয়াল মাসে দশ টাকা দান করলে মুসিবত দূর হয়, আরো বাড়িয়ে যেমন, শাওয়াল মাসের ৬ তারিখ দশ টাকা দান করলে মুসিবত দূর হয়, আরেকটু

এগিয়ে যেমন, শাওয়াল মাসের ৬ তারিখ শনিবার বিকাল ৫টার সময় ১০ টাকা দান করলে মুসিবত দূর হয়। তাই সবাই এভাবে আমল করুন। তাঁর এই কথাগুলো একেবারে মুখ ছাড়া কেউ গ্রহণ করবেন বলে জানি না। যদিও সে তার আমলের ফলাফল এভাবে পেয়েছে। কিন্তু তার এই অনুভূতি রাসূলের শিক্ষা বিবর্জিত। এতে শরীয়তের মূল শিক্ষা পরিবর্তন হয়, তাই তার অনুভূতি কখনো গ্রহণ করা যায় না বা অভিজ্ঞতার নাম দিয়ে এ ধরনের আমল শুরু করা যায় না। এবার এর আলোকে আমরা ‘খতমে ইউনুস’ নামের খতমের কথাটি চিন্তা করি। আশাকরি এসবের অসারতা বুঝতে আর কারো কোনো দ্বিধা থাকবে না।

এতো হলো খতমের নামে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তন থেকেই খতমকে কেন্দ্র করে অন্যান্য খারাবী ও নাজায়েযের সূচনা। যে কোনো সুন্নাতকেই তার স্বাভাবিক অবস্থা তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমলের রূপরেখা থেকে সরিয়ে দিলে সুন্নাত নিমজ্জিত হওয়ার সাথে সাথে আরো অনেক নাজায়েয যোগ হয়। যার অনেকটা আমরা ইতোপূর্বে খতমে কুরআনের শেষে উল্লেখ করেছি। অধিক সংখ্যক পড়া নিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া, খতম পাঠকারী হুজুর ও খতমের আয়োজকের মাঝে সন্দেহ, মন কষাকষির সৃষ্টি হওয়া, টাকার পরিমাণ হিসেবে খতমের সংখ্যায় কমবেশ করা, আলেমদের সাথে জাহেলের বেয়াদবীমূলক আচরণ ইত্যাদি। টাকার স্বার্থে বুঝে না বোঝার ভান করে অনেক শ্রদ্ধাভাজন আলেমকে তাঁর সম্মান বা নিজ অবস্থানের অনেক নিচে নামতে দেখা যায়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ সব থেকে পরিত্রাণ দান করুন এবং হুবহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীক্বার উপর চলার তওফিক দান করুন।

খতমে বুখারীঃ মুমিন ব্যক্তির জীবনে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদীস ছাড়া মুমিন তাঁর ইসলামী জীবন কল্পনা করতে পারে না। কুরআন হাদীস উভয় মিলেই তাঁর জীবন পরিচালিত। তাই কুরআনের মতই হাদীস শিক্ষা করা, হাদীস চর্চা করা মুমিনের জন্য অপরিহার্য। প্রতিটি মুমিনের জন্য জ্ঞান শিক্ষা করা ফরয। আর কুরআন ও হাদীসই হচ্ছে মুসলিমের মূল জ্ঞান ভাণ্ডার। এই হাদীস শিক্ষা, চর্চা, মুখস্থ রাখা, সংরক্ষণ করা ও প্রচার প্রসারে সাহায্যে কেবলম থেকে শুরু করে উম্মতের একদল আলেম তাদের জীবনের পুরো অংশটিই ব্যয় করে দিয়েছেন। যাদের মেহনত, শ্রমের বদৌলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সঠিকভাবে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه قرب حامل فقهه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه ».

(سنن أبي داود، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم، رقم: 3662،
 سنن الترمذي، كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
 باب الحث على تبليغ السماع، رقم: 3656)

“আল্লাহ তাঁর চেহারাকে উজ্জ্বল করুন যে আমার কাছ থেকে কোনো হাদীস শুনল, অতঃপর সে তা সংরক্ষণ করল, এমনকি তা অন্যের কাছে পৌঁছাল। অনেক ফিকহ (হাদীস) এর ধারক এমন রয়েছে, সে যার কাছে পৌঁছায় সেই ব্যক্তি তাঁর চেয়ে অধিক ফকীহ। আর অনেক ফিকহের ধারক নিজে ফকীহ নয়।”³¹⁴

³¹⁴ আবু দাউদ, সুনান, ইলম অধ্যায়, ইলম প্রচারের মর্যাদা পরিচ্ছেদ, নং: ৩৬৬২, তিরমিযী, সুনান,

অধ্যায়: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত ইলম, পরিচ্ছেদ: শ্রবণকৃত প্রচারের উৎসাহ,

হাদীসটির মর্ম হচ্ছে, অনেক সময় এমনও হয় যে, যার কাছে পৌছানো হয় সে হাদীসের মর্ম বা ভাব যিনি পৌছিয়েছেন তার চেয়ে বেশি বুঝেন। আবার এমনও অনেক রয়েছেন যিনি শুধুমাত্র হাদীসটি মুখস্থ রাখতে পেরেছেন কিন্তু তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি, হতে পারে যার কাছে পৌছাবেন তিনি এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবেন, তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসকে বেশি বেশি পৌছানো ও প্রচারের দিকে উৎসাহিত করেছেন।

উলামায়ে কেরামের এই দল উক্ত হাদীসের পুরোপুরি হক্ক আদায় করার চেষ্টা করেছেন। এদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর নামে মিথ্যা বানিয়ে বলার দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা পাওয়া গেলেও সাধারণত কেউই সে সময় তাঁর নামে মিথ্যা কথা বলার সাহস পেত না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর মিথ্যা বানিয়ে বলা শুরু হয়। মুনাফেক, ফাসেক, স্বার্থাশ্বেষী তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য রাসূলের নামে মিথ্যা বানিয়ে বলত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বলে সরলমনা মুসলিমদের ধোকা দেওয়া সহজ ছিল। কিন্তু হাদীস গ্রহণে সাহাবিদের সতর্কতা ও যাচাইয়ের কারণে তা তাদের মধ্যে খুব প্রসার লাভ করতে পারে নি। প্রখ্যাত তাবিয়ী মুজাহিদ (রহ.)³¹⁵ বলেনঃ

"جاء بشير العدوى إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس

নং:৩৬৫৬, হাদীস সহীহ।

³¹⁵ বিশিষ্ট মুফাসসির তাবিয়ী মুজাহিদ ইবন জাবর আবুল হাজ্জাজ মক্কী, ২১-১০৪ হিজরী। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে তাফসীর শিক্ষা লাভ করতেন। (আল-আ'লাম: ৫/২৭৮)

ما لى لا أراك تسمع لحديثى أحدثك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا تسمع. فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بأذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف". (صحيح مسلم، مقدمة، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء، 10-1)

“(তাবিয়ী) বুশাইর আল-আদাবী ইবনে আব্বাসের (রা) কাছে আগমন করেন এবং হাদীস বলতে শুরু করেন। তিনি বলতে থাকেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা) তার দিকে কর্ণপাত করলেন না। তখন বুশাইর বলেন: হে ইবনু আব্বাস, আমার কি হলো! আমি আপনাকে আমার হাদীস শুনতে দেখছি না? আমি আপনার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস বর্ণনা করছি, অথচ আপনি কর্ণপাত করছেন না! তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: একসময় ছিল যখন আমরা যদি কাউকে বলতে শুনতাম: ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন’, তখনই আমাদের দৃষ্টিগুলো তাদের দিকে আবদ্ধ হয়ে যেত এবং আমরা পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তাঁর প্রতি কর্ণপাত করতাম। কিন্তু যখন মানুষ খানাখন্দক ভালমন্দ সব পথেই চলে গেল তখন থেকে আমরা আর শুধুমাত্র সুপরিচিত ও পরিজ্ঞাত বিষয় ব্যতীত মানুষদের থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করি না।”³¹⁶

³¹⁶ সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দিমাহ, দুর্বলদের থেকে বর্ণনা গ্রহণ করা নিষেধ অনুচ্ছেদ, ১/১০।

মুসলিম উম্মাহর ভিতরে মিথ্যাবাদী হাদীস বর্ণনাকারীর উদ্ভব হবে বলে নবী আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক করেন। তার থেকে কিছু শুনেই যাচাই ছাড়া নির্বিচারে গ্রহণ করা, বর্ণনা করা থেকে উম্মতকে সর্বোচ্চ সতর্ক ও সাবধান করে দেন। মিথ্যা বা সন্দেহযুক্ত হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ আরোপ করেন। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أَنَسٌ يُحَدِّثُكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَأَيُّكُمْ وَإِيَّاهُمْ » (صحيح مسلم، المرجع السابق)

“শেষ যুগে আমার উম্মতের কিছু মানুষ তোমাদেরকে এমন সব হাদীস বলবে যা তোমরা বা তোমাদের পিতামহগণ কখনো শুনে নি। খবরদার! তোমরা তাদের থেকে সাবধান থাকবে, তাদের থেকে দূরে থাকবে।”³¹⁷

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে আরেকটি হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع »

“একজন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বর্ণনা করবে।”³¹⁸

³¹⁷ সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত।

³¹⁸ সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দিমাহ, যা কিছু শুনে তার সব বর্ণনা থেকে নিষেধাজ্ঞা অনুচ্ছেদ, ১/৮

এভাবে অগণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে উম্মতকে সর্বোচ্চ সতর্ক করেছেন।

একদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সতর্কবাণী, অপরদিকে জালিয়াতদের জালিয়াতী উম্মতের এই শ্রেষ্ঠ জাতি উলামাদল তথা মুহাদ্দিসীদের শ্রমকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে বর্ণিত অগণিত হাদীসের মধ্য হতে প্রকৃত হাদীসটি খোঁজে বের করতে তাদেরকে অনেক শ্রম দিতে হয়েছে। হাদীস মূলত কুরআনের ব্যাখ্যা বা প্রজ্ঞা হিসেবে কুরআনের মতই তার হেফাযত করতে আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের আলেমের এক ঝাঁক তৈরী করে দেন। যারা তাদের জীবনের সিংহভাগই হাদীস চর্চার পিছনে ব্যয় করে রাসূলের প্রকৃত বাণীটি উম্মতের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হন। আর একেই আমরা সহীহ হাদীস বা বিশুদ্ধ হাদীস বলে জানি।

উলামায়ে উম্মতের এই শ্রেণির অন্যতম ছিলেন ইমাম বুখারী (রাহ.)। আরব রীতি অনুযায়ী বংশধারা সহ তার পুরো নাম হলো, মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরাহ ইবন বারদিযবাহ। তার মূল নাম মুহাম্মদ। তিনি ১৯৪ হিজরীর শাওয়াল মাসের ১৩ তারিখ রোজ শুক্রবার (৮১০ খ্রিস্টাব্দ) খোরাসানের বুখারা এলাকায় (বর্তমানে উজবেকিস্তানের অংশ) জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৯ বৎসর বয়সে কুরআন মুখস্থ শেষ করেই ১০ বৎসর বয়স থেকে হাদীস মুখস্থ, হাদীসের চর্চা, হাদীস সংরক্ষণ করতে বিভিন্ন মুহাদ্দিসের কাছে যাতায়াত শুরু করেন। তার মেধা ছিল বর্ণনাতীত। তার মেধা, হাদীস গ্রহণে সতর্কতার বিভিন্ন ঘটনা কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে। তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্ম 'সহীহুল বুখারী' নামে প্রসিদ্ধ হাদীসের

এই গ্রন্থটির রচনা বলে উল্লেখ করেছেন উলামায়ে কেরাম। হাদীসের উপর পূর্ণ পাণ্ডিত্য অর্জনের পর ২১৭ হিজরী সনে তার বয়স যখন ২৩, তখন তিনি এই গ্রন্থটির রচনা শুরু করেন। গ্রন্থটিতে শুধুমাত্র সহীহ হাদীসকেই স্থান দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি দীর্ঘ ষোল বছর সাধনার মধ্য দিয়ে ২৩৩ হিজরী সনে এর কাজ সমাপ্ত করেন। রচনাকালে তিনি সর্বদা সওম পালন করতেন এবং প্রতিটি হাদীস লিখতে গোসল করে দু রাক‘আত সালাত আদায় করতেন বলে জানা যায়। বিশুদ্ধতার উপর নিশ্চিত হওয়ার আগে কোনো হাদীস লিখতেন না। বর্ণনায় আরো জানা যায় যে, তিনি বিশুদ্ধ থেকে বিশুদ্ধতম হাদীসের সংকলনের ইচ্ছায় তার মুখস্থ অনুমানিক ছয় লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে একেবারে সহীহ বা বিশুদ্ধ হাদীসটিকেই এই গ্রন্থে স্থান দেন। এত সংখ্যক হাদীস থেকে বিভিন্ন হাদীস বারবার বর্ণনা সহকারে মাত্র ৭২৭৫ বা তার সামান্য কমবেশ³¹⁹ হাদীস তার কিতাবে স্থান পেয়েছে। সহীহুল বুখারী হিসেবে কিতাবটির নাম সর্বজনের কাছে পরিচিত। তবে তার মূল নাম হচ্ছে ‘আল-জামি‘উস-সহীহ’। ২৫৬ হিজরীর ১লা শাওয়াল, মোতাবেক ৩১ আগষ্ট ৮৭০ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার দিবাগত রাতে ৬২ বৎসর বয়সে এই মহান ব্যক্তিত্ব মারা যান।³²⁰

উলামায়ে উম্মতের মূলধারার আলেম তথা আহলুসুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলেমদেরকে সর্বদা সহীহ হাদীসকেই গ্রহণ করতে এবং অন্যান্য ভেজালযুক্ত হাদীসকে চিহ্নিত করে প্রত্যাখ্যান করতে দেখা গেছে। জানা অবস্থায় কেউই সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কোনো হাদীস গ্রহণ করতেন না। সহীহ হাদীস ছাড়া শরীয়তের বিষয়াদি প্রমাণ করতেন না। ইমাম বুখারী

³¹⁹ ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ১০ নং অনুচ্ছেদ জামে‘ এর হাদীসের সংখ্যা, ১/৪৬৫।

³²⁰ বিস্তারিত দেখুন, শায়খ আব্দুল্লাহ মুহসিন, আল ইমাম বুখারী ও কিতাবুহু আল-জামি‘উস সহীহ। 440

তাঁর এই রচনায় সহীহ গ্রহণের প্রচেষ্টায় পূর্ণ সফল হয়েছেন বলে সমস্ত উলামায়ে মুহাদ্দিসীন যাচাই ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি তার চেষ্টায় সফল হওয়ায় সারা বিশ্বের আনাচে কানাচে তাঁর কিতাবের সুনাম, সুখ্যাতি ও মূল্যায়ন ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কিতাব দল মত নির্বিশেষে সর্বজনের কাছে ‘আসান্হুল কুতুব বা‘দা কিতাবিল্লাহ’ বা কুরআনের পর সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ কিতাব হিসেবে ভূষিত হয়। এর মত আরেকটি কিতাব ‘সহীহ মুসলিম’ ছাড়া অন্য সব কিতাবের হাদীস যাচাই করে নেওয়াকে মুহাদ্দিসীনে কেলাম জরুরী মনে করলেও তাঁর এ কিতাবের হাদীসগুলো নির্বিচারে গ্রহণের অনুমোদন দেন।

এই হলো ‘সহীহুল বুখারী’ বা আমাদের মাঝে ‘বুখারী শরীফ’ হিসেবে পরিচিত কিতাবের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সারকথা। অত্যন্ত সংক্ষেপে আমরা যে সার কথাটি জানলাম তা হলো,

*‘সহীহুল বুখারী’ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারীর লিখিত একটি হাদীসের কিতাব।

* এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিপুল সংখ্যক বিশুদ্ধ হাদীসের এক বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে।

* তাঁর কিতাবের সমস্ত হাদীস বিশুদ্ধ বলে মুহাদ্দিসীনে কেলামের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে।

* যাচাই বা নিরীক্ষা ছাড়াও আমরা তাঁর কিতাবের হাদীস গ্রহণ করতে পারি।

তাঁর কিতাবের হাদীসগুলো সহীহ জানার পর এখন আমাদের করণীয় কী?
এই প্রশ্নের উত্তর আহলুসুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলেমদের কাছে একটিই।
আর তা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা মোতাবেক আমাদের করণীয়ঃ

* হাদীসগুলো থেকে আমাদের জ্ঞান আহরণ করতে হবে।

* বেশি বেশি এই হাদীসগুলোর চর্চা করতে হবে।

* হাদীসগুলো নিজে বুঝা এবং অপরকে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে।

* হাদীসগুলো মুখস্থ করা, বর্ণনা করা, তার প্রচার প্রসার করতে হবে।
হাদীসের ক্ষেত্রে এই হলো রাসূলের শিক্ষা। সাহাবায়ে কেরামের জীবন থেকেও আমরা এই শিক্ষাই দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বীকৃত খাইরুল কুরুনেও এই ছিল হাদীসের ক্ষেত্রে তাদের আচরণ।

এর বিপরীত ঈসালে ছওয়াবের জন্য হাদীস তেলাওয়াত করা, অসুস্থ হলে বা যে কোনো বিপদে মুসিবতে পড়লে হাদীস পাঠ করে দো‘আ করার কোনো নজীর না রাসূলের শিক্ষায় রয়েছে, না সাহাবিদের জীবনে রয়েছে, না খাইরুল কুরুনে রয়েছে। কিন্তু কে বা কারা কুরআনের মত বিভিন্ন বাহানায় এই কিতাবের হাদীসকে তাদের অর্থ উপার্জনের জন্য ‘খতমে বুখারী’ নামে এই প্রসিদ্ধ ‘সহীহুল বুখারী’ কিতাবের খতম বের করেছে তার কোনো হাদীস না থাকলেও আমাদের মাঝে তা অত্যন্ত প্রসার লাভ করেছে। এই কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে দো‘আ করলে নাকি দো‘আ কবুল হয়। রাসূলের বাণী ছাড়া এমন কথা বলার সাহস আমরা কী-ভাবে

পাই তাতে অবাক লাগে। এর নাম আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর মিথ্যা অপবাদ নয় কি? আমাদের বাস্তব জীবনে এই কিতাবের হাদীসের তেমন একটা গুরুত্ব না দেখা গেলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষার উল্টো বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহ এবং এই বিপরীতমুখি শিক্ষার দিকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে দেখা যায়। পেটপূজারী বা আলেম নামে অজ্ঞ কোনো ব্যক্তি হয়তো এর সূচনা করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে খাইরুল কুরূনের বিপরীত কর্ম কী-ভাবে বর্তমান আহলুসুন্নাহ ওয়াল জামাত দাবীদার আলেমদের মাঝে প্রচলন লাভ করে তা ভেবে পাওয়া মুশকিল। অর্থের লোভ ছাড়া বাহ্যত আর কোনো কারণ না দেখে গেলেও এতসব আলেমকে এদিকে সম্পৃক্ত করাটাও দুস্কর। আল্লাহই ভাল জানেন। কথিত রয়েছে, ইমাম বুখারী রাহ. না কি এই কিতাব শেষ করে দো‘আ করেছিলেন। এই বাহানায় এই কিতাবের খতমের দিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়ে থাকে। পাঠক, এই কথাকে আপনি নিজের বিবেক খাটিয়ে একটু চিন্তা করে বুঝুন। ইমাম বুখারী রাহ. এত বছরের সাধনায় যে কর্ম করেছেন তা তাঁর একটি নেক আমল। কুরআন ও হাদীসের ভাষায় যা ‘আমলে সালেহ’। তাঁর কর্মটি যে ‘আমলে সালেহ’ এতে কোনো সন্দেহ নেই। হাদীসের মাধ্যমে আমরা তা প্রমাণ করেছি। ‘আমলে সালেহ’ বা নেক কর্মের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। আমলে সালেহের পর দো‘আ কবুল হয় বলে হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি। তাই বুখারী রাহ. এর জন্য এটা করা স্বাভাবিক। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, ‘আমল’ কোনটি সালেহ আর কোনটি সালেহ নয় তা সম্পূর্ণ তাওকীফী বা নুসূস নির্ভর বিষয়। ওহির বাইরে যুক্তি দিয়ে এ বিষয়ে কিছু বলার সুযোগ নেই। ইমাম বুখারী রাহ. এর কর্মটি আমলে সালেহ হওয়ার বেলায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এর বাণী রয়েছে। কিন্তু আমাদের এই কর্ম কি তাই? তার কর্ম আর আমার কর্ম কি এক? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এমনটি করতে বলেছেন? সাহাবিরা কখনো এমনটি করেছেন? এসবের উত্তর যদি ‘না’ হয় তবে কোন বাহানায় আমরা এ ধরনের কর্মের বৈধতা দেই? না কি উপার্জনের স্বার্থে হালালকে হারাম করার মত পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা আমরা অর্জন করেছি? এই খতমের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য আরো বলা হয়ে থাকে যে, ইমাম বুখারী রাহ. নাকি এই কিতাবের কাজ সমাপ্তির পরে আল্লাহর কাছে দো‘আ করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর এই কিতাবটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে দো‘আ করবে আল্লাহ যেন তাঁর দো‘আ কবুল করেন। এ থেকেই নাকি এই খতমের সুত্রপাত। পাঠক, এই কথাটি আপনি কী হিসেবে দেখেন? বুখারী রাহ. এর কিতাব রচনার প্রেক্ষাপটের নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে আপনি এমন কোনো কথা পাবেন না। ‘সহীহুল বুখারী’ রচনার কয়েক শতাব্দী পর পর্যন্ত ইমাম বুখারী রচিত এ গ্রন্থের চর্চা, তার খেদমত অত্যন্ত ব্যাপক হারে হলেও খতমের নজীর দেখবেন না। এ থেকেই এসব কিছু যে বানানো গল্প তা অতি সহজে অনুমেয়। তা ছাড়া বুখারী রাহ. এর মত বিশুদ্ধ আকীদার ধারক ব্যক্তির দিকে এমন কথার অপবাদ দেওয়া কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা বিবেকের কাছে প্রশ্ন। ইমাম বুখারী (রাহ.) তিনি কি শারি‘ তথা শরীয়ত প্রবর্তক? তিনি এমন কথা বললে তা অনুসরণযোগ্য হবে? নাকি তার আকীদা প্রশ্নবিদ্ধ হবে? যাই হোক আমরা অযথা অনির্ভরযোগ্য কোনো কথার উপর ভিত্তি করে ইমাম বুখারী (রাহ.) এর ব্যক্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারি না। আমরা এই কথাগুলোকেই অসার বলে ধরে নেই। বুখারী পড়ে দো‘আ কবুল হলে রাসূলের অন্য সব হাদীসের কি দোষ? নাকি আপনার অভিজ্ঞতায় অন্য

হাদীস পড়ে দো‘আ করলে তা কবুল হয় না, শুধু এই কিতাবের হাদীস পড়লে দো‘আ কবুল হয়? সাহাবিরা যে সব হাদীস জানতেন তা তাদের কাছে হাদীস বলে সন্দেহ ছিল নাকি? নাকি তারা এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন? নাকি তাদের কারো জীবনে কোনদিন কোনো বিপদ মুসিবত আসে নি? তারা একটি দিনও একটি হাদীস পড়ে দো‘আ করলেন না তার কারণ কি?

মোটকথা, অভিজ্ঞতার নামে রাসূলের শিক্ষার বাইরে আমাদের কিছু বলার অধিকার নেই।

পাঠক, আশা করি আমরা এই বুখারী খতমের তাৎপর্য বুঝতে পেরেছি। এতো হলো শুধুমাত্র মূল খতমের বিষয়। অর্থাৎ এটি একটি রাসূলের শিক্ষা বিরোধী কর্ম। যার কোনো নজীর বা দৃষ্টান্ত সোনালী যুগে নেই। অপরদিকে খতমে কুরআনের বেলায় তা খেলাফে সুন্নাহ হওয়া ছাড়া আরো যে সমস্ত অতিরিক্ত খারাবী উল্লেখ করা হয়েছিল তার অনেকটা এই খতমে বুখারীতেও রয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে তা খতমে কুরআনের তুলনায় অধিক। যেমনঃ

* কুরআন খতম করা বুখারী খতমের তুলনায় অনেক সহজ। তাই কুরআন সাধারণত খতম তথা পড়ে শেষ করা হয়। খতম না করে মিথ্যা বলার ধোকা কুরআনের বেলায় কম হয়। পক্ষান্তরে বুখারী পুরো পড়া অনেক কঠিন। তাই এখানে খতমের আয়োজকের জিজ্ঞাসার উত্তরে খতম হয়ে গেছে বলে মিথ্যার ধোকা প্রায়ই অপরিহার্য বলে দেখা যায়।

* কুরআন সাধারণত আলেম বলতেই সবাই পড়তে পারে। তাই তাজবীদ, সিফাত, হক্ক আদায় করে তেলাওয়াত বা অতি দ্রুত তেলাওয়াতের ত্রুটি

ছাড়া সাধারণত শব্দ ভুলের ত্রুটি হয় না। পক্ষান্তরে বিজ্ঞ আলেম ছাড়া অনেকেই হাদীস পড়তে পারে না। টাকার স্বার্থে খতমে অংশ নিয়ে সে আল্লাহর রাসূলের বাণীকে তার মনমত ভুল উচ্চারণ করে। এমন ভুলকেও মুহাদ্দিসীনে কেরাম রাসূলের উপর মিথ্যা বলার অপরাধ বলে গণ্য করেছেন।

* ইতোপূর্বে বলেছি যে, বুখারী অধিকাংশ সময়ই খতম হয় না। একজনের অংশ শেষ হলেও আরেকজন তার নির্ধারিত অংশ শেষ করতে পারে না। এক্ষেত্রে মানুষের সাথে মিথ্যা বলা ধোকা দেওয়ার সাথে সাথে দো‘আর সময় আল্লাহর সাথে মিথ্যা বলতে অনেক দিন লক্ষ্য করা গেছে। যেমন, দো‘আয় বলা হয়, “আল্লাহ, এই আমাদের বুখারী খতমকে...” “যে খতম করা হয়েছে...” ইত্যাদি।

* হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পড়া অবস্থায় অনর্থক গল্পগুজব, হাসিঠাট্টা, ঢং তামাশা থেকে সাধারণত কোনো মজলিসই খালি থাকে না। একমাত্র খতমের আয়োজক সামনে থাকলে তাঁর ভয় বা সম্মানে নিশ্চুপ পড়া হয়। হাদীসের সাথে বেয়াদবী ছাড়া এ সবের নাম কি দেওয়া যায়?

* এই খতমে মাঝে মাঝে সবচেয়ে বড় আপত্তিকর যে বিষয়টি সংঘটিত হয় তা হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম জপের মাধ্যমে বরকত গ্রহণ যা সম্পূর্ণরূপে শির্ক। কেননা বরকতের জন্য কারো নাম জপ করা তাঁর ইবাদত বা আর্চনার শামিল। বরকতের জন্য একমাত্র আল্লাহর নামই নেওয়া যায়। তাই বরকতের জন্য আল্লাহ ছাড়া কারো নাম এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিলেও শির্কের গোনাহ কাঁধে বহন করতে

হবে। কিন্তু অনেক সময় খতমে বুখারীর অনুষ্ঠানের শেষদিকে আসহাবে বদরিয়্যিন অর্থাৎ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাগণ সম্বলিত হাদীসটি সবাইকে শুনিয়ে পুনরায় পড়া হয়। তাদের নাম নেওয়ার কারণ হিসেবে বরকতের কথা উল্লেখ করা হয় এবং পরবর্তীতে তাদের নামের দোহাই দিয়ে দো‘আ করা হয়। কারো দোহাই দিয়ে দো‘আর ব্যাপারটি খতমে তাসমিয়াতে আমরা আরেকটু বিস্তারিত জানব ইনশাআল্লাহ। এখানে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, বরকতের জন্য আল্লাহ ছাড়া কারো নাম নেওয়া শির্ক।

সত্য সন্ধানী নিঃস্বার্থ ব্যক্তির জন্য এই খতমের তাৎপর্য বুঝতে আর কোনো বেগ পেতে হবে না বলে আশা করি। আল্লাহ সর্বপ্রথম আমাকে অসংখ্য এসব মজলিসে শরীক হওয়ার কারণে যে সব গুনাহ সংঘটিত হয়েছে তা থেকে ক্ষমা করুন এবং আমি সহ সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন। স্বার্থের জন্য দীনকে জলাঞ্জলি দেওয়া থেকে আমাকে এবং সবাইকে বিরত রাখুন। আমীন।

খতমে না-রীঃ খতমে নারী’ বা ‘দুরুদে নারীয়াহ’। মানুষের বানানো দুরূদের নামে নির্দিষ্ট কিছু বাক্য। এই বাক্যগুলো ৪৪৪৪ বার পড়লে এই খতম হয়। কথিত আছে এই খতম পড়লে নাকি আগুন যেমন কোনো বস্তুকে ভস্মীভূত করে দেয় ঠিক তদ্রূপ এই খতমও বিপদ আপদকে ভস্মীভূত করে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই এই খতমের নাম আরবী শব্দ “نار” যার অর্থ আগুন, এই অর্থের দিকে সম্পৃক্ত করে এর নাম ‘খতমে নারী’ বা ‘দুরুদে নারী’ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই খতমের উৎপত্তি কোথা থেকে? এর প্রথম আবিষ্কারক কে? এতে যে দো‘আ পড়া হয় তার মর্ম কী? অনেকে একে

দুরূদে নারী নাম দেন, একে দুরূদ নামে নামকরণ করা অদৌ বৈধ কি না? তা জানা না থাকলেও কারো কারো কথায় আমরা এমন কাজের পিছে দৌড়াই। এতে যেমন কান্না পায় আবার হাসিও পায়। অথচ দুনিয়ার সাধারণ একটি বিষয় হলেও আমরা অনেক যাচাই বাছাই করে অগ্রসর হই। ডাক্তারের কথা শুনলেই দৌড়াই না, বরং পূর্বে তার সম্পর্কে অবগত হওয়ার চেষ্টা করি। অথচ ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে একটি আমল করছি বা করাছি আর একবারও ভেবে দেখছি না। এসব হচ্ছে ঈমান আক্বীদার বিষয়ে আমাদের শৈথিল্য আচরণের বহিঃপ্রকাশ। প্রশ্ন হলো, যিনি আমাকে এই খতম পড়ানোর জন্য উৎসাহিত করলেন তিনি তার কতটি রোগ বালাই এই দুরূদ দ্বারা সমাধান করেছেন? নাকি হাসপাতাল আর ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছেন? এই দুরূদের এত অ্যাকশন হলে তিনি নিজে বিভিন্ন সময়ে বিপদে জর্জরিত হয়ে তা দূর করার জন্য অন্য পথ খোঁজেন কেন? জানা দো‘আটি পড়ে ফেললেই তো হয়। আফসোস, যার নিজের আস্থা এই দুরূদের উপর নেই, থাকার কথাও নয়, তিনি কীভাবে মানুষকে এটি পড়ানোর উপদেশ দেন? অপরদিকে আমাদের পাগলামী দেখে আফসোস হয় যে, আমরা কী-ভাবে এমন কথা গ্রহণ করি? ঔষধ মনে করলেও খাবে একজন আর ভাল হবে আরেকজন? এইটুকু বোঝার কি বিবেক আমাদের নেই? যাই হোক এবার আমরা মূল বিষয়ে আসি এবং জানার চেষ্টা করি খতমে না-রী কী? এবং তা পড়া বা পড়ানো কতটুকু সমীচীন? প্রথমেই মানুষের বানানো দো‘আটি ও তার অর্থ উল্লেখ করছি। সত্যসন্ধানী ব্যক্তি অর্থের দিকে একটু মনোনিবেশ করলেই দো‘আটির তাৎপর্য এবং এমন দো‘আ পড়া কতটুকু সিদ্ধ তা বুঝে নিতে পারবেন। দুরূদের নামে আরবী যে বাক্যগুলো পড়া হয় তা নিম্নরূপঃ

"اللَّهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي
تَنَحَّلَ بِهِ الْعُقَدُ، وَتَنَفَّرَ بِهِ الْكُرْبُ وَتَقَضَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتَنَالَ بِهِ
الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفْسٍ بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ".

“হে আল্লাহ পরিপূর্ণ রহমত ও পূর্ণ শান্তি বর্ষিত কর আমাদের সরদার মুহাম্মদের উপর যার মাধ্যমে সমস্যাসমূহ সমাধান হয়, দুঃখ দুর্দশা তিরোহিত হয়, প্রয়োজনাদি মিটিয়ে দেওয়া হয়, পূণ্যাবলী ও সুন্দর শেষ পরিণাম অর্জিত হয়, তার পবিত্র চেহারা/সত্তার মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা হয়। আর রহমত বর্ষণ কর তার পরিবার ও তার সাহাবায়ে কেরামের উপর তোমার জানা সংখ্যানুযায়ী, প্রতিটি মুহুর্তে ও নিঃশ্বাসে” সচেতন ও সত্যসন্ধানী আলেমকে এ দুরূহদের সমস্যা ব্যাখ্যা করে বুঝাবার প্রয়োজন নেই। জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্র দুরূহটির শব্দ বা অর্থের প্রতি একটু খেয়াল দিলেই এর সমস্যা বুঝতে পারবেন। খতমটিতে যেহেতু অনেক আপত্তিকর শব্দ বা বাক্য রয়েছে তাই এর আপত্তিগুলো কোনো পর্যায়ের নিজ বিবেক দিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যাবে। সবাই সহজে বোঝার জন্য প্রথমে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি, যাতে করে এর তাৎপর্য বুঝা আমাদের জন্য সহজ হয়।

আল্লাহতে বিশ্বাসী মানুষ বলতেই একথা বিশ্বাস করেন যে, সবকিছুর মূল সমাধানকারী বা পরিচালনাকারী একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। আল্লাহতে বিশ্বাসী মুসলিম অমুসলিম সকলেই এ বিশ্বাস পোষণ করেন। তবে মুসলিম ব্যক্তির বিশ্বাস আর আস্তিক বিধর্মীর বিশ্বাসের মাঝে পার্থক্য এই যে, মুসলিম মনে করেন আল্লাহ কোনো কিছুর সমাধান বা পরিচালনা করতে

কারো মুখাপেক্ষী নন। তার কাছে কিছু চাইতে কোনো ব্যক্তিকে মিডিয়া বানাবার দরকার পড়ে না। পক্ষান্তরে অমুসলিমের বিশ্বাস হলো, বাদশা যেমন রাষ্ট্র পরিচালনায় বিভিন্ন ব্যক্তির মুখাপেক্ষী থাকেন আল্লাহও এরকম মুখাপেক্ষী। বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ যেমন সরাসরি বাদশাহর কাছে কোনো কিছু চাইতে পারে না, মিডিয়ার প্রয়োজন হয়, ঠিক তদ্রূপ আল্লাহও সবাইকে চিনেন না, তাঁর কাছে সরাসরি পৌছা যায় না, তাই তাঁর কাছে কিছু চাইতে হলে বিশেষ ব্যক্তিকে মিডিয়া বানানো প্রয়োজন।

কুরআনের অসংখ্য আয়াতে তাদের এসব বিশ্বাস বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলো থেকে তাদের এমন বিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। মক্কার সমস্ত কাফের এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করত। মূল পরিচালনায় তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করত বলে কুরআনের একাধিক আয়াতে এর প্রমাণ মিলে। মূর্তির পূজা করলেও মূর্তিকে তারা মূল পরিচালনাকারী বলে বিশ্বাস করত না। তাদের নিজের মুখের কথা ছিল,

(مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى) (الزمر: 188)

“আমরা তাদের ইবাদত কেবল এ জন্য করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়”³²¹ সবকিছুর ক্ষমতা, রক্ষা, সৃষ্টি, রিযিক, পরিচালনা ইত্যাদির মূল কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে বলে তাদের বিশ্বাস ছিল। কুরআনে অসংখ্য জায়গায় এর আলোচনা করা হয়েছে। মূল কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে স্বীকার করার পর অন্য কিছু ইবাদত বা অন্যকিছুকে আল্লাহর অংশীদার করা অযৌক্তিক বলে কুরআনে বারবার দেখানো হয়েছে। মোটকথা তারা যে সমস্ত মাখলুক বা নেক

³²¹ সূরা আয-যুমার:৩

মানুষের ইবাদত করত ওসিলা হিসেবেই করত। কিন্তু যা ওসিলা হওয়ার যোগ্যতা রাখে না তাকে ওসিলা হিসেবে গ্রহণ বা বিশ্বাস করাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে শির্কের মাধ্যম বা শির্ক বলেই আখ্যায়িত করেছেন।

অপরদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শির্কের সমস্ত পথকে বন্ধ করেছেন। রাসূলকেও যাতে কেউ কোনো বাহানায় আল্লাহ পর্যন্ত না পৌছায়, আল্লাহর কোনো গুণাবলীতে শরীক না করে, এ ব্যাপারে উম্মতকে সর্বোচ্চ সতর্ক করেছেন। উম্মতকে এ ব্যাপারে সতর্ক করার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল। আল্লাহ বলেন,

(قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ...) (الاعراف: 188)

“হে নবী আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই...”³²²

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে,

(وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ...) (يونس: 107)

“আর আল্লাহ যদি আপনার উপর কোনো কষ্ট আরোপ করেন তবে তিনি ছাড়া কেউ তা খণ্ডাবার নেই, পক্ষান্তরে যদি তিনি আপনাকে

³²² সূরা আ'রাফ : ১৮৮।

কিছু কল্যাণ দান করেন তবে তার মেহেরবানীকে রহিত করার মতও
কেউ নেই...”³²³

এ মর্মের আয়াত কুরআনে অসংখ্য জায়গায় রয়েছে। আমাদের নবী ছাড়া
অন্যান্য নবী রাসূলেরও এই শিক্ষাই ছিল বলে কুরআনের বিভিন্ন জায়গা
থেকে আমরা জানতে পারি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার
বিষয়ে বাড়াবাড়ি করতে সর্বোচ্চ সতর্ক করেছেন। আল্লাহর সাথে শির্ক
দুরের কথা, তার প্রশংসায় পর্যন্ত বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। সহীহ
হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
বলল, যা আল্লাহ চেয়েছেন এবং আপনি চেয়েছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

"أَجْعَلَنِي لِمَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ". (مسند أحمد، حديث
عبد الله بن عباس، رقم: 1839)

“তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমতুল্য করেছ, বরং যা একমাত্র আল্লাহ
চেয়েছেন”³²⁴ কোনো কোনো বর্ণনায়,

"وَيْلَكَ أَجْعَلَنِي وَاللَّهِ عَدْلًا قُلُوبًا مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ". (سنن النسائي
، باب النهي أن يقال ما شاء الله وشاء فلان)

“তোমার ধ্বংস হউক, তুমি কি আমাকে আল্লাহর সাথে সমতুল্য
করেছ? তুমি বল, যা শুধুমাত্র আল্লাহ চেয়েছেন”³²⁵

³²³ সূরা ইউনুস:১০৭।

³²⁴ মুসনাদে আহমদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীস, নং: ১৮৩৯।

³²⁵ নাসাঈ, সুনান, হাদীস সহীহ, আল্লাহ এবং অমুক চেয়েছেন বলা নিষেধ অনুচ্ছেদ, নং:১০৮২৪।

এক হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

" لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا
عبد الله ورسوله ". (صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب: وأذكر
في الكتاب مريم...رقم:3261)

“তোমরা আমার প্রশংসায় সীমালংঘন করো না, যেমনটি খৃষ্টানরা মারয়ামের পুত্র ঈসার ক্ষেত্রে করেছে, কেননা আমি তো আল্লাহর বান্দা, তাই তোমরা বল আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল”।³²⁶ এভাবে শিকের আপনোদন করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এবার আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও ‘খতমে নারী’ নামক দো‘আটির বাক্যগুলো নিয়ে একটু বিবেচনা করি। আশা করি যিনি প্রকৃত সত্য জানার আগ্রহ রাখেন এবং সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর সাথে সাথে গ্রহণের মানসিকতা রাখেন তার সামনে এই দো‘আর শিকী শব্দগুলো অতি সহজেই ধরা পড়বে। আর যার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে, যা করছি আজীবন করেই যাব, আমি টলব তবে আমার বিশ্বাস টলবে না, তার সামনে কুরআনের স্পষ্ট আয়াত পেশ করলেও একটি না একটি অজুহাতে তিনি তার মতকে অটুট ও প্রতিষ্ঠিত রাখতে বর্ণিত দো‘আটি বা কুরআনের আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। অন্যদের ভ্রান্তির ক্ষেত্রে তিনি আয়াতের ব্যাখ্যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী ও তাঁর আমল অথবা সাহাবিদের আমল দ্বারা করলেও এখানে এসে নিজের ভ্রান্ত মতকে অটুট রাখতে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আদর্শে আদর্শবান

³²⁶ সহীহুল বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: কিতাবে মারয়ামের কথা স্মরণ কর..., নং: ৩২৬১। 453

আকাবীর আসলাফদের এই উসূলটি ভুলে যাবেন। হানাফী হলেও আবু হানিফা রাহ. এর মানহাজ ভুলে যাবেন। কুরআনের আয়াত দলীল হিসেবে উপস্থাপনের কারণে সাধারণ মহিলার কথায় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত খলীফার নিজ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার আদর্শ ভুলে যাবেন। এখানে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিদের আদর্শের চেয়ে নিজ পীর বা নিজের মতের আলেমের কর্মই অগ্রাধিকার পাবে। যেমনটি রাসূল গাইব জানেন বা রাসূল হাজির-নাজির এজাতীয় শিকী বিশ্বাস পোষণকারীরা তাদের ভ্রান্ত আকীদা প্রতিষ্ঠিত রাখার বেলায় করে থাকে। যদিও এ সব বিষয় কুরআনে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

একেই আল্লাহ তা‘আলা প্রবৃত্তি ও আলেমকে প্রভু বানিয়ে তাদের পূজা বলে আখ্যা দিয়েছেন। কুরআনের আয়াত ও হাদীসের আলোকে এজাতীয় কর্মকে ‘শিরক ফিল ইবাদত’ বা উপাসনাগত শিরক বলে আখ্যায়িত করেছেন আহলুস্-সুন্নাহ ওয়াল-জামাতের আলেমগণ। আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন,

(أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) (الجاثية: 23)

“আপনি কি তাঁর প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার প্রবৃত্তি তথা মনের খেয়াল খুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করে নিয়েছে। আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কানে ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। আল্লাহ ছাড়া কে তাকে

হেদায়াত করবে? তোমরা কি চিন্তা ভাবনা করো না?”³²⁷ অন্যত্র
এরশাদ করেন,

(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا إِلَّا إِلَهُهُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
(التوبة: 31))

“তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের এবং মারয়াম
তনয় ঈসাকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে, অথচ তাদেরকে নির্দেশ
করা হয়েছিল শুধুমাত্র এক প্রভুর ইবাদত করতে। একমাত্র তিনি ছাড়া
কোনো মা'বুদ নেই। তারা আল্লাহর যে সমস্ত শরীক সাব্যস্ত করে তা থেকে
তিনি পবিত্র”³²⁸। এই দুরূদে একমাত্র আল্লাহ করতে পারেন এমন যাবতীয়
সিফাত বা গুণাবলীতে রাসূলকে শরীক করা হয়েছে। মাধ্যম হলে রাসূল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিডিয়া বা মাধ্যম হিসেবে আল্লাহর শরীক
করা হয়েছে। তাই মাধ্যম হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম
এর নাম উল্লেখ করায় শিরকের মাঝে কোনো তারতম্য সৃষ্টি হবে না।
কুরআনের অসংখ্য আয়াত এবং অগণিত হাদীস এর প্রমাণ। আল্লাহ
আমাদের সবাইকে বোঝার তওফিক দান করুন এবং হেদায়াতের উপর
অবিচল রাখুন।

অজুহাত ও তার পর্যালোচনা

একটি দো‘আ বা আরবী বাক্যকে দুরূদ বলতে উচিত ছিল এটা জানা যে,
এই দুরূদটি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তেন কি না, জীবনে

³²⁷ সূরা আল-জাসিয়াহ: ২৩।

³²⁸ সূরা তাওবা: ৩১।

কোনো সাহাবীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন কি না, অথবা কোনো সাহাবা দুরূদ হিসেবে এই বাক্যগুলো পড়তেন কি না তা দেখা। বিপদে আপদে তারা কোনোদিন এই দো‘আকে আমলে এনেছেন কি না লক্ষ্য করা। কোনো সাহাবা থেকে বিশুদ্ধ সুত্রে এই দুরূদ পেলে আমরা ধারণা করে নিতাম, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এটি শিক্ষা দিয়েছেন। কেননা আমরা বিশ্বাস করি যে, সাহাবায়ে কেরাম ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজ থেকে কিছু বলেন না। এর কোনোটি না পেলে এই দো‘আ বর্জনের জন্য আমাদের অন্য কিছু দরকার পড়ে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর পড়ার জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন দুরূদ ফযিলত সহ বর্ণনা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানো দুরূদগুলো কি আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? মূলত যিনি ধর্মীয় বিশ্বাসের সকল ক্ষেত্রে রাসূলের শিক্ষাকে যথেষ্ট মনে করেন তার জন্য আর অন্য দুরূদের প্রয়োজন নেই। অন্য দুরূদ জায়েয করতে তার মাথা ঘামাবার সময় নেই। তার কথা হবে, আমার নবী করেন নি, নবীর হাতেগড়া ছাত্ররা করেন নি, আমি তা করব না। কিন্তু হুবহু সুন্নাতের উপর থাকার আসলাফের সেই জযবা আমাদের থেকে হারিয়ে যাওয়ার কারণে ইবাদতগত বা বিশ্বাসগত নতুন কিছু আসলেও আমাদেরকে জায়েয না-জায়েযের বাহাসে লিপ্ত হতে হয়। আবু হানিফা রাহ. এর অনুসারী দাবী করলেও হানিফী মানসিকতা হারিয়ে যাওয়ার কারণে নতুন আলোচনার প্রয়াস পায়। বিভিন্ন ওজুহাতে আমরা নব উদ্ভাবিত আমলকে জায়েয করার চেষ্টা করি। খতমে না-রীও এর বিপরীত নয়। বিভিন্ন সময় এই দো‘আটির আপত্তিকর দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করলে যে অজুহাতগুলো পেশ করতে দেখা গেছে শুধু সেগুলো নিয়ে একটু পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর তওফিক কাম্য।

প্রথমেই যে অজুহাত পেশ করা হয় তা হলো, আমরা রাসূলকে কেবল মাধ্যম মনে করি মাত্র। এখানে শির্কের কোনো প্রশ্নই আসে না। মাধ্যমে মনে করলেই শির্ক হতে পারে না একথা কতটুকু শুদ্ধ, তা আমরা ইতোপূর্বে জানতে পেরেছি। আমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছি যে, মাধ্যম মূলতই শির্ক অথবা শির্কের পথ। কেননা কারো সমস্যা সমাধান করতে, দুঃখ দুর্দশা দূর করতে, প্রয়োজন মিটাতে, বৃষ্টি দিতে আল্লাহ কোনো মিডিয়ার মুখাপেক্ষী নন। এবার আমাদের দো‘আটির বিষয়ে আসা যাক।

মোটকথা কর্মের যোগসূত্র যার সাথেই রয়েছে সেটিই মাধ্যম, যে কোনোভাবে এই যোগসূত্র থাকুক না কেন। যার সাথে কোনো যোগসূত্র নেই তাকে মাধ্যম বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, আপনি একটি অ্যাক্সিডেন্টের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। কোনো ব্যক্তি আপনাকে তাঁর হাত দ্বারা টান দিয়ে রক্ষা করেছে। আপনি বলতে পারেন, আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। আবার এও বলতে পারেন যে, অমুক ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছে। এ দ্বিতীয় বাক্যটির ক্ষেত্রে মুমিন ব্যক্তির বিশ্বাস হলো, মূলত আল্লাহই আমাকে রক্ষা করেছেন, অমুক ব্যক্তি মাধ্যম মাত্র। এখানে লোকটি বলতে পারে, আল্লাহর দ্বারা রক্ষা পেয়েছি। আবার এও বলতে পারে যে, অমুকের মাধ্যমে আল্লাহ রক্ষা করেছেন। এখানে তার কোনো কথাই শির্ক হবে না। কিন্তু লোকটি যদি বলে, রাসূল আমাকে রক্ষা করেছেন, অথবা রাসূলের মাধ্যমে আমি রক্ষা পেয়েছি, তবে তার উভয় কথাই শির্ক হবে। আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাতের কোনো আলেম এতে সংশয় বা দ্বিমত পোষণ করবেন না। এই একটি বিষয়ে রাসূলের মাধ্যম শির্ক হলে আপনার জীবনের যাবতীয় বিষয়ের মাধ্যম রাসূলকে বানিয়ে দিলে তা শির্ক হয় না এ কেমন কথা? এবার আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল

জামা‘আতের আলেমগণের কাছে বিনীত আবেদন যে, আপনারা একটু চিন্তা করলেই সমাজ ধীরে ধীরে শিকর্মুক্ত হতে থাকবে। তাই চলে আসা প্রথাকে জায়েয বানাবার চেষ্টা না করে সমাজকে শিকর্মুক্ত করার দিকে একটু মনোনিবেশ করুন। জনৈক বিজ্ঞ আলেমের সাথে একবার এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি আমাকে বালাগাতের কিতাবে উল্লেখিত উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি শিকর্মুক্ত নয় বলে বুঝাবার চেষ্টা করেন। পরে আরো অনেককে এই উপমা পেশ করতে দেখেছি। উপমাটি হচ্ছে, “أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ” অর্থাৎ বসন্ত শস্য উৎপাদন করেছে। তারা বলে থাকেন, মুমিন ব্যক্তি এই বাক্যটি বললে শিকর্মুক্ত হয় না, কারণ সে এখানে রূপক অর্থ গ্রহণ করে। মুমিনের বিশ্বাস মূল শস্য দাতা আল্লাহ। বসন্তে তা উৎপাদিত হয়। তাই সে বলে, বসন্ত শস্য উৎপাদন করেছে। বসন্ত তাদের এ কথাটি অগ্রহণযোগ্য আর এ ধরনের উপমাও আল্লাহর সাথে অসামঞ্জস্য। কারণ কোনো কাজকে কার্যকারনের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে কিংবা সাহাবায়ে কিরাম থেকে কোনো হাদীস বা আছার পাওয়া যায় না। বরং এর বিপরীতটিই পাওয়া যায়, দেখুন সাহাবায়ে কিরাম বলেন,

«لَوْلَا الْكَلْبُ لَجَاءَنَا النَّصْرُ»

‘যদি কুকুর না থাকত তবে চোর আসত’ এ জাতীয় কথাকে শিকর্মুক্ত (আসগর) এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাই “أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ” অর্থাৎ ‘বসন্ত শস্য উৎপাদন করেছে’ এটা কোনোভাবেই কোনো মুমিনের কথা হতে পারে না। কারণ মুমিন জেনে বুঝে শিকর্মুক্ত আসগরে লিপ্ত হতে পারে না। এখন বলতে পারেন তাহলে এ কথাটি কোথেকে আসল? বসন্ত তা জানার জন্য আমাদেরকে তথাকথিত বালাগত বিদ্যার প্রবর্তকদের মন-মানসিকতা,

আকীদা মাযহাব দেখতে হবে। তাদের অনেকেই মু‘তায়িলা, আশ‘আরিয়া ও মাতুরিদিয়া মাযহাবের লোক থাকার কারণে তাদের গ্রন্থে সেটার অনুরনন দেখতে পাওয়া যায়। তারা মাজায বা রূপক বলে অনেক শিক্কে বালাগাত বানাতেও সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ এ জাতীয় কথাকে কখনও স্বীকৃতি দেন না। তাই এ জাতীয় কথা কোনো মুমিন বলতে পারে না। এ তো গেল বাস্তব কার্যকারণের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে বলার মাসআলা। বাস্তব কার্যকারণের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে কোনো কথা বলা যদি শিক্কে আসগার হয়, তবে যেখানে বাস্তব কোনো কার্যকারণ নেই সেখানে সেদিকে সম্পর্কযুক্ত করা নিঃসন্দেহে শিক্কে আকবারে পরিণত হবে। যেমন, কেউ যদি বলে “রাসূল শয্য উৎপাদন করেছেন বা রাসূল ধান দেন” অথবা “রাসূলের মাধ্যমে শয্য উৎপাদন হয় বা রাসূলের মাধ্যমে ধান হয়” এর কোনটি বলার কোনো সুযোগ নেই, কারণ তা শিক্কে আকবার হবে। আশা করি, আশেকে রাসূল নামে রাসূলকে আল্লাহর সাথে বিভিন্ন গুণাবলীতে সমতুল্যকারী ছাড়া সবাই এ ধরনের কথাটির মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারলেন। এবার আপনি নিজেই খতমে না-রীর ব্যাপারে ফায়সালা দিন।

এখন উপরোক্ত অজুহাতটির অসারতা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছি। তবে এই অজুহাতটি যারা ব্যাকরণ বা ভাষার জ্ঞান রাখেন তারা পেশ করেন। আর যাদের ব্যাকরণের গভীরতা নেই তাদের সামনে এই অভিযোগ তুলে ধরলে তারা প্রথমে অন্য অজুহাত পেশ করেন। সেটি না টিকলে পরবর্তীতে আবার ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বলেন। প্রশ্ন হলো, প্রথমে যখন নিজে শিক্কে মেনে নিয়ে অন্য অজুহাত দেখালেন তবে সেই অজুহাত না টিকলে আবার পূর্ব কথাকে ব্যখ্যার মাধ্যমে টিকানোর চেষ্টার কী প্রয়োজন। অন্য অজুহাতের মধ্যে যেমন, একদিন জনৈক আলেমের সাথে আলোচনা করলে তিনি বলেন

এখানে, “ہ” শব্দের “و” সর্বনামটি “صلاة” শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তিত। অতএব রাসূলের ওসিলায় নয় বরং এই দুরূদের ওসিলায়। কিন্তু তিনি এটি লক্ষ্য করেন নি যে, “صلاة” শব্দের দিকে সর্বনাম প্রত্যাবর্তিত হলে এখানে পুংলিঙ্গের সর্বনাম “و” ব্যবহার না হয়ে স্ত্রীলিঙ্গের সর্বনাম “ہ” হত। আরেকদিন এ বিষয়ে এক সেমিনারে আলোচনায় এখানে সর্বনাম ‘সালাত’ শব্দের দিকে নেয়ার সুযোগ নেই বললে একজন বলে উঠলেন “صلاة” শব্দটি মাসদার। আর আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী মাসদারের দিকে যে কোনো সর্বনাম ব্যবহার করা যায়, কেননা মাসদার পুংলিঙ্গও নয় আবার স্ত্রীলিঙ্গও নয়। একথা শুনে অত্যন্ত অবাক লাগল। নিজের মতকে অটুট রাখতে কোনদিকে খেয়াল না করে যারা কথা বলেন, তাদের কথায় যেমন হাসি পায় তেমনি তারা এ ধরনের কথা বলে নিজের আস্থা নষ্ট করেন। আরবী ভাষায় উনার জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে প্রশ্ন এসে যায়। কেননা, **প্রথমত:** এখানে “صلاة” স্ত্রীলিঙ্গ ধরেই “الامة” শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। **দ্বিতীয়ত:** “محمد” শব্দের পরেই “الذي” ইসমে মাউসুল নিয়ে আসা হয়েছে। জানা কথা ইসমে মাউসুলের পরে বাক্য থাকা এবং তার মধ্যে একটি সর্বনাম থাকা জরুরী যা মাউসুলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং এখানে “و” কে “الذي” এর দিকে না নিয়ে অন্য দিকে নেয়ার কথা বলা কতটুকু গাফলতির পরিচয় একটু ভেবে দেখুন। **তৃতীয়ত:** দো‘আটির শেষদিকে রয়েছে “بوجه” তার চেহারা বা তার স্বত্বার মাধ্যমে। অতএব সর্বনামকে মুহাম্মদ ছাড়া অন্যদিকে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সুযোগ থাকাবস্থায় বক্তার কথা থেকে তার উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থ নেওয়াকে আরবী প্রবচনে বলা হয়, “توجيه القول بما لا يرضى به القائل” অর্থাৎ বক্তার কথার এমন ব্যাখ্যা দেওয়া যা বক্তার নিজের উদ্দেশ্য নয়। আর যেখানে

কোনো সুযোগ নেই সেখানে এমনটি নেওয়া কতটুকু অবান্তর ও হঠকারিতা একটু ভেবে দেখেছি কি? এবার ধরে নিন কেউ উপরোক্ত দুর্ন্যদটিকে সমান্য পরিবর্তন করে সর্বনামগুলো দুর্ন্যদের দিকে প্রত্যাবর্তন করে নতুন একটি দুর্ন্যদ বানাল। যার মর্ম হল যেমন, “যে দুর্ন্যদের মাধ্যমে সব সমস্যা সমাধান হয়”। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা বা বলে দেওয়া ছাড়া কারো এধরণের কোনো কথা বলে বৈধ কি? বিভিন্ন দুর্ন্যদ এবং তাতে কী লাভ, কী ফযিলত, কী উপকার সবই আমাদের নবী আমাদেরকে বলে গেছেন। ওহি ছাড়া এর বাইরে কিছু বলা বৈধ কি? ওহির বিষয়ে ওহি ছাড়া যুক্তি দিয়ে কিছু বলার নামইতো ভ্রষ্টতা বা গোমরাহী। মানুষের জ্ঞান যেখানে শেষ সেখান থেকে ওহীর সূচনা। ওহীর বিষয়ে যুক্তি দিয়ে বলার কারণেই বিভিন্ন বাতিল দল উপদলের জন্ম। এসব জানা থাকা সত্ত্বেও ওহির মুখাপেক্ষী বিষয়ে আমরা কী-ভাবে দখল দিতে পারি। এটি কি আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর মিথ্যাচার নয়? আরেকটি অজুহাত কেউ কেউ পেশ করেন যে, আমাদের বিশ্বাস তো সবকিছু আল্লাহ করেন। রাসূল করেন বা মাধ্যম হন বলে আমাদের আক্বীদা নয়। তবে এটি শির্ক কী-ভাবে হয়? আর বেশিরভাগ লোক অর্থ না জেনেই পড়েন। আলহামদুলিল্লাহ, এই বিশ্বাস বলেইতো এই দুর্ন্যদ পড়লেই আপনাকে কাফের বা মুশরিক বলা হচ্ছে না। আপনার বিশ্বাস এই দুর্ন্যদের মর্মানুযায়ী হলে তো আপনি মুশরিক হয়ে যেতেন। বলা হচ্ছে এখানে শির্কী কথাবার্তা রয়েছে। শির্কী আক্বীদা পোষণ ছাড়া শির্কী কথাবার্তা বলার হুকুম কী প্রশ্নটি আপনাদের কাছে রেখেই ইতি টানছি।

পরিশেষে আরেকটি কথা এই যে, অনেককেই বলতে শুনা যায়, খতমের বিপক্ষে এ সব কথা বলে আমাদের পেটে লাথি মারবেন না। আফসোস!!

আপনি জাতির একজন কর্ণধার। আপনার মুখ থেকে এমন কথা বের হলে ঘুষখোর, সুদখোরের সামনে ঘুষ সুদের বয়ান করলে সে যখন বলে উঠে হুজুর, আমাদের পেটে লাথি মারবেন না। তার কথায় আর আপনার কথায় বেশ কম কী? সবার রিয়কের মালিক আল্লাহ। যে ব্যক্তি যে পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য সেই পথকেই সহজ করে দেন বলে আপনার আমার পূর্ণ বিশ্বাস। হালালের উপর থাকতে বদ্ধপরিকর হলে আল্লাহ আপনার আমার রিয়কের ব্যবস্থা হালালের মধ্যে থেকেই করবেন বলে আমরা পূর্ণ আস্থাশীল ইনশা আল্লাহ। এর বিপরীত বিশ্বাসের পরিণাম কী তা আপনার আমার সবারই নিশ্চয় জানা আছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝা এবং হালালের উপর থাকার তওফিক দান করুন। আমীন।

খতমে ইয়াসিনঃ কুরআন করীমের মোট ১১৪ টি সূরার একটি সূরার নাম ইয়াসিন। সূরার ধারাবাহিক ক্রমানুসারে এটি কুরআনের ৩৬ নং সূরা। কুরআনের অন্যান্য আয়াত তেলাওয়াত করলে প্রতিটি অক্ষরে যে পরিমাণ ছওয়াব পাওয়া যায় এই সূরা তেলাওয়াত করলেও তার প্রতিটি অক্ষরে সেই পরিমাণ ছওয়াব পাওয়া যাবে। তবে কুরআনে মাত্র কয়েকটি সূরা রয়েছে যেগুলোর অতিরিক্ত কিছু ফযিলত রয়েছে যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সহীহ হাদীসে সূরা ইয়াসিনের অতিরিক্ত কোনো ফযিলত বর্ণিত হয় নি। দু একটি দুর্বল ও বিভিন্ন জাল বানোয়াট হাদীসে এ সূরার বিভিন্ন ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। দুর্বল হাদীসের মধ্যে প্রসিদ্ধ হাদীসটি হচ্ছেঃ

" إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس ومن قرأ يس كتب الله له
بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات". (سنن الترمذي، فضل يس،

رقم: 2887)

“প্রত্যেক বস্তুর একটি হৃদয় রয়েছে, আর কুরআনে হৃদয় হচ্ছে ‘ইয়াসিন’। যে ব্যক্তি ‘ইয়াসিন’ পড়বে আল্লাহ তার আমলনামায় দশবার পূর্ণ কুরআন পড়ার নেকী দান করবেন।”³²⁹ ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনার পর নিজেই হাদীসটির সনদ গরীব ও দুর্বল বলে মন্তব্য বরং প্রমাণ করেছেন। তার মন্তব্য মতে হাদীসটি একেবারেই দুর্বল। অনেকে হাদীসটিকে বানোয়াট বলেও মন্তব্য করেছেন। তিরমিযির আলোচনা থেকেও এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মোটকথা ‘ইয়াসিন’ সূরার আলাদা ফযিলতে কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীস নেই।³³⁰

হাদীসটির অবস্থা এমন অর্থাৎ বিশুদ্ধ না হলেও তা আমাদের সমাজে অত্যন্ত প্রচলিত। অপরদিকে এই হাদীস এবং আরো কিছু ভিত্তিহীন হাদীসের উপর নির্ভর করে চালু রয়েছে এই সূরার খতম। একবার পড়ার খতম, দশবার পড়ার খতম, চল্লিশবার পড়ার খতম। কুরআন বা সুন্নাহ যার কোনো ভিত্তি নেই। যার মনে যা চেয়েছে ইচ্ছামত রাসূলের সুন্নাহ এর পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কারো মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তার নিকট এই সূরা খতম করার প্রচলন রয়েছে। এতে নাকি মুমূর্ষ ব্যক্তির কষ্ট হাক্কা হয়। এসবের কোনো কিছুই সহীহ হাদীস নির্ভর নয়।

পক্ষান্তরে সহীহ হাদীসে মুমূর্ষ ব্যক্তির পাশে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর তালকীনের কথা এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

³²⁹ তিরমিযী, সুনান, ইয়াসিনের মর্যাদা অনুচ্ছেদ, নং:২৮৮৭।

³³⁰ আলী হাশীশ, সিলসিলাতুল আহাদীসিল ওয়াহিয়াহ, ১/৩৩৫, আলবানী, আস-সিলসিলাতুদ-দ’য়াফাহ, ১/৩১২।

« لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ». (صحيح مسلم، باب تلقين الموتى لا

إله إلا الله، رقم: 2162)

“মৃত্যু উপস্থিত ব্যক্তিকে তোমরা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর তালক্বীন করো।”³³¹ এর বিপরীত মূমূর্ষ ব্যক্তির পাশে ‘ইয়াসিন’ পড়ার কোনো আমল রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন শিক্ষা সাহাবিদের দেন নি। এ সম্পর্কে যা বলা সবই অনির্ভরযোগ্য, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।

‘ইয়াসিন’ খতমের একটি বানোয়াট পদ্ধতিঃ ‘নস’ তথা কুরআন হাদীসের শিক্ষা একপাশে রেখে যুক্তি ও মনগড়া এবং সহীহ ছেড়ে ভিত্তিহিনের উপর দিয়ে নিজের মর্জি মোতাবেক শরী‘আত পরিবর্তনের কর্ম মূলত শিয়া, খাওয়ারিজ ইত্যাদি ভ্রান্ত সম্প্রদায় থেকেই শুরু হয়। পরবর্তীতে তাদের প্রভাব অনেক আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আলেমদের মাঝে বিস্তার লাভ করে। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর থেকে এ পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় একটু গভীর দৃষ্টি দিলেই বিষয়টি সবার কাছে ধরা পড়বে বলে আশা করি। এবার শিয়াদের বানানো একটি মনগড়া ‘খতমে ইয়াসিন’ দেখুন,

প্রয়োজন পূরণে ইয়াসিনের খতম যার পদ্ধতি এই³³²

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

³³¹ সহীহ মুসলিম, মৃত্যু উপস্থিত ব্যক্তিকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর তালক্বীন অনুচ্ছেদ, নং: ২১৬২।

তালক্বীন অর্থাৎ মূমূর্ষ ব্যক্তি মুখোমুখি এই কালেমা উচ্চরণ করা, যাতে সে তা শিখে বা স্মরণ করে পড়তে পারে। এতে তার জীবনের শেষ বাক্য ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ হবে।

³³² মুনতাদাল-কফীল ওয়েব। আল-মুনতাদার-রাসমি, শায়খ আব্দুর রেযা মা‘আশ।

(يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَنْعَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ الْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ)

এরপর এই দো'আ তিনবার পড়বে:

سُبْحَانَ الْمَفْرُجِ عَنْ كُلِّ مَحْزُونٍ , سُبْحَانَ الْمَخْلُصِ عَنْ كُلِّ مَشْحُونٍ ,
سُبْحَانَ الْمُنْقَسِ عَنْ كُلِّ مَدْيُونٍ سُبْحَانَ الْعَالِمِ عَنْ كُلِّ مَكْنُونٍ , سُبْحَانَ
سُبْحَانَ مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ , مَنْ جَعَلَ خَزَائِنَهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ
يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

এরপর বল:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَأَبْوَابَ خَزَائِنِكَ بِحَقِّ سُورَةِ يَسَ وَبِفَضْلِكَ
وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

এরপর তুমি ১০০ বার বল

إِلَهِي بِحَقِّ سِرِّ هَذِهِ الْأَسْرَارِ وَبِحَقِّ كَرَمِكَ الْخَفِيِّ وَبِحَقِّ اسْمِكَ الْعَظِيمِ
أَنْ تَقْضِيَ حَاجَاتِنَا يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

(وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ
اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا
بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا
يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ)

এরপর একবার পড়বে

سُبْحَانَ الْمَفْرُجِ عَنْ كُلِّ مَحْزُونٍ , سُبْحَانَ الْمَخْلَصِ عَنْ كُلِّ مَشْحُونٍ ,
سُبْحَانَ الْمُنْقَسِ عَنْ كُلِّ مَدْيُونٍ سُبْحَانَ الْعَالِمِ عَنْ كُلِّ مَكْنُونٍ , سُبْحَانَ
سُبْحَانَ مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ , مَنْ جَعَلَ خَزَائِنَهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ
يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

(يا مفرج الهم) এরপর ১০০ বার বল

এবং এই দো‘আ কর

الهي بحق سر هذه الاسرار وبحق كرمك الخفي وبحق اسمك العظيم
ان تقضي حاجتنا (وحاجات الحاضرين) يا قاضي الحاجات يا ارحم
الراحمين.

(قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ
قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَجَاء مِنْ أَقْصَى
الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنِ لَا يُسْأَلُكُمْ
أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ
مِن دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا
يُنْقِذُونِ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ)

এরপর পড়বে

سُبْحَانَ الْمَفْرُجِ عَنْ كُلِّ مَحْزُونٍ , سُبْحَانَ الْمَخْلَصِ عَنْ كُلِّ مَشْحُونٍ ,
سُبْحَانَ الْمُنْقَسِ عَنْ كُلِّ مَدْيُونٍ سُبْحَانَ الْعَالِمِ عَنْ كُلِّ مَكْنُونٍ , سُبْحَانَ
سُبْحَانَ مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ , مَنْ جَعَلَ خَزَائِنَهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ
يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

এরপর বল

اللهم افتح لي ابواب رحمتك وابواب خزائنك بحق سورة يس وبفضلك
وكرمك يا ارحم الراحمين

(يامفرج اللهم) এরপর ১০০ বার বল

এবং এই দো'আ কর

الهي بحق سر هذه الاسرار وبحق كرمك الخفي وبحق اسمك العظيم
ان تقضي حاجتنا (وحاجات الحاضرين) يا قاضي الحاجات يا ارحم
الراحمين.

(إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ
بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ
مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ
خَامِدُونَ يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ
وَإِنْ كُلُّ لَمَامٍ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا
وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ
وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا
يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِمَّنْ
أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ
مُظْلَمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ
قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ
الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا
دُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنْ نَشَأْ
نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ
مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا
مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ
أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ)

এরপর পড়বে:

سُبْحَانَ الْمَفْرَجِ عَنْ كُلِّ مَحْزُونٍ , سُبْحَانَ الْمَخْلَصِ عَنْ كُلِّ مَشْحُونٍ ,
 سُبْحَانَ الْمُنْقَسِ عَنْ كُلِّ مَدْيُونٍ سُبْحَانَ الْعَالِمِ عَنْ كُلِّ مَكْنُونٍ , سُبْحَانَ
 مَنْ جَعَلَ خَزَائِنَهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ , سُبْحَانَ مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ
 يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

এরপর বল

اللهم افتح لي ابواب رحمتك وابواب خزانك بحق سورة يس وبفضلك
 وكرمك يا ارحم الراحمين

এরপর ১০০ বার বল

يامفرج الهم

এবং এই দো'আ কর

الهي بحق سر هذه الاسرار وبحق كرمك الخفي وبحق اسمك العظيم
 ان تقضي حاجاتنا (وحاجات الحاضرين) يا قاضي الحاجات يا ارحم
 الراحمين.

(وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً
 وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ
 يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا
 يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ
 كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ
 نَفْسٌ شَيْئاً وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي
 شُغْلٍ فَاكِهِونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكَوِّونَ لَهُمْ فِيهَا
 فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَاءٌ يَدْعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ وَامْتَنَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا
 الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ
 عَدُوٌّ مُبِينٌ)

এরপর পড়বে

سُبْحَانَ الْمَفْرَجِ عَنْ كُلِّ مَحْزُونٍ , سُبْحَانَ الْمَخْلَصِ عَنْ كُلِّ مَشْحُونٍ ,
 سُبْحَانَ الْمُنْقَسِ عَنْ كُلِّ مَدْيُونٍ سُبْحَانَ الْعَالِمِ عَنْ كُلِّ مَكْنُونٍ , سُبْحَانَ
 مَنْ جَعَلَ خَزَائِنَهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ , سُبْحَانَ مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ
 يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

এরপর বল

اللهم افتح لي ابواب رحمتك وابواب خزانك بحق سورة يس وبفضلك
 وكرمك يا ارحم الراحمين

এরপর ১০০ বল: (يا مفرج الهم) এবং এই দো'আ কর

الهي بحق سر هذه الاسرار وبحق كرمك الخفي وبحق اسمك العظيم
 ان تقضي حاجاتنا (وحاجات الحاضرين) يا قاضي الحاجات يا ارحم
 .الراحمين

(وَأَنْ اَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ
 تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ
 تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا
 كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى
 يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا
 يَرْجِعُونَ وَمَنْ نَعْمَرَهُ نُنْكَسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ
 وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ)

এরপর পড়বে

سُبْحَانَ الْمَفْرَجِ عَنْ كُلِّ مَحْزُونٍ , سُبْحَانَ الْمَخْلَصِ عَنْ كُلِّ مَشْحُونٍ ,
 سُبْحَانَ الْمُنْقَسِ عَنْ كُلِّ مَدْيُونٍ سُبْحَانَ الْعَالِمِ عَنْ كُلِّ مَكْنُونٍ , سُبْحَانَ
 سُبْحَانَ مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ , مَنْ جَعَلَ خَزَائِنَهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ
 يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

এরপর বল

اللهم افتح لي ابواب رحمتك وابواب خزانك بحق سورة يس وبفضلك
وكرمك يا ارحم الراحمين

এরপর ১০০ বার বল (يامفرج الهم) এবং এই দো'আ কর:

الهي بحق سر هذه الاسرار وبحق كرمك الخفي وبحق اسمك العظيم
ان تقضي حاجتنا (وحاجات الحاضرين) يا قاضي الحاجات يا ارحم
الراحمين

(لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا
لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ
وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ
دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّهُمْ يَنْصُرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ
مُّحَضَّرُونَ فَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرِ
الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ)

এরপর পড়বে

سُبْحَانَ الْمُفَرِّجِ عَنْ كُلِّ مَحْزُونٍ , سُبْحَانَ الْمَخْلُصِ عَنْ كُلِّ مَشْحُونٍ ,
سُبْحَانَ الْمُنْقِصِ عَنْ كُلِّ مَدْيُونٍ سُبْحَانَ الْعَالِمِ عَنْ كُلِّ مَكْنُونٍ , سُبْحَانَ
سُبْحَانَ مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ , مَنْ جَعَلَ خَزَائِنَهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ
يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

এরপর বল

اللهم افتح لي ابواب رحمتك وابواب خزانك بحق سورة يس وبفضلك
وكرمك يا ارحم الراحمين

এরপর ১০০ বার (يامفرج الهم) এবং এই দো'আ পড়:
الهي بحق سر هذه الاسرار وبحق كرمك الخفي وبحق اسمك العظيم

ان تقضي حاجتنا (وحاجات الحاضرين) ياقاضي الحاجات يا ارحم

الراحمين.

(وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُخَيِّبِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُخَيِّبُهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّ مَا أَمَرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)

পাঠক, পদ্ধতিটি নমুনা স্বরূপ হুবহু উল্লেখ করতে গিয়ে একটু দীর্ঘ হয়েছে। বুঝার সুবিধার্থে শিয়া আলেমদের উল্লেখিত পদ্ধতিটি হুবহু তুলে ধরলাম। পদ্ধতিটির সাথে বানোয়াট অনেক ফযিলত উল্লেখ করা হয়েছে। অতিরিক্ত দীর্ঘ হয়ে যাবে বলে তা ছেড়ে দেয়েছি। নিশ্চয় আপনি ইয়াসিন খতমের এই পদ্ধতি দেখেই তা মনগড়া বানোয়াট এবং বানানো বলে উড়িয়ে দিবেন। কারণ হিসেবে রাসূল শিখান নি, সাহাবিরা করেন নি, খাইরুল্ল কুরুনে এর কোনো নজীর নেই বলে উল্লেখ করবেন।

এই যদি হয় এই পদ্ধতি বানোয়াট হওয়ার দলীল এবং বাস্তবেও তাই, তবে আমাদের মাঝে যে পদ্ধতির প্রচলন আছে তার কি কোনো অস্তিত্ব কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত যুগে আছে? যদি এর উত্তর ‘না’ হয় এবং আসলেও তাই, তবে উভর পদ্ধতিই মনগড়া ও বানোয়াট। সবকিছু থেকেই বিরত থাকা আমাদের জন্য অপরিহার্য। আর যদি বলেন, বুয়ুর্গদের থেকে এমন আমল পাওয়া গেছে, তবে অন্যদের বুয়ুর্গদের কি দোষ? আপনার আমার বুয়ুর্গের কথা গ্রহণযোগ্য, আর তাদের বুয়ুর্গদের কথা গ্রহণযোগ্য নয় এ কেমন ইনসাফ? আপনি নিজেই বিচার করুন।

নিজের পক্ষের লোকের কথা নির্বিচারে গ্রহণ, অন্যের কথা শুদ্ধ হলেও প্রত্যাখ্যান এটি একমাত্র বিভ্রান্ত দলের বৈশিষ্ট্য।

পক্ষান্তরে আহলুসুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলেমদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সবার কথা নিরীক্ষার মাধ্যমে গ্রহণ, সহীহ বা নির্ভুল হলে অন্যের কথাও গ্রহণ। ভুল হলে নিজ মতাদর্শের লোকের কথাও প্রত্যাখ্যান। এই আমানতদারীর সাথে তারা দ্বিনি ইলমের শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

যুক্তির আলোকে সুন্নাহ বিরোধী কর্ম সৃষ্টির সূচনা করতে পারলে আরেকজন তার যুক্তিতে বানানো জিনিসটিকে একটু মোডিফাই বা সুন্দর করতে সমস্যা কোথায়? বরং এটাইতো নিয়ম। যাইহোক, আমরা যারা সুন্নাহের উপর থাকতে চাই, সুন্নাহকে যুক্তি ও প্রচলনের উপর অগ্রাধিকার দেই ইবাদতের মধ্যে কম বেশ নতুন কোনো নিয়মই আমরা মানি না বা মানতে পারি না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহের বাইরে গেলেই বিদ‘আতে লিপ্ত হওয়ার আশংকা সর্বদা আমাদের মনে কাজ করে। আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই আদর্শের অবিচল রাখেন। সবাইকে সুন্নাহ বোঝার তওফিক দান করেন। হুবহু সুন্নাহের উপর থাকা, বিদ‘আতকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করার তওফিকই তার কাছে আমাদের কাম্য। আমীন।

খতমে শিফাঃ ‘শিফা’ শব্দের আরবী মূল শব্দ ‘شفاة’ যার অর্থ রোগমুক্ত করা বা রোগ নিরাময়। এভাবে ‘খতমে শিফা’ অর্থ: রোগ নিরাময় করার খতম। কেউ অসুস্থ হলে তার রোগমুক্তির আশায় এই খতম পড়ানো হয়। আমাদের দেশে প্রচলিত একটি বইয়ে এই খতমটি যেভাবে তুলে ধরা হয়েছেঃ

“খতমে শিফাঃ

الله لا اله الا الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)

এই পবিত্র কালেমা একলক্ষ পঁচিশ হাজার বার পাঠ করাকে “খতমে শিফা” বলে। একে খতমে তাহলীলও বলা হয়। এই খতম পাঠ করিয়া এর সোয়াব মৃত লোকের রুহের উদ্দেশ্যে বখশিশ করিয়া দিলে নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা এর উসিলায় তাকে মাফ করিয়া দিবেন ও বেহেশত দান করবেন। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয় অথবা কোনো কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘদিন ভুগিতে থাকে, তবে উক্ত কালাম তাহার নিকট বসিয়া সশব্দে পাঠ করিতে থাকিবে, যেন সেই রোগী উহা শুনিতে পায়।

আল্লাহর ফযলে খতম শেষ হইবার পূর্বেই ইহার আশ্চর্য ফল বুঝিতে পারা যায়। কোনো মুমূর্ষু লোকের নিকট বসে এই খতম পাঠ করলে তাহার রোগ যন্ত্রনা লাঘব হয় এবং পরমায়ু শেষ হইয়া থাকিলে আছানির সহিত মৃত্যু হয়। এই খতম একজনে পাঠ করাই ভাল, তবে জরুরী প্রয়োজনে ১০/১৫ জন একত্র বসিয়া একদিনেও খতম করা চলে।”³³³ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ওহি নির্ভর কথার উপর নিজ থেকে কিছু বলার কি দুঃসাহসিকতা!!

রোগ আল্লাহ দেন এবং তিনিই মানুষকে রোগমুক্ত করেন। কারো রোগ দেখা দিলে রোগীর নিজের কী করণীয় এবং তার বেলায় অন্যদের কী

³³³ মোকছুদুল মো‘মিনীন বা বেহেশ্তের পুঞ্জী, আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ নাজমুল হক, পঞ্চদশ খ-, ১৭৮ পৃষ্ঠা। সাদনান পাবলিকেশন।

করণীয় সবই বলে গেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার মাঝে ‘খতমে শিফা’ নামের কিছু নেই। একবার সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা কি চিকিৎসা করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রশ্নের উত্তরে বলেনঃ

« تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم ». (سنن أبي داود، كتاب الطب، باب في الرجل يتداوى، رقم: 3857، سنن الترمذي، كتاب الطب، باب الدواء والحث عليه، رقم: 2038)

“তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর। কেননা মহান আল্লাহ তা‘আলা এমন কোনো রোগ দেননি যার ঔষধ দেননি, একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত।”³³⁴ আরেকটি হাদীসে এরশাদ করেন:

« لكل داء دواء فإذا أصيب الدواء برأ بإذن الله عز وجل »
(صحيح مسلم، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، رقم: 5871)

“প্রত্যেক রোগের ঔষধ রয়েছে। অতঃপর যখন ঔষধ রোগের সাথে ঠিকমত পড়ে আল্লাহর ইচ্ছায় ভাল হয়।”³³⁵ এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা গ্রহণের আরো অনেক হাদীস রয়েছে। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। হাদীসের পাতা খুললেই চিকিৎসা গ্রহণের

³³⁴ আবু দাউদ, সুনান, চিকিৎসা অধ্যায়, ব্যক্তির চিকিৎসা গ্রহণ অনুচ্ছেদ, নং: ৩৮৫৭, তিরমিযী, সুনান, চিকিৎসা অধ্যায়, ঔষধ ও তার প্রতি উৎসাহিত করা অনুচ্ছেদ, নং: ২০৩৮।

³³⁵ সহীহ মুসলিম, প্রত্যেক রোগের ঔষধ রয়েছে এবং চিকিৎসা করা মুস্তাহাব অনুচ্ছেদ, নং: ৫৮৭১৭৪

ঘটনা পাত্তা যায়। মুহাদ্দিসীনে কেরামের অনেকে তাদের কিতাবে ‘চিকিৎসা অধ্যায়’ নামে পৃথক অধ্যায় রচনা করেছেন। তবে মুমিন ব্যক্তি চিকিৎসাকে শুধুমাত্র মাধ্যম হিসেবেই গ্রহণ করেন। তার বিশ্বাস, রোগ নিবারণের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। তবে আল্লাহ অমুক ঔষধ অমুক রোগের জন্য দিয়েছেন বলে গবেষণার মাধ্যমে এ বিষয়ের পণ্ডিতগণ জানতে পেরেছেন। তাই ঔষধ ব্যবহার মূলত আল্লাহর নির্দেশ বলেই আমরা হাদীসের আলোকে জানতে পারি। বিধায় মুমিন ঔষধ ব্যবহার করেন। এতে তিনি নবীর সুন্নাহ পালন করেন। তাই মুমিন ঔষধ ব্যবহার করলেও আল্লাহকে ভুলেন না। ঔষধ যেন ঠিকমত কাজ করে তার জন্য তিনি সকাতে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। ঔষধ তাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে না। বরং আল্লাহ এই ঔষধের মাঝে রোগের শিফা রেখেছেন বলে সে ঔষধ ব্যবহার করে আরো বেশি আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করতঃ আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে। এ হলো একজন মুমিন অসুস্থ হলে তার নিজের কাজ। অপরদিকে এক মুমিন আরেক মুমিনের ভাই বলে কুরআন ও হাদীসে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই একজন মুমিন অসুস্থ হয়ে বিপদে পড়লে অপর মুমিনের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব মুমিনকে একই ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন। একজন মানুষের একটি অঙ্গে ব্যথা হলে তার সমস্ত শরীর যেমন কষ্ট অনুভব করে তদ্রূপ একজন মুমিন ব্যথিত হলে প্রতিটি মুমিন তার ব্যথায় ব্যথিত হওয়া ঈমানের আলামত বলে আমাদেরকে বুঝিয়েছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

« مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ».

(صحيح مسلم، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم:

(6751

“মুমিনদের দৃষ্টান্ত পরস্পরের প্রতি দয়া, মমতা, আন্তরিকতার দিক দিয়ে একটি দেহের মত। তাদের দেহের একটি অংশ আক্রান্ত হলে, তার সমগ্র অঙ্গ ব্যথা, যন্ত্রনা ও অনিদ্রায় আক্রান্ত হয়।”³³⁶ এই হাদীস থেকেই কোনো মুমিন অসুস্থ হলে আরেক মুমিনের কি করণীয়, তার কতটুকু দায়িত্ব উপলব্ধি করা যায়। তথাপি এ হাদীস ছাড়া আরো অনেক হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনের অনেক করণীয় স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। একজন অসুস্থ মুমিনের আরেক মুমিনের উপর তাকে দেখতে যাওয়াকে অধিকার সাব্যস্ত করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

« حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ ». قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ :

...وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ ». (صحيح مسلم، باب من

حق المسلم على المسلم، رقم: 5778)

“এক মুসলিমের অপর মুসলিমের উপর ছয়টি প্রাপ্য রয়েছে। বলা হলো: হে আল্লাহর রাসূল: সেগুলো কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

³³⁶ সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াসসিলাহ, মুমিনদের প্রতি দয়া, মমতা সহযোগিতা পরিচ্ছেদ, নং:

৬৭৫১, সহীহুল বুখারী, কিতাবুল আদব, পরিচ্ছেদ: মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর উপর দয়া করা, নং ৫৬৬৬।

ওয়াসাল্লাম বললেন:আর যখন সে অসুস্থ হয় তাকে দেখতে যাও,
আর যখন সে মারা যায় তার জানাযায় অংশ নাও।”³³⁷

রোগীকে দেখতে যাওয়া বা তার সেবার ফযিলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. » (صحيح
مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب فضل عيادة المريض، رقم:
6717)

“যে ব্যক্তি রোগীকে দেখতে যায় ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত সে
জান্নাতের ফলের মাঝে থাকে।”³³⁸ এভাবে রোগী দেখতে যাওয়া, তাঁর
সেবা করা, এর ফযিলত সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
দেখতে গিয়ে কী পড়বে এতেও নবীর সুন্নাত রয়েছে। হাদীসে রয়েছে:

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعود فقال: "لا
أس طهور إن شاء الله" (صحيح البخاري، باب علامات النبوة في
الإسلام، رقم: 5338)

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির কাছে তার রোগ
দেখতে গেলেন। গিয়ে বললেন: কোনো অসুবিধা নেই, (ভাল হয়ে
যাবে) পবিত্র হবে (রোগ গোনাহের কাফ্যারা হয়ে গোনাহ থেকে
পবিত্র করবে) ইন-শা-আল্লাহ।”³³⁹

³³⁷ সহীহ মুসলিম, মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের হক পরিচ্ছেদ, নং: ৫৭৭৮।

³³⁸ সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াসসিলাহ, রোগী দেখতে যাওয়ার মর্যাদা পরিচ্ছেদ, নং: ৬৭১৭।

³³⁹ সহীহুল বুখারী, ইসলামে নবুওয়্যাতের আলামত পরিচ্ছেদ, নং: ৫৩৩৮।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত দিক নির্দেশনা থাকতে এগুলো বাদ দিয়ে, বা এগুলো রেখে নতুন কিছু সংযোজন করে ‘খতমে শিফা’ নামে খতম বের করা হয়েছে যার কোনো ভিত্তি নেই। এর ফযিলতে যা বলা হয়েছে সবই মনগড়া। এই খতম রোগ নিবারণের খতম হলে আর অন্য কিছুর কি দরকার ছিল? রোগের জন্য কুরআন খতম, বুখারীর হাদীসের খতমকে অভিজ্ঞতার বাহানায় অর্থ উপার্জনের মাধ্যম বানানোর কি প্রয়োজন ছিল। অসুস্থ ব্যক্তি অজ্ঞতার কারণে না বুঝলে তাকে সঠিক বিষয় বোঝানোই ছিল একজন আলেমের দায়িত্ব। তাকে দীনের দাওয়াত দেওয়ার এটি ছিল একটি সুবর্ণ সুযোগ। তাকে দীনের সঠিক একটি শিক্ষাদান আমার মৃত্যুর পরও কাজে আসতো। এই দায়িত্ব আদায় না করে বরং তার অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের চিন্তা করা কতটুকু অমানবিক কাজ তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। এই অমানবিক কাজকেই তার থেকে কিছু অর্থ উদ্ধারের সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া গেছে বলে মনে করা হয়। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, একজন অসুস্থ মানুষ মানেই সে যে কোনো দিক থেকে বিপদগ্রস্ত। এই বিপদে আমাকে আমার সামর্থানুযায়ী তার সাহায্যে এগিয়ে আসা প্রয়োজন ছিল। আজীবন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এই শিক্ষাই দিয়ে গেলেন। আমরা রাসূলের এই শিক্ষাতো গ্রহণ করছিই না, উপরন্তু বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে আরো বিপদ ও ঝামেলায় ফেলছি। তাকে সাহায্য না করে খতমের বাহানায় তার থেকেই আর্থিক সাহায্য নিচ্ছি। আল্লাহ আমাকে এবং সবাইকে হেদায়াত দান করুন। সাহায্য গ্রহণ না করে সাহায্য করার তওফিক ও মানসিকতা দান করুন। আমীন।

উল্লেখ্য যে, ‘খতমে শিফা’ নামের খতমের বর্ণিত পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে। যেমন, ‘ইয়া সালামু’ নির্দিষ্ট সংখ্যায় পড়া। এর কোনো ভিত্তি নেই। টাকার পরিমাণে ছোট দো‘আ, বড় দো‘আ, কম সংখ্যা, বেশি সংখ্যা নির্ধারিত হয়ে থাকে। অনেক সময় পড়ার মাঝে কম বেশ করা আয়োজকের তদারিকের উপর নির্ভর করে। আল্লাহ আমাদেরকে এসব থেকে দূরে রাখুন। আমীন।

খতমে তাহলীলঃ খতমে তাহলীল বা " لا إله إلا الله " (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এর খতম। খতমে শিফার সাথেই তা পড়ার নিয়ম ও এর ফযিলতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সবকিছুই মনগড়া, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। এই কালিমাটি হচ্ছে ইসলামে মূল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ২৩ বছরের পুরো জীবনটাই এই কালেমার তাৎপর্য বুঝানো এবং এর তাৎপর্যের উপর সাহাবীদেরকে উঠানোর পিছনে ব্যয় করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত, তারা প্রথমে ঈমান অতঃপর কুরআন শিক্ষা করেছেন।³⁴⁰ হাদীসে এই কালেমার যিকরকে সর্বোত্তম যিকর বলা হয়েছে। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিতঃ “আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দো‘আ ‘আলহামদুলিল্লাহ’”।³⁴¹ পক্ষান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি তাঁর জীবনে কখনো সাহাবীদেরকে খতম নামের এসব কোনো কথা বলেননি বা শিক্ষা দেন নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার

³⁴⁰ ইবনে মাজাহ, হাদীস সহীহ, ঈমান অধ্যায়, ঈমানে একটি অনুচ্ছেদ, নং: ৬১।

³⁴¹ তিরমিযী, সুনান, হাদীস হাসান, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দো‘আ অধ্যায়, মুসলিমের দো‘আ গৃহীত অনুচ্ছেদ, নং: ৩৩৮৩, সহীহ ইবনে হিব্বান, আযকার অধ্যায়, নং: ৮৪৬, সহীহ কুন্যিস-সুন্নাতিন্-নাবাবিয়াহ, আল্লাহর যিকর অনুচ্ছেদ, ১/৯।

ভিত্তিতে সাহায্যে কেবল তাদের জীবনে ঈমানের পিছনে অনেক মেহনত করে এই কালেমার তাৎপর্য তাদের অন্তরে বসালেও কখনোই তাদের থেকে এমন ধরণের কোনো শিক্ষা বা কথাবার্তা পাওয়া যায় না, এমনকি কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত বা খাইরুল কুরানের কোনো যুগেই এসবের কোনো অস্তিত্ব বিদ্যমান নেই। অন্য মানুষ এই কালেমার খতম করে মৃত ব্যক্তিকে জান্নাতে বা স্বর্গে পাঠিয়ে দেওয়ার ধারণা মূলত বিধর্মী, ব্রাহ্মণী, পুরোহিতবাদি শিক্ষা। ইসলামের শিক্ষা যার সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দুত্ববাদের হাওয়ায় কোনো অজ্ঞ সুফি সাধক থেকে এই খতমের সূচনা হওয়া অসম্ভবের কিছু নয়। আমাদের দেশের হিন্দু সমাজে এর বাস্তবতা পাওয়া যায়। আল্লাহই ভাল জানেন। তিনি আমাদেরকে এসব বুঝে এগুলোর খপ্পর থেকে নিরাপদ রাখুন। কালিমার সঠিক মর্ম বুঝে আমল করা এবং এর দাওয়াত দেওয়ার তওফিক দান করুন। আমীন।

খতমে তাসমিয়াঃ ‘তাসমিয়া’ শব্দের মূল অর্থ নামকরণ করা। মুসলিম ব্যক্তি যে কোনো কাজ আল্লাহর নাম নিয়েই শুরু করেন, তাই আল্লাহর নাম নেওয়া বা বিসমিল্লাহ বলার ক্ষেত্রেও শব্দটি প্রয়োগ হয়। এভাবে ‘খতমে তাসমিয়া’ বিসমিল্লাহ এর খতমকে বুঝানো হয়ে থাকে। একলক্ষ পঁচিশ হাজার বার “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম” পাঠের মাধ্যমে এই খতম করতে হয়।

এই খতমের বিবরণে লেখা হয়েছেঃ “এই পাক কালাম একলক্ষ পঁচিশ হাজার বার পাঠ করাকে “খতমে তাসমিয়া” বলে। কোনো কঠিন বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য অথবা কোনো মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার জন্য এই

খতম অত্যন্ত ফলপ্রদ। অনেক লোক একত্রিত হয়ে একই বৈঠকে এই খতম পাঠ করিয়া আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলে আল্লাহ তাআলা নিশ্চয় তাহাকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করেন বা তাহার বাসনা পূর্ণ করেন।”³⁴²

যে কোনো কাজ আল্লাহর নামে শুরু করা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার অন্যতম। “পড় তোমার রব্ব এর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন”³⁴³ বলে ওহির সুচনাতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই শিক্ষার বাস্তবায়ন করেছেন। ‘বিসমিল্লাহ’ ব্যবহারের মাধ্যমে এর বাস্তব প্রয়োগের সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরামদেরকেও এর নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই শিক্ষার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন। এছাড়া ‘বিসমিল্লাহ’ বলে রোগের ঝাড় ফুঁকের আমলও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পাওয়া যায়।

সাহাবী উসমান ইবন আবিদ ‘আস আস-সাক্বাফী একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর শরীরের একটি ব্যথার অভিযোগ করলেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই তিনি তাঁর শরীরে এই ব্যথা অনুভব করছেন বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরঘ করলেন।

³⁴² মোকছুদুল মো‘মিনীন বা বেহেশ্তের পুঞ্জী, আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ নাজমুল হক, পঞ্চদশ খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা। সাদনান পাবলিকেশন।

³⁴³ সূরা আলাক, আয়াত: ১।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ

« ضَعِ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ. ثَلَاثًا. وَقُلْ
سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَازِرُ. » (صحيح
مسلم، باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء،
رقم: 5867)

“তোমার শরীরের যে জায়গায় ব্যথা রয়েছে সেখানে হাত রাখ এবং
তিনবার ‘بِسْمِ اللَّهِ’ বল। আরো সাতবার বল:

“أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَازِرُ”

(আমি যে ব্যথা অনুভব করছি এবং যে ভয় পাচ্ছি তা থেকে আল্লাহ ও
তার কুদরতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি)”³⁴⁴। এই হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে ‘বিসমিল্লাহ’ এর শিক্ষা। সাহাবা,
খাইরুল কুরুন সবার জীবনেও এই একই শিক্ষা দেখতে পাবেন। এর
বাইরে খতম নামে যা কিছু বলা হয়ে থাকে তা সম্পূর্ণ মনগড়া ও
ভিত্তিহীন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবিদের জীবনে
এই তাসমিয়া খতমের কোনো দৃষ্টান্ত নেই, কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত
কোনো যুগেই এর কোনো নজীর নেই। এ সবকিছু তাদের যুগের
অনেক পরের উদ্ভাবন। এছাড়া এই খতমের ফযিলতে যা কিছু বলা
হয় সবই মনগড়া বানানো। আল্লাহ আমাদেরকে এ সমস্ত মনগড়া কর্ম

³⁴⁴ সহীহ মুসলিম, সালাম অধ্যায়, ব্যথায় আক্রান্ত স্থানে দো‘আর সহিত হাত রাখা মুত্তাহাব পরিচ্ছেদ, নং:

থেকে রক্ষা করুন। ‘বিসমিল্লাহ’ এর মৌলিক শিক্ষায় আমাদের জীবন গড়ার তওফিক দান করুন। আমীন।

খতমে খাজেগানঃ ফার্সী শব্দ ‘খাজা’ যার বহুবচন ‘খাজেগাঁ’। খতমের নাম থেকেই তা যে অনারব কোনো সুফি থেকে আবিষ্কৃত তা সহজেই অনুমেয়। এই নামকরণের কারণে বলা হয়, “পীর-পীরানগণের উপর দো‘আ করা হয় বলিয়া এই খতমের নাম খাজেগান বা পীরান³⁴⁵ রাখা হইয়াছে”।

খতমের নিয়মে লিখা হয়েছে:³⁴⁶

১. সূরা ফাতেহা ৭০ বার।
২. দুর্রুদ শরীফ ১০০ বার।
৩. সূরা ‘আলাম নাশরাহ লাকা’ ৭০ বার।
৪. সূরা ইখলাস ১০০০ বার।
৫. পুনরায় সূরা ফাতেহা ৭ বার।
৬. পুনরায় দুর্রুদ শরীফ ১০০ বার।
৭. নিম্নোক্ত দো‘আ ১০০ বার:

"فسهل يا الهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل بفضلك يا عزيز".

³⁴⁵ নেয়ামুল কুরআন, মৌলবী শামছুল হুদা, রহমানিয়া লাইব্রেরী, একাদশ সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ২০০।

³⁴⁶ প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা: ১৯৯।

(হে আল্লাহ নেক্কারগণের সরদারের (নবী সা.) সম্মানার্থে আমার প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করিয়া দাও, হে ক্ষমাশীল, তোমার দয়ায় সহজ করিয়া দাও।

৮. **يا قاضي الحاجات** (হে প্রয়োজন পূর্ণকারী) ১০০ বার।

يا كافي المهمات (হে বৃহৎ কাজ সমাধানকারী) ১০০ বার।

يا دافع البليات (হে বিপদ প্রতিরোধকারী) ১০০ বার।

يا مجيب الدعوات (হে প্রার্থনা কবুলকারী) ১০০ বার।

يا رافع الدرجات (হে মর্যাদা বর্ধনকারী) ১০০ বার।

يا حلال المشكلات (হে বিপদ দূরকারী) ১০০ বার।

يا غوث أغثني وامدني (হে সাহায্যকারী আমায় সাহায্য ও মদদ কর) ১০০ বার।

انا لله وانا اليه راجعون (নিশ্চয় আমরা আল্লাহর এবং তার নিকটই আমরা ফিরে যাব) ১০০ বার।

لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين (তুমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। নিশ্চয় আমি গোনাহ্কার) ১০০ বার।

৯. সর্বশেষ দুর্জদ একশত বার।

এই খতমের এই পদ্ধতি লিখিত হলেও যে যার মত সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে, টাকা পয়সার কম বেশির দিকে বিবেচনা করে এদিক সেদিক যোগ

বিয়োগ করে বানিয়ে খতম করেন। খতমকারীদের ভাষায় সটকার্ট খতম বা লং খতম। বানানো জিনিস একেকজন একেক রকম বানাবেন এটাই স্বাভাবিক। এই খতমের ৭ নাম্বারে উল্লেখিত দো‘আটি আপত্তিকর। আপত্তির কারণ ও পর্যায় একটু পরেই আলোচনা করছি ইনশাআল্লাহ। এ ছাড়া বাকী অনেকটি যেমন সুরা, দুরুদ মানসুস, যার নির্দিষ্ট ফযিলত রয়েছে। কিছু বাক্য যেগুলোতে আল্লাহকে সম্বোধন করা হয়েছে এই বাক্যগুলো দ্বারা আল্লাহকে ডাকা এবং নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করা যাবে। ওযিফা হিসেবে তা পাঠ বা এতে ছওয়াব আছে মনে করা যাবে না, কেননা ছওয়াবের বিষয়টি সম্পূর্ণ তাওকীফি বা ওহি নির্ভর। এর বাইরে খতমের যে ধারা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর নির্দিষ্ট যে ফযিলত বলা হয় তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মানসুস বা রাসূল সাল্লাল্লাহু থেকে প্রমাণিত আমলগুলো তিনি যেভাবে করেছেন সেভাবেই করতে হবে এবং তিনি যে ফযিলত বলেছেন বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। আমলের ক্ষেত্রে এর বাইরে কিছু বলার কারো কোনো অধিকার নেই। এই খতমের ফযিলতে বলা হয়ে থাকে, কঠিন পীড়া ও বিপদাপদ হতে উদ্ধার লাভের জন্য ও প্রত্যেক প্রকার মনের বাসনা, পরীক্ষা পাস ও চাকরী লাভ করিবার জন্য এই খতমটি অদ্বিতীয়।³⁴⁷ এ সবকথাই ভিত্তিহীন ও মনগড়া। এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন দো‘আ বা ইবাদত। এর ফযিলত একমাত্র তিনি বলতে পারেন যিনি এগুলো দিয়েছেন। আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমল যেভাবে করলে যে ফযিলত বলেছেন তা সেভাবে করেই উক্ত ফযিলতের আশা করতে হবে। রাসূল কর্তৃক প্রদানকৃত রূপকে পরিবর্তন করা এবং সাথে সাথে নতুন ফযিলতের বুলি আওড়ানোর অধিকার কাউকে

³⁴⁷ প্রাগুক্ত।

তিনি দেননি। আর এগুলো হচ্ছে ধর্মীয় বিষয়। ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞতার কথা বলা অনর্থক।

৭ নং দো‘আটি আপত্তিকর হওয়ার কারণ হলো, অন্যের মর্যাদার দোহাই দিয়ে পার পাওয়ার ধারণা মূলত মুশরিকদের। ঈসা আলাইহিস সালামের মর্যাদার দোহাই দিয়ে পার পাওয়া খ্রিস্টবাদী ধারণা। উযাইর আলাইহিস সালামের দোহাই দিয়ে পার পাওয়ার আশা ইয়াহুদীবাদী ধারণা। ফেরেশ্তাগণ আল্লাহর মেয়ে হওয়ার ধারণায় তাদের মর্যাদার দোহাই দিয়ে পার হওয়ার ধারণা মক্কার মুশরিকরা লালন করত। কুরআন করীমে এসবের বিবরণ ও তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন জাতি আল্লাহতে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও শিক্কে লিপ্ত হয়। ইসলাম এর মূলোৎপাটন করেছে। আল্লাহর বিধান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানো পদ্ধতিতে পালনের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহরই দয়ায় পার পাওয়া যাবে বলে শিক্ষা দিয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে আজীবন এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। কুরআন ও হাদীসের সাথে সম্পৃক্ততা বাড়িয়ে দিলেই বিষয়টি সবার কাছে ফুটে উঠবে। কুরআন বা হাদীসে বর্ণিত দো‘আগুলো এবং দো‘আর শিক্ষা থেকেও আমরা বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারি। আল্লাহ তাঁর জ্ঞানের দিক থেকে বান্দার শাহরগের চেয়েও অধিক নিকটে বলে ঘোষণা দিয়েছেন।³⁴⁸

³⁴⁸ সূরা ক্বাফ, আয়াত: ১৬।

এটি গ্রন্থকারের মত। আর এটা সত্য যে আল্লাহ তা‘আলা স্বয়ং আরশের উপর থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানের দিক থেকে আমাদের সাথেই রয়েছেন। তবে বিশুদ্ধ তাফসীর মতে আলোচ্য আয়াতে ‘আমরা’ বলে ফিরিশতাদের বুঝানো হয়েছে। [সম্পাদক]

তাই আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে কোনো ব্যক্তি মিডিয়া বা ব্যক্তির মর্যাদা মিডিয়া বানানোর প্রয়োজন ইসলাম বোধ করে না। আর এটাই ছিল সালাফে সালিহিনের আকীদা। ইমাম আবু হানিফা (রাহ.) বলেনঃ

" لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به والدعاء المأذون فيه المأمور به
ما استفيد من قوله تعالى " والله الأسماء الحسنى فادعوه بها
".(الدر المختار، كتاب الحظر والاباحة)

“কারো জন্য উচিত নয় আল্লাহর কাছে তারই মাধ্যম ছাড়া দো‘আ করা। আর তাঁর নাম নিয়ে দো‘আর অনুমোদন ও নির্দেশিত হওয়ার দলীল আল্লাহর বাণী: “আর আল্লাহর অনেক সুন্দর নাম রয়েছে, অতএব তোমরা তাকে এগুলোর মাধ্যমে ডাকো”।”³⁴⁹ ‘তারই মাধ্যমে’ দো‘আর ব্যখ্যায় আল্লামা শামী লিখেনঃ

"قوله (إلا به) أي بذاته وصفاته وأسمائه".

অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা, তার গুণাবলী এবং তার নামের মর্যাদার ওসিলাতেই কেবল দো‘আ করা যাবে। ফিকহে হানাফীতে আবু হানিফা রাহ. মাযহাব উল্লেখে বলা হয়েছেঃ

³⁴⁹ আল্লামা আলাউদ্দীন আল-হাসকাফী, আদুররুল-মুখতার, অবৈধ বৈধ অধ্যায়, বেচাকেনা অনুচ্ছেদ।

ড: আব্দুর রহমান আল-খুমাইছ, ইতিকাদুল আয়িম্মাতিল আরবা‘আহ, আকীদাতুল ইমাম আবু হানিফা।

পৃষ্ঠা:৩। শামসুদ্দীন আফগানী (১৩৭২-১৪২০ হি.), জুহুদুল উলামায়িল হানাফিয়াহ ফি ইবতালি

আক্বায়িদিল কুবুরিয়াহ (কবরপূজারীদের আক্বায়িদ বাতিল করতে হানাফী আলেমদের প্রচেষ্টা), ১/৩১,

২/১১২৪।

" (و) كره قوله (بحق رسلك وأنبياك وأوليائك) أو بحق البيت لأنه لا حق للخلق على الخالق تعالى".

“এবং বলা মাকরুহ³⁵⁰, তোমার রাসূলগণ, নবীগণ ও ওলীগণের অধিকারে অথবা বাইতুল্লাহর অধিকারে কেননা আল্লাহর উপর মাখলুকের কোনো অধিকার নেই।”³⁵¹

আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত, বিশেষ করে ইমাম আবু হানিফা (রাহ.) ও তার দুই বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.) এর আক্বীদা বর্ণনায় হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত আলেম আবু জা‘ফর আত্ভাহাবী³⁵² রচিত আক্বীদার কিতাব ‘আল-

³⁵⁰ উল্লেখ্য যে, আমাদের পূর্বসূরীগণ ‘মাকরুহ’ শব্দ বলে হারাম বোঝাতেন। [সম্পাদক]

³⁵¹ আব্দুররুফ মুখতার, প্রাণ্ডু, জুহুদুল উলামায়িল হানাফিয়াহ ফি ইবতালি আক্বায়িদিল ক্বুরিয়্যাহ, ১/৭, ২/১১২৬।

³⁵² হানাফী বিশিষ্ট ফক্বীহ আবু জা‘ফর আহমদ ইবন মুহাম্মদ সালামাহ আত্ভাহাবী। বলা হয়, মিশরে ফিক্বহে হানাফীর নেতৃত্ব তাঁর কাছে এসে শেষ হয়েছে। তিনি প্রথমে ফিক্বহে শাফি অর্জন করেন। পরবর্তীতে ফিক্বহি হানাফী গ্রহণ এবং এতে নেতৃত্বের স্থান অধিকার করেন। জন্ম: ২৩৯, ওফাত: ৩২১ হিজরী, ৮৫৩-৯৩৩ ঈসায়ী। (আল-আ‘লাম ১/২০৬) তার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ যা ‘আরব ‘আজম সবখানে প্রসিদ্ধ। তাঁর লিখিত আক্বীদার কিতাব ‘আল-আক্বীদাতুত্ভাহাবীয়াহ’ আরব ‘আজম সবখানে প্রসিদ্ধ ও পাঠ্য সিলেবাসভুক্ত। অনেকেই তর এ কিতাবের শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। তিনি তার এ কিতাব ইমাম আবু হানিফা (রাহ.) ও সাহেবাইন অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রাহ.) এর আক্বীদা বর্ণনা করতে লিখেছেন বলে কিতাবের শুরুতেই নিজে উল্লেখ করেছেন। তার বক্তব্যটি এরূপ:

هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة : أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي " وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين (وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين)". (العقيدة الطحاوية، مقدمة، 1-1

আক্বীদাতুত্বাহবীয়াহ’ এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে আল্লামা আবুল-ইয আল-হানাতী³⁵³ লিখেনঃ

" قال أبو حنيفة وصاحباہ رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام، والمشعر الحرام، ونحو ذلك حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك".

“আবু হানীফা এবং তার দুই সঙ্গী (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলেন: দো‘আকারীর জন্য বলা মাকরুহ, “অমুকের অধিকারে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, অথবা তোমার নবী ও রাসূলগণের অধিকারে এবং বাইতুল হারামের অধিকারে এবং মাশ‘আরে হারামের³⁵⁴ অধিকারে।” এ জাতীয় আরো যা রয়েছে।

এমনকি ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা মাকরুহ মনে করেন যে, লোকটি বলবেঃ “হে আল্লাহ, তোমার আরশের

³⁵³ আলী ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আবীল-ইয। ইবনু আবীল ‘ইয নামে প্রসিদ্ধ। দামেশেকের বিশিষ্ট হানাফী ফক্বীহ। জন্ম: ৭৩১, ওফাত: ৭৯২হিজরী, ১৩৩১-১৩৯০ ঈসাব্দী। (আল-আ‘লাম ৪/৩১৩)

³⁵⁴ মাশ‘আরে হারাম অর্থ সম্মানী প্রতীক। বর্ণনার আলোকে কুরআনের মাশ‘আরে হারাম বলতে মুযদালিফার মাঠ উদ্দেশ্য নিয়েছেন উলামায়ে কেরাম। কেউ কেউ শুধুমাত্র মুযদালিফার শেষ প্রান্তে অবস্থিত ছোট পাহাড়টি উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন। দেখুন: সহীহুল বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: যারা পরিবারের দুর্বল লোকদের রাতে পাঠিয়ে দেয় (মুযদালিফা থেকে মিনায়) অতঃপর তারা রাতে মুযদালিফায় অবস্থান করে এবং দো‘আ করে..., নং: ১৫৯২, সহীহ মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: পরিবারের দুর্বল লোক মহিলা ও অন্যদেরকে মানুষের ভিড়ের পূর্বে রাতের শেষভাগের দিকে মুযদালিফা থেকে মিনায় পাঠিয়ে দেওয়া এবং অন্যরা ফজরের সালাত আদায় পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করে যিকরে লিগু থাকা মুস্তাহাব, নং: ৩১৯০, আল্লামা আলুসী, রুহুল মা‘আনী, সূরা বাক্বারা, আয়াত:১৯৮, তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা বাক্বারা, আয়াত:১৯৮।

সম্মানিত আসনের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি”।³⁵⁵

তিনি আরো লিখেনঃ

وتارة يقول: بجاه فلان عندك، يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك. ومراده أن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم، وهم يؤمنون على دعائه، كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه - لما خرجوا يستسقون -: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا». معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسواله، ليس المراد أنا نقسم عليك به، أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. (شرح العقيدة الطحاوية، بحث: الشفاعة، 1-154)

“এবং অনেক সময় দো‘আ প্রার্থী বলে: ‘আপনার কাছে অমুকের যে সম্মান রয়েছে তার মাধ্যমে’ সে বলে ‘আমরা আপনার নিকট আপনার নবী, রাসূল ও ওলীগণকে মাধ্যম গ্রহণ করছি’, এর দ্বারা লোকটির উদ্দেশ্য, অমুক আপনার নিকট মান, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, তাই আপনি আমাদের দো‘আ কবুল করুন। এটাও নিষিদ্ধ। কেননা যদি সাহাবায়ে কেরাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবিত থাকাকালে এ ধরনের মাধ্যম গ্রহণ করতেন তবে তাঁর মৃত্যুর পরও

³⁵⁵ ইবনু আবীল ইয়, শরহুল আক্বীদাতুত্তাহাবীয়াহ, শাফা‘আত প্রসঙ্গ, ১/১৫৪।

অবশ্যই নিতেন। অথচ তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাকালে তারা তাঁর দো‘আর মাধ্যম নিতেন। তারা তাঁর কাছে তাদের জন্য দো‘আর প্রার্থনা করতেন। তারা তাঁর দো‘আর উপর ঈমান রাখতেন, যেমন বৃষ্টি কামনা ইত্যাদির বেলায়। অতঃপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গেলেন এবং তারা বৃষ্টি কামনার দো‘আর জন্য বের হলেন, তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেনঃ ‘হে আল্লাহ, যখন আমরা দুর্ভিক্ষের শিকার হতাম তোমার কাছে তোমার নবীর মাধ্যমে দো‘আ করতাম, ফলে তুমি আমাদের বৃষ্টি দিতে।

এখন আমরা তোমার কাছে আমাদের নবীর চাচা (আব্বাস) এর (দো‘আর) মাধ্যম গ্রহণ করছি’। এর অর্থ হলো, তিনি আল্লাহর কাছে যে দো‘আ করেন, সুপারিশ করেন এবং প্রার্থনা করেন এর মাধ্যমে। তোমার কাছে তার শপথ এ উদ্দেশ্য নয়, অথবা আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তার সম্মানের মাধ্যমে যা তোমার কাছে রয়েছে এটাও উদ্দেশ্য নয়।

কেননা যদি এ ধরনের মাধ্যম ধরা উদ্দেশ্য হত তবে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান সর্বাধিক এবং আব্বাসের সম্মান থেকে বেশি।”³⁵⁶ কুরআন হাদীসের শিক্ষা অনুযায়ী এই ছিল আবু হানিফা (রাহ.) সহ সমস্ত আসলাফের আক্বীদা বা বিশ্বাস। সালফে সালিহিনের আক্বীদা, বিশ্বাস, আদর্শ থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফলেই আজ

³⁵⁶ শরহুল আক্বীদাতুত্তাহাবীয়াহ, প্রাগুক্ত, জুহুদুল উলামায়িল হানাফিয়াহ ফি ইবতালি আক্বায়িদিল কুবুরিয়াহ, ৩/১৫১২।

আমাদের মাঝে এমন অনেক কিছু বিস্তার লাভ করেছে যা তাদের মাঝে ছিল না। তাদের আদর্শ থেকে সরে যাওয়ার ফলেই আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত থেকে সরে গেছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিদের আর আমাদের আমলের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারতম্য সৃষ্টি হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের নমূনার উপর উঠার তওফিক দান করুন।

সুন্নাতের বিপরীত যে কোনো ইবাদতের বেলায় জায়েয না-জায়েযের বাহাসে লিপ্ত না হয়ে চোখ বুঁজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাতকে সাহাবা ও সালফে সালেহিনের মত নেয়ার তওফিক দান করুন। হক্ক বোঝার জন্য প্রথমে আমার চক্ষু এবং আমাদের চক্ষু খোলে দিন।

মুফতি ফয়জুল্লাহ (রাহ.) রচিত কবিতার দুটি পঙক্তি দিয়ে আলোচনাটি শেষ করছি। পঙক্তিদ্বয় এইঃ

هم مروج این دعائے خواجگان □ از سلف منقول نے خوب دان
ان عبادت نیست بااں اهتمام □ مثل طاعت بدعت امد لا كلام

“প্রচলিত এই খাজেগাঁর দো‘আও, ভালভাবে জেনে রাখ এগুলো সালাফ থেকে প্রমাণিত নয়, এগুলো ইবাদত নয়, ইবাদতের মত এগুলোর গুরুত্ব দেওয়া নিশ্চিত বিদ‘আত।”³⁵⁷

³⁵⁷ মুফতি ফয়জুল্লাহ, পান্দে নামাহ খাকী, দো‘আয়ে খাজেগাঁ অপ্রমাণিত, পৃষ্ঠা: ৩৪।

খতমে জালালীঃ আল্লাহর পবিত্র নামসমূহের মধ্যে তার মূল নাম ‘الله’। এই পবিত্র নাম বা ইসমে যাত নিয়ে তামাশার এক পদ্ধতির নাম খতমে জালালী। প্রথমেই দো‘আ করি, যে অজ্ঞ ব্যক্তি এই খতম আবিষ্কার করেছে আল্লাহ যেন তাকে মাফ করে দেন। খতমের পদ্ধতিটি দেখলেই সচেতন ব্যক্তি যিনি ইসলাম সম্পর্কে নূন্যতম ধারণা রাখেন তার কাছে এই খতমের খারাবী ধরা পড়বে। তবে যিনি ইলমের ধারক হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার লালসায় হাবুডুবু খাচ্ছেন, তিনি ধর্মের রক্ষা নয় বরং ধর্মই তাকে রক্ষা করেছে এমন ব্যক্তির কথা ভিন্ন। খতমের পদ্ধতিটি যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে: “নদী ভাঙ্গন বা ঐরূপ কঠিন বিপদ হইতে উদ্ধারকল্পে এই নাম সোয়া লক্ষ বার কাগজে লিখিবে ও সোয়া লক্ষ ময়দার আটার গুলী তৈয়ার করিবে, গুলী তৈয়ার করার সময় ‘আল্লাহ্’ এই নাম মুখে বলিবে, তৎপর আল্লাহর নাম লিখিয়া কাগজগুলি একটি করিয়া গুলীর মধ্যে ভরিবে, তৎপর গুলীগুলি নদী বা যে পুকুরে মাছ থাকে তাহাতে ফেলিয়া দিবে। সকলেই পাক সাফ অবস্থায় ওয়ুসহ এই আমল করিবে। নতুবা হিতে বিপরীত হইতে পারে। এই আমল দ্বারা বিপদ হইতে উদ্ধার হইবে ও মতলব পূর্ণ হইবে। ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। আল্লাহর নামসমূহ ২ ভাগে বিভক্ত- জালালী (তেজস্বী) ও জামালী (সৌন্দর্যময়)। ‘আল্লাহ’ নাম জালালীর অন্তর্ভুক্ত; এই জন্য ইহার খতমকে খতমে জালালী বলা হয়।”³⁵⁸

পাঠক, এবার আপনি নিজেই এই খতমের ফায়সালা করুন। এই খতমের পদ্ধতিতে আল্লাহর যাতি নাম নিয়ে খেল তামাশা, নির্লজ্জ আচরণের সাথে সাথে এর ফায়েদায় যা কিছু বলা হয় তা সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। ওহী

³⁵⁸ নেয়ামুল কুরআন, ১৯৮।

ছাড়া এসব কথা বিশ্বাসে মুমিনের আকীদায় স্পট পড়ে। আলহাম্দুলিল্লাহ এমন অনেক আলেম পেয়েছি যিনি এই খতমের নাম ও পদ্ধতি শুন্যর সাথে সাথে “লা হাওলা...” পড়েছেন। আবার অনেক এমন রয়েছেন যিনি একে অপছন্দ করেন তবে অংশ নেন। তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ভাই, আপনি জানা সত্ত্বেও কেন এসব খতমে উপস্থিত হন তাদের একই কথা, ভাই, আমার টাকার দরকার তাই যাই। আবার এমন অনেক আছেন যারা এটির পক্ষে সাফাই গান। বিভিন্ন যুক্তি ও হিলার মাধ্যমে এগুলোকে জায়েয রাখবার চেষ্টা করেন। স্বার্থের কারণে দ্বীনী বিষয়ের যে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। ব্যাখ্যা সঠিক নাকি ভুল এই বিষয় তাদের কাছে মূল্যহীন। এই কর্ম আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সেটিও উপেক্ষিত। অর্থই যেন তাদের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য। অথচ সম্পদের স্বার্থে ইলমের জোরে দীনের যে কোনো অপব্যখ্যা ইয়াহুদী আলেমদের গুণ ছিল বলে আমাদের সকলের জানা। ইলমের দ্বারা অপব্যখ্যার মাধ্যমে দো‘আ দুরুদের সুন্নাহ বহির্ভূত পদ্ধতি আবিষ্কার বা আবিষ্কৃত বিষয় জায়েয বানাবার অপচেষ্টা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যৎবাণীর প্রকাশ। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যৎ বাণী ছিল যার মর্ম হচ্ছে: তার উম্মত বনী ইসরাঈলের পূর্ণ অনুসরণ করবে। এমনকি এক জোড়া জুতার মাঝে যেমন কোনো বেশ কম হয় না তার উম্মত ও বনী ইসরাঈলের উম্মতের মাঝে কোনো বেশ কম হবে না।³⁵⁹ তাই আল্লাহর কাছে সর্বদা অশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত যে, আল্লাহ যেন আমাদেরকে কখনো এই তৃতীয় স্তরের আলেমদের মাঝে শামেল না করেন। আমাদের ঈমানকে

³⁵⁹ তিরমিযী, সুনান, উম্মতের দলাদলি অনুচ্ছেদ, নং: ২৬৪১, হাকীম, আল-মুসতাদরাদক ‘আলাস-সহীহাইন, ফিতনা ও পরস্পর লড়াই অধ্যায়, নং: ৮৪৮, ৪/৫১৬।

দুর্বল করে দ্বিতীয় স্তরের মধ্যে ও যেন না রাখেন। বরং এই তিন শ্রেণির আলেমের মাঝে আল্লাহ আমাদেরকে প্রথম স্তরের আলেমদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং এই প্রথম শ্রেণির মত আমাদেরকেও সঠিক দীন বোঝার তওফীক দিন। টাকার স্বার্থে বুঝে না বোঝার বাহানার মত মারাত্মক ব্যাধি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন।

খতমে দুরূদে মাহিঃ ‘মাহি’ ফারসি শব্দ। যার অর্থ মাছ। বানানো একটি দুরূদকে ‘দুরূদে মাহি’ হিসেবে নামকরণের কারণ হিসেবে যে কাল্পনিক কাহিনীটি বলা হয়েছে তা নিম্নরূপ: “হযরত রসূল (সাঃ) এর সময় একজন কামেল ব্যক্তি নদীর তীরে বসিয়া সর্বদা এই দুরূদ শরীফ পড়িতেন। ঐ নদীর একটি রুগ্ন মৎস্য ইহা সর্বদা শুনিতে শুনিতে শিখিয়া ফেলিল ও পড়িতে লাগিল। ক্রমে মৎস্যটির রোগ আরোগ্য হইতে লাগিল ও তাহার শরীরের রং বদলাইয়া সোনার বর্ণ ধারণ করিল। দৈবাৎ একদিন এক ইহুদী জেলের জালে মৎস্যটি ধরা পড়িল। ইহুদীর স্ত্রী অনেক চেষ্টা করিয়া মৎস্যটি কাটিতে পারিল না। অবশেষে উহাকে ফুটন্ত তৈলের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু মৎস্যটি নির্বিঘ্নে তৈলের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই দুরূদ শরীফ পড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ইহুদী অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়া পড়িল ও মৎস্যটিকে লইয়া হযরত রসূল (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইল। হযরত (সাঃ) এর দোয়ায় মৎস্যটি বাকশক্তি লাভ করিল ও সমস্ত বিষয় হযরত (সাঃ) এর নিকট বর্ণনা করিল। ইহা শুনামাত্র সেখানে উপস্থিত ৭০ জন ইহুদী তৎক্ষণাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন ও রসূল (সাঃ) এর নবুয়তের উপর ঈমান আনিলেন। তৎপর মৎস্যটিকে নদীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। উপরোক্ত কারণে এই দুরূদ শরীফ

‘দরুদে মাহি’ তথা মাছের দরুদ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহা পড়িলে অতি মধুর শুনায়।”³⁶⁰

দুরুদটি নিম্নরূপঃ

" اللهم صل على محمد خير الخلائق، أفضل البشر، شفيع الامة
يوم الحشر والنشر سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك، وصل على
جميع الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله
الصالحين، وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين ."

এই খতমের নিয়মে বলা হয়ঃ ২১ দিনে বা ৪২ দিনে সোয়া লক্ষবার বর্ণিত দুরুদটি পড়া। এই নিয়মে এই খতম পড়লে নাকি হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। অযু সহকারে নদীর তীরে বসে পড়লে আরও বেশি দ্রুত ফল পাওয়া যায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে³⁶¹। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। বর্ণিত দুরুদটি মাছুর তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। বরং এটি কারো বানানো একটি দো‘আ। তাই একে ওযিফা হিসেবে আমলে আনা যাবে না। তবে এতে কোনো আপত্তিকর শব্দ নেই। তাই কেউ ইচ্ছা করলে দো‘আর উদ্দেশ্যেই তা পড়তে পারে। এর যে পদ্ধতি ও ফযিলত বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মনগড়া বানানো বক্তব্য। তাই মুমিন এ সবার পিছে পড়েন না এবং তা বিশ্বাস করেন না।

দুরুদে মাহি নামকরণের কারণে যে কাহিনীটি উল্লেখ করা হয়েছে তা জালিয়াতদের বানানো সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও মনগড়া, এ কাহিনীর কোনো সত্যতা নেই।

³⁶⁰ নেয়ামুল কুরআন, পৃষ্ঠা:৪৩-৪৪।

³⁶¹ প্রাগুক্ত।

সূরা ইখলাস দ্বারা কুরআন খতমঃ নির্দিষ্ট সংখ্যার মাধ্যমে সূরা ইখলাসের খতম প্রচলিত না থাকলেও সূরা ইখলাস তিনবার পড়ার মাধ্যমে কুরআন খতমের প্রচলন রয়েছে। তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করলে পূর্ণ এক খতম কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব পাওয়া যায় বলে অনেকের ধারণা। তাই অনেক সময় কুরআন খতম করতে অপারগ হলে তিনবার এই সূরা পাঠ করা হয়। বলা হয় হাদীসে রয়েছে, তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করলে এক খতম কুরআনের ছওয়াব পাওয়া যায়। অথচ এমন কোনো কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয় নি। রাসূলের হাদীসের সাথে যুক্তির মিশ্রণ ঘটিয়ে এমন কথা বলা হয়। আর অনেক ক্ষেত্রে এভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার মর্ম পরিবর্তন হয়ে শরীয়তের বিকৃতি ঘটেছে। কুরআন আল্লাহর পবিত্র কালাম। তার প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি আয়াত, প্রতিটি সূরা বরকতময় ও মর্যাদাপূর্ণ। আল্লাহর কালাম হিসেবে মর্যাদার দিক থেকে পুরো কুরআন এক সমান। তবে ভাব বা মর্মের দিক থেকে কোনো কোন আয়াত বা সূরার ফযিলত অন্যটির তুলনায় বেশি বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন। এরকম মর্যাদাপূর্ণ একটি সূরা হচ্ছে সূরা ইখলাস। সূরাটিতে আল্লাহ তাঁর পরিচয় অত্যন্ত অল্প বাক্যের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরেছেন। এই সূরার ফযিলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ

"والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن". (صحيح البخاري،

كتاب التفسير، باب فضل قل هو الله أحد، رقم: 4726)

“ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ নিশ্চয় এটি (ইখলাস)
কুরআনের এক তৃতীয়াংশের বরাবর।”³⁶²

আরেকটি হাদীসে রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ

« أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن ». قالوا وكيف يقرأ
ثلث القرآن قال « (قل هو الله أحد) يعدل ثلث القرآن ». (صحيح
مسلم، كتاب التفسير، باب فضل قراءة قل هو الله أحد، رقم: 1922)

“তোমাদের কেউ কি প্রতি রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়তে
অক্ষম? সাহাবিরা বললেন, এক তৃতীয়াংশ কীভাবে পড়বে? রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

“³⁶³ (قل هو الله أحد) এক তৃতীয়াংশের সমান।”

এবার দেখুন, এই হাদীসের অর্থটিকে কীভাবে পরিবর্তন করে তা রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, যার কোনো
বিবরণ সহীহে হাদীসে নেই। এক তৃতীয়াংশের সমান হওয়া এবং তিনবার
পড়লে পূর্ণ কুরআন পড়ার ছওয়াব পাওয়া কি এক? উলামায়ে কেরাম এই

³⁶² সহীহুল বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, “قل هو الله أحد” এর ফযিলত পরিচ্ছেদ, নং: ৪৭২৬। উল্লেখ্য
বুখারীর আরো একাধিক জায়গায় হাদীসটি রয়েছে।

³⁶³ সহীহ মুসলিম, কুরআন ফযিলত সমূহ অধ্যায়, “قل هو الله أحد” পড়ার ফযিলত পরিচ্ছেদ, নং: ১৯২২,
সহীহুল বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, “قل هو الله أحد” এর ফযিলত পরিচ্ছেদ, নং: ৪৭২৭। উল্লেখ্য বুখারীর
বর্ণনাটি সামান্য ভিন্ন। বর্ণনাটি এইরূপ,

“ أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينما يطيق ذلك يا رسول الله ؟ فقال: الله
الواحد الصمد ثلث القرآن ”.

হাদীসের মর্ম বর্ণনা করেন যে, কুরআনের বিষয়বস্তু মূলত তিনটিঃ আহকাম বা জীবন বিধান, আখবার বা সংবাদসমূহ, তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের বিবরণ। সূরা ইখলাসে তাওহীদের আলোচনা বা আল্লাহর একত্ববাদকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে এক তৃতীয়াংশ বলেছেন।³⁶⁴

একেই কেউ কেউ এভাবে বলেন যে, কুরআনের অর্থ তিন ভাগে বিভক্ত। ঘটনাবলী, আহকাম, আল্লাহর গুণাবলী। সূরা ইখলাসটি আল্লাহর গুণাবলীতে বিশেষিত ³⁶⁵। এভাবেও বলা যায় যে, পুরো কুরআনের আলোচনা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত নিয়ে। যে কোনো বিষয় এ তিনটির কোনোটির সাথে সম্পৃক্ত। আর সূরা ইখলাসে তাওহীদের আলোচনা অত্যন্ত নিপুণভাবে করা হয়েছে, তাই এ সূরাকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস থেকেও এ অর্থেই এক তৃতীয়াংশ বলার কথাটি স্পষ্ট হয়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

« إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن ». (صحيح مسلم، المرجع السابق، رقم: 1923)

“আল্লাহ তা‘আলা কুরআনকে তিন অংশে বিভক্ত করেছেন। “ قل هو الله أحد ” (সূরা ইখলাস) কে কুরআনের তিন অংশের এক অংশ সাব্যস্ত করেছেন।”³⁶⁶

³⁶⁴ ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, প্রাপ্ত অধ্যায়, ৯/৫৯।

³⁶⁵ ইমাম নাওয়াওয়ী, মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, প্রাপ্ত অধ্যায়।

³⁶⁶ সহীহ মুসলিম, প্রাপ্ত, নং: ১৯২৩।

এই হাদীস থেকে উপরোক্ত মর্মটি আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। তবে কেউ কেউ এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য বলতে এক তৃতীয়াংশ পড়লে যে ছওয়াব হয় সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করলে এই পরিমাণ ছওয়াব হয় বলে বলেছেন। কিন্তু এই মর্মটির কোনো দলীল নেই। বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘ফাতহুল বারী’তে লিখেন:

" ومنهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب فقال معنى كونها
ثلث القرآن أن ثواب قراءتها يحصل للقارئ مثل ثواب من قرأ ثلث
القرآن وقيل مثله بغير تضعيف وهي دعوى بغير دليل ". (فتح
الباري، كتاب التفسير، باب فضل قل هو الله أحد، 9-60)

“আলেমগণের মধ্যে কেউ সমতুল্য অর্থটি ছওয়াব অর্জনের ক্ষেত্রে নেন এবং বলেন, এক তৃতীয়াংশ হওয়ার অর্থ এই সূরাটি পড়ার ছওয়াব পাঠকের জন্য ঐ ব্যক্তির সমান হবে যে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়েছে। এটাও বলা হয়ে থাকে, অতিরিক্ত ছওয়াব ব্যতিরেকে³⁶⁷ মূল ছওয়াবের এক তৃতীয়াংশের সমান। তবে এই দাবীর সপক্ষে কোনো দলীল নেই।”³⁶⁸

এখানে লক্ষণীয় যে, একবার সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করলে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়ার ছওয়াব পাওয়ার ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস নেই।

³⁶⁷ একথার মর্ম হল: যে কোনো নেক আমলের একটি মূল নেকী রয়েছে, তবে আল্লাহ তা‘আলা তার দায় এই নেকী কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন বলে কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি। এই হিসেবে পূর্ণ কুরআন একবার তেলাওয়াত করলে তার মূল এক ছওয়াব রয়েছে। তেলাওয়াতের মাঝে ইখলাস, গভীরতা ইত্যাদি অনুযায়ী ব্যক্তি বিশেষে আল্লাহ তা অনেকগুণ বাড়িয়ে দিতে পারেন। একবার সূরা ইখলাস পড়লে এক তৃতীয়াংশের মূল ছওয়াব পাওয়া যাবে। অতিরিক্তটুকু নয়।

³⁶⁸ ফাতহুল বারী, প্রাপ্ত অধ্যায়, ৯/৬০।

একটি হাদীস থেকে এই মর্ম নেয়ার সামান্য সম্ভাবনা ছিল মাত্র, তবে মুসলিম শরীফের হাদীসের মাধ্যমে এই সম্ভাবনাটির অবকাশ দূর হয়ে গেছে। তথাপি দূরবর্তী সম্ভাবনা অনুযায়ী আমরা যদি মেনে নেই যে, একবার সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করলে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ পড়ার ছওয়াব পাওয়া যায় তবে একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, তিনবার সূরাটি তেলাওয়াত করলে এক তৃতীয়াংশ তিনবার পড়ার ছওয়াব পাওয়া যাবে। পূরো কুরআন একবার পড়ার ছওয়াব পাওয়া যাবে বলে কোনো ইঙ্গিত হাদীসে নেই। বিষয়টি সহজে বোঝার জন্য মনে করুন, আপনার একটি কাজ আছে। যে কাজের তিনটি অংশ রয়েছে। এই কাজটি পূর্ণ করার উপর আপনার ১০০ টাকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তবে একটি অংশ করলে ২০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। এখন কেউ যদি একটি অংশ তিনবার করে এবং এমনটি করার সুযোগ থাকে তবে আপনার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সে ৬০ টাকা পাওয়ার কথা।

এখন যদি সে দাবী করে যে, মোট অংশ তিনটি, আমি একটি অংশ তিনবার করেছি, সুতরাং আমি কাজটি পূর্ণ করেছি, তাই যুক্তির দাবী হলো আমাকে ১০০ টাকা দেওয়া হোক, এখানে আপনি তার এই যুক্তিকে কীভাবে দেখবেন? ঠিক তদ্রূপ একবার সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করলে এক তৃতীয়াংশের ছওয়াব মেনে নিলেও একবার পড়লে এক খতম কুরআনের ছওয়াব পাওয়া যাবে এমন কথা যেমন নির্ভরযোগ্য হাদীস বহির্ভূত, তেমন যুক্তি বহির্ভূত। কোনো ইবাদত বা তার ছওয়াবের ক্ষেত্রে যুক্তি দিয়ে কিছু বলার সুযোগ নেই, তথাপি অনেক দূরবর্তী একটি যুক্তির আলোকে আমাদের মাঝে সূরা ইখলাস তিনবার পড়ে কুরআন খতমের ছওয়াব অর্জনের কথা ও আমল অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও প্রচলিত।

অনেকে পুরো কুরআন পড়ার পর তিনবার সূরা ইখলাস পড়েন যাতে করে ভুলভ্রান্তি কিছু হলে এর মাধ্যমে তার ঘাটতি পূর্ণ হয়ে যায়, তারাবীর সালাতে অনেকে এই সূরা তিনবার পড়ে ঘাটতি পূর্ণ করেন, অথচ শরীয়তে এ সবার কোনো ভিত্তি নেই।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, অন্যের জন্য খতম পড়তে গিয়ে ঘটনাক্রমে পড়া শেষ না হলে এই সূরা তিনবার পড়ে বেঁচে যাওয়ার বাহানা তাল্লাশ করা হয়। খতমের আয়োজকের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য এই সূরা তিনবার পড়ে নিলেই কাম সারে। এভাবে বিভিন্ন সুন্নাহ বিরোধী কর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে।

কেউ বলতে পারেন সূরা ইখলাসের বর্ণিত ফযিলতের ব্যাপারে হাদীস রয়েছে, যেমন একটি হাদীসে এসেছে:

"من قرأ (قل هو الله أحد) ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن أجمع."

“যে ব্যক্তি **قل هو الله أحد** তিনবার পড়ল সে যেন পুরো কুরআন পাঠ করল।”³⁶⁹

এ হাদীসটি অনির্ভরযোগ্য। এর কোনো নির্ভরযোগ্য সনদ নেই।³⁷⁰ এ হাদীস ছাড়াও উক্ত সূরা সংক্রান্ত নির্দিষ্ট সংখ্যা ও বিশাল ফযিলতের কথা সহ

³⁶⁹ আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, (৮৪৯-৯১১ হিজরী, ১৪৪৫-১৫০৫ ঈসায়ী) জাম‘উল জাওয়ামি‘য়, মিম হরফের হাদীস, নং ৬২০১, আলাউদ্দীন আলী ইবন হুসামুদ্দীন আল-মুত্তাফী, (৮৮৮-৯৭৫ হিজরী, ১৪৮৩-১৫৬৭ ঈসায়ী) কানযুল উম্মাল, ১/৫৯৮।

³⁷⁰ নুরুদ্দীন আলী ইবনু আবু বাকর আল-হাইসামী, মাজমা‘উয়াওয়ায়িদ, সূরা “**قل هو الله أحد**” এবং এবিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে, নং: ১১৫৪০, আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিদ্দা‘য়ীফাহ, ১০/১৩৬, নং: ৪৬৩৪।

আরো কিছু হাদীস রয়েছে যার নির্ভরযোগ্য কোনো সনদ বা ভিত্তি নেই। হাদীসের সাথে যাদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে তারা জানেন যে, অন্যের কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে নিসবত বা সম্পৃক্তের একটি দিক হচ্ছে, অনেক সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের বিভিন্ন মর্ম বা ব্যাখ্যা মানুষ তাদের জ্ঞান বা মেধা থেকে বর্ণনা করে থাকেন। পরবর্তীতে ব্যাখ্যাকারী নিজে অথবা অন্য কেউ উক্ত ব্যাখ্যা বা মর্মকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পৃক্ত করে হাদীস বলে চালিয়ে দিয়েছেন। অনেক জাল হাদীসের অনুপ্রবেশ এভাবেই ঘটেছে।

আল্লামা সুযুতী মনে করেন জাল হাদীসের এই প্রকারটি সর্বাধিক।³⁷¹ নির্ভরযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য কোনো সনদ না থাকায় বর্ণিত হাদীসটিও এই ধরনের বলে সহজেই অনুমেয়। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালনার তওফীক দান করুন। আমীন।

(৩৩) আযান ও ইকামতে বিদ'আতঃ আমাদের দেশে প্রচলিত আযান ও ইকামতেও বিদ'আতী প্রথা রাসূল (সাঃ) এর হাদীস অনুযায়ী পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমনঃ

হাদীসটি নিম্নরূপঃ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الثَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّافُوسِ يَعْْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لَجْمُ الصَّلَاةِ طَافَ بِي

³⁷¹ সুযুতী, তাদরীবুর-রাবী, জালিয়াতের প্রকার, ১/২৮৭।

وَأَنَا نَأْتِمُ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَافُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّافُوسَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ . قَالَ أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَى . قَالَ فَقَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَلَيَّ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ وَتَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ " إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَدِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أُنْدَى صَوْتًا مِنْكَ " . فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُنْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَدِّنُ بِهِ - قَالَ - فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَيَقُولُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَلِلَّهِ الْحَمْدُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ فِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ " . وَقَالَ مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ " . لَمْ يَتْنَبَا

অর্থঃ মুহাম্মাদ ইবন মাসূর আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিংগা ধ্বনি করে লোকদের নামাযের জন্য একত্র করার নির্দেশ প্রদান করেন তখন একদা আমি স্বপ্নে দেখি যে, এক ব্যক্তি শিংগা হাতে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে বলি, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কি শিংগা বিক্রয় বরবে? সে বলে, তুমি শিংগা দিয়ে কি করবে? আমি বলি, আমি তার সাহায্যে নামাযের জামাআতে লোকদের ডাকব। সে বলল, আমি কি এর উত্তম কোন সন্ধান তোমাকে দেব না? আমি বলি, হ্যাঁ। রাবী বলেন, তখন সে বলল, তুমি এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করবেঃ

১. আল্লা-হু আকবার (অর্থ : আল্লাহ সবার চেয়ে বড়) **اللَّهُ أَكْبَرُ** ৪ বার

২. আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) ২ বার

(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই)

৩. আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ) ...২ বার

(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল)

৪. হাইয়া ‘আলাহু ছালা-হ (ছালাতের জন্য এসো) حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ ...২ বার

৫. হাইয়া ‘আলাল ফালা-হ (কল্যাণের জন্য এসো) حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ ... ২বার

৬. আল্লা-হু আকবার (আল্লাহ সবার চেয়ে বড়) اللَّهُ أَكْبَرُ ... ২ বার

৭. লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ১৫ বার মোট = ১৫ বার।

রাবী রলেন! অতঃপর ঐ স্থান হতে ঐ ব্যক্তি একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ায় এবং বলে- তুমি যখন নামায পড়তে দাঁড়াবে (একামত) তখন বলবে – মোট ১১ বারঃ

“আল্লাহু আকবার (اللَّهُ أَكْبَرُ);

আলাহু আকবার (اللَّهُ أَكْبَرُ);

আশহাদুআল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ);

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ)

হাইয়া আলাস্সালাহ্ (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ);

হাইয়া আলাল-ফালাহ্ (حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ);

কাদ কামাতিস্সালাহ্ (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ);

কাদ কামাতিস্সালাহ্ (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ);

আলাহ্ আকবার (اللَّهُ أَكْبَرُ),

আল্লাহ্ আকবার (اللَّهُ أَكْبَرُ);

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)।

সুতরাং, উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রচলিত আযান ও ইকামতে ভিন্ন চিত্র তথা কতিপয় বিদ'আত পরিলক্ষিত হতে দেখা যায় আমাদের সমাজে। আর এই প্রচলিত বানোয়াট পদ্ধতিকে বিদ'আতী প্রথা বললেও ভুল হবে না।

(৩৪) সালাতে নাভীর নিচে হাত বাঁধা সুন্নাহ বিরোধী কাজ তথা বিদ'আতঃ

‘নাভির নীচে হাত বাঁধা’ সম্পর্কে আহমাদ, আবুদাউদ, মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে চারজন সাহাবী ও দু'জন তাবেঈ থেকে যে চারটি হাদীস ও দু'টি ‘আছার’ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে মুহাদ্দেছীনের বক্তব্য হ'ল- **لَا يَصْلُحُ وَاحِدٌ مِنْهَا لِلْإِسْتِزْلَالِ** - (যঈফ হওয়ার কারণে) এগুলোর একটিও দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়' বরং বিদ'আত।

প্রকাশ থাকে যে, সালাতে দাঁড়িয়ে মেয়েদের জন্য বুকে হাত ও পুরুষের জন্য নাভীর নীচে হাত বাঁধার যে রেওয়াজ চালু আছে, হাদীসে বা

এর কোন প্রমাণ নেই। বরং এটাই স্বতঃসিদ্ধ যে, সালাতের মধ্যকার ফরয ও সুন্নাত সমূহ মুসলিম নারী ও পুরুষ সকলে একই নিয়মে আদায় করবে।

দুই হাতের আংগুল সমূহ ক্বিবলামুখী খাড়াভাবে কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত উঠিয়ে দুনিয়াবী সবকিছুকে হারাম করে দিয়ে স্বীয় প্রভুর মহত্ত্ব ঘোষণা করে বলবে ‘আল্লাহ-হু আকবার’ (আল্লাহ সবার চেয়ে বড়)। অতঃপর বাম হাতের উপরে ডান হাত বুকের উপরে বেঁধে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সম্মুখে নিবেদিত চিত্তে সিজদার স্থান বরাবর দৃষ্টি রেখে দন্ডায়মান হবে। আল্লাহ বলেন,

- وَفُؤْمُوا ۝ اللَّهُ قَانِتِينَ

‘আর তোমরা আল্লাহর জন্য নিবিষ্টচিত্তে দাঁড়িয়ে যাও’ (বাক্বারাহ ২/২৩৮)। হাত বাঁধার সময় দুই কানের লতি বরাবর দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী উঠানোর হাদীস যঈফ।

সালাতে দাঁড়ানোর সময় তাকবীরে তাহরীমার পর বুকে হাত বাঁধা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ হাদীসগুলির কয়েকটি নিম্নরূপঃ

১. সাহু বিন সা‘দ (রাঃ) বলেন,

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ، قَالَ أَبُو حَازِمٍ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا يَتَمَى ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

‘লোকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হ’ত যেন তারা সালাতের সময় ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখে। আবু হাযেম বলেন যে, ছাহাবী সাহু বিন সা‘দ এই

আদেশটিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করতেন বলেই আমি জানি’।

‘যেরা’ (ذِرَاعٌ) অর্থ কনুই থেকে মধ্যমা আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ হাত’ (আল-মু‘জামুল ওয়াসীত্ব)। একথা স্পষ্ট যে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখলে তা বুকের উপরেই চলে আসে।

নিম্নোক্ত রেওয়াযাত সমূহে পরিষ্কারভাবে যার ব্যাখ্যা এসেছে। যেমন-

২. সাহাবী হুন্স আত-ত্বাঈ (রাঃ) বলেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ
-فَوْقَ الْمَفْصِلِ، رواه أحمد

‘আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বাম হাতের জোড়ের (কজির) উপরে ডান হাতের জোড় বুকের উপরে রাখতে দেখেছি’।

৩. ওয়ায়েল বিন হুজ্র (রাঃ) বলেন,

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ
الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ، رواه ابنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ

‘আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সালাত আদায় করলাম। এমতাবস্থায় দেখলাম যে, তিনি বাম হাতের উপরে ডান হাত স্থায় বুকের উপরে রাখলেন’।

উপরোক্ত সহীহ হাদীস সমূহে ‘বুকের উপরে হাত বাঁধা’ সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে। ইমাম শাওকানী বলেন,

وَلَا شَيْءَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْمَذْكُورِ فِي صَحِيحِ ابْنِ -خُزَيْمَةَ-

‘হাত বাঁধা বিষয়ে ছহীহ ইবনু খুযায়মাতে ওয়ায়েল বিন হুজ্র (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের চাইতে বিশুদ্ধতম কোন হাদীছ আর নেই’।

উল্লেখ্য যে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখা সম্পর্কে ১৮ জন সাহাবী ও ২ জন তাবেঈ থেকে মোট ২০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আদিল বার বার বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে এর বিপরীত কিছুই বর্ণিত হয়নি এবং এটাই জমহূর সাহাবা ও তাবেঈনের অনুসৃত পদ্ধতি।

সালাতে বুকে হাত বাঁধার তাৎপর্যঃ ত্বীবী বলেন, ‘হুৎপিন্ডের উপরে বুকে হাত বাঁধার মধ্যে হুঁশিয়ারী রয়েছে এ বিষয়ে যে, বান্দা তার মহা পরাক্রান্ত মালিকের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে হাতের উপর হাত রেখে মাথা নিচু করে পূর্ণ আদব ও আনুগত্য সহকারে, যা কোনভাবেই ক্ষুণ্ণ করা যাবে না’।

(৩৫) মুহাররম মাসের সুন্নাত ও বিদ‘আতঃ আল্লাহ তা‘আলা বার মাসের মধ্যে মুহাররম, রজব, যুলক্বা‘দাহ ও যুলহিজ্জাহ এই চারটি মাসকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। এই মাসগুলো ‘হারাম’ বা সম্মানিত মাস হিসাবে পরিগণিত। ঝগড়া-বিবাদ, লড়াই, খুন-খারাবী ইত্যাদি অন্যায়-অপকর্ম হ’তে দূরে থেকে এর মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

‘এই মাসগুলিতে তোমরা পরস্পরের উপরে অত্যাচার কর না’ (তওবা ৯/৩৬)। রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক আশুরার ছিয়াম পালন ও এর ফযীলত বর্ণনার মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই এ মাসের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

তবে দুঃখের বিষয় হ’ল, রাসূল (সাঃ) যে উদ্দেশ্যে আশুরার ছিয়াম পালন করেছেন, আমরা তাঁর উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গিয়ে এমন উদ্দেশ্যে ছিয়াম পালন করছি যা কুরআন ও সুন্নাতের সম্পূর্ণ বিরোধী। সাথে সাথে এমন সব বিদ‘আতে লিপ্ত হয়েছি যা থেকে বেঁচে থাকা একান্ত যরুরী।

নিম্নে মুহাররম মাসের সুন্নাত ও বিদ‘আত সম্পর্কে আলোকপাত করা হ’ল।-

মুহাররম মাসের সুন্নাতি আমলঃ মুহাররম মাসের সুন্নাতি আমল সম্পর্কে সহীহ হাদীস সমূহে যা বর্ণিত হয়েছে তা হ’ল আশুরার সিয়াম পালন করা। রাসূল (ছাঃ) ১০ই মুহাররমে ছিয়াম পালন করেছেন। ইহুদী ও নাছারারা শুধুমাত্র ১০ই মুহাররমকে সম্মান করত এবং ছিয়াম পালন করত। তাই রাসূল (সাঃ) তাদের বিরোধিতা করার জন্য ঐ দিন সহ তার পূর্বের অথবা পরের দিন সহ ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব সুন্নাত হ’ল, ৯ ও ১০ই মুহাররম অথবা ১০ ও ১১ই মুহাররমে ছিয়াম পালন করা। আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعْظَمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ النَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন আশুরার সিয়াম পালন করলেন এবং সিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন, তখন ছাহাবায়ে কেলাম রাসূল (সাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! ইহুদী ও নাছারাগণ এই দিনটিকে (১০ই মুহাররম) সম্মান করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ‘আগামী বছর বেঁচে থাকলে ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব’। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়। (মুসলিম হা/১১৩৪)।

অন্য হাদীসে এসেছে, ইবনু আববাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا

‘তোমরা আশুরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহুদীদের বিরোধিতা কর। তোমরা আশুরার সাথে তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর’। (বায়হাকী ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২৮৭। অত্র রেওয়ায়াতটি ‘মারফূ’ হিসাবে ছহীহ নয়, তবে ‘মওকূফ’ হিসাবে ‘ছহীহ’। দ্রঃ হাশিয়া ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, ২/২৯০ পৃঃ। ৯, ১০ বা ১০ ও ১১ দু’দিন ছিয়াম রাখা উচিত। তবে ৯ ও ১০ দু’দিন রাখাই সর্বোত্তম)।

আশুরার সিয়ামের ফযীলতঃ ফযীলতের দিক থেকে রামাযানের ছিয়ামের পরেই আশুরার ছিয়ামের অবস্থান। এটা পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহের

কাফফারা স্বরূপ। অর্থাৎ এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়।
আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ
-النَّيْلِ-

‘রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ’ল মুহাররম মাসের ছিয়াম (অর্থাৎ আশুরার ছিয়াম) এবং ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ’ল রাতের নফল ছালাত’ (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সালাত)। (মুসলিম হা/১১৬৩, মিশকাত হা/২০৩৯ ‘নফল ছিয়াম’ অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪১)। অন্য হাদীসে এসেছে, আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন,

-وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ-

‘আমি আশা করি আশুরা বা ১০ই মুহাররমের ছিয়াম আল্লাহর নিকটে বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহের কাফফারা হিসাবে গণ্য হবে’ (মুসলিম হা/১১৬২, মিশকাত হা/২০৪৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪৬)।

আশুরার সিয়াম পালনের উদ্দেশ্যঃ ১০ই মুহাররম তারিখে অত্যাচারী পাপিষ্ঠ ফেরাউন ও তার কওম আল্লাহর প্রিয় নবী মূসা (আঃ)-কে হত্যার ঘৃণিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ’লে ফেরাউনের সাগরডুবি হয় এবং মূসা (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায় বনু ইস্রাঈল আল্লাহ তা‘আলার বিশেষ রহমতে অত্যাচারী ফেরাউনের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে। তার শুকরিয়া হিসাবে মূসা (আঃ) এ দিন নফল ছিয়াম রাখেন। মূসা (আঃ)-এর তাওহীদী আদর্শের সনিষ্ঠ

অনুসারী হিসাবে স্বয়ং মুহাম্মাদ (সাঃ) এ দিনে নফল ছিয়াম পালন করেছেন এবং তাঁর উম্মতকে পালন করতে বলেছেন।

ইহুদীরা কেবল ১০ তারিখে ছিয়াম রাখত। তাই তাদের বিরোধিতার লক্ষ্যে তার আগের অথবা পরের দিনকে যোগ করার কথা রাসূল (সাঃ) বলেছেন।

হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ বিন আববাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় হিজরত করে ইহুদীদেরকে আশুরার ছিয়াম রাখতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন,

هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحْنُ أَحَقُّ. مُوسَى شُكْرًا فَتَحْنُ نَصُومُهُ
وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ. فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

‘এটি একটি মহান দিন। এদিনে আল্লাহ মূসা (আঃ) ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরাউন ও তার লোকদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তাঁর শুকরিয়া হিসাবে মূসা (আঃ) এ দিন ছিয়াম পালন করেন। তাই আমরাও এ দিন ছিয়াম পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসা (আঃ)-এর (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক দাবীদার। অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখেন ও সকলকে রাখতে বলেন’। (মুসলিম হা/১১৩০)।

উল্লেখ্য যে, আশুরায়ে মুহাররম উপলক্ষে ৯ ও ১০ই মুহাররম অথবা ১০ ও ১১ই মুহাররম এই দু’টি ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। এছাড়া অন্য কোন

ইবাদত সুন্নাত নয়। আর তাও হ'তে হবে একমাত্র ফেরাউনের কবল থেকে মুসা (আঃ)-এর নাজাতের শুকরিয়া স্বরূপ। শাহাদতে হুসাইনের শোক বা মাতম স্বরূপ কখনোই নয়।

মুহাররম মাসের বিদ'আত সমূহ

(১) শাহাদতে হুসাইনের শোক পালনের উদ্দেশ্যে ছিয়াম পালন করা: উপরোক্ত আলোচনায় মুহাররম মাসের সুন্নাতী আমল এবং তা পালনের উদ্দেশ্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হ'ল। আর তা হ'ল, অত্যাচারী শাসক ফেরাউনের কবল থেকে মুসা (আঃ)-এর নাজাতের শুকরিয়া স্বরূপ ৯ ও ১০ই মুহাররম অথবা ১০ ও ১১ই মুহাররম ছিয়াম পালন করা। বর্তমান সমাজে উক্ত দু'টি ছিয়াম পালনের প্রচলন রয়েছে। তবে তা শাহাদতে হুসাইনের শোক পালনের উদ্দেশ্যেই পালিত হয়ে থাকে। যা সম্পূর্ণরূপে সহীহ হাদীস বিরোধী এবং স্পষ্ট বিদ'আত। কেননা এই ছিয়ামের সূচনা হয়েছে মুসা (আঃ)-এর সময় থেকে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশাতেই মুহাররমের ছিয়াম পালন করেছেন। আর কারবালার ঘটনা ঘটেছে রাসূল (সাঃ)-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পরে ৬১ হিজরীতে। তাহ'লে কি করে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতের কারণে এই ছিয়াম পালন করলেন? অতএব এসব নিছক ভিত্তিহীন কথা মাত্র। রাসূল (সাঃ) আশুরার ছিয়াম পালন করেছিলেন অত্যাচারী শাসক ফেরাউনের কবল থেকে মুসা (আঃ)-এর নাজাতের আনন্দে আল্লাহর শুকরিয়া স্বরূপ। পক্ষান্তরে আমরা আজ তা পালন করছি হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতের শোক স্বরূপ। অথচ ওমর (রাঃ), ওছমান (রাঃ) সহ আরো অনেক ছাহাবী

শাহাদত বরণ করেছেন। আমরা তাঁদের স্মরণে কিছুই করি না। যদি হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতের কারণে শোক দিবস পালন করা হয়, তাহ'লে ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর শোক দিবস পালনের অধিক হক রাখে। বিদ'আতীদের নিকট এ সমস্ত ছাহাবায়ে কেরামের শাহাদত বরণে শোক তো দূরের কথা; বরং আনন্দ দিবসে পরিণত হয়। যেমন- আববাসীয় খলীফা মুত্বী' বিন মুকুতাদিরের সময়ে (৩৩৪-৩৬৩হিঃ/৯৪৬-৯৭৪ খৃঃ) তাঁর কউর শী'আ আমীর আহমাদ বিন বূইয়া দায়লামী ওরফে মুইযযুদৌলা ৩৫১ হিজরীর ১৮ই যিলহজ্জ তারিখে বাগদাদে ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদত বরণের তারিখকে তাদের হিসাবে খুশীর দিন মনে করে 'ঈদের দিন' (عيد غدير خم) হিসাবে ঘোষণা করেন। শী'আদের নিকটে এই দিনটি পরবর্তীতে ঈদুল আযহার চাইতেও গুরুত্ব পায়। অতঃপর ৩৫২ হিজরীর শুরুতে ১০ই মুহাররমকে তিনি হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদত বরণের 'শোক দিবস' ঘোষণা করেন এবং সকল দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত বন্ধ করে দেন এবং মহিলাদেরকে শোকে চুল ছিঁড়তে, চেহারা কালো করতে, রাস্তায় নেমে শোকগাথা গেয়ে চলতে বাধ্য করেন। শহর ও গ্রামের সর্বত্র সকলকে শোক মিছিলে যোগদান করতে নির্দেশ দেন।

শী'আরা খুশী মনে এই নির্দেশ পালন করে। কিন্তু সুন্নীরা নিষ্ক্রিয় থাকেন। পরে সুন্নীদের উপরে এই ফরমান জারি করা হ'লে ৩৫৩ হিজরীতে উভয় দলে ব্যাপক সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে বাগদাদে তীব্র নাগরিক অসন্তোষ ও সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। (ইবনুল আছীর, তারীখ ৮/১৮৪ পৃঃ; মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, পৃঃ ৬-

৭)³⁷²। আমরা বর্তমানে যে উদ্দেশ্যে আশুরার ছিয়াম পালন করছি তা শী‘আদের থেকে গৃহীত; যা অবশ্যই বর্জনীয়।

(২) ১০ই মুহাররমকে আনন্দ উৎসবে পরিণত করা : রাফেযীরা (কউর শী‘আ) হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতের শোক স্বরূপ শোক দিবস পালন করে। পক্ষান্তরে একটি গোষ্ঠী রাফেযীদের বিরোধিতা করার লক্ষ্যে এ দিনটিকে আনন্দ উৎসবে পরিণত করে। এ দিনে রাফেযীদের শোক দিবস যেমন বিদ‘আত; তেমনি তাদের বিরোধিতার লক্ষ্যে এ দিনে আনন্দ উৎসব করাও বিদ‘আত। এটা যেন বিদ‘আত দিয়ে বিদ‘আত এবং মিথ্যা দিয়ে মিথ্যা প্রতিহত করার চেষ্টা। অথচ উচিত ছিল সুন্নাত দিয়ে বিদ‘আত প্রতিহত করা। সত্য দিয়ে মিথ্যা প্রতিহত করা। রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম এ দিনটিকে শোক দিবস হিসাবেও পালন করেননি। আবার আনন্দ উৎসবেও পরিণত করেননি। তাঁরা শুধুমাত্র ফেরাউনের কবল থেকে মূসা (আঃ)-এর নাজাতের শুকরিয়া স্বরূপ ছিয়াম পালন করেছেন। (ড. সুলাইমান ইবনে সালেম আস-সুহাইমী, আল-আ‘ইয়াদ ওয়া আছারুহা, পৃঃ ২৭৩)।

(৩) তা‘যিয়া : তা‘যিয়া অর্থ বিপদে সাহায্য দেওয়া। যেটা বর্তমানে শাহাদাতে হোসাইনের শোক মিছিলে রূপ নিয়েছে। অথচ ইসলামে কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন করা নিষেধ। (আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৬৩ ‘চুল আঁচড়ানো’ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) কিন্তু বাগদাদের গোঁড়া শী‘আ আমীর মু‘ইযযুদৌলা ৩৫২ হিজরীর ১০ই মুহাররমকে জাতীয় শোক দিবস

³⁷² ইবনুল আছীর, তারীখ ৮/১৮৪ পৃঃ; মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আশুরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, পৃঃ ৬-৭

ঘোষণা করেন এবং শহর ও গ্রামের সকলকে তা'যিয়া মিছিলে যোগদানের নির্দেশ দেন। সেদিন থেকেই এই বিদ'আতী প্রথা চালু হয়েছে। শী'আদের উদ্ভাবিত এই বিদ'আতী প্রথার অনুসরণেই বাংলাদেশের বিদ'আতীরা ১০ই মুহররমে মিছিল বের করে থাকে। প্রত্যেক আল্লাহভীরু মুসলমানের এই সব বিদ'আত হ'তে দূরে থাকা আবশ্যিক।

(৪) ১০ই মুহররমে চোখে সুরমা লাগানো : অনেকেই আশুরার দিন বা ১০ই মুহররমে বিশেষ ফযীলতের আশায় চোখে সুরমা লাগিয়ে থাকে; যা সুস্পষ্ট বিদ'আত। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম আশুরার দিনে চোখে সুরমা লাগাননি এবং এর কোন ফযীলত বর্ণনা করেননি। 'আশুরার দিনে চোখে ইছমিদ সুরমা লাগালে কখনোই চোখে রোগ হবে না' মর্মে প্রচলিত হাদীছটি মাওযু বা জাল (ইবনুল জাওয়ী, আল-মাওযু'আত পৃঃ ২/২০৩; মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফু'আহ, পৃঃ ৪৪)^{৩৭৩}।

(৫) ১০ই মুহররমে বিশেষ ফযীলতের আশায় বিশেষ পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করা : ১০ই মুহররমে বিশেষ ফযীলতের আশায় বিশেষ পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করা হয়ে থাকে; যা সুস্পষ্ট বিদ'আত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম এ দিনে বিশেষ কোন ছালাত আদায় করেছেন মর্মে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে যা পাওয়া যায় তার সবগুলিই জাল বা বানোয়াট। যেমন-

^{৩৭৩} ইবনুল জাওয়ী, আল-মাওযু'আত পৃঃ ২/২০৩; মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফু'আহ, পৃঃ

(ক) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'আশুরার দিনে যে ব্যক্তি চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে এবং প্রত্যেক রাক'আতে একবার সূরা ফাতিহা ও পঞ্চাশবার সূরা ইখলাছ তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অতীতের পঞ্চাশ বছরের গুনাহ এবং ভবিষ্যতের পঞ্চাশ বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন'। উল্লিখিত হাদীছটি জাল বা বানোয়াট। (আল-মাওযু'আত পৃঃ ২/১২২)³⁷⁴।

(খ) রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আশুরার দিনে যোহর ও আছরের ছালাতের মাঝখানে চল্লিশ রাক'আত ছালাত আদায় করবে। প্রত্যেক রাক'আতে একবার সূরা ফাতিহা, দশবার আয়াতুল কুরসী, দশবার সূরা ইখলাছ, পাঁচবার সূরা ফালাক এবং পাঁচবার সূরা নাস তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করবেন'।

অত্র হাদীসটিও জাল বা বানোয়াট (আল-মাওযু'আত পৃঃ ২/১২২-১২৩; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ পৃঃ ৪৮)³⁷⁵।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

ليس في حديث عاشوراء حديث صحيح غير الصوم، وما يروي في فضل صلاة معينة فيه فهذا كله كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة، ولم ينقل هذه الأحاديث أحد من أئمة أهل العلم في كتبهم

³⁷⁴ আল-মাওযু'আত পৃঃ ২/১২২

³⁷⁵ আল-মাওযু'আত পৃঃ ২/১২২-১২৩; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ পৃঃ ৪৮

‘সিয়াম ব্যতীত আশূরা সম্পর্কিত কোন ছহীহ হাদীছ নেই। এই দিনে নির্দিষ্ট ছালাতের ফযীলত সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছগণের ঐক্যমতে তার সবগুলিই মিথ্যা ও বানোয়াট। মুহাক্কিক আলেমদের কেউই তাদের কিতাব সমূহে এ সমস্ত হাদীছ সংকলন করেননি (শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/১১৬)³⁷⁶। অতএব এ উপলক্ষে আশূরার দু’টি ছিয়াম ব্যতীত অন্য কোন ইবাদত রাসূলুল্লাহ (সাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে ইয়াম, ইমাম চতুষ্টয়ের কেউ কখনোই করেননি। আর তাঁরা ছিয়াম দু’টি পালন করেছেন কেবল ফেরাউনের কবল থেকে মূসা (আঃ)-এর নাজাতের শুকরিয়া স্বরূপ; শাহাদতে হুসাইনের শোক স্বরূপ নয়। সুতরাং বর্তমানে আশূরা উপলক্ষে যা হচ্ছে তার সবগুলিই পরবর্তী যুগের বিদ‘আতীদের আবিষ্কার; যা অবশ্যই বর্জনীয়। (মুহাররম মাসের সুন্নাহ ও বিদ‘আত - মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, লিসাঙ্গ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব; দাঈ, আল-ফুরকান ইসলামিক সেন্টার, মানামা, বাহারাইন। উৎস: মাসিক আত তাহরীক)³⁷⁷।

(৬) তাবেঈ ইয়াযীদ বিন মু‘আবিয়া-কে ‘মালউন’ বা অভিশপ্ত বলে গালি দেওয়া : ইয়াযীদ বিন মু‘আবিয়াকে ‘মালউন’ বা অভিশপ্ত বলে গালি দেওয়া আদৌ ঠিক নয়। বরং সকল মুসলমানের ন্যায় তার মাগফেরাতের জন্য দো‘আ করা উচিত। কেননা মানুষ হিসাবে তার কিছু ভুল-ত্রুটি থাকলেও কারবারার মর্মাস্তিক ঘটনার জন্য তিনি দায়ী নন। এজন্য মূলতঃ দায়ী

³⁷⁶ শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/১১৬

³⁷⁷ মুহাররম মাসের সুন্নাহ ও বিদ‘আত - মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, লিসাঙ্গ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব; দাঈ, আল-ফুরকান ইসলামিক সেন্টার, মানামা, বাহারাইন। উৎস: মাসিক আত তাহরীক

বিশ্বাসঘাতক কূফাবাসী ও নিষ্ঠুর গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ। কেননা ইয়াযীদ কেবল হুসাইন (রাঃ)-এর আনুগত্য চেয়েছিলেন, তাঁর খুন চাননি। হুসাইন (রাঃ) সে আনুগত্য দিতেও প্রস্তুত ছিলেন।

ইয়াযীদ স্বীয় পিতার অছিয়ত অনুযায়ী হুসাইনকে সর্বদা সম্মান করেছেন এবং তখনও করতেন। হুসাইন (রাঃ)-এর ছিন্ন মস্তক ইয়াযীদের সামনে রাখা হ'লে তিনি কেঁদে বলে ওঠেন, ‘ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের উপর আল্লাহ লা'নত করুন। আল্লাহর কসম! যদি হুসাইনের সাথে ওর রক্তের সম্পর্ক থাকত, তাহ'লে সে কিছুতেই তাঁকে হত্যা করত না। তিনি আরো বলেন, হুসাইনের খুন ছাড়াও আমি ইরাকীদেরকে আমার আনুগত্যে রাযী করাতে পারতাম’ (ইবনু তায়মিয়া, মুখতাছার মিনহাজুস সুন্নাহ, ১/৩৫০; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/১৭৩; আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, পৃঃ ৭-১০)³⁷⁸। কূফার নেতাদের লিখিত ১৫০টি পত্র পেয়ে হুসাইন (রাঃ) কূফায় আসলে বছরার গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ কূফার গভর্ণর মুসলিম বিন আকীলকে গ্রেফতার করে হত্যা করে।

এদিকে হুসাইন (রাঃ) প্রদত্ত তিনটি প্রস্তাবের কোনটি গ্রহণ না করায় দুষ্টমতি ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের সাথে সংঘর্ষ অবশ্যস্বাবী হয়ে পড়ে। এতে হুসাইন (রাঃ) সপরিবারে নিহত হন (ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ ২/২৫২; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৮/১৫৪, ১৭১)³⁷⁹।

³⁷⁸ ইবনু তায়মিয়া, মুখতাছার মিনহাজুস সুন্নাহ, ১/৩৫০; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/১৭৩; আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, পৃঃ ৭-১০

³⁷⁹ ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ ২/২৫২; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৮/১৫৪, ১৭১

সম্মানিত পাঠক! পরিপূর্ণভাবে ইসলামের উপর টিকে থাকতে হ'লে ফিরে যেতে হবে একমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর দিকে। মুসলিম জাতি আজ কুরআন-সুন্নাহ থেকে ছিটকে পড়েছে। ফলে বিদ'আতের কাল মেঘে আচ্ছাদিত হয়েছে ইসলামী শরী'আতের স্বচ্ছ আকাশ। এ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য শারঈ জ্ঞানার্জন অপরিহার্য।

মুহররম মাসে রাসূল (সাঃ) কি করেছেন আর আমরা কি করছি তা মিলিয়ে দেখতে হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর সাথে। কারবালার ঘটনা সম্পর্কে সকল প্রকার আবেগ ও বাড়াবাড়ি হ'তে দূরে থাকতে হবে এবং আশুরা উপলক্ষে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আতী আকীদা-বিশ্বাস ও রসম-রেওয়াজ পরিহার করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে বিদ'আত মুক্ত জীবন-যাপন করার তওফীক দান করুন- আমীন!

(৩৬) অন্যান্য বিদ'আতী কাজ এবং সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার সমূহঃ
নির্দিষ্ট কোন দিনে কবর যিয়ারতের জন্য একত্রিত হওয়া, হাফেজদের দিয়ে কুরআন খতম করিয়ে পারিশ্রমিক দেয়া ইত্যাদি। ঈদ বা জুমার দিন পুরুষ-মহিলা একসাথে বা আলাদা আলাদাভাবে কবরের পাশে একত্রিত হওয়া, খানা বিতরণ অথবা কিছু তথাকথিত মৌলোভী বা কুরআনের হাফেজদেরকে একত্রিত করে কুরআন পড়িয়ে তাদেরকে পারিশ্রমিক দেয়া ইত্যাদি কাজ সুস্পষ্ট বিদ'আত এবং নাজায়েয। কবর যিয়ারতের জন্য জুমা বা ঈদের দিনের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য প্রামাণিত নয়। অনুরূপভাবে কবরের পাশে কুরআন পড়া বা পড়ানো একাটি ভিত্তিহীন কাজ। একে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা আরও বেশি অন্যায়। শুধু তাই নয়, প্রচলিত

সালাত পদ্ধতিতেও অসংখ্য বিদ'আত পরিলক্ষিত হয়। ওযুতেও রয়েছে অসংখ্য বিদ'আত পদ্ধতি।

বিদ'আত প্রসঙ্গে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী (রহঃ) এর নসীহতঃ

সমাজের অপ্রতিরোধ্য চাপের কাছে নতি স্বীকার করে উপরের সকল খেলাফে-সুন্নাত কর্মকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, বিভিন্ন ওজরখাহি করে, পূর্বে আলোচিত বিভিন্ন প্রকারে অপ্রাসঙ্গিক আয়াত ও হাদীসকে “অকাট্য দলিল” হিসাবে পেশ করে “জায়েয” বলেছেন কেউ কেউ। তবে কেউ বলেননি যে, এগুলি সুন্নাত বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ কখনো এগুলি করেছেন। অপরদিকে অনেক আলেম সমাজের কাছে নতি স্বীকার করতে চান নি। তাঁরা চেষ্টা করেছেন যেন আমাদের সমাজ অন্য সকল বিষয়ের মতো এ বিষয়েও অবিকল সুন্নাত অনুযায়ী চলেন। যাতে সুন্নাত জীবিত হয় এবং মুসলিমগণ নিশ্চিতরূপে সাওয়াব ও বরকত লাভ করেন। এ সকল আলেম ও বুজুর্গগণের একজন সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী (রহঃ)। তিনি এ বিষয়ে আলোচনা কালে বলেন: এখন কেউ যদি প্রচলিত রুসুম অনুযায়ী এ সকল ফাতেহা, ইসালে সাওয়াব, কুলখানী, ওরস ইত্যাদি পালন না-করেন তাহলে সুন্নাত বিষয়ে অজ্ঞ মানুষেরা বলবে যে, তিনি আল্লাহর ওলী ও বুজুর্গগণের ভক্তি করেন না, তাঁদের হক্ক আদায় করেন না বা তাঁদের প্রতি আদব রক্ষা করেন না। তার এই চিন্তার মাধ্যমে তিনি বলতে চান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আহলে বাইত, সাহাবীগণ, তাবেরী, তাব-তাবেরী ও অন্যান্য নেককার বুজুর্গগণ, যাঁরা এ সকল রেওয়াজ সমাজে প্রচলিত হওয়ার আগে চলে গিয়েছেন তাঁরা সবাই তাঁদের পূর্ববর্তী বুজুর্গ ও আউলিয়াগণের প্রতি বেয়াদবী করেছেন।

উপরন্তু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পূর্বপুরুষ ও আল্লাহর খলীল ইবরাহীম এর প্রতিও একই রকম বেআদবী করেছেন বলে দাবি করা হবে। নাউযু বিল্লাহ!! নাউযু বিল্লাহ!!

এ বিষয়ে তিনি কিছু মূল্যবান নসীহত করেছেনঃ

প্রথমত, সকল মৃত বুজুর্গ ও আপনজনের ক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের সুন্নাহ হুবহু পালন করা ও প্রতিষ্ঠা করাই সর্বোত্তম। এজন্য কাফন, দাফন, জানাযা ও মাসনূন তিন দিনের শোক প্রকাশের বাইরে কোনো প্রকারের রুসুম না-মানা প্রয়োজন। বিবাহের ওলীমা ছাড়া সকল প্রকার খানাপিনার আয়োজন ও রুসুম রেওয়াজ পরিত্যাগ করতে হবে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কেই পেশওয়া, মুরব্বী ও আদর্শ মানতে হবে। তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে পারসিক, রোমীয়, মধ্য এশিয়, ভারতীয় ইত্যাদি সকল রুসুম রেওয়াজ পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ এগুলি সবই তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণের প্রচলিত রীতি ও তাঁদের তরীকার অতিরিক্ত কর্ম। এগুলি বর্জন করতে হবে এবং এগুলির প্রতি নিজের ঘৃণা ও না-রাজি প্রকাশ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, এ সকল রুসুমাতের মধ্যে নিয়্যাতগত ও কর্মগত অনেক গোনাহের কাজ রয়েছে, যার ফলে কেয়ামতের দিন এ সকল রুসুমাত পালনকারীকে কঠিন বিপদে পড়তে হবে। কেউ যদি একান্তই খালেস নিয়্যাতে, খালেসভাবে কোনোরকম দিনতারিখ স্থান বা পদ্ধতি নির্ধারণ না-করে কিছু খাওয়া দাওয়া করান তাহলে হয়ত তিনি সাওয়াব পাবেন। তবে

তাকে মনে রাখতে হবে যে, মৃতকে সাওয়াব পাঠানো খানাপিনা করানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দু‘আ ও দানই মৃতের সাওয়াব পাঠানোর সুন্নাত-সম্মত পদ্ধতি। খানাপিনা করানো দানের একটি প্রকরণ মাত্র। সাহাবীগণ এক্ষেত্রে এই প্রকরণ ব্যবহার করেন নি, বরং কূপ খনন, জমি বা বাগান ওয়াকফ করা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে দানের সাওয়াব প্রেরণ করেছেন। আমাদেরও এ সকল পদ্ধতিতে দান করা উচিত।

তৃতীয়ত, যদি আমরা এ সকল খেলাফে-সুন্নাত ও বিদ‘আত রুসূম রেওয়াজ পরিত্যাগ করতে না-পারি, তাহলে অন্তত সুন্নাতকে পূর্ণাঙ্গ মনে করতে হবে। কেউ যদি অবিকল সুন্নাত পদ্ধতিতে ছবছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের মতো দু‘আ ও দানে রত থাকেন এবং সকল প্রকার কুলখানী, ইসালে সাওয়াব, ওরশ ইত্যাদি অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করেন, তাহলে তাঁকে উত্তম ও পরিপূর্ণ সুন্নাতের অনুসারী বলে মহব্বত করতে হবে। এভাবে সকল বিষয়ে সুন্নাতকে পরিপূর্ণ ও আমাদের রুসূমকে খেলাফে সুন্নাত ও বিশেষ প্রয়োজনে বা বাধ্য হয়ে করছি বলে মনে করতে হবে। [তথ্যসূত্রঃ সিরাতে মুস্তাকীম (উর্দু তরজমা), পৃ: ৫০-৭৫]। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে সকল বিষয়ে সুন্নাত তরীকা অবলম্বনের তাওফীক দান করুন। আমীন !!

এ প্রসঙ্গে প্রবন্ধটির সম্পাদক ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া আরো উল্লেখ করেন যে, মৃত ব্যক্তির জন্য করণীয় কাজসমূহের দ্বারা তার কাছে কী সাওয়াব পৌঁছে না কি সেটার অসীল দ্বারা দো‘আ করা হলে সেটা কাজে লাগে এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের ইমামগণের মধ্যে দু’টি মত পাওয়া যায়।

এক. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়েম (রহঃ) সহ একদল আলেম মনে করেন যে তাদের কাছে সাওয়াব পৌছে। এ ব্যাপারে তারা তাদের গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

দুই. পক্ষান্তরে অধিকাংশ আলেম মনে করেন, সাওয়াব কেউ কাউকে দিতে পারে না, বরং উচিত হবে সৎকাজ করে সেটার অসীলা দিয়ে দো'আ করা। শাইখুল আলবানী (রহঃ) সহ অনেক বিদগ্ধ আলেম এমতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

এ দ্বিতীয় মতটিকে আমি প্রাধান্য দিয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের লেখককে মনে হচ্ছে প্রথম মতের প্রবক্তা। এ ব্যাপারে আমি তার মতামতের উপর হস্তক্ষেপ না করে বিষয়টি বর্ণনা করে দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেছি। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতভেদটি দ্বান্দ্বিক নয় বরং প্রকারান্তিক। কারণ, সবাই মনে করেন যে শরী'আতে অনুমোদিত নয় এমন কোনো কাজ করলে সেটা বিদ'আত হবে। যেমন ওরস, চল্লিশা (চেহলাম), পঞ্চ দিনের অনুষ্ঠান, কিংবা খতমে তাহলীল, খতমে খাজেগান, নির্দিষ্ট দিনে দো'আ অনুষ্ঠান, কুলখানি ইত্যাদি সকল বিষয় বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতা। এ ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাহের উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করার তৌফিক দিন। আমীন। (তথ্যসূত্রঃ খুতবাহ খানা ড. আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের অমর গ্রন্থ 'এহ'ইয়াউস-সুনান' অবলম্বনে লিখিত)।

প্রচলিত কুসংস্কারঃ তাছাড়া আমাদের সমাজে অনেক বিদ'আতীয় প্রচলিত কুসংস্কার বিদ্যমান রয়েছে তার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

- ১) পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পূর্বে ডিম খাওয়া যাবে না। তাহলে পরীক্ষায় ডিম (গোল্লা) পাবে।
- ২) খাবার সময় সালাম দিতে নেই।
- ৩) দোকানের প্রথম কাস্টমর ফেরত দিতে নাই।
- ৪) নতুন স্ত্রীকে নরম স্থানে বসতে দিলে মেজাজ নরম থাকবে।
- ৫) বিড়াল মারলে আড়াই কেজি লবণ দিতে হবে।
- ৬) ঔষধ খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ বললে' রোগ বেড়ে যাবে।
- ৭) জোড়া কলা খেলে জোড়া সন্তান জন্ম নিবে।
- ৮) রাতে নখ, চুল ইত্যাদি কাটতে নাই।
- ৯) চোখে কোন গোটা হলে ছোট বাচ্চাদের গোপনাঙ্গে লাগালে সুস্থ হয়ে যাবে।
- ১০) ভাই-বোন মিলে মুরগী জবেহ করা যাবে না।
- ১১) ঘরের ময়লা পানি রাতে বাইরে ফেলা যাবে না।
- ১২) ঘর থেকে কোন উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পর পেছন থেকে ডাক দিলে যাত্রা অশুভ হবে।
- ১৩) ব্যাঙ ডাকলে বৃষ্টি হবে।

১৪) কুরআন মাজীদ হাত থেকে পড়ে গেলে আড়াই কেজি চাল দিতে হবে।

১৫) ছোট বাচ্চাদের দাঁত পড়লে ইঁদুরের গর্তে দাঁত ফেলতে বলা হয়, দাঁত ফেলার সময় বলতে শিখানো হয়, “ইঁদুর ভাই, ইঁদুর ভাই, তোর চিকন দাঁত টা দে, আমার মোটা দাঁত টা নে।”

১৬) মুরগীর মাথা খেলে মা-বাবার মৃত্যু দেখবে না।

১৭) বলা হয়, কেউ ঘর থেকে বের হলে পিছন দিকে ফিরে তাকানো নিষেধ। তাতে নাকি যাত্রা ভঙ্গ হয় বা অশুভ হয়।

১৮) ঘরের ভিতরে প্রবেশ কৃত রোদে অর্ধেক শরীর রেখে বসা যাবে না। (অর্থাৎ শরীরের কিছু অংশ রৌদ্রে আর কিছু অংশ বাহিরে) তাহলে জ্বর হবে।

১৯) রাতে বাঁশ কাটা যাবে না।

২০) রাতে গাছের পাতা ছিঁড়া যাবে না।

২১) ঘর থেকে বের হয়ে বিধবা নারী চোখে পড়লে যাত্রা অশুভ হবে।

২২) ঘরের চৌকাঠে বসা যাবে না।

২৩) মহিলাদের মাসিক অবস্থায় সবুজ কাপড় পরিধান করতে হবে। তার হাতের কিছু খাওয়া যাবে না।

২৪) বিধবা নারীকে সাদা কাপড় পরিধান করতে হবে।

২৫) ভাঙ্গা আয়না দিয়ে চেহারা দেখা যাবে না। তাতে চেহারা নষ্ট হয়ে যাবে।

২৬) ডান হাতের তালু চুলকালে টাকা আসবে। আর বাম হাতের তালু চুলকালে বিপদ আসবে।

২৭) নতুন কাপড় পরিধান করার পূর্বে আগুনে ছেক দিয়ে পড়তে হবে।

২৮) নতুন কাপড় পরিধান করার পর পিছনে তাকাতে নেই।

২৯) বৃষ্টির সময় রোদ দেখা দিলে বলা হয় শিয়ালের বিয়ে।

৩০) আশ্বিন মাসে নারী বিধবা হলে আর কোন দিন বিবাহ হবে না।

৩১) খানার পর যদি কেউ গা মোচড় দেয়, তবে বলা হয় খানা না কি কুকুরের পেটে চলে যায়।

৩২) রাতের বেলা কাউকে সুই-সূতা দিতে নাই।

৩৩) গেঞ্জি ও গামছা ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতে নাই।

৩৪) খালি ঘরে সন্ধ্যার সময় বাতি দিতে হয়। না হলে ঘরে বিপদ আসে।

৩৫) গোছলের পর শরীরে তেল মাখার পূর্বে কোন কিছু খেতে নেই।

৩৬) মহিলার পেটে বাচ্চা থাকলে কিছু কাটা-কাটি বা জবেহ করা যাবে না।

৩৭) পাতিলের মধ্যে খানা থাকা অবস্থায় তা খেলে পেট বড় হয়ে যাবে।

৩৮) কোন ব্যক্তি বাড়ি হতে বাহির হলে যদি তার সামনে খালি কলস পড়ে যায় বা কেউ খালি কলস নিয়ে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করে তখন সে যাত্রা বন্ধ করে দেয়, বলে আমার যাত্রা আজ শুভ হবে না।

৩৯) ছোট বাচ্চাদের হাতে লোহা পরিধান করাতে হবে।

৪০) রুমাল, ছাতা, হাত ঘড়ি ইত্যাদি কাউকে ধার স্বরূপ দেয়া যাবে না।

৪১) হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে ভাগ্যে দুর্ভোগ আছে।

৪২) হাত থেকে প্লেট পড়ে গেলে মেহমান আসবে।

৪৩) নতুন স্ত্রী কোন ভাল কাজ করলে শুভ লক্ষণ।

৪৪) পাখি ডাকলে বলা হয় ইষ্টি কুটুম (আত্মীয়) আসবে।

৪৫) কাচা মরিচ হাতে দিতে নাই।

৪৬) তিন রাস্তার মোড়ে বসতে নাই।

৪৭) খানার সময় যদি কারো ঢেকুর আসে বা মাথার তালুতে উঠে যায়, তখন একজন আরেকজনকে বলে, দোস্তু তোকে যেন কেউ স্মরণ করছে বা বলা হয় তোকে গালি দিচ্ছে।

৪৮) কাক ডাকলে বিপদ আসবে।

৪৯) গুঁকুন ডাকলে মানুষ মারা যাবে।

৫০) পেঁচা ডাকলে বিপদ আসবে।

৫১) তিনজন একই সাথে চলা যাবে না।

৫২) দুজনে ঘরে বসে কোথাও কথা বলতে লাগলে হঠাৎ টিকটিকির আওয়াজ শুনা যায়, তখন একজন অন্যজনকে বলে উঠে “দোস্তু তোর কথা সত্য, কারণ দেখছস না, টিকটিকি ঠিক ঠিক বলেছে।”

৫৩) একজন অন্য জনের মাথায় টোকা খেলে দ্বিতীয় বার টোকা দিতে হবে, একবার টোকা খাওয়া যাবে না। নতুবা মাথায় ব্যথা হবে/শিং উঠবে।

৫৪) ভাত প্লেটে নেওয়ার সময় একবার নিতে নাই।

৫৫) নতুন জামাই বাজার না করা পর্যন্ত একই খানা খাওয়াতে হবে।

৫৬) নতুন স্ত্রীকে স্বামীর বাড়িতে প্রথম পর্যায়ে আড়াই দিন অবস্থান করতে হবে।

৫৭) পাতিলের মধ্যে খানা খেলে মেয়ে সন্তান জন্ম নিবে।

৫৮) পোড়া খানা খেলে সাতার শিখবে।

৫৯) পিপড়া বা জল পোকা খেলে সাতার শিখবে।

৬০) দাঁত উঠতে বিলম্ব হলে সাত ঘরের চাউল উঠিয়ে তা পাক করে কাককে খাওয়াতে হবে এবং নিজেকেও খেতে হবে।

৬১) সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই ঘর ঝাড়- দেয়ার পূর্বে কাউকে কোন কিছু দেয়া যাবে না।

৬২) রাতের বেলা কোন কিছু লেন-দেন করা যাবে না।

৬৩) সকাল বেলা দোকান খুলে যাত্রা (নগদ বিক্রি) না করে কাউকে বাকী দেয়া যাবে না। তাহলে সারা দিন বাকীই যাবে।

৬৪) দাঁড়ী-পাল্লা, মাপার জিনিস পায়ে লাগলে বা হাত থেকে নিচে পড়ে গেলে সালাম করতে হবে, না হলে লক্ষ্মী চলে যাবে।

৬৫) শুকরের নাম মুখে নিলে ৪০দিন মুখ নাপাক থাকে।

৬৬) রাতের বেলা কাউকে চুন ধার দিলে চুন না বলে ধই বলতে হয়।

৬৭) বাড়ি থেকে বের হলে রাস্তায় যদি হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় তাহলে যাত্রা অশুভ হবে।

৬৮) কোন ফসলের জমিতে বা ফল গাছে যাতে নয়র না লাগে সে জন্য মাটির পাতিল সাদা-কালো রং করে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

৬৯) বিনা ওয়ুতে বড় পীর (!!) আবদুল কাদের জিলানীর নাম নিলে আড়াইটা পশম পড়ে যাবে।

৭০) নখ চুল কেটে মাটিতে দাফন করতে হবে, কেননা বলা হয় কিয়ামতের দিন এগুলো খুঁজে বের করতে হবে।

৭১) নতুন স্ত্রীকে দুলা ভাই কোলে করে ঘরে আনতে হবে।

৭২) মহিলাগণ হাতে বালা বা চুড়ি না পড়লে স্বামীর অমঙ্গল হবে।

৭৩) স্ত্রীগণ তাদের নাকে নাক ফুল না রাখলে স্বামীর বেঁচে না থাকার প্রমাণ।

৭৪) দা, কাচি বা ছুরি ডিঙ্গিয়ে গেলে হাত-পা কেটে যাবে।

৭৫) গলায় কাটা বিঁধলে বিড়ালের পা ধরে মাপ চাইতে হবে।

৭৬) বেঁচা কেনার সময় জোড় সংখ্যা রাখা যাবে না। যেমন, এক লক্ষ টাকা হলে তদস্থলে এক লক্ষ এক টাকা দিতে হবে। যেমন, দেন মোহর (কাবীন) এর সময় করে থাকে, একলক্ষ এক টাকা ধার্য করা হয়।

৭৭) বন্ধু মহলে কয়েকজন বসে গল্প-গুজব করছে, তখন তাদের মধ্যে অনুপস্থিত কাউকে নিয়ে কথা চলছে, এমতাবস্থায় সে উপস্থিত হলে, কেউ কেউ বলে উঠে “দোস্তু তোর হায়াত আছে।” কারণ একটু আগেই তোর কথা বলছিলাম।

৭৮) হঠাৎ বাম চোখ কাঁপলে দুঃখ আসে।

৭৯) বাড়ী থেকে কোথাও জাওয়ার উদ্দেশে বেড় হলে সে সময় বাড়ির কেউ পেছন থেকে ডাকলে অমঙ্গল হয়।

৮০) স্বামীর নাম বলা জাবে না এতে অমঙ্গল হয়।

৮১) বাছুর এর গলায় জুতার টুকরা ঝুলালে কারো কু দৃষ্টি থেকে বাচা যায়।
(তথ্যসূত্রঃ সংকলনেঃ জাহিদুল ইসলাম -সম্পাদনায়ঃ আব্দুল্লাহিল হাদী)।

অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, এভাবে অসংখ্য বিদআত ও প্রচলিত কুসংস্কার আমাদের সমাজে জেঁকে বসে আছে যেগুলোর প্রতিবাদ করতে গেলেও হয়ত প্রতিবাদকারীকে উল্টো বিদআতী উপাধী নিয়ে ফিরে আসতে হবে। তবে বর্তমানে জ্ঞান চর্চার অবাধ সুযোগে আমাদের নতুন প্রজন্ম, যুব সমাজ, তরুন আলেম সমাজ সবাই যদি উন্মুক্ত হৃদয়ে দ্বীনে ইসলামের বুক থেকে বিদআতের পাথরকে সরানোর জন্য তৎপর হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে ইসলাম তার আগের মহিমায় ভাস্বর হবে। ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য্যে ভরে উঠবে আমাদের সপ্নিল বসুন্ধরা। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমীন।

উল্লেখিত কাজ সমূহ নাবী (ﷺ) বা সাহাবায়ে কেরাম দ্বারা প্রমানিত নয় বা তারা কখনও এসব বিদাতী আমল করে নি বরং আমাদের উচিত রাসূল (ﷺ) ও তার হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুনতের অনুসরণ করা। আর এসব বিদ'আতী মূলক কাজ পরিহার করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি আরও বলেছেনঃ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو السُّلَمِيِّ، وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا أَتَيْنَا الْعَرَبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ { وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ } فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا أَتَيْنَاكَ زَانِرِينَ وَعَانِدِينَ وَمُقْتَسِبِينَ . فَقَالَ الْعَرَبَاضُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودَعٌ فَمَآذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ " أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عِنْدَا حَبِشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّدِينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَصُوا عَلَيْهَا بِالتَّوَّاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ "

আহমদ ইবন হাম্বল (رحيمه الله) ... হাজার ইবন হাজার (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমরা ইরবায় ইবন সারিয়া (رضي الله عنه) - এর নিকট গমন করি, যার শানে এ আয়াত নাযিল হয়ঃ তাদের জন্য কোন অসুবিধা নেই, যারা আপনার নিকট এ জন্য আসে যে, আপনি তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করবেন। আপনি বলেনঃ আমি তো তোমাদের জন্য কোন বাহন পাই না। রাবী বলেনঃ আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করি এবং বলি, “আমরা আপনাকে দেখার জন্য, আপনার শিদ্দতের জন্য এবং আপনার কাছ থেকে কিছু সংগ্রহের জন্য এসেছি।” তখন তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের সঙ্গে সালাত আদায়ের পর, আমাদের দিকে ফিরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন, যাতে আমাদের চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয় এবং অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়।

আমাদের মধ্যে একজন বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! মনে হচ্ছে এ আপনার বিদায়ী ভাষণ, কাজেই আপনি আমাদের আরো কিছু অছীয়ত করুন। তখন তিনি (ﷺ) বলেন, আমি তোমাদের তাকওয়া অবলম্বনের জন্য বলছি এবং শোনা ও মানার জন্যও, যদিও তোমাদের আমীর হাবশী গোলাম হয়। কেননা, তোমাদের মাঝে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে।

এমতাবস্থায় তোমাদের উচিত হবে আমার ও আমার খুলাফায়ে-রাশেদার সুন্নাহের অনুসরণ করা, যারা সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী। তোমরা তাদের দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করবে। তোমরা বিদ'আতের অনুসরণ ও অনুকরণ করা হতে দূরে থাকবে। কেননা, প্রত্যেক নতুন কথাই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গুমরাহী। [তথ্যসূত্রঃ সুনান আবু দাউদ :: কিতাব আস-সুন্নাহ অধ্যায় ৪২, হাদীস ৪৬০৭]³⁸⁰। অতএব উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যতটুকু ইবাদত কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ততটুকুই আল্লাহর নিকট গ্রহণীয়। কুরআন ও সহীহ হাদীস বহির্ভূত আমল মানুষের নিকট যত ভাল কাজ হিসাবে বিবেচিত হোক না কেন তা অবশ্যই বর্জনীয় এবং বিদ'আত হিসাবে পরিগণিত হবে তাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। অথচ আজ বর্তমান মুসলিম বিশ্বে তথা বাংলাদেশ মুসলিম দেশসহ সকল মানব জাতি বিভিন্নভাবে আল্লাহর নৈকট্য হাছিলের চেষ্টায় ব্যস্ত। কেউ মূর্তি পূজার মাধ্যমে, কেউ কবর পূজার মাধ্যমে, কেউ পীর পূজার মাধ্যমে, আবার কেউবা ভাল কাজের দোহাই দিয়ে বিদ'আতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাছিলে সচেষ্ট। অথচ আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে তাঁর

³⁸⁰ সুনান আবু দাউদ :: কিতাব আস-সুন্নাহ অধ্যায় ৪২, হাদীস ৪৬০৭

নাযিলকৃত বিধানের যথাযথ অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষ প্রত্যেকটি ইবাদত কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সম্পাদন করবে। আর এর মাধ্যমেই কেবল তাঁর নৈকট্য হাসিল করা সম্ভব। আল্লাহ সুবহানু তা‘আলা তাই পবিত্র কুরআনে বলেছেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
-وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا-

‘হে নবী! আল্লাহ্ কে ভয় কর এবং কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্যক জ্ঞানী, মহা প্রজ্ঞাময়। আর তোমার রবের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা অহী করা হয়, তুমি তার অনুসরণ কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত’ (আহযাব ৩৩/১-২)³⁸¹। তিনি অন্যত্র বলেনঃ

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

‘তুমি তার অনুসরণ কর, যা তোমার প্রতি অহী করা হয়েছে তোমার রবের পক্ষ থেকে। তিনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই। আর মুশরিকদের থেকে বিমুখ থাক’ (আন‘আম ৬/১০৬)। তিনি অন্যত্র বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

‘অতঃপর আমি তোমাকে দ্বীনের এক বিশেষ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর এবং যারা জানে না তাদের

³⁸¹ সূরা আহযাব, আয়াত - ১-২

খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না’ (সূরা জাসিয়া ৪৫/১৮)³⁸² অতএব একমাত্র অহি-র বিধানের অনুসরণ করতে হবে। অহি-র বিধান বহির্ভূত আমল করলে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হ’তে হবে। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

‘এটাই আমার সরল-সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হ’তে বিচ্ছিন্ন করে দিবে’ (সূরা আন’আম ৬/১৫৩)³⁸³।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা’আলা যেমনভাবে তাঁর সরল-সঠিক পথ তথা সূন্নাহের পথের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে তাকে ধ্বংসকারী পথ তথা বিদ’আতের পথ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি অন্যত্র বলেন,

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

‘যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে সে এমন এক ময়বূত হাতল ধরবে যা কখনো ভাঙবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়’ (সূরা বাক্বারাহ ২/২৫৬)³⁸⁴। তিনি অন্যত্র বলেন,

³⁸² সূরা জাসিয়া ৪৫/১৮

³⁸³ সূরা আনআম, আয়াত নং - ১৫৩

³⁸⁴ সূরা বাক্বারাহ ২/২৫৬

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

‘আল্লাহর ইবাদত করার ও ত্বাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি’ (সূরা নাহল ১৬/৩৬)³⁸⁵। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ

‘যারা ত্বাগূতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দাও’ (সূরা যুমার ৩৯/১৭)³⁸⁶।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرَّمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ

‘যে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই এবং আল্লাহকে ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয় তাদেরকে অস্বীকার করল, তার রক্ত ও সম্পদ (মুসলমানদের জন্য) হারাম এবং তার প্রতিদান আল্লাহর নিকটে রয়েছে। অতএব, মানুষ কিভাবে ইবাদত করবে তার বাস্তব রূপ মুহাম্মাদ (সাঃ) দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করা আমাদের প্রত্যেক

³⁸⁵ সূরা নাহল ১৬/৩৬

³⁸⁶ সূরা যুমার, ৩৯/১৭

মুসলিম নর ও নারীর জন্য ওয়াজিব। সাথে সাথে তাঁর সুন্নাতকে ধ্বংসকারী বিদ'আত সম্পর্কে জানাও ওয়াজিব।

প্রসিদ্ধ তাবে-তাঁবেই সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) [১৬১ হিঃ] বলেন, “ইবলিসের কাছে গোনাহ ও পাপাচারের চেয়ে বিদ'আত বেশি প্রিয়। কারন গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির তাওবা করার সম্ভাবনা আছে কিন্তু বিদ'আতে লিপ্ত ব্যক্তির তাওবা করার সম্ভাবনা থাকে না”।

সুতরাং, যারা বিদ'আত এর অপসারণ করে সুন্নতকে ফিরিয়ে আনবে তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে - “বান্ধবহীন স্বজনহীন ইসলামের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদ যারা আমার পরে মানুষেরা আমার যেসকল সুন্নত নষ্ট করবে তা ঠিক করবে”। (তিরমিজি, কিতাবুল ঈমান, ২৬৩০)। এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তাঁদের যারা নবীজীর হারিয়ে যাওয়া সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করবে। তাই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে তাকে ধ্বংসকারী বিদ'আত সম্পর্কে জানা ওয়াজিব। কেননা বিদ'আত সম্পর্কে জানা না থাকলে সে কখন কিভাবে বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে তা উপলব্ধি করতে পারবে না। সুতরাং, সঠিকভাবে জেনে বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে পারি আল্লাহ তা'আলা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন, আমীন।

বিদাতীর পরিচয়, বিদ'আত চেনার উপায় এবং বিদাতীর কাজের পরিণতি সম্বন্ধে শরীয়তের ফয়সালা কি এবং বিদ'আতের ভয়াবহতাঃ

সাধারণ ভাবে সুন্নতের বিপরীত বিষয়কে বিদাত বলে। আর শার'ঈ ভাবে বিদাত হ'লো “আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে ধর্ম এর নামে নতুন

কোন প্রথা বা ইবাদতের প্রচলন করা যা শরীয়াতের কোন সহীহ দলীল-
প্রমানের উপর ভিত্তিশীল নয় (তথ্যসূত্রঃ আল ইতিসাম ১/১০ পৃষ্ঠা)^{১৪১}

বস্তুতঃ বিদ'আত মানেই ক্রমান্বয়ে দীনের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাওয়া।
কেননা দীন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত জীবন
পদ্ধতির নাম। তাঁর পদ্ধতি থেকে বিভিন্ন যুক্তির আলোকে যে ব্যক্তি বেরিয়ে
পড়ে, সে মূলত দীন থেকেই বেরিয়ে পড়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি থেকে যে যতটুকু বের হয়, সে মূলত ততটুকু দীন
থেকে বের হয়। তাই এব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
উম্মতকে পূর্ব থেকে সতর্ক করে গেছেন, যাতে করে যুক্তির আলোকে কেউ
তাঁর দেখানো আদর্শ ও পদ্ধতি থেকে সরে না যায়। ইরবায় ইবন সারিয়া
আম্‌সুলামি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

" وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة

موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل :

إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله ؟ قال :

أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من
يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة
فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
عضوا عليها بالنواجذ ". (سنن الترمذي، كتاب العلم عن رسول

الله، باب ما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدعة، رقم: 2676)

“একদিন ফজরের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
আমাদেরকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী নসীহত করলেন, এতে সবার চোখে অশ্রু
বয়ে গেল, হৃদয়গুলো ভীত শঙ্কিত হলো। এক লোক বলে উঠল: নিশ্চয়
এটি বিদায়ী নসীহত, অতএব আপনি আমাদের থেকে কী অঙ্গিকার নিবেন।

হে আল্লাহর রাসূল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি অর্জনের ওসিয়াত (অঙ্গীকার, গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ) করছি, নেতার কথা মান্য ও তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিচ্ছি, যদিও সে হাবশী দাস হয়। কেননা তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে সে অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। আর তোমরা সব নব অবিস্কৃত বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে, কেননা এগুলো পথভ্রষ্টতা। তোমাদের মধ্যে যে এই অবস্থা পাবে সে যেন আমার সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাত আকড়ে ধরে। তোমরা সুন্নাতকে মাড়ির দাঁত দিয়ে আকড়ে ধর।”³⁸⁷ বিদ‘আত কাকে বলে বুঝতে এবং তা থেকে সতর্ক থাকতে সুন্নাত প্রেমিকদের জন্য এই একটি হাদীসই যথেষ্ট। আল্লাহর রহমতে সর্বদা একদল এর উপর ছিলেন বলেই সুন্নাত সংরক্ষিত হয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। জান্নাতে পৌঁছতে, তায়কিয়ার চূড়ান্তে উপনীত হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতই আমাদের জন্য যথেষ্ট। সুন্নাতের বাইরে কোনো কিছুকে যে কোনো ক্ষেত্রে মনে স্থান দেওয়া মানেই গোমরাহীর পথ খুলে দেওয়া, যা উপরোক্ত হাদীসে স্পষ্ট। এভাবে বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনের মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করার কঠিন পরিণতি সম্পর্কে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। সাহল ইবনে সা‘দ, আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত একটি হাদীস দেখুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

" إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظماً
أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم،

³⁸⁷ তিরমিযী, সুনান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত ইলম অধ্যায়, সুন্নাতকে আকড়ে ধরা এবং বিদ‘আত পরিহার করা অনুচ্ছেদ, নং: ২৬৭৬, হাদীস সহীহ।

فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقاً
سحقاً لمن غير بعدي ". (صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب في
الحوض، رقم: 6212، كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى }
واتقوا فتنة...، رقم: 6643)

“আমি তোমাদের আগে হাওয়ে গিয়ে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব।
যে আমার কাছে যাবে সে (হাউয থেকে) পান করবে, আর যে পান
করবে সে কখনো পিপাসার্ত হবে না। অনেক মানুষ আমার কাছে
(হাওয়ে পানি পানের জন্য) আসবে, যাদেরকে আমি চিনব, তারাও
আমাকে চিনবে, তবে তাদের এবং আমার মাঝে বাঁধা সৃষ্টি করা হবে,
(আমার কাছে আসতে দেওয়া হবে না) আমি বলব এরা আমার
উম্মত। তখন (প্রতি উত্তরে) বলা হবেঃ আপনি জানেন না, এরা
আপনার পরে কী সব নব উদ্ভাবন করেছিল। একথা শুনে আমি বলবঃ
যারা আমার পর পরিবর্তন করেছেন তারা দূর হয়ে যাক, তারা দূর
হয়ে যাক!”³⁸⁸ ইবাদতের যে কোনো নবআবিষ্কৃত পদ্ধতি বিদ‘আত।
এতে জড়িত হওয়ার কী করুণ পরিণতি তা আমরা লক্ষ্য করতে
পেরেছি। তেলাওয়াত, যিকর, দো‘আ, দুরূদ ইত্যাদির নতুন পদ্ধতি
আবিষ্কারের কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে
তাড়িয়ে দিলে আমাদের মত হতভাগা আর কে আছে? আরো লক্ষ্যণীয়
যে, নবীজী সবচেয়ে বেশি যে জিনিস থেকে বারণ করতেন তা হচ্ছে
বিদ‘আত। সর্বদা বারণের কারণ আশাকরি স্পষ্ট হয়েছে। এবার
নবীজীর খুতবার সিফাত বর্ণনার হাদীসটি দেখিঃ

³⁸⁸ সহীহুল বুখারী, কিতাবুর রিকাক, হাউয অনুচ্ছেদ, নং: ৬২১২, কিতাবুল-ফিতান, নং: ৬৬৪৩

" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته : يحمد الله
ويثني عليه بما هو له أهل ثم يقول : من يهد الله فلا مضل له و
من يضل فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله و أحسن الهدى
هدى محمد و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة
ضلالة و كل ضلالة في النار". (صحيح ابن خزيمة، باب صفة
خطبة النبي □، رقم: 1785)

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খুতবায় প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও তার যথাযথ গুণাবলী বর্ণনা করতেন, এরপর বলতেন: যাকে আল্লাহ হেদায়াত প্রদান করেন তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না, আর যাকে আল্লাহ গোমরাহ করেন তাকে কেউ হেদায়াত প্রদান করতে পারে না। নিশ্চয় সর্বাধিক সত্য কথা আল্লাহর কিতাব এবং সর্বাধিক সুন্দর আদর্শ মুহাম্মদের আদর্শ, নব উদ্ভাবিত বিষয় সর্বাধিক নিকৃষ্ট, প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত বিষয় বিদ‘আত, প্রত্যেক বিদ‘আত ভ্রষ্টতা এবং এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে নিক্ষেপ্ত।”³⁸⁹

উপরোক্ত হাদীসটির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনে আমাদের যত কথা বলে গেছেন সবই হাদীস। তিনি যা বলেছেন, যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তা কতবার বলেছেন? নিশ্চয় একবার, দুইবার, তিনবার, একাধিক বার, ক্ষেত্র বিশেষে অনেক বার। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত কথাগুলো তিনি কতবার বলেছেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনে কতটি খুতবা দিয়েছেন? একটি? দুইটি? একাধিক? অনেক? অগণিত?

³⁸⁹ মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবনু খুযায়মাহ আস-সুলামী, ২২৩-৩১১ হিজরী, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খুতবার গুণাবলী অনুচ্ছেদ, নং ১৮৭৫।

যতবারই তিনি খুতবা দিয়েছেন, উপরের বিষয়গুলো আলোচনা করতেন বলে আমরা জানতে পারলাম। এখান থেকে একটি ধারণা নেই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে কতবার বলেছেন: “একমাত্র আদর্শ তাঁরই আদর্শ, তাঁর আদর্শের বাইরের সবকিছুই নব উদ্ভাবিত, সব নব উদ্ভাবিত কর্ম বিদ‘আত, সব বিদ‘আতই গোমরাহী এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে নিক্ষেপ্ত।” এছাড়া অন্যান্য হাদীসতো আছেই। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ বহির্ভূত কোনো আমল গ্রহণযোগ্য নয়, চাই তা যে কোনো উদ্দেশ্যেই হোক না কেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসটি দেখুনঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد". (صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم: 2550، صحيح مسلم، كتاب الأفضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم: 4589)

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমাদের এই দীনে যে ব্যক্তি নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে তা প্রত্যাখ্যাত।”³⁹⁰ এই হলো বিদ‘আতের অবস্থা। আমলের ক্ষেত্রে সুন্নাতের বিপরীত চিন্তা মানেই বিদআতে লিপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়া, আর বিদ‘আত মানেই দীন ধ্বংসের প্রক্রিয়া। তাই সাহাবায়ে কেরাম ও কল্যাণপ্রাপ্ত যুগ তথা খাইরুল কুরুনের আলেমদেরকে এব্যাপারে সর্বাধিক সতর্ক থাকতে দেখা

³⁹⁰ সহীহুল বুখারী, সন্ধি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: অন্যায়ের উপর লোকেরা সন্ধিবদ্ধ হলে তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, নং: ২৫৫০, সহীহ মুসলিম, বিচার সংক্রান্ত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: বাতিল সিদ্ধান্ত খণ্ডন এবং বিদ‘আতি কার্যকালাপ প্রত্যাখ্যান, নং: ৪৫৮৯।

গেছে। বিদ'আত দূরের কথা, বিদ'আতের সন্দেহযুক্ত বিষয়কেও তারা প্রত্যাখ্যান করে চলেছেন। এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রাহ.কে এতই সতর্ক থাকতে দেখা যায় যে, প্রমাণিত সুন্নাতের মাঝেও সমান্যতম হেরফের হলেই তিনি তা বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করতেন এবং এ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতেন। ফিকহে হানাফিতে বিদ্যমান অসংখ্য মাস'আলা এর জলন্ত প্রমাণ। এথেকেই হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো: কোনো বিষয় সুন্নাত ও বিদ'আতের মাঝে সংশয়যুক্ত হলে তা বিদ'আত বলে গণ্য করে পরিহার করতে হবে। কারণ কাজটি যদি বাস্তবেই সুন্নাত হয়ে থাকে তবে ছেড়ে দিলে গোনাঙ্গার হবে না, শুধুমাত্র ছওয়ার থেকে বঞ্চিত হবে, কিন্তু বিদ'আত হয়ে থাকলে গোনাহ হবে। তাই ইমাম আবু হানিফা রাহ. এমন কাজ ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করতেন। আর ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে চলাই জ্ঞানির কাজ। আল্লামা সারখসী³⁹¹ লিখেনঃ

"وما تردد بين البدعة والسنة يتركه لأن ترك البدعة لازم وأداء
السنة غير لازم". (المبسوط، 2-146)

“আর যে বিষয়টি বিদ'আতও হতে পারে আবার সুন্নাতও হতে পারে বলে উভয় সম্ভাবনা রয়েছে এমন বিষয় পরিত্যাগ করবে, কেননা বিদ'আত পরিত্যাগ করা অপরিহার্য জরুরী, আর সুন্নাত পালন করা অপরিহার্য নয়।”³⁹²

³⁹¹ শামসুল আয়িম্মাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন সাহাল আস্-সারখাসি, হানাফী মাযহাবের অন্যতম মুজতাহিদ আলেম। ওফাত: ৪৮৩ হিজরী, মোতাবেক ১০৮০ ঈসায়ী। (আল-আ'লাম: ৫/৩১৫)

³⁹² সারখাসী, আল-মাবসূত, ২/১৪৬।

তিনি অন্যত্র লিখেনঃ

"وما تردد بين المباح والبدعة لا يؤتى به فإن التحرز عن البدعة واجب... وما تردد بين السنة والبدعة لا يؤتى به". (357-3)

“যে বিষয়টি বৈধও হতে পারে আবার বিদ‘আত হতে পারে বলে উভয় সম্ভাবনা রয়েছে এমন বিষয়ের উপর আমল করা যাবে না, কেননা বিদ‘আত পরিহার করে চলা ওয়াজিব,... এবং যে কাজ সুন্নাতও হতে পারে আবার বিদ‘আতও হতে পারে বলে উভয় সম্ভাবনা রয়েছে এমন কাজ করা যাবে না।”³⁹³ এই ছিল খাইরুল কুর‘ান থেকে নিয়ে হানাফী মাযহাবের মূলধারার আলেমদের আদর্শ। তাই বিভিন্ন দো‘আ দুরুদ ইত্যাদির মাঝে নতুন যে কোনো সংযোজনের সবই তাদের যুগের অনেক পরের সৃষ্ট বলে দেখতে পাবেন। সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনায় বলা যায় যে, বিভিন্ন আমল, আমলের বিভিন্ন পদ্ধতি, দুরুদের বিভিন্ন পদ্ধতি, যিকরের বিভিন্ন পন্থা, সংযোজন বিয়োজন। দো‘আ, যিকর, তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদির নতুন সংখ্যা ও তার লাভ নির্ধারণ। ইবাদতের নতুন নতুন উদ্দেশ্যের প্রণয়ন করে যদি বলি তা বিদ‘আত নয় তবে, আমি আমার নিজেকে সম্বোধন করে বলব: তুমি পৃথিবীর কাউকে বিদ‘আতি বলে আখ্যায়িত করো না। রাসূলের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বর্জিত হয়ে তোমার কাজ যদি বিদ‘আত না হয়, তবে যাকে তুমি বিদ‘আতি বলছ তাঁর কাজ বিদ‘আত হবে কেন? তোমার বানানো পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পন্থায় না হলেও তুমি তোমার ইলম, কুরআন, হাদীস, যুক্তি ইত্যাদির

³⁹³ প্রাগুক্ত, ৩/৩৫৭।

অকাট্য (?) দলীল দ্বারা জায়েয প্রমাণ করতে পার। তবে তুমি যাকে বিদ'আতি বলছ তাঁর কাছেও তোমার মত হাজারো দলীল রয়েছে। আলোচনা আর দীর্ঘ না করে আমাদের মূল বিষয়ে চলে যাচ্ছি। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে বিদ'আত বুঝা ও তা এড়িয়ে চলার তওফিক দিন। আমীন।

বিদ'আত চেনার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিঃ আর এ ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ নিয়ম হল এ কথা বলা যে, মানুষ নতুন করে কোনো কিছু তখনই উদ্ভাবন করে, যখন তারা সেটাকে যথাযথ ও কল্যাণকর মনে করে, কেননা তারা যদি বিশ্বাস করত যে, তাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কিছু আছে, তাহলে তারা তা উদ্ভাবন করত না; সুতরাং যখন মানুষ কোনো কিছুকে যথাযথ ও কল্যাণকর মনে করবে, তখন সেটার কারণের প্রতিও নজর দিতে হবে; অতঃপর যদি কারণটি এমন বিষয় হয়, যার উদ্ভব হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে, তাহলে প্রয়োজনের দাবি অনুযায়ী নতুন বিষয় উদ্ভাবন করা বৈধ হবে, যেমন- দলিল-প্রমাণ গ্রন্থবদ্ধ করা; কেননা, এর প্রয়োজনীয় কারণ হল ভ্রান্ত দল ও গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ; সুতরাং তারা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আত্মপ্রকাশ করেনি, তখন তার প্রয়োজন হয়নি। আর যদি এই ধরনের কাজের চাহিদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু এমন অস্থায়ী কারণে তা পরিত্যাগ করা হয়, যা তাঁর মৃত্যুর কারণে দূর হয়ে গেছে, তাহলে অনুরূপভাবে তা উদ্ভাবন করা বৈধ হবে, যেমন- কুরআন সংকলন করা; কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এই কাজের প্রতিবন্ধকতা ছিল ওহী অবতীর্ণ অব্যাহত থাকা, কেননা আল্লাহ তা'আলা

তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তা পরিবর্তন করতেন; অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর মাধ্যমে এই প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটে।³⁹⁴

বিদাতীর কাজের পরিণতি ৩টি, যথাঃ

(১) ঐ বিদ'আতী কাজ বা আমল আল্লাহর দরবারে কখনোই গৃহীত হবে না।

(২) বিদ'আতী কাজ বা আমলের ফলে মুসলিম সমাজে গোমরাহী বিস্তার লাভ করে এবং

(৩) এ গোমরাহীর চূড়ান্ত ফলাফল হলো বিদ'আত কার্য সম্পাদনকারীকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন নতুন কিছু সৃষ্টি করল যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত। (সহীহুল বুখারী ও মুসলিম)³⁹⁵ রাসূল (ﷺ) আরও বলেছেন, আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন করা থেকে সাবধান থেকো! নিশ্চয়ই প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ'আত। আর প্রত্যেকটি বিদ'আত গোমরাহীর পথে পরিচালিত করে আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম হলো জাহান্নাম। (তথ্যসূত্রঃ আহমদ, আবু দাউদ, আত্ তিরমিযী)³⁹⁶

³⁹⁴ [তথ্যসূত্রঃ সংকলন: শাইখ আহমদ আর-রুমী আল-হানাফী (রহঃ), অনুবাদক: মোঃ আমিনুল ইসলাম, সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, সূত্র: ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদিআরব]।

³⁹⁵ বুখারী ও মুসলিম

³⁹⁶ আহমদ, আবু দাউদ, আত্ তিরমিযী

বিদ'আতের ভয়াবহতাঃ বিদ'আতের ভয়াবহতার কারণ হল, অপরাধী ব্যক্তি জানে যে, সে অপরাধের সাথে জড়িত, ফলে তার পক্ষ থেকে আশা করা যায় যে সে তা থেকে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে। কিন্তু বিদ'আতের অনুসারী বিশ্বাস করে যে, সে আনুগত্য ও ইবাদতের মধ্যেই আছে, ফলে সে তাওবা করে না এবং ক্ষমাও প্রার্থনা করে না। আর এটাই ইবলিস থেকে বর্ণনা করা হয় যে, সে বলে: “আমি আদম সন্তানদের পিঠ ভেঙ্গে দেই অপরাধ ও পাপরাশি দ্বারা, আরা তারা আমার পিঠ ভেঙ্গে দেয় তাওবা ও ইস্তিগফারের (ক্ষমা প্রার্থনা করার) দ্বারা; তাই আমি তাদের জন্য এমন কতগুলো অপরাধের প্রবর্তন করি যার থেকে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে না এবং তার থেকে তারা তাওবাও করে না আর সেগুলো হল ইবাদতের আকৃতিতে বিদ'আত।” [একটি সন্দেহ অপনোদন]। যদি বলা হয় যে, অনেক মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে যে, তাদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি হাদীসের দ্বারা তারা তাদের অভ্যাসে পরিণত হওয়া বিদ'আতকে মাকরুহ না হওয়ার ব্যাপারে দলিল পেশ করে থাকে, সে হাদীসটি হলঃ

« مَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ »

“মুমিনগণ যা উত্তম বলে মনে করেন, তা আল্লাহর নিকট উত্তম; আর মুসলিমগণ যা মন্দ বলে মনে করেন, তা আল্লাহর নিকট মন্দ”! এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাদের পক্ষ থেকে এর দ্বারা যুক্তি প্রদর্শন শুদ্ধ হবে, নাকি অশুদ্ধ হবে?

[উত্তর] কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ যা আলোচনা করেছেন, তার উপর ভিত্তি করে এর জবাব হল: এই যুক্তি প্রদর্শন বিশুদ্ধ নয়, আর হাদিসটি তাদের বিপক্ষে দলিল, তাদের পক্ষে নয়; কারণ, তা ইবনু মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত মাওকুফ। হাদীসের অংশবিশেষ, যা আহমদ, বায্‌যার, তাবারানী, তায়ালাসী ও আবু নু'আইম বর্ণনা করেছেন; হাদিসটি এই রকমঃ

« إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيئاً . (أخرجه أحمد) . »

“নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের অন্তরসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন, অতঃপর তিনি বান্দাদের অন্তরসমূহের মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরকে সর্বোত্তম পেয়েছেন, অতঃপর তাঁকে তিনি তাঁর নিজের জন্য নির্বাচন করেছেন, অতঃপর তাঁকে তিনি তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন; অতঃপর তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরের পর (বাকি) বান্দাদের অন্তরসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন, তারপর তিনি বান্দাদের অন্তরসমূহের মধ্যে তাঁর সাহাবীদের অন্তরসমূহকে সর্বোত্তম পেয়েছেন, অতঃপর তিনি তাদেরকে তাঁর নবীর উজির বা সাহায্যকারী বানালেন, যারা তাঁর দীনের জন্য লড়াই করবে; সুতরাং মুসলিমগণ যা উত্তম বলে মনে করবে, তা আল্লাহর নিকট উত্তম; আর মুসলিমগণ যা মন্দ বলে মনে করবে, তা আল্লাহর নিকট মন্দ।” কোনো সন্দেহ নেই যে, **المسلمون** শব্দের মধ্যে “**ال**” টি সাধারণভাবে

গোটা (মুসলিম) জাতিকে বুঝানোর জন্য নয়; কারণ, হাদীসটি তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর বিরোধী হয়ে যাবে, তিনি বলেছেনঃ

« سَتَفْتَرُقُ أُمِّي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ثِنْتَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي
(الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ » . (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)

“অচিরেই আমার উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, তাদের বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে, আর একটি দল জান্নাতে যাবে, আর সে দলটি হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত।”। কেননা, উম্মতের প্রতিটি ফিরকা বা দলই মুসলিম, সে তার মাযহাবকে উত্তম মনে করে, সুতরাং যদি সবার ভালো মনে করা ও সবার কথাই গ্রহণযোগ্য হয় তবে তো কোনো দলই জাহান্নামী না হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। যা হাদীসের ভাষ্যের পরিপন্থী। অনুরূপভাবে মুসলিমদের কেউ কেউ কোনো জিনিসকে উত্তম মনে করে, আবার তাদের কেউ কেউ সেই জিনিসটিকেই মন্দ মনে করে, এমতাবস্থায় (যদি সবার কথাই গ্রহণযোগ্য হয়, তবে) তো উত্তম থেকে মন্দ আলাদা না করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। যা হাদীসের ভাষ্যের পরিপন্থী। তাই বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে,

• হাদীসে বর্ণিত, " **المسلمون** " শব্দের মধ্যকার " **ال** " টি " **عهد** " বা পূর্বে বর্ণিত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে। এখানে পূর্ববর্ণিত বিষয় হচ্ছে, “তারপর তিনি বান্দাদের অন্তরসমূহের মধ্যে তাঁর সাহাবীদের অন্তরসমূহকে সর্বোত্তম পেয়েছেন, অতঃপর তিনি তাদেরকে তাঁর নবীর উজির বা সাহায্যকারী বানালেন”। অর্থাৎ হাদীসে মুসলিমগণ বলে সাহাবীগণকেই উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

• অথবা " **المسلمون** " শব্দের মধ্যকার " **ال** " টি দ্বারা " **خصائص الجنس** " বা মুসলিম শব্দের মুসলিম জাতির অন্তর্নিহিত কোনো বৈশিষ্ট্যকে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। তখন মুসলিম বলে বুঝানো হবে ইসলামের গুণে পরিপূর্ণ ব্যক্তিগণ, অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা ইজতেহাদ করত সক্ষম। এর মাধ্যমে সাধারণগুণ বিশিষ্টকে পূর্ণাঙ্গ গুণবিশিষ্টদের সম্পৃক্ত করা হবে। কারণ, ইঙ্গিত না পাওয়াকালীন সময়ে মুতলাক (**مطلق**) তথা সার্বজনীন বিষয়টি একটি পরিপূর্ণ শ্রেণীর দিকে স্থানান্তরিত হবে, আর সে শ্রেণি হলো মুজতাহিদ তথা গবেষক শ্রেণী; সুতরাং হাদীসের সঠিক অর্থ হবে: সাহাবীগণ অথবা মুসলিমদের মুজতাহিদগণ যা উত্তম মনে করবে, তা আল্লাহর নিকট উত্তম; আর সাহাবীগণ অথবা মুসলিমদের মুজতাহিদগণ যা মন্দ বলে মনে করবে, তা আল্লাহর নিকট মন্দ। তাছাড়া " **المسلمون** " শব্দের মধ্যকার " **ال** " টিকে তার প্রকৃত " **استغراق** " বা এক জাতীয় সকল ব্যক্তি বা বস্তুর অর্থে ব্যবহার করাও বৈধ হবে, তখন তার অর্থ হবে: "যা সকল মুসলিম উত্তম মনে করবে, তা আল্লাহর নিকট উত্তম; আর যা সকল মুসলিম মন্দ মনে করবে, তা আল্লাহর নিকট মন্দ।

আর যে ব্যাপারে মতবিরোধ হবে, সেক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য বিষয় হবে সেসব যুগের ব্যক্তিবর্গের মন্তব্য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর মধ্যে যাদের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, ঐসব যুগের ব্যক্তিবর্গের মন্তব্য নয়, যাদের ব্যাপারে মিথ্যাবাদিতা ও অনির্ভরযোগ্যতার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ

« خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي الَّذِي يُلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو
الْكَذِبُ ».

“আমার যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ, যাতে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, অতঃপর তাদের সাথে যারা সম্পৃক্ত হবে, অতঃপর তাদের সাথে যারা সম্পৃক্ত হবে, অতঃপর মিথ্যা ছড়িয়ে পড়বে।” সুতরাং (যাদের মধ্যে মিথ্যা ছড়িয়ে পড়বে) তোমরা তাদের কথা ও কর্মকাণ্ডসমূহের উপর আস্থা স্থাপন বা নির্ভর করো না। আর কোন সন্দেহ নেই যে, সাহাবী, তাবেরী ও মুজতাহিদ ইমামগণ একান্ত অত্যাব্যশ্যকতার সীমা অতিক্রমকারী বিদ‘আতকে মন্দ ও ঘৃণিতই মনে করতেন, সুতরাং সে-সব বিদ‘আত আল্লাহ ত‘আলার নিকটও মন্দ। বস্তুত আমাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর বাণীর মত, যেখানে তিনি বলেছেনঃ

« لا تجتمع أمتي على الضلالة »

“আমার উম্মত ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না।” এই হাদীসেও ‘উম্মত’ বলতে কেবল ‘আহলুল ইজমা’ (যাদের ইজমা বা ঐকমত্য গ্রহণযোগ্য এমন লোকগণ) উদ্দেশ্য, যিনি হবেন এমন মুজতাহিদ (দ্বীনী গবেষক), যার মধ্যে আসলেই কোনো প্রকার ফাসেকী (পাপাচারিতা) ও বিদ‘আত নেই; কারণ, ফিসক তথা পাপাচার যে তা করে সে ব্যক্তিকে অপবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং তা ন্যায়পরায়ণতাকে বিদূরিত করে, আর বিদ‘আতপন্থী ব্যক্তি মানুষকে বিদ‘আতের দিকে আহ্বান করে এবং সে সাধারণভাবে উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হবে না; কেননা, সাধারণ উম্মত দ্বারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতকে বুঝানো হয়, আর তারা হলেন এমন উম্মত, যাদের পথ হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের পথ, বিদ‘আতপন্থী ও পথভ্রষ্টদের পথ নয়, যেমনটি বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামঃ

“আমার উম্মত হল সেই ব্যক্তি, যে আমার সুন্নাতকে অনুসরণ করে।” তবে (“আমার উম্মত ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না” হাদীসে) ‘আমার উম্মত’ (أمتي) দ্বারা সকল উম্মতকে উদ্দেশ্য করাও শুদ্ধ বলা যায়, কারণ কখনও কখনও "إضافة" বা সম্বন্ধ পদ "ال" এর মত "استغراق" তথা সমস্ত ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে; সুতরাং অর্থ হবে: “আমার সকল উম্মত মহাকালের কোনো এক কাল বা সময়ে ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না, যেমনভাবে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানগণ তাদের নবীদের পরে ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হয়েছে”; তখন এই হাদিসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে, যাতে তিনি বলেছেনঃ

« لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى . (يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ » . (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ

“আমার উম্মতের একটি দল আল্লাহর বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে; যারা তাদের সঙ্গ ত্যাগ করবে বা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনো প্রকার অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত এভাবে আল্লাহর আদেশ তথা কিয়ামত এসে পড়বে, আর তারা তখনও লোকের উপর সুস্পষ্টরূপে প্রকাশমান থাকবে।”

বিদআতের নিন্দা, তিরস্কার ও তা থেকে সতর্কতা প্রদর্শন ও দ্বীনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করাঃ সুতরাং - এ কারনেই বিদআতের নিন্দা, তিরস্কার

ও তা থেকে সতর্কতা প্রদর্শন করে রাসূল (ﷺ) অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল - আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ-

مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. وفي رواية مسلم مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ بخاري ومسلم

অর্থঃ যে আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু প্রবর্তন করল, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছেঃ যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যা আমাদের পক্ষ থেকে অনুমোদিত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত। (তথ্যসূত্রঃ বুখারী - ২৬৯৭ ও মুসলিম - ১৭১৮)³⁹⁷।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) স্বীয় জুমআর খুতবায় বলেছেনঃ

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ. مسلم

উত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী। আর উত্তম পথনির্দেশনা হচ্ছে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর পথনির্দেশনা। নিকৃষ্টতম বিষয় হচ্ছে (দ্বীনের মধ্যে) নতুন নতুন বিধান ইবাদতের নামে প্রবর্তন করা, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা। (সহীহ মুসলিম : ৮৬৭)³⁹⁸।

³⁹⁷ বুখারী : ২৬৯৭ ও মুসলিম : ১৭১৮

³⁹⁸ সহীহ মুসলিম : ৮৬৭

রাসূল (ﷺ) খুতবায় আল্লাহর প্রশংসা করার পর বলেনঃ-

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَدَّ
سَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ
وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَسْلَمٌ وَنَسَائِي

অর্থঃ আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শনকারী নেই। নিশ্চয়ই সর্বাধিক সত্যবাণী হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কিতাবের বাণী। আর সর্বোত্তম পথ হলো নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ﷺ) কর্তৃক প্রদর্শিত পথ। আর মন্দ বিষয়গুলো হলো (দ্বীনের ভিতরে) নবসৃষ্ট আমল বা কাজ। প্রত্যেক নবসৃষ্ট আমলই বিদআত। কেননা প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (সহীহ মুসলিম : ৮৬৭ ও নাসাঈ : ১৫৭৮)³⁹⁹।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেনঃ-

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ
شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا مَسْلَمٌ

অর্থঃ যে ব্যক্তি (মানুষকে) হেদায়াতের দিকে আহ্বান করবে, সে হেদায়াতের পথ অনুসরণকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে। এতে কারো সাওয়াব কম হবে না। আর যে ব্যক্তি(মানুষকে) পথভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করবে সে ঐ

³⁹⁹ সহীহ মুসলিম : ৮৬৭ ও নাসাঈ : ১৫৭৮

ভ্রষ্টপথ অনুসরণকারীর সমপরিমাণ গুনাহগার হবে। এতে কারো গুনাহ কম হবে না। (তথ্যসূত্রঃ মুসলিম: ২৬৭৪)⁴⁰⁰ জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেনঃ-

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ مُسْلِمٌ

অর্থঃ যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন ভাল কাজের প্রচলন করল তার জন্য সে কাজের প্রতিদান রয়েছে এবং পরবর্তীতে যারা ঐ ভাল কাজের উপর আমল করল তা থেকেও সে প্রতিদান পাবে, এতে কারো প্রতিদান কম করা হবে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের প্রচলন করল তার আমলনামায় সে মন্দ কাজের গুনাহ রয়েছে এবং পরবর্তীতে উক্ত গুনাহে লিপ্তদের গুনাহও লিখা হবে। এতে কারো গুনাহ কম হবে না। (তথ্যসূত্রঃ মুসলিম: ১০১৭)⁴⁰¹।

ইরবাজ বিন সারিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ-

وَعَظَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً وَجِلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوفُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَأَنَّهَُا مَوْعِظَةٌ مُودِعٌ فَأَوْصِنَا قَالَ: أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرُ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالٌ). أَبُو دَاوُدَ

⁴⁰⁰ তথ্যসূত্রঃ মুসলিম: ২৬৭৪

⁴⁰¹ মুসলিম: ১০১৭

অর্থঃ একদা রাসূল (ﷺ) আমাদের মাঝে এমন ভাষণ দিলেন যাতে আমাদের অন্তর বিগলিত হল এবং চক্ষু হতে অশ্রু প্রবাহিত হল, তখন আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে এ আলোচনা যেন বিদায়ী উপদেশ।

সুতরাং আমাদের আরো কিছু ওসিয়ত করুন। তখন তিনি বললেনঃ আল্লাহকে ভয় কর, আমীরের কথা শোন এবং তার আনুগত্য কর; যদিও সে কৃতদাস হয়। আর যে ব্যক্তি আমার পর বেঁচে থাকবে সে অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে, সে সময় তোমাদের উচিত হবে আমার এবং আমার খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা যেমনি তোমরা কোন বস্তু মাড়ির দাঁত দিয়ে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধর। বিদ'আত পরিহার কর। কেননা সকল প্রকার বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা। (তথ্যসূত্রঃ আবু দাউদ: ৪৭০৭ ও তিরমিযী: ২৬৭৬)⁴⁰²। অন্যত্র হুজাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ رَ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٌّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ دَخْنٌ قُلْتُ وَمَا دَخْنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بَغِيرَ هُدًى تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاءٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَفُّهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَ نِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزِمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالُوا فَاغْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعْضَ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ

⁴⁰² আবু দাউদ: ৪৭০৭ ও তিরমিযী: ২৬৭৬

অর্থঃ লোকজন রাসূল (ﷺ) কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত, আর আমি অকল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম যাতে তা থেকে বেঁচে থাকতে পারি। কোন এক সময় আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহেলিয়াত ও কুসংস্কারের মাঝে নিমজ্জিত ছিলাম, অতঃপর আল্লাহ আমাদের কল্যাণের পথ দেখালেন, এ কল্যাণের পরে কি আবার অকল্যাণ আসবে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ; অতঃপর আবার জিজ্ঞেস করলাম, এ অকল্যাণের পর কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ; কিন্তু তার মধ্যে ফ্যাসাদ থাকবে। আমি বললাম, তার মধ্যে ফ্যাসাদ কি? তিনি বললেন, এক দল লোক সুন্নাতের অনুসারী হবে বটে, তবে তা আমার সুন্নাত নয়। তারা আমার সুন্নাত ছেড়ে অন্য মতাদর্শ গ্রহণ করবে, তাদের মাঝে সৎকর্ম এবং অসৎকর্ম উভয়টিই পাওয়া যাবে। আমি বললাম, এ কল্যাণের পরও কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ; একদল লোক মানুষকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করবে, যারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে তারা জাহান্নামের স্বাদ গ্রহণ করবে। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিচয় দিন। তিনি বললেন, তারা আমাদের স্ব-জাতি ও আমাদের ভাষাতেই কথা বলবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ সময় যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে আমার জন্য আপনার পরামর্শ কি? তিনি বললেন, তুমি মুসলিম জামাআত ও তাদের ইমামের অনুসরণ করবে। আমি বললাম, যদি তাদের জামাআত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন - তাহলে সকল জামাআতই পরিত্যাগ করবে। যদি প্রয়োজন হয় কোন গাছের শিকড় ধরে আমরণ এভাবে পড়ে থাকবে। (তথ্যসূত্রঃ সহীহুল বুখারীঃ ৭০৮৪ ও মুসলিমঃ ১৮৪৭)⁴⁰³।

⁴⁰³ সহীহুল বুখারী : ৭০৮৪ ও মুসলিম : ১৮৪৭

এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, هدى (হাদী) শব্দের অর্থ হল ত্বরীকা ও আদর্শ। আর জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী দল প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরাম বলেন, তারা হল সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যারা মানুষকে বিদআতের দিকে আহ্বান করে। যেমন - খারেজী, কারামতী ও বস্তুবাদী দল। (শরহে মুসলিমঃ ১২/৪৭৯)⁴⁰⁴। যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন:-

أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُّوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبُ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْ
نِ أَوْلَهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ [هو حبل الله المتين من أتبعه كان على الهدى
ومن تركه كان على الضلالة فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به مسلم

অর্থ: হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ, যখনই আমার রবের পক্ষ থেকে মৃত্যুদূত আসবে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দেব। আর আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। তার একটি হল আল্লাহর কিতাব (অপরটি আমার সুনাত), যাতে রয়েছে হেদায়াত ও নূর। এটা আল্লাহর সুদৃঢ় রশি। যারাই এ কিতাব মেনে চলবে তারাই হেদায়াত পাবে। আর যারা তা ছেড়ে দেবে তারা পথভ্রষ্ট হবে। তোমরা আল্লাহর কিতাব সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। (তথ্যসূত্রঃ মুসলিমঃ ২৪০৮)⁴⁰⁵। এ হাদীসে আল্লাহর কিতাব মেনে চলার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন:-

⁴⁰⁴ শরহে মুসলিমঃ ১২/৪৭৯

⁴⁰⁵ মুসলিমঃ ২৪০৮

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمُ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا
أَبَاؤُكُمْ فَأَيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ مُسْلِم

অর্থঃ শেষ জমানায় এমন কিছু মিথ্যাবাদী প্রতারকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা তোমাদের কাছে এমন সব হাদীস বর্ণনা করবে; যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষ কোন দিন শোননি। অতএব তোমরা তাদের হতে দূরে থাক যাতে তারা তোমাদের গোমরাহী ও ফিতনায় ফেলতে না পারে। (তথ্যসূত্রঃ মুকাদ্দামায়ে মুসলিম: ৬ ও ৭)⁴⁰⁶। যারা বিদ'আতের চর্চা করেন তারা শুধু ইহকালেই নিন্দনীয় নন বরং পরকালে রয়েছে তাদের জন্য মারাত্মক পরিণতি। যারা বিদ'আত সৃষ্টি করে আর যারা তাদেরকে প্রশয় দেয় তাদের সকলকে হাদীস শরীফে লা'নত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে নিম্নে কতিপয় দলীল পেশ করা হলোঃ

১। আমল নষ্ট হওয়াঃ মহান আল্লাহ বলেন –

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ
يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.

“হে নবী আপনি বলে দিন যে, আমি কি তোমাদেরকে বলব: কারা আমলের দিক থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত? তারা হলো যারা তাদের পার্থিব জীবনের সকল চেষ্টাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। অথচ তাদের ধারণা যে, তারা ভাল কাজই করছে।” (আল কাহফ, ১০৩, ১০৪)।

⁴⁰⁶ মুকাদ্দামায়ে মুসলিম: ৬ ও ৭

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আলী (রাঃ) ও সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন,
صَلَّ سَعِيْهُمْ তথা “আমলের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত” বলতে বিদ‘আত
চর্চাকারীকে বুঝানো হয়েছে।

২। আমল কবুল না হওয়াঃ

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

ابى الله ان يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته

“মহান আল্লাহ্ বিদ‘আতীদের আমল কবুল করতে অস্বীকার করেছেন,
যতক্ষণ না তারা তা পরিত্যাগ করে।”

৩। তাওবার পথ বন্ধ হওয়াঃ

ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته

“নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিদ‘আতীদের তাওবায় পথ বন্ধ করে দেন।
যতক্ষণ না সে তার বিদ‘আতকে ছেড়ে দেয়।

৪। হাউজে কাওসার থেকে বঞ্চিত হওয়াঃ “সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে
আহমদে বর্ণিত, হাশরের ময়দানে রাসুলে কারীম (সঃ) তার উম্মতকে
পেয়ালা ভরে ভরে হাওযে কাওসারের পানি পান করাবেন।

লোকেরা এক দিক থেকে আসতে থাকবে ও পানি পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে
অপর দিকে চলে যেতে থাকবে। এসময় তার একদল উম্মত হাওজে
কাওসারের দিকে আসতে থাকবে। তখন নবী (সাঃ) বলেছেন -

يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ

“আমার ও তাদের মাঝে প্রতিবন্ধক দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে।” তখন আমি
আল্লাহকে বলব এদের বাধা দেওয়া হল কেন? তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ

إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أُحْدِثُوا بَعْدَكَ - #

وَأَنَّهُمْ غَيَّرُوا دِينَكَ #

নিশ্চয় আপনি জানেন না, অথচ তারা আপনার পরে দ্বীনের মধ্যে নতুন
বিষয় আবিষ্কার করেছিল। # আর নিশ্চয় তারা আপনার দ্বীনকে পরিবর্তন
করেছিল।

৫। বিদ‘আতীরা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়ঃ

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَصَاحِبَ بَدْعَةٍ صَوْمًا وَلَا صَلَاةً وَلَا صَدَقَةً وَلَا حَجًّا وَلَا عِمْرَةً وَلَا
جِهَادًا وَلَا صَرْفًا وَلَا عَدْلًا يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ

“বিদ‘আতী ব্যক্তির নামাজ, রোজা, সদ্কা, হাজ্জ, উমরাহ্, জিহাদ এবং ফরয
ও নফল ইবাদত কিছুই আল্লাহ্ তাআলা কবুল করেন না। সে ইসলাম

থেকে এরূপ বেরিয়ে যায় যেমন আটা থেকে চুল বেরিয়ে যায়।” (ইবনে মাজাহ)

৬। আল্লাহ ও ফেরেশতাদের লা'নতঃ

من احدث فيها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين

“যে ব্যক্তি বিদ‘আত সৃষ্টি করবে, অথবা বিদ‘আত চর্চা কারীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের লা'নত বর্ষিত হবে।”

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ এর বাণীঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“যারা তাঁর রাসূলের হুকুমের বিরোধিতা করে তাদের ভয় করা উচিত যে, তাদের উপর কোন ফিতনা বা কোন মর্মদন্ত — শাস্তি আসতে পারে।” (সূরা আননুর, আয়াত নং - ৬৩)

৭। জাহান্নামের কুকুরঃ অন্য বর্ণনা রাসূল (সঃ) বলেন-

قال رسول الله ص اصحاب البدع كلاب اهل النار

“বিদ‘আতীরা হলো জাহান্নামের কুকুর।” (আল জামী- আসসাগীর)

৮। ইসলাম ধ্বংস কারীঃ

من وقر صاحب البدعة فقد اعان على هدم الاسلام

“যে ব্যক্তি কোন বিদ‘আতীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করল সে ইসলাম ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করল। (বায়হাকী)

৯। রিসালাত অস্বীকার কারীঃ

قال امام مالك من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم ان محمدا ص قد خان في الرسالة.

“যে ব্যক্তি (ইসলামের মাঝে) কোন বিদ‘আতের উদ্ভাবন করে এবং একে সাওয়াবের কাজে মনে করে প্রকৃত পক্ষে সে অভিযোগ আনল যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তার রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খিয়ানত করেছেন। (আল-ই‘তিসাম)

দীনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করাঃ ইবনুল হাম্মাম বলেনঃ যখন কোনো ইবাদতে ওয়াজিব ও বিদ‘আতের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিবে, তখন সতর্কতার খাতিয়ে তা করা হবে; কিন্তু যদি বিদ‘আত ও সুন্নাতের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিবে, তখন তা পরিত্যাগ করবে; কারণ, বিদ‘আত ত্যাগ করা আবশ্যিক, আর সুন্নাত আদায় করা আবশ্যিক নয়। অবশ্য ‘আল-খোলাসা’ গ্রন্থকারের একটি মাস‘আলা প্রমাণ করে যে, ওয়াজিব তরক (ত্যাগ) করার চেয়ে বিদ‘আত অনেক বেশি ক্ষতিকর, যেমন তিনি বলেনঃ যখন কেউ তার সালাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, সে কি তা সালাত আদায় করেছে,

নাকি আদায় করেনি? এমতাবস্থায় সে যদি ওয়াভের মধ্যে থাকে, তাহলে পুনরায় তা আদায় করে নেবে; আর যদি সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, অতঃপর সে সন্দেহ করে, তাহলে কিছুই করতে হবে না। তবে যদি আসরের সালাত (পড়েছে কি পড়েনি) এর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, তাহলে সে (যখন দ্বিতীয়বার তা আদায় করবে তখন) প্রথম ও তৃতীয় রাকাতে পাঠ করবে, দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকাতে পাঠ করবে না; কারণ, ফরয সালাতের ক্ষেত্রে কিরাআতের জন্য প্রথম দুই রাকআতকে নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে নফল সালাতে প্রতি দু'রাকাতেই কিরাআত মেলাতে হয়, তাই যদি পরপর দু' রাকআতে কিরাআত পড়া হয়, তখন কোনো কারণে পূর্বে সে যদি ফরয সালাত আসলেই পড়ে থাকে তবে তো সেটা নফল হিসেবে ধর্তব্য হয়ে যাবে, অথচ আসরের পরে কোনো নফল সালাত আদায় করা মাকরুহ, তাই তাকে পরপর প্রতি রাকআতে সূরা মিলিয়ে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে করে দ্বিতীয়বার পড়া সালাতটি কোনো ক্রমেই ফরয না হয়ে নফল সালাত হিসেবে ধর্তব্য না হয়। কারণ যদি আসরের পরে নফল সালাত আদায় করা হয় সেটি হবে বিদ'আত, যা অপছন্দনীয়। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, দীনের মধ্যে যদি বৃদ্ধি করাটা বৈধ হয়, তাহলে ফজরের সালাত চার রাকাত এবং যোহরের সালাত ছয় রাকাত আদায় করা বৈধ হবে, আর বলা হবে- এটা সৎ আমলের বৃদ্ধি, তার বৃদ্ধিতে কোনো ক্ষতি হবে না; কিন্তু কারও জন্য এ কথা বলার অধিকার নেই। কেননা, বিদ'আত প্রবর্তনকারী যে কল্যাণ ও ফযিলতের কথা ব্যক্ত করে, যদি তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে সাব্যস্ত হত এবং তা সত্ত্বেও তিনি তা না করতেন, তাহলে এই ধরনের কাজ পরিত্যাগ করা সুন্নাত, যা প্রত্যেক ব্যাপক নির্দেশ ও কiyাসের উপর

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেনঃ “ইবলিসের নিকট সকল পাপের চেয়ে বিদ‘আতই সবচেয়ে বেশি প্রিয়; কারণ, পাপ থেকে তাওবা করা হয়, আর বিদ‘আত থেকে তাওবা করা হয় না।”

বিদ‘আতের ব্যাপারে সাহাবীগণের অবস্থানঃ সাহাবাদের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তারা রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাহর প্রতি খুবই আনুগত্য প্রকাশ করতেন এবং রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ করতেন। রাসূল (ﷺ) সুন্নাহ‘র বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম চোখে পড়লে তারা তা পরিত্যাগ করতেন এবং যারা সুন্নাহ‘র বিন্দুমাত্র পরিবর্তন সাধন করতে চাইত তাদের সতর্ক করে দিতেন। দারেমী এবং আবু নাস্ঈমে সহীহ ইসনাদে বর্ণিত বিদআতীদের প্রতি সাহাবারা কিরূপ আচরণ করতেন তার একটি চমৎকার শিক্ষাপ্রদ ঘটনা রয়েছে। সাহাবীদের বর্ণিত ঘটনাটি নিম্নরূপঃ

ফজরের নামাজের পূর্বে আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের বাড়ির সামনে অপেক্ষা করতাম তার সাথে মসজিদে যাওয়ার জন্যে। আবু মুসা আশআরী আমাদের নিকট আসলেন এবং **আমাদের জিজ্ঞেস করলেনঃ** আবু আব্দুর রহমান (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ) কি চলে গেছেন?

আমরা উত্তর দিলামঃ না।

আবু মুসা আশআরী আমাদের সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। যখন ইবনে মাসউদ ঘর থেকে বেড়িয়ে এলেন, আমরা উঠে দাড়ালাম এবং **আবু মুসা তাকে বললেনঃ** আমি সাম্প্রতিক

সময়ে মসজিদে এমন কিছু দেখেছি যা কোনভাবেই আমার মন সায় দিচ্ছে না।

ইবনে মাসউদ জিজ্ঞেস করলেনঃ সেটা কি ছিল ?

আবু মুসা বললেনঃ “আপনি জীবিত থাকলে আপনিও এটি দেখতে পাবেন। মসজিদে দেখলাম একদল লোক কয়েকটি ভাগে ভাগ হয়ে বৃত্তাকারে বসে নামাজের জন্যে অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক বৃত্তাকারের জন্যে একটি করে দলনেতা রয়েছে। আর এই বৃত্তাকারের সকলেরই নিকট ছোট ছোট পাথরের নুড়ি রয়েছে”।

বৃত্তাকারের দলনেতা তাদের বলছেঃ একশ বার আল্লাহ্ আকবর বল, তারপর তারা একশবার আল্লাহ্ আকবর বলবে; তারপর দলনেতাটি পুনরায় তাদের বলবে, একশবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল, তারা একশবার লা ইলাহা পড়বে; তারপর দলনেতাটি বলবে, একশ বার সুবহানাল্লাহ বল আর তারা একশবার সুবহানাল্লাহ পড়বে।

তারপর ইবনে মাসউদ বললেনঃ আপনি তাদের কি বলেছেন?

তিনি (আবু মুসা) বললেনঃ আমি তাদের কিছু বলেনি। আমি আপনার মতামতের জন্যে অপেক্ষা করতে চেয়েছিলাম।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেনঃ আপনি কি তাদের গুনাহ সমূহ গোনার জন্যে আদেশ দেন নি এবং তাদের নিশ্চিত করতেন যে তারা তাদের পুরস্কার সমূহ ঠিকই পাবে।

এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আমাদের সামনে এগিয়ে চললেন আর আমরাও তার সাথে সাথে চললাম। তিনি যখন সেই বৃত্তাকারে বসা দলগুলোর একটি বৃত্তের কাছে গেলেন তখন **জিঙেস করলেনঃ** তোমরা এটি কি করছ?

তারা বললোঃ ওহে আবু আব্দুর রহমান (ইবনে মাসউদ), এগুলো হচ্ছে নুড়ি পাথর আর আমরা এগুলো দিয়ে কতবার আল্লাহ্ আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সুবহানাল্লাহ পড়লাম তার গণনা করছি।

তিনি (ইবনে মাসউদ) বললেনঃ তোমাদের পাপসমূহ গণনা কর এবং আমি তোমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তোমরা তোমাদের পুরস্কারের কোন অংশ থেকেই বঞ্চিত হবে না। তোমাদের উপর লানত, মুহাম্মদের লোকেরা, কত দ্রুতই না তোমরা ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

আল্লাহর রাসূলের সাহাবীরা এখন পর্যন্ত বর্তমান, রাসূল (ﷺ) এর কাপড়গুলো এখনো জীর্ণ হয়ে যায় নি, তার আহারের পাত্র এখনো ভেঙ্গে যায়নি। যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, তোমরা এমন এক ধর্ম অনুসরণ করছ যেটা হয় রাসূল এর ধর্মের চেয়ে উত্তম আর না হয় তোমরা বিচ্যুত হয়ে যাওয়ার দড়জা উন্মোচন করছ।

তারা বললোঃ ওহে আবু আব্দুর রহমান, আল্লাহর শপথ, এই কাজটি আমরা সওয়াবের আশা ব্যতীত অন্য কোন নিয়তে করিনি।

তিনি (ইবনে মাসউদ) বললেনঃ তাই কি হয়েছে? কত লোকই তো সওয়াবের আশায় ভাল কাজ করতে চায় কিন্তু তারা কি কখনো করতে

পারে? আল্লাহর রাসূল আমাদের ঐ ধরনের লোকদের কথা বলেছেন যারা কোরআন পড়বে ঠিকই কিন্তু কোরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। আল্লাহর শপথ, আমি প্রায়ই নিশ্চিত তোমরাই হচ্ছে সেই ধরনের লোক।

তারপর তিনি তাদের নিকট থেকে সরে গেলেন।

আমর ইবনে সালামাহ বলেনঃ বৃত্তাকারে বসা ঐ লোকগুলোর অধিকাংশকে আন-নহরের যুদ্ধে খারেজীদের পক্ষ হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেখেছি।

– আদ-দারেমী এবং আবু নাস্ঈমে সহীহ ইসনাদে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ্ আকবর এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া নিঃসন্দেহে সওয়াবের কাজ কিন্তু এই পড়াটাকে ভিন্ন একটা নিয়মে আবদ্ধ করে প্রতিষ্ঠিত করলে যেভাবে রাসূল (ﷺ) শিক্ষা দেননি, তখন তা বিদআত হয়ে যাবে।

রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ পর পর আগত কিছু এমন কালেমা রয়েছে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর যার উচ্চারণকারী অথবা আমলকারী ব্যর্থ হবে না। ৩৩ বার ‘সুবহানাল্লাহ’, ৩৩ বার ‘আলহামদু লিল্লাহ’ ও ৩৪ বার ‘আল্লাহ আকবর’। (মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

রাসূল (ﷺ) আলী (রাঃ) এবং ফাতেমা (রাঃ) কে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে এই কালেমাগুলো ৩৩ বার ‘সুবহানাল্লাহ’, ৩৩ বার ‘আলহামদু লিল্লাহ’

ও ৩৪ বার ‘আল্লাহ আকবর’ পড়তে বলেছিলেন যা আলী (রাঃ) সব সময়ই আমল করতেন। (সহীহ বুখারী)

এখন কেউ যদি অন্য সময়ও এই কালেমাগুলো পড়তে চায় সে পড়তে পারে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু সেটাকে যদি একটি নিয়মে আবদ্ধ করে প্রতিষ্ঠিত করা হয় যেমনঃ প্রতিদিন ফরজ নামাজের আগে গোল হয়ে বসে ১০০ বার পড়া বা সপ্তাহে সকলে একত্রিত হয়ে এভাবে সমস্বরে পড়া।

অতএব, যে কেউ সবসময় এই কালেমাগুলো পড়তে চায় সে পড়তে পারবে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু উপরে উল্লিখিত ধরনের কোন নিয়মের আওতায় আনা যাবে না।

“তোমরা নিজেদেরকে নব উদ্ভাবিত বিষয় (ইবাদত) সমূহ থেকে দূরে রেখ, কেননা প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত (দ্বীনি) বিষয়ই বিদআত, আর প্রত্যেক বিদআত হচ্ছে ভ্রান্তি বা ভুল পথ”। (তিরমিযী)

ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহিমাহুল্লাহ বলেন, “যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন একটি বিদআতের প্রচলন করবে এবং সে বিদআতটিকে খায়ির (ভালো) বলে মনে করবে তাহলে সে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর নিন্দা করল, বিষয়টি এমন দাড়াইল যে রাসূল (ﷺ) তাঁর দায়িত্ব সম্পূর্ণ করেন নি” (যার মানে হলো, তিনি (ﷺ) ঠিকমতো আমাদের কাছে ইসলাম পৌছে দেননি)

এখানে লক্ষ্য করুন, মালিক ইবনে আনাস মাত্র একটি বিদআতের কথা বলেছিলেন অনেকগুলো বিদআতের কথা বলেন নি। সুতরাং, বুঝা গেল

বিষয়টি অনেক গুরুতর। মালিক ইবনে আনাসের এই কথা শুনে মানুষজন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, “ওহে ইমাম, আপনার এই কথার প্রমাণ কি?”

ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহিমাহুল্লাহ বলেন, আপনার ইচ্ছা হলে পড়ে দেখুন, “আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম আর ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম” (সূরা মায়িদাঃ আয়াত নং - ৩)।

ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহিমাহুল্লাহ বলেন, এমনকিছু যা ঐদিন দ্বীন ইসলামে ছিল না সুতরাং তা আজকেও দ্বীন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, “আমি তোমাদের যা কিছু করতে বলেছি সেই সব ব্যতীত আর কোন কিছুই তোমাদের জান্নাতের নিকটবর্তী করবে না, এবং যে সকল বিষয়ে সতর্ক করেছি সেগুলো ব্যতীত কোন কিছুই তোমাদের জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে না”। (মুসনাদে আস শাফেয়ীই এবং অন্যান্য)

বর্তমান সময়ে অনেককেই দেখা যায় ইসলামের মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে, বিভিন্ন রকম পন্থার কথা বলতে যা “ঐদিন দ্বীন ইসলামে ছিল না সুতরাং তা আজকেও দ্বীন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়।”

মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সর্বপ্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য। রাসূল (ﷺ) এর উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত নাযিল হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নিষ্ঠাবান বান্দাহদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমীন।

সালাফ ও সালাফিয়াতের অনুসরন এবং বিদ'আত বর্জনঃ মুসলমানগণ দু'প্রকার : একদল হল সালাফে সালাহীনের অনুসারী। আরেক দল হল পরবর্তী যুগের লোকদের সমঝের অনুসারী। এদেরকে প্রায়ই বিদ'আতে লিপ্ত হতে দেখা যায়। কেননা যারা ইলম ও আমল এবং সমঝ ও বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে সালাফে সালাহীনের তরীকা পছন্দ করে না, এর অনিবার্য পরিণতিতে তারা বিদ'আতে আক্রান্ত হন এবং পরিশেষে বিদ'আতী বলে পরিচিত হন। আর সালাফে সালাহীন হলেন : উত্তম যুগের আলেম ব্যক্তিবর্গ। তাদের সম্মুখ সারীতে ও অগ্রভাগে রয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ- আল্লাহ যাদের প্রশংসা করেছেন স্বীয় বাণী দ্বারা :

(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا)

“মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। তুমি তাদেরকে রুকু ও সেজদায় অবনত দেখবে”। [সূরা ফাতহ : ২৯]

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাদের প্রশংসা করেছেন এ কথা বলে যে, "সর্বোত্তম লোক হল আমার যুগের লোকেরা, অতঃপর তাদের পরবর্তী লোকেরা, এরপর তৎপরবর্তী যুগের লোকেরা..."।

সমস্ত সাহাবাদের প্রশংসায় এবং তাদের চলার পদ্ধতি অনুসরণের ব্যাপারে স্বয়ং সাহাবাগণ এবং তাদের সঠিক অনুসারীদেরও একের পর এক বক্তব্য এসেছে।

ইবন মাসউদ রাদি আল্লাহু আনহু বলেন : "তোমাদের কেউ যদি কারো আদর্শ অনুসরণ করতে চায়, সে যেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের আদর্শ অনুসরণ করে। কেননা তারা এ উম্মাতের মধ্যে সবচেয়ে পুণ্যময় হৃদয় ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী, যে সমস্ত ব্যাপারে তাদের জ্ঞান নেই সে সমস্ত ব্যাপারে বক্তব্য দেয়ার প্রবণতা তাদের মধ্যে নেই বললেই চলে, অনুরূপভাবে তারা সর্বাধিক সঠিক হেদায়াতের উপর এবং (আমলের দিক থেকে) সর্বোত্তম অবস্থায় ছিলেন। তারা এমন একদল লোক যাদেরকে আল্লাহ তাঁর নবীর সাহচর্যের জন্য এবং তাঁর দ্বীন কায়েমের জন্য মনোনীত করেছেন।

সুতরাং তাদের মর্যাদা সম্পর্কে জানুন এবং তাদেরকে পদে পদে অনুসরণ করুন। কেননা তারাই ছিলেন সরল সঠিক হেদায়েতের উপর"। এ বিষয়টি আহলে সুন্নাহের সবার সর্বসম্মত মত। এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই। অতএব তারা যখন এমন বিশাল মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তখন এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, মুসলিম ব্যক্তি আল কুরআন ও সুন্নাহ বুঝা, বিশ্লেষণ ও তদনুযায়ী আমলের ক্ষেত্রে তাদের অনুসৃত নীতির সাথে সম্পর্কিত হতে গৌরববোধ করবে।

মুসলিম উম্মার বিভ্রান্ত প্রত্যেক ফিরকাই সালাফে সালাহীন কুরআন ও হাদীসকে যেভাবে বুঝেছেন তার বিপরীত বুঝ নিয়ে কুরআন-হাদীসের দলীল নিজ নিজ মত ও উদ্দেশ্যের সমর্থনে প্রমাণ হিসাবে পেশ করছে। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তারা একে অপরকে কাফির বলছে এবং আল্লাহর কিতাবের একাংশ দিয়ে অন্য অংশের উপর আঘাত হানছে।

প্রত্যেক ফিরকার দাবী অনুযায়ী এসব কিছুই তারা কুরআন-হাদীসকে যে যেভাবে বুঝছে সেভাবে করছে। ফলে বিভ্রান্ত প্রত্যেক ফিরকাই বলছে যে, আমরা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করি। এতে দুর্বল দৃষ্টিসম্পন্ন ও কম ইলমের অধিকারী লোকদের কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট হয়ে গেল। এসব বিভ্রান্তিকর দাবী ও কথা থেকে বের হবার উপায় হল সর্বোত্তম যুগের নীতির অনুসরণ। সে যুগের লোকেরা কুরআন-সুন্নাহের বক্তব্য থেকে যা বুঝেছেন তাই হক ও সত্য, আর যা তারা বুঝেননি এবং আমলও করেননি তা সত্য ও সঠিক নয়। আর অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাডি আল্লাহু আনহুম থেকে যারা জ্ঞান আহরণ করেছেন, তারা সুন্দরভাবে তাদেরকে অনুসরণ করেছেন।

অতএব যে-ই আল-কুরআন ও সুন্নাহ বুঝার ক্ষেত্রে সাহাবাদের এ নীতির অনুসরণ করেছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত তাদের যেসব রেওয়ায়েত বিশুদ্ধ, তা গ্রহণ করে আর নিরেট বুদ্ধিভিত্তিক মতামত ও নব উদ্ভাবিত সমঝ ত্যাগ করে, সে-ই সালাফী হিসাবে পরিচিত

হবে। আর যে সে রকম হতে পারবে না, সে খালাফী ও বিদ'আতী বলে গণ্য হবে।

এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জানা দরকার যে, প্রত্যেকটি ইলমী মাসআলা তিনটি অবস্থা থেকে মুক্ত নয় :

এক : এ মাসআলার অনুকূলে সাহাবা ও তাদের অনুসারীবৃন্দ বক্তব্য রেখেছেন এবং তাদের সকলেই সে অনুযায়ী আমল করেছেন, কিংবা কিছুসংখ্যক সে অনুযায়ী আমল করেছেন এবং অন্য কেউ তার বিরোধিতা করেননি।

দুই : কিছুসংখ্যক সাহাবা সে অনুযায়ী আমল করেছেন, তবে অধিকাংশ সাহাবা মাসআলাটিতে তাদের খেলাফ করেছেন।

তিন : উক্ত মাসআলা অনুযায়ী তাদের কেউ আমল করেননি।

অতএব এ হল মোট তিন প্রকার :

প্রথম প্রকার, যাতে সকল সাহাবা মাসআলা অনুযায়ী আমল করেছেন, অথবা কেউ কেউ করেছেন তবে অন্য কেউ বিরোধিতা করেছেন বলে জানা যায়নি, সন্দেহাতীতভাবে তা এমন সুন্নাহ যার অনুসরণ করা যায় এবং যা পুরোপুরি স্পষ্ট নীতি, সরল পথ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ। অতএব উক্ত মাসআলায় তাদের বিরোধিতা করা কারো জন্যই জায়েয নেই। আকীদা ও ইবাদাতের

ক্ষেত্রে এর উদাহরণ অনেক এবং এত অধিক যে, তা উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় প্রকার, হল যাতে কতিপয় সাহাবা উক্ত মাসআলা অনুযায়ী আমল করেছেন এবং অধিকাংশ সাহাবা তাদের খেলাফ করেছেন। কেননা স্বল্পসংখ্যক সাহাবা যে মত এখতিয়ার করেছেন এবং যে রূপ আমল করেছেন, অধিকাংশ সাহাবা তা ভিন্ন অন্য মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন ও অন্যরূপ আমল করেছেন। ইমাম শাতেবী 'আল মুয়াফিকাত ফী উসুলুশ শরীয়া' গ্রন্থে (খ. ৩, পৃ. ৫৭) অধিকাংশ সাহাবার অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার প্রসঙ্গে বলেন : "উক্ত ভিন্ন আমলই (তথা অধিকাংশ সাহাবার আমলই) অনুসৃত সুন্নাত এবং সরল পথ।

অন্যদিকে যে কাজটি অল্প সংখ্যক ব্যতীত আর কেউ করেনি, সে কাজটির ব্যাপারে এবং সে অনুযায়ী আমলের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। আর যা অধিক ব্যাপক ও অধিকাংশের আমল, তা-ই সর্বদা করা উচিত। কেননা এ স্বল্পসংখ্যকের বিরোধিতা করে পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক সর্বদা ভিন্ন আমল হয়ত শরয়ী কোন কারণে সাধিত হয়েছে, কিংবা শরয়ী কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে। কিন্তু স্বল্পসংখ্যকের বিপরীত তাদের এ আমল শরয়ী কারণ ছাড়া অন্য কারণে হওয়ার ব্যাপারটি ঠিক নয়।

বরং অবশ্যই তা হয়েছে শরয়ী কোন কারণে, যার ভিত্তিতে তারা আমল করার প্রয়াস পেয়েছেন। আর এ বিষয়টি যখন সাব্যস্ত হয়ে গেল, তখন

স্বল্পসংখ্যকের মতানুযায়ী আমল করার ব্যাপারটি উক্ত শরয়ী কারণটির বিরোধী বলে গণ্য হবে - যার ভিত্তিতে অধিকাংশ সাহাবাগণ চিন্তাভাবনা করে আমল করেছেন। যদিও তা প্রকৃতপক্ষে বিরোধী না হয়ে থাকে। অতএব তারা যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা ও যে আমল তারা সর্বদা করেছেন তদনুরূপ আমল করা জরুরী⁴⁰⁷।

এরপর তিনি বলেন (খ. ৭০, পৃ. ৭১) : ‘এজন্য আমলকারীর উচিত পূর্ববর্তীদের নিয়ম অনুযায়ী যেন আমল করতে পারে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। তাই স্বল্পসংখ্যকের পদ্ধতিতে আমলের অনুমতি সে যেন নিজেকে না দেয়। অবশ্য একান্ত প্রয়োজনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন আমল করা যেতে পারে, যদি তাতে অনুমতি থাকে এবং আমল রহিত হওয়ার কিংবা দলীল শুদ্ধ না হওয়ার আশংকা না থাকে অথবা এমন আশংকা না থাকে যে, পেশকৃত দলীলটি প্রমাণ হিসাবে গণ্য হওয়ার মত শক্তিশালী নয়। কিন্তু যদি কেউ সর্বদা স্বল্পসংখ্যকের আমল অনুসরণ করে, তবে তাতে নিম্নের ব্যাপারগুলো অবধারিত হয়ে পড়বে :

এক : পূর্ববর্তীগণ সর্বদা যে কাজ করতেন তার বিরোধিতা করা অপরিহার্য হয়ে পড়বে। আর পূর্ববর্তী সালাফদের বিরোধিতা করার মধ্যে বড় বিপদ রয়েছে।

⁴⁰⁷ ইমাম শাতেবী অনেকগুলো উদাহরণ পেশ করেছেন। অনুরূপভাবে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াও তার 'আত-তাওয়াসুল ওয়াল অসীলাহ' গ্রন্থে অনেকগুলো উদাহরণ পেশ করেছেন।

দুই : সালাফগণ সর্বদা যে কাজ করতেন তা ছেড়ে দেয়া অবধারিত হয়ে যাবে। কেননা উদ্দেশ্য হল তারা এ বর্ণনাগুলোর বিপরীতমুখী কাজে সর্বদা রত ছিলেন। সুতরাং তারা যে আমল করেননি সে অনুযায়ী আমলে রত থাকা তারা যে আমল সর্বদা করতেন তার বিপরীত।

তিন : এটা অধিকাংশ সাহাবা যে আমল করেছেন তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কারণ এবং বিপরীত আমল (তথা স্বল্পসংখ্যকের আমল) প্রসিদ্ধি লাভ করার হেতু। কেননা কাজের অনুসরণ কথার অনুসরণের চেয়ে সুদূরপ্রসারী। আর এটা যখন ঘটে এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে যার অনুসরণ করা হয়, তখন ব্যাপারটি হয়ে দাঁড়ায় আরও ভয়াবহ।

সাবধান! সাবধান! পূর্ববর্তীদের বিরোধিতা করা থেকে সতর্ক থাকুন। তাতে যদি কোন ফযীলত থাকত, তাহলে পূর্ববর্তীরাই তার বেশী হকদার হতেন। আল্লাহরই সাহায্য প্রার্থনা করছি"। [ইমাম শাতেবীর কথা এখানেই শেষ] আর তৃতীয় প্রকার যাতে উক্ত মাসআলা অনুযায়ী সাহাবাদের কেউই আমল করেননি, এমতাবস্থায় বিতর্কের অবকাশ নেই যে, সকল সাহাবার আমলের বহির্ভূত যে আমল তা বিদ'আত ও নিন্দনীয় - যদি উক্ত কাজের মাধ্যমে আমলকারী তার রবের নৈকট্য লাভের আশা করে। অবশ্য যদি তা (ইবাদাত না হয়ে) আদত তথা দৈনন্দিন প্রথার অন্তর্গত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে নিয়ম হল - তা মুবাহ বলে গণ্য হবে। আর এজন্য যে ব্যক্তিই এমন কোন আমল করে যা সালাফ তথা পূর্ববর্তী আলেমগণের তরীকা মাফিক নয় এবং

কুরআন ও সুন্নাহকে তারা যেভাবে বুঝেছেন সে অনুযায়ীও নয়, তাকে বলা হবে : 'তুমি বাতিলপন্থী, বিদ'আতী ও যে পথ মু'মিনদের নয় সে পথের অনুসারী'। ইলমের সাথে সম্পর্কিত কিছু লোক বিভিন্ন স্বার্থ ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সে সব নব উদ্ভাবিত বিষয় (তথা বিদ'আত) কে উত্তম বলে চালিয়ে দিচ্ছে যদ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবারা নৈকট্য লাভ (তথা ইবাদাত) করেননি। 'এসবই দ্বীনের ক্ষেত্রে ভুল হিসাবে বিবেচিত এবং নাস্তিকদের পথ অনুসরণের নামান্তর। কেননা যারা এ বিষয়গুলো উপলব্ধি করেছে এবং এ পথে চলেছে, হয় শরীয়তকে তারা এমনভাবে বুঝেছে যেমনটি পূর্ববর্তীগণ বুঝেননি, অথবা শরীয়তকে (সঠিকভাবে) বুঝা থেকে তারা দূরে সরে গিয়েছে। এ শেষোক্ত কথাটিই সঠিক। কেননা সালাফে সালাহীনের অগ্রবর্তী-দলই সরল সঠিক পথের উপর ছিলেন। তারা উপরোক্ত দলীলসমূহ প্রভৃতি থেকে তা-ই বুঝেছেন যে নীতির উপর তারা ছিলেন। আর এ নব উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ তাদের মধ্যে ছিল না এবং সে অনুযায়ী তারা আমলও করেননি'।⁴⁰⁸ নব উদ্ভাবিত বিষয়গুলো কয়েক ভাগে বিভক্ত : তন্মধ্যে কিছু আছে শিরক, আর কিছু এমন বিদ'আত যা শিরকের দিকে নিয়ে যায়, আর কিছু এমন বিদ'আত যা সুন্নাহকে মিটিয়ে দেয়। আর এ উদ্ভাবিত বিষয়গুলোর কোন প্রকারই সাহাবা ও তাবেয়ীনের যুগে কখনই ছিল না। কেননা তাদের যুগে এমন কোন কবর ছিল না যার পাশে ইবাদাতের নিয়তে অবস্থান করা হত, যার

⁴⁰⁸ ইমাম শাতেবীর আল মুয়াফাকাত খ. ৩, পৃ. ৭৩।

উপর গম্বুজ নির্মাণ করা হত এবং যার অধিবাসীদের অছিলায় শাফায়াত চাওয়া হত। আর তাদের সময়ে নবী ও সৎ ব্যক্তিবর্গের সম্মান অথবা মান-মর্যাদা কিংবা ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে অসীলা করার ব্যাপারটি ছিল না এবং কবরের কাছে দোয়া করার প্রচলনও ছিল না।

তাদের সময়ে মীলাদ তথা জন্মদিবস পালন এবং মীলাদ-মাহফিল বা জন্মদিবসের অনুষ্ঠান নামেও কিছু ছিল না। মুসলমানদের সর্বসম্মতিক্রমে এসব কিছুই তাদের মাঝে অনুপস্থিত ছিল। অতএব এ-ই যখন অবস্থা, তখন পরবর্তীরা এ বিদ'আতসমূহের উপযোগিতা প্রমাণের জন্য যেসব ভ্রান্ত যুক্তি পেশ করছেন, তা তিনভাগে বিভক্ত :

এক : কুরআনুল কারীমের আয়াত, তারা বাড়াবাড়ি করে এর অর্থ বিকৃত করে নিজ নিজ উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যাখ্যা করছে।

দুই : হাদীস, তা আবার দু' প্রকার :

প্রথম প্রকার : সহীহ হাদীসসমূহ যা তাদের উদ্দেশ্য ও বুঝের মুওয়াফিক নয়। তবে তারা এগুলোর অর্থ নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী বিকৃত করে নিয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার : মিথ্যা ও দুর্বল হাদীস। তাদের কাছে এ ধরনের হাদীসের সংখ্যাই বেশী এবং তারা এগুলো নিয়ে খুবই খুশী। এগুলোর প্রচার ও প্রসারের জন্য চলে তাদের প্রাণান্তকর চেষ্টা।

তিন প্রকার : কিসসা-কাহিনী ও স্বপ্ন, যা তারা পারস্পরিক ধারা পরস্পরায় বর্ণনা করে থাকে এমনভাবে যে, মনে হয় তা শরীয়ত প্রণয়নের একটি উৎস। তারা আল কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা যে দলীল পেশ করছে, তা থেকে নিষ্কৃতির উপায় দু'টিঃ

১. বিদ'আতীগণ যে কথা দ্বারা দলীল পেশ করছে, তা মূলত দলীলের উদ্দিষ্ট অর্থ নয়। কেননা উক্ত দলীল দ্বারা বিদ'আতীরা যা বুঝে থাকে, সালাফের অনুসারী আহলে সুন্নাতের বুঝ তা থেকে ভিন্নতর। অতএব সালাফের বুঝের মাধ্যমে খালাফের বুঝ প্রত্যাখ্যাত হবে।

২. দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথম কথা থেকেই উৎসারিত। আর তা হলো এ প্রশ্ন করা যে, সালাফে সালাহীন কি উক্ত দলীলের ক্ষেত্রে খালাফ তথা পরবর্তী লোকদের বুঝ অনুযায়ী আমল করেছেন, নাকি আমল করেননি?

সর্বসম্মত মত হল, সালাফগণ এ উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ দ্বারা কখনোই আমল করেননি। কোন বিদ'আতীই সালাফগণ থেকে এমন কোন আমল প্রমাণ করতে সক্ষম হবে না, যা সাহাবাদের আমলের খেলাফ। কেননা আহলে সুন্নাত পূর্ববর্তীগণ তথা সাহাবা ও তাবয়ীনের আমলের অনুসারী। আর খালাফগণ এর বিপরীত অবস্থানে রয়েছে। তারা এমন কাজ করে যার নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হয়নি। এ অর্থেই উমার ইবনুল খাত্তাব রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন : “অচিরেই এমন লোকজন আসবে যারা আল কুরআন থেকে কিছু ভ্রান্ত যুক্তি বের করে তা দ্বারা

তোমাদের সাথে ঝগড়া করবে। অতএব তোমরা সুন্নাহ দিয়ে তাদের মোকাবেলা কর। কেননা সুন্নাহ বিশারদগণ আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখে।”⁴⁰⁹ [দারেমী এটি বর্ণনা করেছেন, খ. ১, পৃ. ৪৭; এছাড়া দারাকুতনীসহ আরও অনেকে এটি বর্ণনা করেছেন]⁴¹⁰। এজন্যই কোন বিভ্রান্ত ফিরকা কিংবা খালাফীদের কাউকেই আপনি এমনটি পাবেন না যে, তারা নিজ নিজ মতের উপর বাহ্যিক দলীল পেশ করতে অক্ষম। অথচ এ ক্ষেত্রে দলীল শুদ্ধ হওয়াটাই হল আসল ব্যাপার, দলীল পেশ করতে সমর্থ হওয়া নয়। ইমাম শাতেবী এ ধরনের সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলার পর (খ. ৩, পৃ. ৭৭) বলেন: 'এ কারণেই শরয়ী দলীল ও প্রমাণ নিয়ে যারা চিন্তা গবেষণা করবেন, তাদের উপর ওয়াজিব হলো - উক্ত দলীল থেকে পূর্ববর্তীগণ কি বুঝেছেন ও এ দলীল দ্বারা আমলের ক্ষেত্রে তাদের কি ভূমিকা ছিল, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। কেননা এটাই সত্যে উপনীত হওয়ার অধিক উপযোগী এবং ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে অধিক শক্তিশালী। এ ব্যাপারটি যখন স্পষ্ট হয়ে গেল এবং সত্য প্রতিভাত হল, তখন সালাফে সালাহীনের প্রতি সম্পর্কিত হতে যারা গৌরববোধ করে, তারা উল্লেখিত বিষয়গুলোর পাশাপাশি এটাও জানে যেঃ

⁴⁰⁹ দারেমী এটি বর্ণনা করেছেন, খ. ১, পৃ. ৪৭। এছাড়া লালকাই সুন্নাহ গ্রন্থে এবং ইবনে আবদুল বির 'জামেউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী' গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে দারাকুতনী ও ইবনে আবি যমানাইন 'ফসুলুস সুন্নাহ' গ্রন্থে তা রেওয়ায়েত করেছেন। মাকদেসী আল-হুজ্জাহ আ'লা তারেকিল মাহাজ্জাহ' গ্রন্থে এবং আরও অনেকে এর পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন।

⁴¹⁰ দারেমী এটি বর্ণনা করেছেন, খ. ১, পৃ. ৪৭; এছাড়া দারাকুতনীসহ আরও অনেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

১. সাহাবাদের যে আমলটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত ছিল, তারা সে অনুযায়ী আমল করেছেন।

২. যে আমল মাত্র একজন সাহাবী করেছেন অথবা কিছুসংখ্যক করেছেন আর বাদ বাকী সাহাবারা প্রথমোক্তদের বিরোধিতা করেছেন- এ ক্ষেত্রে তারা বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রত্যাবর্তিত করেছেন, যেমনটি তাদের প্রভু তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা তিনি বলেনঃ

(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)

“কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ করলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক। এটাই উত্তম এবং পরিণামের দিক দিয়ে প্রকৃষ্টতর”। [সূরা আন-নিসা : ৫৯]। এখানে আল্লাহর দিকে বিষয়টি প্রত্যাবর্তিত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এর মানে হল আল্লাহর কালাম তথা অবতারিত কুরআন হাকীমের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকেও প্রত্যাবর্তন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হল তার জীবদ্দশায় তার কাছে প্রত্যাবর্তন করা এবং তার মৃত্যুর পর তার সহীহ সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে অধিকাংশের আমল অনুসরণের জন্য চিন্তা গবেষণা করা। আলহামদুলিল্লাহ! আহলে সুন্নাতের এ নিয়মে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি। এতে কোন গরমিলও দেখা যায়নি। এটা

সুস্পষ্ট নিয়ম এবং পরিষ্কার নীতি ও সরল-সোজা পথ। চার ইমাম তাদের অধিকাংশ মাসআলায় এ নিয়মের উপরই চলেছেন। আল্লাহ তাদেরকে রহম করুন এবং তাদের সাওয়াব বৃদ্ধি করুন।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম ইবাদাতের ক্ষেত্রে যে সকল আমল করেননি, সেগুলো (কেউ করলে তা হবে) উদ্ভাবিত আমল যা খালাফী তথা পরবর্তীরা চালু করেছে।

সাহাবী ও তাবয়ীগণ যা কিছু থেকে বিরত ছিলেন, তা ছিল তাদের সঠিক চিন্তাভাবনা প্রসূত এবং আল-কুরআন ও সুন্নাহর দলীলসমূহকে প্রশংসনীয়রূপে বুঝার কারণে। পরবর্তীকালের বিদ'আত প্রচলনকারীদের তৈরি করা একই আসবাব ও কারণ সাহাবাদের যুগেও পাওয়া যাওয়া সম্ভবে তারা শরীয়তের ব্যাপার ভাল করে বুঝে-শুনেই সে সব পরিত্যাগ করেছিলেন। আর তাদের পরিত্যাগ করার কাজটি (আমাদের জন্য) অনুকরণীয় সুন্নাত এবং অনুসৃত পথ। পরবর্তী লোকজন যে আমল দ্বারা পুণ্য ও সাওয়াব পাওয়ার আশা করে থাকে অথচ সাহাবীরা সে আমল থেকে বিমুখ থেকেছেন, তা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা সাহাবীরা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কল্যাণ লাভের প্রত্যাশী ছিলেন এবং শরীয়তসম্মত ইবাদাতে লিপ্ত হতে সবচেয়ে বেশী চিন্তা-ভাবনা করতেন। তারা শরীয়তসম্মত প্রত্যেকটি আমলকে কার্যে পরিণত করতেন এবং তদ্বারা সাওয়াবের আশা করতেন ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতেন। গ্রহণে ও

বর্জনে, বুদ্ধি ও জ্ঞানে, বুঝে ও আমলে যে ব্যক্তি তাদের অনুসরণ করে, সে কতই না বুদ্ধিমান! আর সকল কল্যাণ ও নৈকট্য লাভের কতই না উপযুক্ত এবং প্রত্যেক ব্যাপারে তাওফীকপ্রাপ্ত হওয়ার কতই না যোগ্য!

উপসংহারঃ উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম অনুযায়ী বলা যায় যে, হুকুমদাতা, বিধানদাতা তথা আল্লাহর বিধান তথা ইসলাম বিধান মানতে হবে এবং এর কোন বিকল্প পথ নেই আর তা না হলে মুসলিম জাতিকে বিদ'আত তথা কুসংস্কার থেকে রক্ষা করা কঠিন। অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, উল্লেখিত কাজ সমূহ নাবী (ﷺ) বা সাহাবায়ে কেরাম দ্বারা প্রমানিত নয় বা তারা কখনও এসব বিদাতী তথা শিরকী আমল করে নি বরং আমাদের উচিত রাসূল (ﷺ) ও তাঁর হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতের অনুসরণ করা। আর এসব বিদ'আতী মূলক কাজ তথা কুসংস্কার মূলক কাজ পরিহার করা প্রত্যেক মুসলিমদের অবশ্য কর্তব্য। কারণ বিদ'আত সৃষ্টিকারীর প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতাসমূহ এবং সবলোকের অভিশাপ হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে রাসূল (ﷺ) এর হাদীস প্রনিধানযোগ্য। আসেম (রাঃ) বলেন, আনাস (রাঃ) থেকে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূল (ﷺ) কি মদীনকে হেরেম আখ্যা দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যা, অমুক স্থান থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত। এ স্থানের কোন গাছ কাটা যাবে না। রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এখানে কোন বিদ'আত সৃষ্টি করবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাসমূহ এবং লোক সকলের অভিশাপ হবে। (সহীহুল বুখারী ও মুসলিম - আল্ লু'লুউ ওয়াল মারজান, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং - ৮৬৫)⁴¹¹।

⁴¹¹ বুখারী ও মুসলিম - আল্ লু'লুউ ওয়াল মারজান, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং - ৮৬৫

অধিকন্তু আরও বলা যায় যে, - বিদ'আতী আমল ও শিরক মুক্ত আমল পরিহার করা এবং মৃত সুন্নাত জীবিত করা। কারন মৃত সুন্নাত জীবিত করার মর্যাদা অনেক বেশি। অতএব, যখন কোন সুন্নাত বিলুপ্ত হয়ে যায়, তার উপর মানুষকে উদ্ধুদ্ধ করা এবং তার উপর আমল করার ফযীলত অনেক। রাসূল (ﷺ) তাই বলেনঃ

مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي، فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ، كَانَ لَهُ
مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا،
وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً، فَعَمِلَ بِهَا، كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ
عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا

“যে ব্যক্তি আমার একটি (মৃত) সুন্নাত জীবিত করে এবং লোকেরা তদানুযায়ী আমল করে, সেও আমলকারীর অনুরূপ পুরস্কার পাবে। এতে আমলকারীর পুরস্কার কিছুমাত্র কম হবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি কোন বিদআতের উদ্ভাবন করে এবং সে অনুযায়ী আমল করা হয়, তার উপর আমলকারীর পাপের বোঝার অনুরূপ বোঝা বর্তাবে। এতে আমলকারীর পাপের পরিমাণ কিছুই কমানো হবে না”। যেমনঃ সমাজে রাফউল ইয়াদাইন, উচ্চস্বরে আমীন বলা এসব সহীহ হাদীসগুলো প্রায় মাযহাবপন্থীদের অত্যাচারে প্রায় বাতিল পর্যায়ে। সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনায় বলা যায় যে, বিদ'আত একটি ঈমান বিধ্বংসী কাজ। তাই যারা রাসূলের সুন্নাতকে ভালোবাসেন তাদের উচিত নির্বাক, নিশ্চুপ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে না থেকে বিদ'আত প্রতিরোধে ও নবীর সুন্নাত প্রতিষ্ঠায় ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান সুসংঘবদ্ধ একদল মুমিন তৈরীতে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা

চালিয়ে যাওয়া। অন্যথায় এ সমাজ বিদ'আতের প্রবল স্রোতে ভেসে যেতে পারে রসাতলে। বিদ'আতের মূলোৎপাটন করে কেবল রাসুলের পোশাকী সুন্নত নয় বরং তার আনীত জীবন বিধান কুরআনের আহকাম ও দ্বীনকে পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই সমাজ থেকে সকল প্রকার অবিচার-অনাচার শিরক, বিদ'আত ইত্যাদি আপনা-আপনী দুরীভূত হয়ে যাবে। কারণ দ্বীন কায়েম হচ্ছে সকল ফরযের বড় ফরয। তাই আসুন, আমরা বিদ'আতী তথা কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ার প্রচেষ্টায় এসব বিলুপ্ত প্রায় সুন্নতী আমলগুলো জিন্দা করি এবং সওয়াব ও নেকী অর্জন করি। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

(সমাপ্ত)

